নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন

প্রথম ভাগ

[তত্ত্বাংশ]

"একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র"-প্রণেতা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৯৩২

মূল্য দুই টাকা আট আনা।

উৎসর্গ

১৯৩২ সনে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যে সকল শিশুর জন্ম

তাহারা যখন আঠার বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবে

সেই সময়কার যুবক-বাঙ্গলার হাত-পা'র

জোর আর মাথার জোরকে উদ্দেশ্য

করিয়া এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

কলিকাতা, ১৪ এপ্রিল, ১৯৩২।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ—তত্ত্বাংশ

২০০
Accn No. 28 ৫৫৬
Dt. of accn. 08/02/2009

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" দুইভাগে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথমভাগে * সতরটা রচনা স্থান পাইয়াছে। তাহার প্রায় বার আনা বক্তৃতা। শর্টহ্যাণ্ডের সাহায্যে বক্তৃতাস্থলে কথাগুলা ধরিয়া রাখা হইয়াছিল। অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্তৃতার সারমর্ম্ম মাত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। পরে গ্রন্থকারের সংশোধন সহ এই সব রচনা "মাসিক বঙ্গবাণী", "আত্মশক্তি", "নবশক্তি", "আনন্দবাজার", "শিক্ষা ও সাহিত্য", "উত্তরা", "সুবর্ণ বণিক সমাচার", "জীবনের আলো", "সওগাত", "বাঙ্গলার কথা", "আর্থিক উন্নতি", "অঞ্জলি" ইত্যাদি মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পত্রিকাগুলা সবই "নয়া বাঙ্গলার" সাহিত্যমূর্ত্তি। ১৯১৪-১৮ সনের পূর্ব্বে ইহাদের একটারও জন্ম হয় নাই। প্রবন্ধগুলার কোনো কোনোটা একাধিক পত্রে বাহির হইয়াছে। স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারেও একাধিক প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতার তারিখ ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫। বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রকাশের জন্য বক্তৃতাগুলার স্থানে স্থানে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বাড়ানো কমানো হইয়াছে।

প্রথমভাগের অন্তর্গত চারটা রচনা গ্রন্থকার-প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের ভূমিকা। গ্রন্থগুলা সবই বিদেশে লেখা। মাত্র একটা ভূমিকা দেশে

* প্রথমভাগের প্রধান কথা "জ্ঞানকাণ্ড", "থিয়োরি" বা তত্ত্বাংশ। দ্বিতীয়ভাগে প্রধানতঃ কর্ম্মকৌশল আলোচিত হইয়াছে।

ফিরিবার পর লেখা হইয়াছে। অন্যান্যগুলা ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই ভূমিকাগুলার সঙ্গে বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রধান প্রধান বক্তব্য সমূহের আত্মিক যোগ আছে বলিয়া সেই সমুদয় পুনর্মুদ্রিত করা হইল। অধিকন্তু কয়েকখানা বই বাজারে আর পাওয়া যায় না।

"বিদেশ-ফের্ত্তার অত্যাচার" প্রবন্ধ ইতালিতে লেখা হইয়াছিল। ইহাই গ্রন্থকারের প্রথমবারকার প্রবাস-জীবনের শেষ বাঙ্গলা রচনা (১৯২৫ সনের মাঝামাঝি)।

অবশিষ্ট রচনাগুলার সন তারিখ যথাস্থানে লেখা আছে।

১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর হইতে আজ পর্য্যন্ত বিনয়বাবুর সঙ্গে বোম্বাই, এলাহাবাদ ও কলিকাতার বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই গুলার সবই ইংরেজিতে প্রকাশিত। তাহা ছাড়া নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁহাকে নানা উপলক্ষ্যে ইংরেজিতে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। এই সকল ইংরেজি কথাবার্ত্তা ও বক্তৃতার বেশী-কিছু বর্ত্তমান গ্রন্থের জন্য অনূদিত হয় নাই। "গ্রীটিংস্ টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের নিকট সম্ভাষণ) নামক ইংরেজিগ্রন্থে (কলিকাতা, ১৯২৭) তাহার কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদেশে দুইবারে চোদ্দ বৎসর

বিনয় বাবু প্রথমবার ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন ১৯১৪ সনের ৮ই এপ্রিল তারিখে। প্রায় সাড়ে এগার বৎসর পর ১৯২৫ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি বোম্বাই সহরে পদার্পণ করেন। দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন কলম্বোয় ১৯২৯ সনের ১৩ই মে,—ফিরিয়া আসেন বোম্বাইয়ে ১৯৩১ সনের ২০এ অক্টোবর। দুই বারকার সমবেত চোদ্দ বৎসরের প্রবাস-জীবনের সঙ্গে তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চা সুজড়িত।

"নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" গ্রন্থের রচনাগুলা, কয়েকটা বাদে, ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৯ সনের মে পর্য্যন্ত পৌনে চার বৎসর আর ১৯৩১ সনের অক্টোবর হইতে ১৯৩২ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় সাত মাসের লেখা এই সওয়া চার বৎসরের চিন্তাপ্রণালীর উপর প্রবাসের চোদ্দ বৎসরের অনুসন্ধান-গবেষণা অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই কারণে প্রবাস-জীবনের লেখাপড়া ও অন্যান্য আবহাওয়ার কিছু পরিচয় বর্ত্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে।

"বর্ত্তমান জগৎ"

বিনয় বাবুর বিদেশ-বিষয়ক গবেষণার ফল বাঙ্গলা ভাষায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে, যথা :—(১) কবরের দেশে দিন পনর (মিশর) (১৯১৬, ২০০ পৃষ্ঠা) (২) ইংরেজের জন্মভূমি (১৯১৬, ৫৮৬ পৃষ্ঠা) (৩) বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (১৯১৫, ১৩০ পৃষ্ঠা) (৪) ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ (১৯২২, ৮২৪ পৃষ্ঠা) (৫) নবীন এশিয়ার জন্মদাতা জাপান (১৯২৭, ৫০০ পৃষ্ঠা) (৬) বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য (১৯২৮, ৪৫০ পৃষ্ঠা) (৭) সুইটসার্ল্যাণ্ড (১৯২৯, ৭৫ পৃষ্ঠা), (৮) ইতালিতে বারকয়েক (১৯৩২, ৩০০ পৃষ্ঠা)।

অন্যান্য পুস্তকের অন্তর্গত বিষয়গুলি বিভিন্ন পত্রিকায় বাহির হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে বইয়ের আকারে বাহির করিবার জন্য ছাপান হইতেছে। এই সমস্ত পুস্তকে নিম্নলিখিত দেশগুলিসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে যথা :—(১) প্যারিসে দশ মাস (প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা) (২) পরাজিত জার্ম্মানি ও অষ্ট্রিয়া (প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা)।

গ্রন্থকার এই দশখানি পুস্তকে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য, কলা

এবং সমাজসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বর্ত্তমান কালের গতি কোন্ পথে চলিতেছে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সময়কার আর একখানি পুস্তক ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান নজির অবলম্বনে একালের আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন সম্বন্ধে লিখিত। পুস্তকখানির নাম "দুনিয়ার আবহাওয়া" (৩২০ পৃষ্ঠা, ১৯২৬)। "নবীন রুশিয়ার জীবন প্রভাত" নামক একখানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধের আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বোলশেভিক বিপ্লবের তের চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা আলোচিত হইয়াছে। এই দুইখানা বই অবশ্য ভ্রমণ বৃত্তান্তের সামিল নয়। এই বারখানা বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০০০ এর কিছু উপর। "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলী সভ্যতা-বিজ্ঞানের এক বিশ্বকোষ বিশেষ।

চীনা সভ্যতা ও যুবক ভারত

আরও পাঁচখানা বাংলা বই বিদেশে প্রবাস কালেরই রচনা। সেই সবও ভ্রমণ-কাহিনীর অন্তর্গত নয়। একখানার নাম "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ" (২৫০ পৃষ্ঠা)। এই বইখানি ১৯২৩ সনে ছাপান হইয়াছে। প্রাচীন চীনের সভ্যতা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর লেখা বই বোধহয় এই প্রথম। এই বইয়ের আলোচ্য বস্তু তাঁহারই প্রণীত "বর্ত্তমানযুগে চীন সাম্রাজ্য" হইতে সম্পূর্ণ রূপেই পৃথক। "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ" ভারত-পর্য্যটক যুয়ানচুআ-ঙের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। আর "বর্ত্তমানযুগে চীন সাম্রাজ্য" কাঙ-যু-ওয়ে ও লিয়াঙ্-চি-চাও এই দুইজন আধুনিক চীন-নায়কের নামে উৎসর্গীকৃত।

চীনের বহু পল্লীতে এবং নানা সহরে বিনয়বাবু মোটের উপর এক বৎসর (১৯১৫-১৯১৬) কাটাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান এবং প্রাচীন

চীন সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা ও অনুসন্ধান একাধিক ইংরেজি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ বাংলা দেশে চীনের কথা শুনিবার জন্য এবং বুঝিবার জন্য আগ্রহ দেখা যাইতেছে। বাঙালীর লেখা চীনবিষয়ক চাক্ষুষ গ্রন্থ বাঙালী পাঠকগণের বিশেষ কাজে আসিবে। বিনয় বাবুর যে সকল ইংরেজি বইয়ে চীন বিষয়ক রচনা বাহির হইয়াছে এই সঙ্গে সেই বইগুলা নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

১। চাইনীজ রিলিজ্যন থ্রু হিন্দু আইজ্ (হিন্দু চোখে চীনা ধর্ম্ম) (শাংহাই, ১৯১৬, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)। চীনের পররাষ্ট্র-দূত ডক্টর উ তিং-ফাঙ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে চীন, জাপান এবং ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র যুগের পর যুগ ধরিয়া একসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। ভার [illegible] সঙ্গে ইয়োরোপের নানা যুগের তথ্যও তুলনায় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

২। "দি ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" (যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা) (লাইপ্ৎসিগ্ ৪১০ পৃষ্ঠা, ১৯২২)। এই গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান চীনের আর্থিক রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা বিবৃত আছে। অধ্যায়গুলা আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থকারের প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর সারমর্ম্ম। আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকায় এই সকল অধ্যায় বাহির হইয়াছিল।

৩। দি পলিটিকস্ অব বাউণ্ডারীজ্ (সীমানার রাষ্ট্রনীতি) (কলিকাতা ১৯২৬, ৩৪০ পৃষ্ঠা)। এই গ্রন্থের তিন অধ্যায় চীন, জাপান ও সিঙ্গাপুরের বর্ত্তমান সমস্যা লইয়া লিখিত। ফরাসী, জার্ম্মান এবং ইতালিয়ান নজির ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪। "গ্রীটিংস্ টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের নিকট সম্ভাষণ)

(কলিকাতা, ১৫৮ পৃষ্ঠা, ১৯২৭)। এই গ্রন্থে ১৯২৬—২৭ সনের চীন-সমস্যা আলোচিত হইয়াছে।

চীন-কথাকে ভারতীয় চিন্তামণ্ডলে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস বিনয় বাবুর বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের (মোটের উপর প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠা) অন্যতম লক্ষ্য দেখিতে পাই। ১৯১৫—১৬ সনের দেড় দুই বৎসর ধরিয়া জাপান, কোরীয়া, মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনের বিভিন্ন সমাজে তিনি যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন সেই সমুদয়ের ফলই এই সকল গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। "চীনাধর্ম্ম" বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থের কিয়দংশ বিলাতী "রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি" নামক পরিষদের শাংহাই-শাখার বক্তৃতারূপে বাহির হইয়াছিল। এই পরিষদের তিনি আজীবন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। "চীনা ধর্ম্ম" গ্রন্থ শাংহাইয়ের "ন্যাশনাল রিভিউ" নামক বিদেশী-পরিচালিত ইংরেজি পত্রিকায় আগাগোড়া বাহির হইয়াছে।

চীনা সাহিত্য-সেবী ও শিক্ষা-প্রচারকদের বিভিন্ন পরিষদে তিনি বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পিকিঙের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। তাঁহার কোনো কোনো বক্তৃতা চীনা সুধীদের সম্পাদিত চীনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মার্কিন পণ্ডিত গিল্‌বার্ট রীড্-প্রতিষ্ঠিত "ইন্টারন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট্" সভায় তিনি অনেকবার বক্তৃতা করিবার জন্য আহুত হন। উচ্চশিক্ষিত চীনা সমাজের ভিতর ভারতীয় চিন্তাধারা তাহার ফলে সুবিস্তৃত রূপে প্রবেশ লাভ করে। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যুবক চীনের বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিক্ষা বিষয়ক নানা প্রতিষ্ঠান চীনা সমাজে এশিয়ার প্রাচীন ও বর্ত্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে পঠন-পাঠনের স্থায়ী ব্যবস্থা করিতেছিল। কিন্তু পাকা বন্দোবস্ত ঘটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বিনয় বাবু চীন পরিত্যাগ করেন।

হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-সাধনা

"চীনা সভ্যতা" বিষয়ক বইয়ের মতনই "হিন্দু-রাষ্ট্রের গড়ন" (৩৮২ পৃষ্ঠা) ও বিদেশ প্রবাসের সময় প্রণীত। কিন্তু এই বই বাহির হইয়াছে বিনয় বাবুর স্বদেশে ফিরিবার পর (১৯২৬)। প্রকাশক জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ। হিন্দু সমাজ রাষ্ট্র-শাসনে কিরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল তাহা বাংলা ভাষার সাহায্যে জানিবার উপায় এই প্রথম। প্রত্যেক খুঁটিনাটি বুঝাইবার জন্য গ্রীক, রোমান, মধ্যযুগের ইয়োরোপীয়ান এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমাজের আইন, দণ্ডনীতি, রাজস্ব-ব্যবস্থা, নগর-শাসন, পল্লী-স্বরাজ, সমর-বিজ্ঞান, সাম্রাজ্য-নিষ্ঠা ইত্যাদি সব কিছুই খুলিয়া ধরা হইয়াছে। ভারতীয় "গণ" (রিপাব্লিক) তন্ত্রের যথার্থ মূর্ত্তি ও বিশেষ-রূপে বিবৃত আছে।

তিনখানা ধনবিজ্ঞানবিষয়ক বঙ্গানুবাদ

ঐ সময়ের মধ্যেই বিনয় বাবু ধন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বইগুলির বঙ্গানুবাদ রচনা করিয়াছেন :—

(১) জার্ম্মান ধন-বিজ্ঞানপণ্ডিত ফ্রেডরিক লিষ্ট প্রণীত "স্বদেশী ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশ। অনুবাদ গ্রন্থাকারে (২৫০ পৃষ্ঠা) বাহির হইল (১৯৩২)। নাম "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি"। এই অনুবাদের প্রথম কয়েক অধ্যায় (১৯১৩—১৪) সনের পূর্ব্বে বিভিন্ন পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

(২) ফরাসী ধন-বিজ্ঞান-পণ্ডিত লাফার্গ প্রণীত গ্রন্থের তর্জ্জমা "ধনদৌলতের-রূপান্তর" নামে বাহির হইয়াছে (২৫০ পৃষ্ঠা, ১৯২৭)।

(৩) জার্ম্মান ধন-বিজ্ঞান-পণ্ডিত এঙ্গেল্‌সের বই "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নামে অনূদিত হইয়াছে (৩৪০ পৃষ্ঠা, ১৯২৬)। ধনবিজ্ঞান বিস্তায়

যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিলেন জার্ম্মান পণ্ডিত, সমাজ-সেবক এঙ্গেল্‌স্‌। তাঁহার গ্রন্থ পৃথিবীর সকল বড় বড় ভাষায়ই পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা প্রকাশ করিলেন বিনয় বাবু। এই বইটা পড়িলে বর্ত্তমান জগতের ধনোৎপাদন ও মজুর-সমস্যা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার সাহায্য পাওয়া যাইবে।

"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর"

এই তিনখানা ধন-বিজ্ঞান বিষয়ক বই ছাড়া বিনয় বাবুর লেখা আর একখানা বাঙ্গলা অনুবাদ-পুস্তক আছে। নাম "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর"। দেশে থাকিবার সময়েই তর্জ্জমা শেষ হয়। কিন্তু গ্রন্থকারের এই অনুবাদ প্রথম বাহির হইয়াছিল ১৯১৪—১৫ সনে।

বিশ্বসভ্যতা ও সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থাবলী

প্রথমবারকার বিদেশ-প্রবাসের সময় যে সকল বাংলা বই লিখিত হইয়াছিল তাহার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৫,৫০০। এই সময়ের ভিতরই বিনয় বাবু কতকগুলা ইংরেজি বইও লিখিয়াছেন। বইগুলা চীন, জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জার্ম্মানি এই পাঁচ দেশে প্রকাশিত হইয়াছে। কোনো কোনোটা ভারতবর্ষেও বাহির হইয়াছে। এই বইগুলার ভিতর ভারতীয় জীবন-কথা ও এশিয়ার সভ্যতার নানা অঙ্গ বিশ্লেষিত আছে। কিন্তু প্রত্যেক রচনাই তুলনামূলক। দেশ-বিদেশের তথ্য প্রত্যেক গ্রন্থেই অনেক স্থান অধিকার করিতেছে। কাজেই এই সমগ্র ইংরেজি রচনা বিশ্বসভ্যতা ও সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যের অন্তর্গত।

বইগুলার নাম নিম্নরূপ :—

(১) "হিন্দু চোখে চীনা ধর্ম্ম" ("চাইনীজ্‌ রিলিজ্যিন থ্রু হিন্দু আইজ্‌" (১৯১৬, শাঙহাই, ৩৬০ পৃষ্ঠা)

(২) "হিন্দু সাহিত্যে প্রেম-কথা" (ল্যভ্ ইন্ হিন্দু লিটরেচ্যর) (১৯১৬, তোকিও, ৯৫ পৃষ্ঠা)

(৩) "হিন্দু সভ্যতায় জনসাধারণের জীবন" (দি ফোক-এলিমেণ্ট ইন্ হিন্দু কালচ্যর) (১৯১৭, লণ্ডন, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

(৪) "ভৌতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে হিন্দুজাতির কৃতিত্ব" (হিন্দু অ্যাচীভ্‌মেণ্টস্ ইন্ এক্‌জ্যাক্ট্ সায়েন্স) (১৯১৮, নিউইয়র্ক, ৯৫ পৃষ্ঠা)

(৫) "হিন্দু জাতির সুকুমার-শিল্পে মানব-নিষ্ঠা ও আধুনিকতা" (হিন্দু আর্ট ; ইট্‌স্ হিউম্যানিজম্ অ্যাণ্ড মডার্নিজম্) প্রবন্ধ (১৯২০, নিউইয়র্ক, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৬) "হিন্দু সমাজ-তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি" (দি পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব্ হিন্দু সোসিওলজি) ২য় খণ্ড (রাষ্ট্র-নৈতিক) প্রথম ভাগ (১৯২১ পাণিনি আফিস্, এলাহাবাদ, ১২৬ পৃষ্ঠা)। প্রথম খণ্ড ১৯১৪ সনের প্রথম দিকে বাহির হইয়াছিল।

(৭) "হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র-দর্শন" (দি পোলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশ্যন্‌স্ অ্যাণ্ড থিয়োরিজ অব দি হিন্দুজ) (১৯২২ লাইপৎসিগ, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

(৮) "যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা" (দি ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া) (১৯২২, লাইপৎসিগ্ ৪০৯ পৃষ্ঠা)

(৯) "যুবক ভারতের সুকুমার শিল্প" (দি এস্থেটিক্‌স্ অব ইয়ং ইণ্ডিয়া) (১৯২৩, কলিকাতা ১২০ পৃষ্ঠা)

(১০) "হিন্দু সমাজ-তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি" (দি পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোসিওলজি) ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ। ইতালিয়ান ভাষায় প্রাচীন হিন্দু রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা আছে তাহার বিবরণ এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট। (১২০ পৃষ্ঠা এলাহাবাদ, ১৯২৬)।

ইংরেজিতে লেখা তুলনা-মূলক সমাজ-তত্ত্ব বিষয়ক বইগুলার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ২০০০। সবই প্রথমবারকার প্রবাসের সময়ে বিদেশে লেখা।

এই সকল বইয়ের বহুসংখ্যক সুদীর্ঘ সমালোচনা ইংরেজি, মার্কিন, ইতালিয়ান, ফরাসী ও জার্ম্মাণ দৈনিক, বৈজ্ঞানিক ও পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তুলনা-মূলক সমাজ-বিজ্ঞানে বিনয় বাবু হিন্দু ও এশিয়ান সভ্যতার তরফ হইতে যে সকল বিশেষত্বপূর্ণ তথ্য ও ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছেন সেই দিকে বিদেশী পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বিদেশী পত্রিকাসমূহে বিনয় বাবুর রচনাবলী সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা বাহির হইয়াছে, সেই সব একত্র করিলে একখানা পাঁচ ছয়শ' পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বই প্রকাশিত হইতে পারে। এই সকল সমালোচনা-লেখকদের মধ্যে অনেকেই জগৎ-প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ। তাঁহাদের মতামতের দুএক অংশ বিনয় বাবুর "দি পোলিটিকাল ফিলজফীজ্ সিন্স ১৯০৫" (১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী রাষ্ট্র-দর্শন সমূহ) নামক ইংরেজি গ্রন্থের (মাদ্রাজ ১৯২৮, ৪০০ পৃষ্ঠা) মেজর বামনদাস বসু কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকায় স্থান পাইয়াছে।

ইংরেজিতে কবিতা-পুস্তক

বিনয় বাবুর কয়েকটা ইংরেজি কবিতা ১৯১৭ সনে আমেরিকার মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। পরে ১৯১৮ সনে "দি ব্লিস্ অব্ এ মোমেন্ট" (মুহূর্ত্তের আনন্দ) নামে তাঁহার একখানা গ্রন্থ বষ্টনের "পোয়েট-লোর" কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ পাঁচ অংশে বিভক্ত। মোটের উপর ৭৫টা কবিতা আছে। প্রথম সংস্করণ অনেক দিন হইল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। "বষ্টন ট্র্যান্স্ক্রিপ্ট" এবং নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন পত্রিকায় এই গ্রন্থের বিশেষত্বগুলা সবিশেষ আলোচিত হইয়াছিল।

ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান রচনা

বিনয় বাবুর জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত একখানি গ্রন্থের নাম "ডী লেবেন্স্-আন্শাউঙ্ ডেস্ ইণ্ডার্স" (হিন্দু জাতির জীবন দর্শন) (লাইপ্ৎসিগ, ১৯২৩, ৯ পৃষ্ঠা)। ফরাসী ভাষায় লিখিত তাঁহার কোনো কোনো রচনা "সেআঁস এ ত্রাভো দ্যলাকাদেমী দে সিআঁস মরাল এ পোলিটিক্" নামক ফরাসী রাষ্ট্র-বিজ্ঞান-পরিষৎ-পত্রিকায় ও অন্যান্য পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। সকল লেখা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। রচনাগুলা গ্রন্থাকারে বাহির হইবে। ইতালিয়ান ভাষায়ও বিনয়বাবু ইতালিয়ান ধনবিজ্ঞান-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষায় বিনয় বাবুর রচনা সংখ্যা ১৯২০-২৫ এর যুগে ১৭টা আর ১৯৩০-৩১ এর যুগে ৩৫টা

যুদ্ধের পরবর্ত্তী অর্থ, রাষ্ট্র ও জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক তিনখানি পুস্তক

প্রথমবারকার বিদেশে অবস্থানকালে বিনয়বাবু একালের দুনিয়া সম্বন্ধে তিনখানি বহি ইংরেজিতে লিখিয়াছেন। একখানি গ্রন্থের নাম "সীমানার রাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের ঝোঁক" ("দি পলিটিক্স্ অব বাউণ্ডারীজ অ্যাণ্ড টেণ্ডেন্সীজ্ ইন ইন্টার-ন্যাশনাল রেলেশনস্" (কলিকাতা ১৯২৬, পৃষ্ঠা)। দ্বিতীয় খানির নাম "গ্রন্থাবলী ও জ্ঞান-বিজ্ঞান" (বিব্লিওগ্র্যাফিকাল, কাল্চার‍্যাল অ্যাণ্ড এডুকেশন্যাল নিউজ ফ্রম্ আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি অ্যাণ্ড ইতালি ৩৫০ পৃষ্ঠা)। তৃতীয় খানির নাম "নয়া দুনিয়ার আর্থিক ক্রমবিকাশ" (ইকনমিক ডেভেলাপ্মেণ্ট, স্ন্যাপ্শাট্স্ অব ওয়ার্ল্ড মুভমেণ্টস্ ইন কমার্স, ইকনমিক্ লেজিস্লেশ্যান, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজ্ম্ অ্যাণ্ড টেকনিক্যাল

এডুকেশ্যান) (মাদ্রাজ, ১৯২৬, ৪৫০ পৃষ্ঠা)। প্রথম ও তৃতীয় বই দুখানি ইতিপূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয় বইখানির অনেকাংশ কলেজিয়ান (কলিকাতা) পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। অন্যান্য অংশও নানা পত্রিকায় বাহির হইয়া গিয়াছে।

বার্লিনে "কমার্শিয়াল নিউজ"-সম্পাদক

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে বিনয়বাবু ১৯২২ সাল হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির বার্লিনস্থ "কমার্শিয়াল নিউজ" (বাণিজ্য সংবাদ) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের সুযোগ সুবিধা প্রচার করা পত্রিকাখানির অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। "ইণ্ডো-অয়রোপেয়িশে হাণ্ডেলস্ গেজেল শাফ্ট্" নামক বণিক-কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকা প্রকাশিত হইত।

কাশীর হিন্দি "আজ" পত্রিকায় প্রবন্ধ

বিদেশে ভ্রমণকালে বিনয়বাবু তাঁহার বন্ধু, কাশীর শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আজ" নামক হিন্দি দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত চিঠি লিখিতেন। রচনাগুলা ১৯২১ সনের প্রথম হইতে ১৯২৫ সনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত "হামারী য়োরোপকী চিট্‌ঠি" নামে বাহির হইয়াছে। এইগুলা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কয়েকটা মাত্র নিজের হিন্দি লেখা। অন্যগুলা তাঁহার বাংলা হইতে তর্জ্জমা।

প্রবাস-জীবনের কয়েকটা নিদর্শন

বিনয়বাবু বিভিন্ন বিদেশী সমাজে কোথায় কিরূপ কাজ করিয়াছেন তাহার কয়েকটা নিদর্শন নিম্নে বিবৃত হইতেছে। এই সমুদয় হইতে তাঁহার প্রবাস-জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অধ্যাপক ডুয়ী ও সেলিগ্‌ম্যানের ইস্তাহার

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডুয়ী একালের দর্শন-জগতে অন্যতম ধুরন্ধর। তাঁহার সহযোগী, অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যান নিজ বিদ্যা-ক্ষেত্রে—ধনবিজ্ঞান বিদ্যায় জগৎপ্রসিদ্ধ। বিনয় বাবুর গবেষণা, বক্তৃতাবলী ও গ্রন্থ-প্রবন্ধাদির আলোচনা-প্রণালী এই দুইজন মার্কিন পণ্ডিতের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিষৎ সমূহে তাঁহাদের সমব্যবসায়ী পণ্ডিতগণের নিকট অধ্যাপক ডুয়ী ও সেলিগ্‌ম্যান একখানা ইস্তাহার জারি করেন। ইস্তাহারখানির কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ :—

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক।
৪ঠা জানুয়ারী ১৯১৮।

"নিম্নে যাহাদের নাম সহি রহিল তাঁহারা পরম পরিতোষের সহিত এই দেশে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের অবস্থান সম্বন্ধে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নিবেদন করিতেছেন। বিনয় বাবু একজন বিশিষ্ট ভারতীয় সুধী। তিনি রাজনীতি, ধনবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ তথ্যমূলক কতকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহার একটী প্রবন্ধ "পোলিটিক্যাল সায়েন্স কোয়ার্টারলি" নামক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সত্বর প্রকাশ করিবার জন্য লওয়া হইয়াছে। প্রাচ্য দেশীয় রাষ্ট্র-দর্শন সম্বন্ধে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার বসন্তকালে তিনি দুইটী বক্তৃতা দান করিবেন। ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দুইটী বক্তৃতা দান করিয়াছেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক শ্রীযুত হানকিন্স মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য হইতে আমরা নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বহুদিন ধরিয়া আমি এমন সুন্দর ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করি নাই। এই ব্যক্তির পাণ্ডিত্য খুব ব্যাপক ও সুনিয়ন্ত্রিত। তিনি একাধারে দার্শনিক, কবি ও ঐতিহাসিক। * * * যে সমস্ত বিষয়ে আমেরিকার আরও অনেক বেশী জ্ঞান থাকা উচিত সে সমস্ত বিষয়ে ইনি বাস্তবিকই প্রচুর তথ্যের অধিকারী। এই ব্যক্তির বীর্য্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আছে, আর ইঁহার ধরণ-ধারণও সুন্দর। এইজন্য ইনি লোকজনের সম্মান দখল করিতে সমর্থ হইবেন।"

উপরোক্ত কথাগুলি যে খাঁটী সত্য সে সম্বন্ধে আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে স্বীকার করিতে পারিতেছি বলিয়া আমরা আনন্দিত। বিশেষতঃ আজকালকার এই গোলযোগের সময় যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানের দরকার তখন আমরা কুণ্ঠাশূন্য চিত্তে বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহারা প্রাচ্য দেশীয় জ্ঞানরাজ্যের এই খ্যাতনামা প্রতিনিধির সংস্পর্শে আসিবার জন্য তাঁহাদের ছাত্র দিগকে অবসর দান করেন * * *

(স্বাক্ষরিত) জন ডুয়ী
দর্শনের অধ্যাপক
এড্‌ইন, আর, এ, সেলিগ্‌ম্যান
ম্যাক্‌ভিকার প্রোফেসর অব পোলিটিক্যাল ইকনমি।'

আন্তর্জ্জাতিক পত্রিকায় সম্পাদক

১৯১৯ সনের জুন মাসে আমেরিকার ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিনয় বাবুর নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি আসে :—

"উর্স্টার ম্যাসাচুসেট্স।
৯ই জুন, ১৯১৯

"প্রিয় অধ্যাপক সরকার,

"আপনার অল্পকাল পূর্ব্বের প্রবন্ধগুলি দি জার্ণাল অব্ রেস্ ডেভেলাপ্মেণ্ট পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া আমরা এতই আনন্দ লাভ করিয়াছি যে সম্পাদক মহাশয়গণ আপনাকে এই পত্রিকার একজন প্রবন্ধ লেখক-সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে আন্তরিকতার সহিত আমন্ত্রণ করিতেছেন। এইটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, প্রেসিডেণ্ট ষ্ট্যান্লি হল ও আমার হাতে বর্ত্তমানে পত্রিকা প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব রহিয়াছে।

"এই আমন্ত্রণ যদি আপনার মনঃপূত হয় তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন। আমার বিশ্বাস, আগামী জুলাই সংখ্যায় আপনার নাম পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার এখনও সময় আছে।

আপনার অকপট মিত্র,
(স্বাক্ষরিত) জি, এইচ্, ব্লেক্স্লি।"

ইতালিয়ান অর্থশাস্ত্রী সেনেটার পান্তালেঅনির পত্র

১৯২০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ইতালির রোম হইতে বিনয় বাবুর নিকট আমেরিকায় নিম্নলিখিত পত্রখানি আসে। ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক সেনেটার পান্তালেঅনি এই পত্রের লেখক।

রোম, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯২০
৪ ভিয়া জুলিয়া

"প্রিয় অধ্যাপক মহাশয়,

"শিল্পী ও বণিক শ্রেণী" বিষয়ক আপনার প্রবন্ধটি পাইয়াছি। পাইয়াই তৎক্ষণাৎ উহা জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি নামক পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছি।

"আপনি যে আমাদের কথা ভাবিয়াছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার লেখনী প্রসূত যে কোনো প্রবন্ধ আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিব।

"আপনার বর্ত্তমান প্রবন্ধটি আমার বিবেচনায় জ্যর্ণালের মতন খাঁটী বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদি আপনি রাজনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ (রাজনীতি এখানে বিস্তৃতভাবে বুঝিতে হইবে) প্রদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে চান তাহা হইলে আমি পলিতিকা অথবা ভিতা ইতালিয়ানার মতন রিভিউয়ে ছাপিবার ব্যবস্থা করিতে পারি।

আপনার—
(স্বাক্ষর) মাফেও পান্তালেঅনি"

ফরাসী ধনবিজ্ঞান-পরিষদের চিঠি

১৯২১ সনে প্যারিসের "সোসিয়েতে দেকোনোমী পোলিটিক" নামক ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষদ তাঁহাদের দ্বিতীয় সভাপতি সেনেটার রাফায়েল জর্জ লেভির মনোনয়নে বিনয় বাবুকে তাঁহাদের সভ্য নির্ব্বাচিত করেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহাদের প্রথম সভাপতি শ্রীযুক্ত ঈভ গীয়ো তাঁহাকে একখানি চিঠি দিয়াছেন। ঐ চিঠিতে তিনি ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের

সঙ্গে ফরাসী অর্থশাস্ত্রীদের নিয়মিত চিন্তা-বিনিময়ের কথা আলোচনা করিয়াছেন। চিঠিখানির বাংলা তর্জ্জমা নিম্নরূপ :—

প্যারিস, ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯২১

প্রিয় সহযোগী মহাশয়,

আমরা আপনাকে ফরাসী ধন-বিজ্ঞানপরিষদের সভ্যরূপে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যা একটী আন্তর্জ্জাতিক শাস্ত্র। পাটীগণিত এবং জ্যামিতি যেমন সনাতন ও সার্ব্বজনীন, অর্থশাস্ত্রও সেইরূপ। কোনো দেশের সীমানা দ্বারা এই শাস্ত্রের সত্যসমূহকে গণ্ডীবদ্ধ করা যায় না। যে সকল সত্য এই বিদ্যার অধিকৃত অথবা যে সকল সত্য অধিকার করিবার জন্য এই বিদ্যার গবেষকেরা চেষ্টিত তাহার কোনোটাই সীমাবদ্ধ নহে। এই বিদ্যা সম্বন্ধে এইরূপ বলা সম্ভব নয় যে পিরিনীজ পাহাড়ের এপারকার যা কিছু সবই সত্য আর ওপারের সব হইতেছে অসত্য। প্যারিসে যা সত্য তাহা বোম্বে এবং কলিকাতায়ও সমান ভাবে সত্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী ফিজিঅক্রাৎ অর্থাৎ প্রকৃতিনিষ্ঠ ধনতত্ত্ববিদ-গণই অর্থশাস্ত্রের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। ইংরেজ দার্শনিক হিউম ও আডাম স্মিথ নিজ নিজ চিন্তাধারার ভিতর ফরাসী প্রকৃতবাদীদের প্রভাব অস্বীকার করেন নাই। ফরাসী পণ্ডিত জঁাবাপ্‌তিস্ত সে, বাস্তিয়া, ল্যরোআ-ব্যোলিয়ো এই প্রকৃতিবাদীদের প্রদর্শিত পথই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের প্যারিসের ধনবিজ্ঞানপরিষদও সেই ধারাই বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। আমরা ভারতীয় ধনবিজ্ঞানবিদ-গণের সঙ্গে নিয়মিত আদান-প্রদান চালাইতে পারিলে যারপর নাই সুখী হইব। আমাদের বিশ্বাস এই আদান-প্রদানে যে চিন্তা-বিনিময় সৃষ্ট হইবে তাহার ফলে ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার উন্নতি হইতে পারিবে।

দুনিয়ায় সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহাতে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছে যে ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার দাম আরো বাড়িতেই থাকিবে। একালের দুনিয়ায় যে সব দুর্য্যোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অর্থশাস্ত্রের আবিষ্কৃত সত্য সমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞতা হইতেই প্রসূত।

ইতি ভবদীয়
ঈভ-গীয়ো
ধনবিজ্ঞানপরিষদের সভাপতি।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

১৯২১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় বিনয় বাবুকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ফরাসী ভাষায় ছয়টি বক্তৃতা দেন। যে সরকারী চিঠির জোরে তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার অধিকার দেওয়া হয় তাহার কিয়দংশ অনূদিত হইতেছে :—

"প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়,
"আইন ফ্যাকাল্টি, প্যারিস,
২২ ফেব্রুয়ারী ১৯২১

"অধ্যাপক মহাশয়, বিহিত সম্মান পুরঃসর আপনাকে জানাইতেছি যে, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্ত্রণাসভা আপনাকে এই বৎসরের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা করিবার অধিকার দিয়াছেন :— হিন্দু জাতির সার্ব্বজনিক আইন-প্রতিষ্ঠান,—প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রশাসন বিষয়ক আলোচনা।

১৮১৭ সালের ২১ জুলাই তারিখের ফরাসী আইনের ৭ম ধারা অনুসারে এবং আইন ফ্যাকাল্টির আদেশ লইয়া আপনাকে এই চিঠি লিখিলাম ইত্যাদি,

BAGHBAZAR READING LIBRARY
Call No. 900
Accn. No. 24556
Dt. of accn. 06/02/2007

শাপুই
আইন ফ্যাকাল্টির সেক্রেটারী
('ডীন মহাশয়ের প্রতিনিধি)"।

প্রেসিডেন্ট আপেলের বাণী

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে ফরাসী শিক্ষিত জনমণ্ডলীর সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য আহ্বান করিয়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট আপেল্ বিনয় বাবুকে একখানি পত্র প্রদান করেন। সেই পত্র বঙ্গানুবাদে নিম্নরূপ :—

"বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির দপ্তর
"৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯২১

"প্রিয় বিনয়কুমার সরকার

হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আমি ভারতবর্ষের পণ্ডিত এবং ছাত্রমণ্ডলীর নিকট প্যারিস-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা তাঁহাদের সঙ্গে মানব সভ্যতার উন্নতিকল্পে একত্রে কাজ করিব। এই সভ্যতা এখন হইতে স্বাধীনতার ও সুবিচারের পরিপুষ্টিতে নিযুক্ত থাকিবে।

আপেল
ফরাসী ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্য ও প্যারিস
বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি।"

THE BAGHBAZAR READING LIBRARY

দুই ফরাসী আকাদেমীতে বক্তৃতা

প্যারিসের দুইটী আকাদেমী বা পরিষদে বিনয়বাবু দুইবার অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে প্রত্যেক পরিষদের "চল্লিশ অমরের" নিকট ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। প্যারিসের "দেবা" নামক দৈনিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছিল তাহার দুইটী ফটোগ্রাফ মুদ্রিত হইতেছে (পৃষ্ঠা ২২)। এই সঙ্গে আকাদেমী দে বোজ-আর নামক সুকুমারশিল্পপরিষদের সম্পাদক সঙ্গীত-গুরু শ্রীযুক্ত শার্ল ভিদর তাঁহাকে যে নিমন্ত্রণ চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহারও একটা ফটোগ্রাফ মুদ্রিত হইল।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় বিনয়বাবুকে বক্তৃতা দানের জন্য আহ্বান করেন। জার্ম্মাণ ভাষায় বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যে ইস্তাহার জারি করা হইয়াছিল তাহার প্রতিকৃতি পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা প্রদত্ত হইল।

বার্লিনের ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে বিনয় বাবুর কণ্ঠধ্বনির যন্ত্রলিপি

বার্লিনের সরকারী গ্রন্থশালায় কণ্ঠধ্বনির সংগ্রহালয় আছে। এই সংগ্রহালয়ের কর্ম্মকর্ত্তা বিনয়বাবুর একটি বক্তৃতা যন্ত্রের সাহায্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলোআ ব্রাণ্ডল তাঁহাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ ইংরেজিতে নিম্নরূপ :—

Auslandstudien der Universität Berlin

Mittwoch, den 8. Februar 1922, mittags 12 Uhr c.t.

spricht

Professor Benoy Kumar Sarkar

Direktor der Akademie Panini in Allahabad
Mitglied des Nationalen Erziehungsrats von Bengalen

über

Politische Strömungen in der indischen Kultur

Hörsaal 1 des Aulagebäudes

Freier Eintritt gegen Vorweis der Studentenkarte oder des Hörerscheins.

।বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনয়বাবুর জার্মাণ বক্তৃতা,—৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ফটোগ্রাফ)

"বার্লিন বিশ্ববিস্থালয়ের ইংরেজী গবেষণা বিভাগ, ২১ নভেম্বর, ১৯২২
"বিশেষ সম্মানিত অধ্যাপক মহাশয়,

"সেদিনকার আপনার বক্তৃতা যারপর নাই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই বক্তৃতার জন্য বিশ্ববিস্থালয়ের ইংরেজি সেমিনার আপনাকে কেবল যে ধন্যবাদ এবং আনন্দসূচক বিস্ময় জ্ঞাপন করিতেছেন তাহা নহে। আপনার বক্তৃতা যাহাতে শব্দে ও রূপে চিরস্থায়ী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করিতেছেন। আমাদের ষ্টাট্স্‌বিব্লিওটেক্ বা সরকারী গ্রন্থ-শালার ধ্বনি-বিভাগের পরিচালক বিজ্ঞানাধ্যাপক ডোগেন আপনাকে ৮ই মার্চ্চ আমার সেমিনার-ভবনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন (ঐ দিন যদি আপনার পক্ষে সম্ভবপর হয়)। সেই সময় আপনার বক্তৃতার প্রধান অংশ তিনচার মিনিটের ভিতর ওডেঅন নামক ধ্বনি-যন্ত্রের ভিতর বলিয়া যাইতে হইবে, সেই সঙ্গে আপনার ফটোগ্রাফও তোলা হইবে—ইত্যাদি

ভবদীয়

আলোআ ব্রাণ্ড্‌ল্।"

এই পত্রের জবাব স্বরূপ অধ্যাপক ডোগেনের ল্যাব্‌রেটরীতে ওডেঅন যন্ত্রে বিনয়বাবু তাঁহার বাণী পাঠ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"যুবক ভারতের বাণী

"বিগত কয়েক দশক ধরিয়া জলবায়ু রক্ত ও ধর্ম্ম বিষয়ক কত কগুলি তথাকথিত ভূয়ো বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রভাবে সুকুমার শিল্প বিষয়ক আলোচনা-গবেষণা যারপর নাই দূষিত হইয়া রহিয়াছে। সমালোচনা-শাস্ত্র শিল্পদক্ষতার একটা ভূগোল আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে। ভৌগোলিক বিভিন্নতা হিসাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের শিল্পকলা

ও কলার আদর্শ বা উৎপ্রেরণা ইত্যাদি আবিষ্কার করা আজকালকার সমালোচকদের বাতিকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

"শিল্প-সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য জগতের বিভিন্ন রেখায় বিভিন্ন প্রকারে দেখা দেয়, লোকজনকে এইরূপ চিন্তা করিতে শিখানো এই সকল সমালোচকদের স্বধর্ম্ম। সুকুমার শিল্পের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে এইরূপ ভাগাভাগি করা সব চেয়ে নির্লজ্জ ভাবে দেখিতে পাই একটা তথাকথিত পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মহলের মধ্যে বিভিন্নতা প্রচারে।

"কিন্তু জগতের মহা মহা গ্রন্থগুলি পরীক্ষা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমবা দেখিতে পাই যে, হিন্দু পুরাণের বিশ্বামিত্রগণ গ্রীক সাহিত্যের প্রমেথেয়সগণের মতই দুনিয়াগ্রাসী বিরাট সংগ্রামে লিপ্ত। আর সেই সংগ্রাম চলিতেছে জগতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতাদের বিরুদ্ধে।

"অথর্ব্ববেদে পুরুষ নিজ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিবৃত করিয়া পৃথিবী সম্বন্ধে বলিতেছে:—

"অহমস্মি সহমান
উত্তরোনাম ভূম্যাম্
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়্
আশামাশাং বিশাষহি।"

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে আমায় জানে সবে ধরাতে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী
জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়কেতন উড়াতে।

"এর চেয়ে বেশী তেজস্বী বা বিজিগীষাপূর্ণ কথা ইয়োরোপের কোনো যুগ-ধর্ম্মে বাহির হয় নাই। ল্যাটিন ভার্জ্জিলের ঈনীডে এবং হিন্দু কালিদাসের রঘুবংশে বিশ্বসাহিত্যের রসিকেরা একই প্রকার দার্শনিক

তত্ত্ব বা মতবাদের সাক্ষাৎ পাইবেন। আর এই মতবাদ জাতীয়-স্বার্থ-সাধন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ।

"ইংরেজ এড্‌মাণ্ড স্পেন্সার প্রণীত "ফেয়ারি কুইন" কাব্যগ্রন্থের সংযম-স্তোত্রে, ফরাসী মলেয়ার প্রণীত "লেতুদি´" নাট্যের রঙ্গরসাত্মক রচনায় বা জার্ম্মাণ গ্যেটে প্রণীত "ফাউষ্ট" মহা কাব্যের "নাস্তিক অনুসন্ধিৎসায়" খাঁটী পাশ্চাত্য বলিয়া এমন কোনো পদার্থ নাই। ফ্রান্সের প্রোঁভাস প্রদেশের ত্রুবাদুরগণ, মধ্য যুগের জার্ম্মান মিনে-সিঙ্গারগণ, ও ইংলণ্ডের মিনষ্ট্রেল কবিগণ, ভারতের রাজপুত-মারাঠা চারণ-যোদ্ধা-ভাটগণের সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য।

"আমি আপনাদিগকে এই উপদেশ দিবার জন্য আসি নাই যে, জার্ম্মানির পক্ষে ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য জগৎ হইতে প্রকৃতির বাণী আমদানী করা আবশ্যক। আমি একথাও আপনাদিগকে শুনাইতেছি না যে, ভারতীয় নরনারীর জীবন বা চিন্তার ধারা, পাশ্চাত্য জীবন ও চিন্তাধারার চেয়ে অধিকতর নীতিনিষ্ঠাময় বা আধ্যাত্মিকতা-পূর্ণ ছিল।

"আমার একমাত্র কার্য্য হইতেছে একটা মোটা তথ্যের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। শিল্পজগতে বিপ্লব সাধিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ওয়াশিংটন, আডাম্ স্মিথ্ ও নেপোলিয়ানের সমসাময়িক যুগ পর্য্যন্ত, পাশ্চাত্য জগতে এমন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক, আর্থিক বা বিচার সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ছিল না যার প্রায় সমান সমান অথবা এমন কি একদম দোসর বা জুড়িদার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষেও দেখিতে পাওয়া যাইত না।

"আমি জগতের সমক্ষে এই কথা ঘোষণা করিতেছি যে, সমাজ-তত্ত্ব শাস্ত্রের সংশোধন একমাত্র তখনই সম্ভবপর হইবে যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয়েই যে জীবন বা আদর্শ হিসাবে মূলতঃ একরূপ বা সমান এই

সত্যটি সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রথম স্বীকার্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।" (বার্লিন, ২২ মার্চ্চ, ১৯২২)।

বার্লিনে নব্য ভারতীয় চিত্রশিল্প প্রদর্শনী

প্রসিয়ার সরকারী শিল্পসচিব-দপ্তরের তত্ত্বাবধানে বার্লিনে বর্ত্তমান ভারতীয় চিত্রশিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় (ফেব্রুয়ারি ১৯২৩)। এইজন্য ক্রোনপ্রিণৎসেনপালে নামক ন্যাশন্যাল গ্যালারী-ভবন ব্যবহৃত হইয়াছিল। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অব ওরিয়েণ্টেল আর্ট নামক শিল্পসমিতি হইতে চিত্রগুলি বার্লিনে পাঠান হয়। এই উপলক্ষ্যে বিনয় বাবুকে যে সব কার্য্য করিতে হইয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত "বের্লিনার টাগেব্লাট" নামক দৈনিকে বিবৃত হইয়াছে।

ভারতীয় সুকুমার শিল্প সম্বন্ধে বিনয় বাবু যে বিবরণ ও সমালোচনা লিখিয়াছিলেন তাহা সম্বন্ধে জার্ম্মাণ শিল্প-সমালোচক ফ্রিট্স্ ষ্টাল ঐ দৈনিকে একটা মন্তব্য প্রকাশ করেন। সমালোচনার ফটোগ্রাফ নিম্নে মুদ্রিত হইতেছে। (৭ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩)। (পৃঃ ২৯)।

ইতালিতে প্রথম বার

ইতালিতে ত্রেন্ত সহরের "লিব্যার্ত্তা" নামক দৈনিক বিনয় বাবুর সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের সাহিত্য, সুকুমার শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে মোলাকাৎ করিবার জন্য একজন অধ্যাপককে পাঠাইয়াছিলেন। কথোপকথন তাঁহাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ছাপা হয় (২৯ জানুয়ারি ১৯২৫)। সেই স্তম্ভের দুই কলাম ফটোগ্রাফে মুদ্রিত হইতেছে। (পৃঃ ৩০)

Moderne indische Maler.

In der Nationalgalerie.

Mit der nationalen Bewegung der Inder ist auch eine Anknüpfung an die Kunst der Ahnen verbunden. Professor Benoy Kumar Sarkar, der den Katalog einleitet, weist sehr treffend auf die parallele Erscheinung in der deutschen Geschichte hin. Wir können das vielleicht etwas bestimmter formulieren, und die Neuentdeckung der Nibelungen und des Volksliedes, der gotischen Dome, Dürers und der niederländischen und altdeutschen Malerei, die mit Pausen und Rückschlägen im letzten Viertel des 18. und im ersten des 19. Jahrhunderts geschah, als entscheidend für die ganze Entwicklung der neueren Zeit hinstellen, eine Entwicklung, in der gerade jetzt wieder die Neuentdeckung der gotischen Plastik als starker Faktor wirkt.

Dieser treffende Hinweis ist sehr geeignet, unser Interesse für das anzuregen, was jetzt in Indien geschieht, und uns mehr als bloß äußerliches Verstehen dafür zu geben. Ein lang unterdrücktes Volkstum will wiederum sprechen und sucht die Ausdrucksmittel. Es greift in die eigene Vergangenheit zurück, begeistert sich für indische Fresken und Miniaturen, findet sich aber doch in einer anderen Zeit, auch als verändertes, durch den aktivistischen Okzident verändertes Temperament, und ist nicht mehr abgeschlossen, sondern kennt, wie wir alle, alles, was geschah und jetzt geschieht, kennt vor allem verwandtes Asiatisches, besonders Japanisches, und Englisches, von dem Raffinement Whistlers bis zu der Banalität der Buntdrucke in den Magazines. Und greift nach allem, nach allem zugleich.

Man kann, man muß über diese Mischung manchmal lächeln. Aber man darf nicht vergessen, daß die deutschen Werke der Periode, die zum Vergleich herangezogen wurde, für uns heute zum Teil denselben Beigeschmack haben, daß da auch Antikes, Gotisches, Wirkliches in merkwürdigster Weise vermengt wurden. Man denke nur an die Fresken der Casa Bartholdy! Wie sie können auch diese Bilder ein Anfang sein, der eine bedeutende Entwicklung einleitet. Zumal, nach dem Katalog zu schließen, wenn auch nicht die Künstler, so doch ihr Wortführer ein Bewußtsein des Zustandes hat, wie es auf dem entsprechenden Punkt unserer Entwicklung nicht vorhanden war.

Und ein positives Moment ist hier vorhanden. Die besten Dinge zeigen den ererbten sehr feinen Farbensinn und die ebenso ererbte Fähigkeit einfacher Zeichnung, die nicht Wirklichkeit nachzieht, aber ausdrückt, und als natürliche Folge gute Form, um die man bei uns so heftig ringt. Das ist ziemlich viel. Es gibt ein rechtes Handwerk, aus dem immer Kunst wachsen kann. Diese Vorhut besteht ja doch wohl aus anglisierten Indern, wenn sie auch heute Nationalisten sind. Es wird darauf ankommen, ob aus dem unberührten Volk ein Nachwuchs entsteht, der weniger gesehen hat und unmittelbarer lebt.

Fritz Stahl.

বার্লিনের টাগেব্লাট নামক জার্মাণ দৈনিকে সুকুমার শিল্প সম্বন্ধে বিনয়বাবুর মতামত আলোচনা ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩)।

প্রথম ইতালিয়ান রচনা

বিনয় বাবু কিছুকাল উত্তর ইতালির বোল্‌ৎসানো সহরে কাটাইয়াছিলেন। এই জনপদের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিবার জন্য তাঁহাকে "রিভিস্তা দেল আল্‌ত আদিজে" নামক মাসিক পত্রিকা অনুরোধ করে। তিনি ইতালিয়ান ভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯২৫ সনের এপ্রিল সংখ্যায় তাহা ছাপা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে সম্পাদকেরা কলিকাতার "বঙ্গবাণী" মাসিকে প্রকাশিত, বিনয় বাবুর ইতালি-বিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধের এক পৃষ্ঠার ফটোগ্রাফও ছাপিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে আদিজে উপত্যকার বিবরণ পাওয়া যায়। রিভিস্তা পত্রিকায় প্রকাশিত ইতালিয়ান রচনার কিয়দংশ ফটোগ্রাফে মুদ্রিত হইল। এই অংশে "বঙ্গবাণীর" সচিত্র পৃষ্ঠাটার ফটোও দেখা যাইতেছে (পৃঃ ৩২)।

বিদেশী পত্রিকাসমূহে রচনাবলী

১৯১৭ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত বিনয় বাবুর যে সকল রচনা আমেরিকান, ফরাসী, জার্ম্মান ও ইতালিয়ান পত্রিকায় বাহির হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। ১৯১৭, ১৪ই এপ্রিল : "ওরিয়েণ্টাল কাল্‌চার ইন্‌ মডার্ণ পেডাগজিক্‌স্‌" (আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রাচ্য সভ্যতার স্থান) (স্কুল অ্যাণ্ড্‌ সোসাইটি, নিউইয়র্ক)।

২। ১৯১৮, জুলাই : "দি ফিউচারিজ্‌ম্‌ অভ্‌ ইয়ং এশিয়া", (যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা) (ইণ্টার ন্যাশান্যাল জর্ণাল অভ্‌ এথিকস্‌ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়)

৩। ১৯১৮ জুলাই : "ইন্‌ফ্লুয়েন্স অব ইণ্ডিয়া ইন্‌ মডার্ণ ওয়েষ্টার্ণ

সিবিলিজেশ্চন্" (আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভারতের প্রভাব) (জার্ণ্যাল অব রেস ডেভেলপমেণ্ট)

৪। ১৯১৮, নভেম্বর : "ডেমক্র্যাটিক্ থিয়োরীজ, অ্যাণ্ড রিপাব্-লিকান্ ইনষ্টিটিউশানস্ ইন্ এনশেণ্ট্ ইণ্ডিয়া" (প্রাচীন ভারতবর্ষের গণ-নীতি ও গণ-প্রতিষ্ঠান) (আমেরিকান্ পোলিটিক্যাল সায়েন্স্ রিভিউ)।

৫। ১৯১৮, ডিসেম্বর : "হিন্দু পোলিটিক্যাল ফিলজফি" (হিন্দু জাতির রাষ্ট্রদর্শন) (পোলিটিক্যাল্ সায়েন্স্ কোয়ার্টারলি, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক)

৬। ১৯১৯, জানুয়ারি : "দি ডেমক্র্যাটিক ব্যাক্গ্রাউণ্ড অভ্ চাইনিজ্ কাল্চার" (চীনা সভ্যতায় গণশক্তি) (দি সায়েন্টিফিক্ মন্থলি, নিউইয়র্ক)

৭। ১৯১৯, জুলাই : দি রিশেপিং অভ্ দি মিড্ল্ ইষ্ট্ (মধ্য প্রাচ্যের পুনর্গঠন) (জর্ণাল্ অভ্ রেস্ ডেভেলাপ্মেণ্ট)

৮। ১৯১৯, আগষ্ট : "আমেরিকানিজেশ্চন্ ফ্রম্ দি ভিউপইণ্ট অভ্ ইয়ং এশিয়া" (মার্কিনী-করণ, যুবক এশিয়ার তরফ হইতে সমালোচনা)
(জার্ণাল অভ্ ইণ্টার ন্যাশান্যাল রেলেশানস্, ক্লার্ক ইউনিভার্সিটি)

৯। ১৯১০, আগষ্ট : দি হিন্দু ভিউ অভ্ লাইফ্ (হিন্দুজাতির জীবন-দর্শন) (ওপন্ কোর্ট, শিকাগো)

১০। ১৯১৯, আগষ্ট ; "হিন্দু থিয়োরি অফ্ ইণ্টার ন্যাশন্যাল রেলেশানস্" (আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন সম্বন্ধে হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন) (আমেরিকান পোলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ)

১১। ১৯১৯, নভেম্বর ; "কনফিউশিয়ানিজম্, বুদ্ধিজ্ম্ অ্যাণ্ড ক্রীশ্চিয়ানিটি" (কনফিউশিয়ান-নীতি, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও খৃষ্ট-তত্ত্ব) (ওপন কোর্ট, শিকাগো)

১২। ১৯১৯ ডিসেম্বর : "অ্যান্ ইংলিশ্ হিষ্টরি অভ্ ইণ্ডিয়া"

(ইংরেজ লিখিত ভারতবর্ষের এক ইতিহাস গ্রন্থ) (পোলিটিক্যাল সায়েন্স্ কোয়ার্টারলি)

১৩। ১৯২০ এপ্রিল ; "গিল্দে দি মেস্তিয়ার এ গিল্দে মার্কান্তিলি নেল ইন্দিয়া আন্তিকা" (প্রাচীন ভারতের শিল্পিশ্রেণী ও বণিকশ্রেণী),— (জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি এ রিভিস্তা দি স্তাতিস্তিকা, রোম)।

১৪। ১৯২০, এপ্রিল ; "দি থিয়োরি অফ্ প্রপার্টি, ল, অ্যাণ্ড্ সোশ্যাল অর্ডার ইন্ হিন্দু পোলিটিক্যাল ফিলজফি" (হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনে সম্পত্তি, ধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা) (ইণ্টার ন্যাশন্যাল জ্যর্ণাল অভ্ এথিক্স্)

১৫। ১৯২০, জুন, রিভিউজ্ (সমালোচনা) (পোলিটিক্যাল সায়েন্স কোয়ার্টারলি)

১৬। ১৯২০ জুলাই ; "দি জয় অফ্ লাইফ ইন্ হিন্দু সোশ্যাল ফিলজফি" (হিন্দু সমাজ-দর্শনে জীবন-নিষ্ঠা) (এশিয়ান্ রিভিউ, তোকিও)

১৭। ১৯২০, ৩রা জুলাই। "মুভ্মেণ্টস্ ইন্ ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের নানা আন্দোলন) (দি নেশন, নিউইয়র্ক)

১৮। ১৯২০, ২৮ জুলাই : "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম থ্রু দি আইজ অভ্ অ্যান্ ইংলিশ্ সোশালিষ্ট (ভারতের রাষ্ট্রসাধনা, ইংরেজ সোশ্যালিষ্টের সমালোচনা) (ফ্রী ম্যান্, নিউইয়র্ক)

১৯। ১৯২০ আগষ্ট, ডিসেম্বর : "লা তেওরী দ' লা কঁস্তিতুসিঅঁ দাঁ লা ফিলোজোফী পোলিটিক অঁ্যাদ্" (রাষ্ট্র-শাসন সম্বন্ধে হিন্দু দর্শন) (রেহ্বি দ্যূ সঁাথেজ্ ইস্তোরিক্, প্যারিস)।

২০। ১৯২০, ১৩ই অক্টোবর : "দি লিডারস্ অফ্ মডার্ণ ইণ্ডিয়া" (আধুনিক ভারতের জননায়কগণ) (ফ্রীম্যান্, নিউইয়র্ক)

২১। ১৯২০, অক্টোবর : "দি পেন্ অ্যাণ্ড দি ব্রাশ্ ইন্ চায়না" (চীনাদের কলম ও তুলী) (•এশিয়ান রিভিউ, তোকিও)।

২২। ১৯২১, জানুয়ারি: "দি ইণ্টারন্যাশনাল ফেটারস্ অভ্ ইয়ং চায়না" (যুবক চীনের আন্তর্জ্জাতিক শৃঙ্খলসমূহ) (জর্ণাল অভ্ ইণ্টার ন্যাশানাল রেলেশানস্)

২৩। ১৯২১ ফেব্রুয়ারি: "লা ফ্রঁাস এ লঁ্যাদ্ (ফ্রান্স ও ভারত) (লঁ্যাত্রঁ্যাজিশঁা, প্যারিস)।

২৪। ১৯২১, মার্চ্চ: "দি হিষ্টরি অভ্ ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনালিজ্‌ম্" (ভারতীয় জাতীয়তার ইতিহাস) (পোলিটিক্যাল সায়েন্স্ কোয়ার্টারলি)।

২৫। ১৯২১, মার্চ্চ: "দি হিন্দু থিয়োরি অভ্ দি ষ্টেট্" (রাষ্ট্র-বিষয়ক হিন্দু দর্শন) (পোলিটিক্যাল সায়েন্স্ কোয়ার্টারলি)।

২৬। ১৯২১ জুলাই—আগষ্ট: "লা দেমক্রাসী অঁ্যাহ্" (হিন্দু জীবনে ও চিন্তাধারায় সাম্যনীতি) (সেঅঁাস এ ত্রাভো দ্য লাকাদেমী দে সিঅঁাস্ মরাল এ পোলিটিক, অঁ্যাস্তিতিউ দ্য ফ্রাসঁ, প্যারিস)।

২৭। ১৯২১, সেপ্টেম্বর: "দি পাব্লিক্ ফিনান্স্ অভ্ হিন্দু এম্পায়ারস্" (হিন্দু সাম্রাজ্যের রাজস্ব ব্যবস্থা)

(অ্যানালস্ অভ্ দি আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব্ পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড্ সোশ্যাল সায়েন্স, ফিলাডেলফিয়া)

২৮। ১৯২২ জানুয়ারি: ডী লেবেন্স্-আন্‌শাউঙ্ ডেস ইণ্ডার্স" (ভারতবাসীর জীবন-দর্শন) (ড্যয়চে রুণ্ডশাও, বার্লিন)

২৯। ১৯২২ মার্চ্চ: "পোলিটিশে ষ্ট্রোয়মুঙ্গেন ইন ড্যর ইণ্ডিশেন কুল্টুর" ভারতীয় সভ্যতায় রাষ্ট্রনৈতিক জীবনধারা), (ড্যয়চে রুণ্ড্শাও, বার্লিন)

৩০ ১৯২২ এপ্রিল: "ডী সোৎসিআলে ফিলোজোফী য়ুঙ্ ইণ্ডি-য়েন্স্" (যুবক ভারতের সমাজ-দর্শন) (ড্যয়চে রুণ্ড্শাও, বার্লিন)

৩১। ১৯২২ সেপ্টেম্বর: "ইণ্ডিয়াজ্ ওভারসীজ ট্রেড" (ভারতের বহির্বাণিজ্য) (এক্সপোর্ট অ্যাণ্ড ইম্পোর্ট রিভিউ, বার্লিন।)

৩২। ১৯২৩ ফেব্রুয়ারি: "মডার্ণে ইণ্ডিশে আকোআরেলে" (বর্ত্তমান ভারতের জল-চিত্র) (ষ্টিম্মেন ডেস ওরিয়েন্ট্স্)

৩৩। আগষ্ট: "আইন ড্যয়চার বেরিখট্ য়্যিবার ডাস হয়টিগে ইণ্ডিয়েন" (আজকালকার ভারত সম্বন্ধে একটা জার্ম্মাণ বিবরণ) (ড্যয়চে আলগেমাইনে ৎসাইটুঙ্, বার্লিন)

৩৪। ১৯২৪ অক্টোবর: ডী ইণ্ডুষ্ট্রীয়ালিজীরুঙ্ ইণ্ডিয়েন্স্" (ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি), (ফারাইন্ ড্যয়চার ইঞ্জেনিয়রে নাখ্রিখ্টেন বার্লিন)।

৩৫। ১৯২৪ অক্টোবর: "ডী আরবাইটার বেহ্বেগুঙ্ ইন ইণ্ডিয়েন" (ভারতের মজুর আন্দোলন) (হ্বেণ্ট হ্বির্টশাফ্টলিখেস্ আর্খিভ্, য়েনা)

৩৬। ১৯২৫ এপ্রিল: "প্যোসাজ্জ্য আতেজিনা" (পল্লী দৃশ্য) রিহ্বিস্তা দেল্ আল্‌ত আদিজে, বোল্‌ৎসানো।

"আর্থিক উন্নতি"র যুগে

কলিকাতায় আসিবা মাত্রই বিনয় বাবু ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী, নলিনীমোহন রায়চৌধুরী, সত্যচরণ লাহা, গোপালদাস চৌধুরী ইত্যাদি জমিদার বন্ধুগণের আনুকূল্যে ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে "আর্থিক উন্নতি" নামক মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন (বৈশাখ ১৩৩৩)। বর্ত্তমান গ্রন্থের কোনো কোনো অধ্যায় এই পত্রে বাহির হইয়াছে। "আর্থিক উন্নতি"র জন্য লিখিত অন্যান্য রচনার কতকগুলা

একত্র করিয়া "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" (প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে। তাহার প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যে বাহির হইয়া গিয়াছে (১৯৩১)। বঙ্গভাষায় অর্থনৈতিক গবেষণা ও অর্থশাস্ত্র বিষয়ক বাংলা সাহিত্য পুষ্ট করিবার জন্য ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাসে তিনি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কয়েক জন উচ্চ শিক্ষিত গবেষক তাঁহার সঙ্গে একযোগে এই বিদ্যার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে ব্রতী আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য বই লিখিয়া বাঙ্গলাভাষার সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।

১৯২৬ সনেই বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স নামক বঙ্গীয় স্বদেশী বণিক-ভবনের উদ্যোগে বিনয় বাবুর সম্পাদকতায় কৃষিশিল্পবাণিজ্য বিষয়ক ইংরেজি ত্রৈমাসিক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সূত্রে তাঁহাকে যেসকল অর্থনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করিতে হইয়াছে সেই সমুদয়ের কোনো কোনোটা "ইকনমিক ব্রোশুর্‌স্ ফর ইয়ং ইণ্ডিয়া" নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতি মধ্যে ২০।২৫টা "ব্রোশুর" বা পুস্তিকা বাহির হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণির "হ্বেণ্ট্ হ্বির্টশাফট্‌লিখেস্ আর্খিভ্", ইতালির "জ্যর্ণালে দেলি একনমিস্তি", আমেরিকান ইকনমিক্ রিভিউ, প্যারিসের জুর্ণাল দেজ একোনোমিস্ত ইত্যাদি পত্রিকায় এই সকল ব্রোশুরের উল্লেখ আছে।

১৯২৮ সনে "দি পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ্ সিন্স্ ১৯০৫" (১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী রাষ্ট্রদর্শন সমূহ) নামক ইংরেজি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে (মান্দ্রাজ, ৪০৯ পৃষ্ঠা)। ভূমিকা লিখিয়াছেন মেজর বামনদাস বসু।

১৯২৯ সনের মে মাসে "ইণ্ডিয়ান কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি" নামক ইংরেজি মাসিক পত্র সম্পাদনের ভার তাঁহার হাতে আসিয়াছিল।

এইখানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, প্রথমবারকার প্রবাসের পর দেশে ফিরিয়া আসামাত্রই বিনয়বাবু কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃক ধনবিজ্ঞানশাস্ত্রে অধ্যাপনার জন্ত আহুত হন। ১৯২৬ সনের গোড়ার দিকে তিনি এই পদ গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার জন্ত এই পদ সৃষ্টি করিয়া একটি সর্ব্বজনপ্রিয় কার্য্যই করিয়াছিলেন। বিনয়বাবুও নানা উপায়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেশ-বিদেশের সুধীমণ্ডলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

দ্বিতীয়বারকার ইয়োরোপ-প্রবাস

(১৯২৯---৩১)

১৯২৯ সনের মে মাসে বিনয় বাবু, কলম্বো হইয়া, দ্বিতীয় বার বিদেশ-যাত্রা করেন। পর্য্যটনের ক্রম ছিল নিম্নরূপ :—ইতালি, সুইট্সার্ল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, সুইট্সার্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মাণি, সুইট্সার্ল্যাণ্ড, ইতালি, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মাণি, ইতালি, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, ইতালি। ইয়োরোপে কাটে আড়াই বৎসর।

সুইট্সার্ল্যাণ্ডের জেনীভা নগরে ছিলেন মাস চারেক। লীগ অব নেশুন্সের প্রত্যেক বিভাগের কর্ম্ম-প্রণালী তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধানের বৃত্তান্ত "জেনীভা কম্প্লেক্স ইন্ ওয়ার্লড ইকনমি" (বিশ্বব্যবস্থায় জেনীভা-চক্র) নামক প্রবন্ধের আকারে বাহির হইয়াছে,—"জার্ণ্যাল অফ দি বেঙ্গল ন্যাশন্তাল চেম্বার অব কমার্স" ত্রৈমাসিকে (জুন ১৯৩১)। ইহার ভিতর জেনীভার অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের বৃত্তান্তও আছে। মোটের উপর ৯৬টা দেখাশুনা ইহাতে বিবৃত আছে।

Uno scienziato indiano
fervente ammiratore dell'Italia

Prof BENOY KUMAR SARKAR

Il prof Benoy Kumar Sarkar, direttore dell'Istituto di Economia del Bengala, e di vari giornali economici del suo Paese, è uno studioso di notevole valore, un organizzatore di grande attività, che ha svolto e svolge un'azione nettamente favorevole all'Italia.

Nato nel 1887 laureatosi a Calcutta nel 1905, dal 1907 con tutta una serie di pubblicazioni, letterarie, politiche, sociologiche economiche, va diffondendo nei paesi occidentali idee e notizie sul popolo indiano. E da notarsi che la maggior parte dei suoi studi sono frutto diretto di esperienze e di osservazioni personali, in quanto che il prof. Sarkar ha dedicato parecchi anni della sua vita a viaggi di investigazione nell'Europa e nelle Americhe, al fine di trovare nell'evoluzione di questi paesi i punti di contatto con la civiltà indiana. In questi suoi viaggi egli ha avuto modo di tenere un ciclo di conferenze alla Sorbonne, a Parigi, di svolgere il suo pensiero nelle varie riviste scientifiche di carattere internazionale e di venir chiamato dal Governo Bavarese a insegnare nella Facoltà di Economia e Commercio di Monaco.

In Italia il prof. Sarkar ritorna ora per la seconda volta, e dopo Milano scelse Padova per parlare della attività del popolo indù e della industrializzazione dell'India odierna.

Se già la enunciazione del tema delle sue conferenze desta vivo interesse, in quanto è comune abitudine presentare la filosofia metafisica e l'astrazione idealistica come le speciali caratteristiche della popolazione indiana giova ricordare anche che tale interesse è reso più forte dal fatto di aver il prof Sarkar promosso l'iniziativa della costituzione di un Istituto Italo-Indiano. Sappiamo infatti che il Capo del Governo ha accolto assai cordialmente la proposta ed ha affidato al Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica il compito di concretare la situazione del nuovo Ente, che oltre e più che avere un carattere strettamente culturale deve svolgere la sua attività nel campo economico e commerciale. Scambio di merci e di idee, in una parola, è il programma che si sta ora attuando.

Se si pensa che il mercato indiano, sia per materie prime, sia per prodotti finiti sia per capitali, si rivolge ancora all'estero è facile comprendere l'importanza dell'Istituto che sta sorgendo.

Al prof. Sarkar pertanto, che attraverso studi ed esperienze è giunto a scegliere il nostro Paese per un ulteriore progresso economico e politico della sua Patria, il nostro cordiale [illegible]

"Industrializzazione dell' India,,

Ieri, alle ore 17, il prof. Sarkar ha tenuto nell'aula E dell'Università una seconda conferenza, parlando sull'industrializzazione dell'India moderna. Assistevano vari professori, signore e signori.

L'oratore ha esaminato la vita economica dell'India ed ha esposte le trasformazioni industriali e commerciali avvenute in quest'ultimo ventennio, mettendole in rapporto diretto con le condizioni economiche del mondo. L'India s'è, ormai, familiarizzata con le macchine moderne e la popolazione si appassiona alla vita europea. Il conferenziere si è soffermato, quindi, sulle importazioni dell'India, i cui mercati sono stati tenuti finora dalla Germania e dall'Inghilterra; bene accolte sono le macchine agricole italiane, come, in generale, tutti i prodotti italiani sono accolti con grande favore, sicchè i rapporti commerciali potrebbero essere maggiori e più proficui.

Il prof. Sarkar, alla fine della conferenza, fu caldamente applaudito.

পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনয়বাবুর ইতালিয়ান ভাষায় বক্তৃতা উপলক্ষ্যে ভেনিসের "গ্যাজেত্তিন ভেনেৎসিয়া" নামক দৈনিকে বক্তার জীবন ও কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০)

সুইস ও ইতালিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

জেনীভার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবার জন্যও নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। এইখানে ফরাসী ভাষায় তিনি দুইটী বক্তৃতা দিয়াছেন (নভেম্বর ১৯২৯, জানুয়ারী ১৯৩০)। প্যারিস হইতে প্রকাশিত "স্যাঁথেজ্ ইস্তোরিক" মাসিকে একটা বক্তৃতা বাহির হইয়াছে। সুইটসার্ল্যাণ্ডের নানা ফরাসী ও অন্যান্য পত্রিকায় বক্তৃতা দুইটার সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইতালির মিলান আর প্যাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও দুইটা করিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন (ফেব্রুয়ারী ১৯৩০)। সবই ইতালিয়ান ভাষায়। মিলানের বক্কনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্পাদিত "অনালি দি একনমিয়া" নামক বার্ষিক পত্রিকায় বক্তৃতাগুলা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩১ সনের মার্চ্চ মাসে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে জার্ম্মাণি হইতে আসিতে হয়। এই বক্তৃতাও ইতালিয়ান ভাষাই দেওয়া হইয়াছিল। রোম হইতে প্রকাশিত "কমার্চ্য" মাসিকে এই বক্তৃতা ছাপা হইয়াছে। ইতালিতে অনুসন্ধান কার্য্যের বিবরণ "কণ্টাক্ট্স্ উইথ ইকনমিক ইটালি" (আর্থিক ইতালির সঙ্গে ছোঁআ ছুঁয়ি) নামে পূর্ব্বোক্ত "জার্ণ্যালে"র দুই সংখ্যায় বাহির হইয়াছে (১৯৩১—৩২)। ইহার ভিতর গোটা শ'য়েক মোলাকাৎ ও পর্য্যবেক্ষণের বৃত্তান্ত আছে।

মিউনিকের টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা (১৯৩০—৩১)

জেনীভায় থাকিবার সময় বিনয় বাবু "ডয়চে আকাডেমী" (জার্ম্মাণ পরিষৎ) হইতে মিউনিকের টেখ্নিশে হোখ্শুলেতে (টেক্‌নলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে) অধ্যাপনার কাজে আহুত হন। ব্যাভেরিয়ার শিক্ষা-

Deutschland und das moderne Indien

Unterredung mit Professor Benoy Kumar Sarkar in München

Das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat bekanntlich durch Vermittlung der Deutschen Akademie Herrn Professor Benoy Kumar Sarkar aus Kalkutta für zwei Semester an die Technische Hochschule in München berufen. Der hervorragende Gelehrte, der schon in München weilt, hatte die Freundlichkeit, uns eine Unterredung zu gewähren.

„Deutschland macht mit Indien ein jährliches Geschäft von über 700 Millionen Reichsmark. Das sind pro Kopf der Bevölkerung 10 Reichsmark. In dieser Tatsache drückt sich schon etwas von der Wichtigkeit meiner hiesigen Tätigkeit aus."

Mit diesen Worten begann Professor Sarkar das Gespräch. Er ist ein noch junger, sehr sympathischer und äußerst lebhafter Mann, der beweist, daß ein Übermaß von Wissen noch lange keine weißen Haare und keinen weltfremden Sonderling machen müssen. Denn der indische Professor ist ein hervorragender Gelehrter.

Im Jahre 1887 in Kalkutta geboren, bekommt er von der indischen Regierung das Staatsstipendium für höhere Studien. Mit 20 Jahren veröffentlicht er seine ersten Arbeiten. Es erscheint die „Nationalerziehung im alten Griechenland", mehrere Sprachunterrichtsbücher, Hilfswerke zur [illegible], ferner „Geschichtskunde und die [illegible] der Menschheit", ein Werk, das seinerzeit großes Aufsehen erregte. Sarkar wandte sich später pädagogischen Problemen zu und errichtet Schulen in Bengalen. Er bildete eine Anzahl Lehrer heran und gründete einen Fond, aus dessen Mitteln indische Schüler zum höheren Universitätsstudium in das Ausland geschickt werden konnten. In der gleichen Zeit begründete er eine bengalische Monatsschrift für Weltkultur, Wirtschaftswohlfahrt und sozialen Wiederaufbau.

1914 bis 1925 war Sarkar auf Forschungsreisen. Er studierte 11 Jahre Fragen der Industrie, der Erziehung, der Literatur, Kunst und Wissenschaft und die sozialen Einrichtungen in England, Amerika, Deutschland, Frankreich, Österreich, in der Schweiz, in Italien, Japan, China, in der Mandschurei und in Hawai. Eine Reihe von Büchern sind der Niederschlag seiner Studien. Viele Universitäten der ganzen Welt laden ihn zu Vorlesungen ein. Er wird Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften. Er übersetzt Werke der deutschen [illegible] List und Engels ins Bengalische und [illegible] in Indien drei Zeitschriften heraus. Dann begründet und leitet er das bengalische Institut für Wirtschaftswissenschaft und wird Rektor der Technischen Hochschule in Kalkutta. Seit 1929 wieder in Europa, hat er fast an allen Universitäten Vorträge gehalten und hat nun die Einladung der Technischen Hochschule in München angenommen.

„Was betrachten Sie als Ihre vornehmste Aufgabe an den deutschen Universitäten?"

„Ich will hier in Deutschland ein Bild des modernen Indien, wie es wirklich ist, zeigen. Denn es gibt in Indien nicht nur Asketen und Religionsstifter, sondern auch Männer, die mit Stahl und Eisen zu tun haben. Ich betone das **positivistische Element** und will die indische Kultur von einem Standpunkt aus erörtern, der bisher von den europäischen Gelehrten negiert worden ist. Indien ist auf dem Wege, **ein moderner Staat zu werden**, und ich will meinem Lande dabei nützen. Deutschland hat durch sein soziales Fürsorgewesen die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gelenkt. Nicht nur das klassische Deutschland, das Land Goethes und Beethovens ist groß, sondern auch die wirtschaftlichen Einrichtungen in Deutschland sind nachahmenswert. Das Berufswesen, die Fachschulen, die Arbeitergesetze, die sozialen Frauenschulen usw. sind ganz große Beiträge zur modernen Weltkultur, konkrete Dinge, die zu Hauptfaktoren des öffentlichen Lebens geworden sind. Wenn ein Ausländer nach Deutschland kommt, muß er diese Dinge ansehen. Deutschland, das heute schon wieder den Vorkriegsstand im Außenhandel erreicht hat, muß für die nächsten zehn Jahre noch einen neuen großen Plan suchen. Ich bin durchaus optimistisch: nur aus der Wissenschaft können die führenden Männer der Industrie und des Handels lernen. Und so will ich Deutschland mit den Tatsachen über das moderne Indien informieren. Ich lese in München zwei Semester über das wirtschaftliche und soziale Indien der Gegenwart."

Max Dittege

ব্যাভেরিয়ার শিক্ষাসচিব কর্ত্তৃক ভারতীয় অধ্যাপক নিয়োগ সম্পর্কে "ডয়চে সোন্টাগস্ পোষ্ট" নামক মিউনিকের সাপ্তাহিকে বিনয়বাবুর জীবন ও অর্থশাস্ত্রবিষয়ক মতামত আলোচনা (৬ এপ্রিল, ১৯৩০)।

সচিবের অনুমোদনে এবং "হোখশুলে"র বড় ও ছোট সেনেটের সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এই পদ তাঁহার জন্য দুই "সেমেষ্টার" অর্থাৎ এক বৎসরের জন্য নূতন সৃষ্টি করা হয়। ১৯৩০ সনের মে মাস হইতে ১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তাহে চার ঘণ্টা করিয়া গাষ্ট-প্রোফেসর (অতিথি-অধ্যাপক) রূপে রীতিমত ক্লাস পড়াইয়াছেন। আইন অনুসারে অধ্যাপকদের যে সকল দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য জার্ম্মাণির শিক্ষা-সংসারে প্রচলিত আছে অতিথি-অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যও সেইরূপই ছিল। সর্ব্বসমেত একাশীটা বক্তৃতায় এই অধ্যাপনা সম্পূর্ণ হইয়াছে। জার্ম্মাণ ভাষায়ই বক্তৃতা করিতে হইত। আলোচ্য বিষয় ছিল একালের আর্থিক ভারত ও বিশ্বদৌলতের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ।

মিউনিকের অতিথি-অধ্যাপক হিসাবে জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার নিকট বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। তাহা ছাড়া বণিক-ভবন, শিল্প-পরিষৎ, সাহিত্যসভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও তাঁহাকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করিয়াছিল। কীল, ষ্টুটগার্ট, বার্লিন, ইনস্‌ব্রুক (অষ্ট্রিয়া), কার্লস্‌রুহে, ন্যুর্ণব্যর্গ, হ্বুর্ৎস্‌বুর্গ, লাইপৎসিগ ও ড্রেসডেন এই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হইয়াছে। য়েনা, বিলেফেল্ড, গোটিঙ্গেন ও আউগস্‌বুর্গ ইত্যাদি কেন্দ্রেও বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বার্লিন এবং অন্যান্য কেন্দ্রে তাঁহার জন্য অধ্যাপনার কথঞ্চিৎ দীর্ঘতর ব্যবস্থা করা হইতেছিল। জার্ম্মাণির বহুসংখ্যক পত্রিকায় বিনয়বাবুর তুলনামূলক শিল্পনিষ্ঠা-বিষয়ক গবেষণা ও মতামত সুবিস্তৃত রূপে আলোচিত হইয়াছে।

মিউনিকে দুইবার "রাডিও" (বেতার) বক্তৃতার জন্য তাঁহার ডাক পড়ে। একবার তিনি টেলিফোনে বক্তৃতা করেন (২৪ অক্টোবর ১৯৩০)।

সেই বক্তৃতা টেলিফোনের মারফতে হ্বিয়েনায় চালান করা হয়। হ্বিয়েনার বেতার আফিস তাহা অষ্ট্রিয়ায় ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিতরণ করে। আর একবারকার শ্রোতৃমণ্ডলী ছিল গোটা ব্যাভেরিয়া ও দক্ষিণ জার্ম্মাণির নরনারী (৩০ অক্টোবর ১৯৩০)। বক্তৃতা দুইটা পরে পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে।

জার্ম্মাণির বিভিন্ন জনপদে তাঁহার জন্য ফ্যাক্টরি, ব্যাঙ্ক, বীমা-কোম্পানী, মজুর-পরিষৎ, কৃষিব্যবস্থা, বাণিজ্যভবন, প্রদর্শনী-ক্ষেত্র, বণিক-পরিষৎ, সরকারী কর্ম্মকেন্দ্র, ধনবিজ্ঞান-গবেষণাসমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান পর্য্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হইত। এই ধরণের দেখাশুনা গুনতিতে প্রায় চারশ'। "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সেণ্টার্স অ্যাণ্ড ইকনমিক ইনষ্টিটিউশন্স্ ইন্ জার্ম্মাণি" (জার্ম্মানির শিল্প-কেন্দ্র ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান) নামে তাঁহার মোলাকাৎ ও পর্য্যবেক্ষণগুলা "জার্ণ্যালে" (সেপ্টেম্বর ১৯৩১) ছাপা হইয়াছে।

ইতাল-ভারতীয় পরিষৎ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প

দ্বিতীয়বারকার ইয়োরোপ প্রবাসের সময় তাঁহাকে চারবার ইতালিতে যাওয়া আসা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ইতালি পর্য্যটন ও ইতালি-বিষয়ক গবেষণার বৃত্তান্ত ইতালির বহুসংখ্যক পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছে। ইতালিয়ান গবর্মেণ্টের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্-বিভাগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া গবর্মেণ্টের অন্যান্য বিভাগ এবং বেসরকারী শিল্পবাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক সমিতি সমূহ বিনয়বাবুর নিকট "ইস্তিতুত ইতল-ইন্দিয়ান"(ইতাল-ভারতীয় পরিষৎ) গড়িয়া তুলিবার ও বৎসর দুয়েকের জন্য তাহা পরিচালনা করিবার প্রস্তাব করেন।

বর্ত্তমান ভারতের আর্থিক তথ্য ও অঙ্ক সম্বন্ধে ইতালিয়ান নরনারীকে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে শিক্ষিত করা প্রস্তাবিত ইস্তিতুত'র উদ্দেশ্য

Nuove vie per la coltura e il commercio

Un istituto italiano per lo studio dell'India

in una conferenza di uno studioso indiano

Il prof Benoy Kumar Sarkar, indiano, è un fedele amico e grande ammiratore dell'Italia e lo dimostrano i suoi ripetuti viaggi ed i suoi acuti studi compiuti nelle nostre città, intesi a creare ovunque favorevoli correnti per la conoscenza sempre maggiore e profonda del suo paese e

BENOY KUMAR SARKAR

per aprire fra l'Italia e l'India sicure e prospere vie di cultura e di commerci

Undici anni in viaggio

Dotato di una meravigliosa attività e di un felicissimo intuito il prof Sarkar ha viaggiato undici anni e in Europa per approfondire cognizioni sull'industria sull'educazione la letteratura le scienze e le delle diverse nazioni scrivendo quantità di libri di fascicoli, di coli, tenendo ovunque conferenze più svariati argomenti

Nel 1925 il prof Sarkar che ha 44 anni tenne una conferenza all'Università Bocconi di Milano e nel febbraio dell'anno appresso a Padova trattando il tema dello Stato e dell'Economia nell'attività del popolo indù

Nella sua permanenza in Italia si è fatto promotore di un Istituto Italo-Indiano per lo studio sull'India moderna che potrà essere non soltanto un apprezzabile mercato per la merce italiana ma anche per le idee italiane Il Capo del Governo accolse già con favore la proposta affidando al Presidente dell'Istituto Centrale di Statistica il compito di concreare l'attuazione del nuovo Ente di cui il suo ideatore così definisce le linee essenziali

«Sarà consigliabile per l'istituzione dell'Istituto un lavoro unito tra Camera di Commercio società industriali ed agricole società di navigazione, università scuole tecniche e commerciali ed altre istituzioni scientifiche-sociali Un tale Istituto dovrebbe occuparsi altro che del cambiamento economico dell'India d'oggi e cioè industria commercio tecnica ecc leggi di politica sociale temi di moderna economia politica e sociologia

Per un modesto inizio d'un già detto Istituto è necessario quanto segue

1 Una biblioteca sull'India d'oggi ... d'India

Questo deve appoggiarsi a qualche grande istituto sociale-scientifico politico-commerciale o d'economia politica già esistente in Italia costituendovi una sezione speciale indiana

3 Uno scienziato un professore d'università italiana per le seguenti funzioni

a) Organizzare l'istituto

b) Fare e promuovere indagini sullo sviluppo dell'India d'oggi

c) Tenere delle conferenze non solamente all'istituto stesso, ma anche alle Università, alle Camere di Com-

"জ্যর্ণালে দিতালিয়া" নামক রোমের দৈনিকে বিনয়বাবুকে ইন্স্টিটুত ইতল-ইন্দিয়ান নামক পরিষদের ডিরেক্টর নিয়োগ করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা (১৮ মার্চ্চ ১৯৩১)

ছিল। তাহার ব্যবস্থায় রোমের ও ইতালির অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করাও পরিচালকের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইত। এই প্রচেষ্টায় ইতালিয়ান সরকারের তরফ হইতে অগ্রণী ছিলেন ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌ দপ্তরের প্রেসিডেন্ট ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক করাদ জিনি। কিন্তু দেশব্যাপী ও দুনিয়াব্যাপী আর্থিক দুর্য্যোগের জন্য প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ইতালির বিভিন্ন সহরের নানা সংবাদপত্রে এই বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা বাহির হইয়াছে। বলা বাহুল্য স্বয়ং মুসলিনি এই সঙ্কল্পে খুব উৎসাহী ছিলেন।

আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি

(১৯৩১)

১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রোমে "আন্তর্জ্জাতিক লোকবল কংগ্রেসের" (কংগ্রেস্‌স ইন্তার্ণাৎসিঅনালে প্যর লি স্তুদি সুল্লা পপলাৎসিঅনে'র) অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে শ'চারেক প্রাণতত্ত্ববিৎ, চিকিৎসক, সুপ্রজনন-শাস্ত্রী, নৃতত্ত্ববিৎ, সমাজবিজ্ঞানসেবী, অর্থশাস্ত্রী ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। প্রায় তিনশ' প্রবন্ধ পঠিত অথবা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এই কংগ্রেসের ধনবিজ্ঞান-শাখায় বিনয়বাবুকে অন্যতম সভাপতি রূপে নিমন্ত্রণ করা হয়। অন্যান্য সভাপতিদের ভিতর জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের ষ্ট্যাটিষ্টিকস্‌-বিভাগের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক হ্বাগেমান, জাপানী ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌-বিভাগের ডিরেক্টার হাসেগাওয়া, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্‌-অধ্যাপক লুসিআঁ মার্চ, রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের

ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক বেনিনি, আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধন-বিজ্ঞানাধ্যাপক উইলকক্‌স্ ইত্যাদি পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিনয়বাবু ইতালিয়ান ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করিয়াছিলেন নিজ নিজ মাতৃভাষায়। বিনয়বাবুর বক্তৃতা বড় বড় আশী পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ গ্রন্থের আকারে (নয়টা কার্ড-চিত্রসহ) প্রকাশিত হইয়াছে। ইতালির বিভিন্ন পত্রিকায় এই বক্তৃতা সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ হইয়াছিল।

ফরাসী, ইতালিয়ান ও জার্ম্মাণ পত্রিকায় প্রবন্ধ (১৯৩০-৩২)

দ্বিতীয়বারকার ইয়োরোপ প্রবাসের সময় আড়াই বৎসরের ভিতর বিনয়বাবুর লেখা তেইশটা প্রবন্ধ ফরাসী, ইতালিয়ান ও জার্ম্মান পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাগুলির স্বদেশী ও বাংলা নাম এবং প্রবন্ধ প্রকাশের সন নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

১। ডয়চে রুণ্ডশাও (জার্ম্মাণ সমালোচন), বার্লিন, ১৯৩০।

২। ফর্শুঙেন উণ্ড্ ফর্টশ্রিট্টে (গবেষণা), বার্লিন, ১৯৩০।

৩। রেভ্যি দ' স্যাঁথেজ্ ইস্তোরিক্ (ঐতিহাসিক সমন্বয়-সাধন) প্যারিস, ১৯৩০।

৪-৫। আনালি দি একনমিয়া (ধনবিজ্ঞান), মিলান, ১৯৩০।

৬। বায়ারিশে ইণ্ডুষ্ট্রী উণ্ড্ হাণ্ডেল্‌স্-ৎসাইটুঙ্ (শিল্প ও বাণিজ্য) মিউনিক, ১৯৩০।

৭। ৎ হ্বেল্ট্ হ্বির্টশাফ্ট (বিশ্বদৌলত), বার্লিন, ১৯৩০।

৮। হ্বির্টশাফ্টলিখে নাখ্রিখ্টেন (ধনদৌলত), হ্বিয়েনা ১৯৩০।

৯। বেরিখ্টে য়্যিবার লাণ্ড্হ্বির্টশাফ্ট্ (কৃষি), বার্লিন, ১৯৩১।

আন্তর্জাতিক লোকবল কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গের ভিতর বিনয়বাবু (রোম সেপ্টেম্বর, ১৯৩১)

১০। নয়মান্‌স্ ৎসাইটশ্রিফ্‌ট্ ফ্যির ফার্জিখারুংস-হ্বেজেন (বীমা), বার্লিন, ১৯৩১।

১১। বাঙ্কহ্বিস্‌সেনশাফট (ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞান), বার্লিন, ১৯৩১।

১২। ৎসাইটশ্রিফট ফ্যির গেওপোলিটিক (জনপদমাফিক কর্ম্ম-কৌশল), বার্লিন, ১৯৩১।

১৩। মাশিনেন-বাও (যন্ত্রনির্ম্মাণ), বার্লিন, ১৯৩১।

১৪। কার্লস্‌রুহার আকাডেমিশে মিটটাইলুঙেন (পারিষদিক সংবাদ), কার্লস্‌রুহে, ১৯৩১।

১৫। মাগাৎসিন ড্যর হ্বির্টশাফট (আর্থিক জীবন), বার্লিন, ১৯৩১।

১৬। আল্‌গেমাইনেস্ ষ্টাটিষ্টিশেস্ আর্খিভ্ (তথ্য ও অঙ্করাশি বিষয়ক বিজ্ঞান) য়েনা, ১৯৩১।

১৭। কমার্চ্য (বাণিজ্য), রোম, ১৯৩১।

১৮। আউসলাণ্ডলিখে ফোর্ট্রেগে ড্যর টেখনিশেন হোখশুলে ষ্টুটগার্ট (ষ্টুটগার্ট টেকনলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাবলী) ষ্টুটগার্ট ১৯৩১।

১৯। এস্‌সেনার ফোল্কস্ ৎসাইটুঙ (সার্ব্বজনিক), এস্‌সেন ১৯৩১।

২০। ক্যেল্‌নার ৎসাইটশ্রিফট ফ্যির সোৎসিওলোগী (সমাজবিজ্ঞান) কোলোন, ১৯৩২।

২১। আর্খিভ ফ্যির কুল্‌টুর-গেশিষ্টে (সভ্যতার ইতিহাস), লাইপৎসিগ, ১৯৩২।

২২। কমিতাত ইতালিয়ান প্যর ল স্তুদিঅ দেই প্রব্‌লেমি দেল্লা পপলাৎসিঅনে (লোকবল), রোম, ১৯৩২।

২৩। আর্খিভ ফ্যির ফার্গ্লাইখেণ্ডে রেখ্‌টস্-হ্বিসেসনশাফট (আইন-কানুন), বার্লিন ১৯৩২।

অন্যান্য অর্থনৈতিক রচনা (১৯৩০-৩২)

এই সময়কার দুইটা ইংরেজি রচনাও উল্লেখযোগ্য :—

১। দি রেলওয়ে ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড কমার্স অব ইণ্ডিয়া ইন কমপ্যারেটিভ রেলওয়ে ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ (ভারতের রেলশিল্প ও বাণিজ্য, আন্তর্জ্জাতিক রেলতথ্যের মাপে)।

২। "র‍্যাশন্যালিজেশ্যন ইন ইণ্ডিয়ান কটন-মিল্স্, রেলওয়েজ, ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রি অ্যাণ্ড আদার এণ্টারপ্রাইজেস্" (ভারতীয় তুলার কল, রেল, ইস্পাত-শিল্প ইত্যাদিতে যুক্তিযোগ)।

দুইটাই জার্ণ্যাল অব দি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সে বাহির হইয়াছে (ডিসেম্বর ১৯৩০)।

দ্বিতীয়বারকার ইয়োরোপ-পর্য্যটনের সময় মাত্র একটা বাংলা রচনা লেখা হইয়াছিল, যথা "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" বইয়ের ভূমিকা। ইহা "আর্থিক উন্নতি"তে বাহির হইয়াছে (১৯৩০)।

এই সঙ্গে আর একটা অর্থনৈতিক বাংলা রচনার উল্লেখ করা যাইতেছে। নাম "ফ্রীডরিশ লিষ্ট"। উহা দেশে ফিরিবার পর "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি" নামক অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ প্রণীত (১৯৩২)।

"প্রবুদ্ধ ভারতে" গান্ধী বনাম সরকার (১৯৩০-৩১)

বিনয়বাবু যখন বিদেশে ছিলেন তখন "প্রবুদ্ধ ভারত" নামক ইংরেজি মাসিকের আমন্ত্রণে "ধনবিজ্ঞানে সাকরেতি"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত মহাত্মা গান্ধী ও বিনয়বাবুর অর্থনৈতিক মতামত সমূহ তুলনার আলোচনা করেন। শিববাবুর রচনাগুলা ১৪-১৫টা প্রবন্ধের আকারে "প্রবুদ্ধ ভারতে"র বিভিন্ন সংখ্যায় বাহির হইয়াছে (১৯৩০-৩১)।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর (১৯৩১ অক্টোবর)

১৯৩১ সনের ২১শে অক্টোবর বিনয়বাবু বোম্বাইয়ে নামেন। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত ছয় মাসের ভিতর তাঁহাকে নানা কর্ম্মকেন্দ্রে সভাপতিত্ব, বক্তৃতা ও আলোচনায় যোগ দিতে হইয়াছে। বিভিন্ন সংবাদ পত্রে তাঁহার সঙ্গে মোলাকাৎও বাহির হইয়াছে। এই সকল উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যে গোটা চল্লিশেক রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। মজুর-মজুরি, দুনিয়ার আর্থিক দুর্য্যোগ, বেকার-সমস্যা, শিল্পনিষ্ঠা, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, বিবেকানন্দ সম্বর্দ্ধনা, ওয়াশিংটন-স্মৃতি, গ্যেটে-তিথি, দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব, বীমা, জন্মমৃত্যুর হার, ব্যাঙ্কসম্পদ, "বল্কান-চক্র" ইত্যাদি বিষয় এই সকল রচনার আলোচ্য বস্তু।

"আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ (১৯৩২ এপ্রিল)

কয়েক সপ্তাহ হইল তিনি "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ নামে এক অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন (এপ্রিল ১৯৩২)। এই পরিষদের তদবিরে ছয়জন "গবেষক" নিয়মিত রূপে লেখাপড়া করিতেছেন। বাংলা ভাষায় সমাজ-বিজ্ঞান, আইনকানুন ও শাসনপ্রণালী আলোচনা করা এই পরিষদের উদ্দেশ্য। সকল তথ্যেই জগতের নানা দেশের সঙ্গে বাঙ্গালীর যোগাযোগ বিশ্লেষণ করা এই গবেষণার অন্তর্গত। "বিশ্বশক্তি" নামক মাসিক পত্রিকা পরিচালনার ব্যবস্থা হইতেছে। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ আর "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ দুইয়ের গবেষণা-প্রণালীই একরূপ। উভয়ে ভগ্নী-প্রতিষ্ঠান রূপে চলিতেছে।

প্রাক্-প্রবাস বাংলা রচনাবলী (১৯০৬-১৪)

এই সকল বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান রচনাবলীর আবহাওয়ার ভিতরই "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" বাহির

হইল। এই কথাটা জানিয়া রাখিলে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলা কিছু নূতন আলোক পাইতে পারিবে।

অধিকন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থ বিনয়বাবুর পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরব্যাপী লেখাপড়া ও অনুসন্ধান-গবেষণার ফল। কাজেই প্রথমবারকার বিদেশ ভ্রমণের (১৯১৪ এপ্রিল) পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সাহিত্য-চর্চ্চাও এই উপলক্ষ্যে কিছু কিছু উল্লেখ করা যাইতেছে।

১৯০৬ সনে যখন "বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ" প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সময় বিনয়বাবু এই প্রতিষ্ঠানের দিকে বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ পত্রের সাহায্যে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সূত্রে বাংলা ও ইংরেজি রচনার এক সঙ্গে আরম্ভ হয়।

১৯০৭ সনের জুন মাসে তিনি বিপিন বিহারী ঘোষ, রাধেশচন্দ্র শেঠ ইত্যাদি স্থানীয় জন-নায়কগণের সাহায্যে মালদহে জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন বাঙ্গলায় স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছিল। সমিতি প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে তিনি "বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" গ্রন্থের আত্মিক যোগ লক্ষ্য করা কঠিন নয়। একালের মত সেকালেও তাঁহার রচনাবলী প্রথমে পত্রিকায় ও পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইত। ১৯১০ সনে এই সমুদয় রচনা গ্রন্থাকারে বাহির হইতে সুরু করে। বাংলা বইগুলার নাম নিম্নরূপ :—(১) শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা (৪৮ পৃষ্ঠা ১৯১০) হীরেন্দ্র নাথ দত্তের ভূমিকা সমন্বিত। (২) প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা (১৭৫ পৃষ্ঠা ১৯১১), প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ,—অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ সেনের ভূমিকা সমন্বিত। (৩) ভাষা শিক্ষা (১২০ পৃষ্ঠা ১৯১২), (৪) সংস্কৃত শিক্ষা (৩২০ পৃষ্ঠা ১৯১২) (৫) ইংরেজী শিক্ষা (২২০ পৃষ্ঠা ১৯১২)। (৬) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ (১২৫ পৃষ্ঠা, ১৯১২), রামেন্দ্র সুন্দর

ত্রিবেদীর ভূমিকা সমন্বিত। (৭) শিক্ষা-সমালোচনা (১৫০ পৃষ্ঠা, ১৯১৩) বরদা চরণ মিত্রের ভূমিকা সমন্বিত। (৮) সাধনা (২০০ পৃষ্ঠা ১৯১৩) অক্ষয় চন্দ্র সরকারের ভূমিকা সমন্বিত। (৯) রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী (১৯১৩, ১৫০ পৃষ্ঠা)। (১০) বিশ্বশক্তি (১৯১৪, ৩২৫ পৃষ্ঠা)।

একালে "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" গ্রন্থে যে সকল সমস্যা আলোচিত হইতেছে, প্রায় সেই ধরণের সমস্যাই সেকালের "সাধনা" "শিক্ষা-সমালোচনা" "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" ও "বিশ্বশক্তি" এই চারখানা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। দুই সাহিত্যেরই কথা-বস্তু "দেশ ও দুনিয়া", তবে চিন্তা ও কর্ম্ম-গণ্ডীর প্রভেদ বিস্তর। আর, একালের ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চা ও ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ এবং "অন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা সেকালের শিক্ষাবিজ্ঞান চর্চ্চা, জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির অনুরূপ। অধিকন্তু সেকালে "গৃহস্থ" নামক মাসিক পত্রের সঙ্গে বিনয় বাবুর যেরূপ সম্বন্ধ ছিল সেইরূপ সম্বন্ধই দেখা যাইতেছে একালের "আর্থিক উন্নতি"র সঙ্গে।

প্রাক্-প্রবাস ইংরেজি রচনাবলী

(১৯০৬-১৪)

স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষার যুগে বিনয়বাবু বাংলার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজিতেও নানা লেখায় মনোনিবেশ করেন। ১৯০৬ সনে অমৃত-বাজার পত্রিকা ও বেঙ্গলী ইত্যাদি দৈনিকে বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ সম্বন্ধে তাঁহার রচনা বাহির হয়। ১৯০৭ সনে মালদহে জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই বৎসর আগষ্ট মাসে এই সমিতির শিক্ষা ও পরিচালনা-প্রণালী সম্বন্ধে তিনি শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র

মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "দি ডন অ্যাণ্ড দি ডন সোসাইটিজ ম্যাগাজিন" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন।

সেকালের ইংরেজী রচনা সমূহের ভিতর উল্লেখ যোগ্য "এইড্স্ টু জেনার‍্যাল্ কালচার" নামক "বিশ্ববোধ সহায়ক" গ্রন্থরাজি (১৯১০-১২)। এই গ্রন্থাবলীতে ছয় খানা বই প্রকাশিত হইয়াছিল :—(১) ইকনমিক্স্ (ধনবিজ্ঞান, ১৯৩ পৃষ্ঠা), (২) পোলিটিকাল সায়েন্স (রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৮৪ পৃষ্ঠা), (৩) কন ষ্টিটিউশুন্স্ (রাষ্ট্র শাসন প্রণালী ১৩১ পৃষ্ঠা), (৪) এনশ্যেন্ট্ ইয়োরোপ (প্রাচীন ইয়োরোপ ১০০ পৃষ্ঠা) (৫) মিডীভ্যাল ইয়োরোপ (মধ্যযুগের ইয়োরোপ, ১৬৫ পৃষ্ঠা), (৬) হিষ্টরি অব ইংলিশ লিট্টরেচার (ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস ২৩২ পৃষ্ঠা)। তখনকার দিনে যাঁহারা বি, এ অনার বা এম্ এ পড়িতেন তাঁহাদের অনেকের পক্ষে এই সব বই কাজে লাগিয়াছে। তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলা এই যুগের ইংরেজি রচনা :—

(১) "দি সায়েন্স অব হিষ্টরি অ্যাণ্ড দি হোপ্ অব ম্যানকাইণ্ড" (ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা, প্রকাশক লংম্যান্স্ গ্রীণ অ্যাণ্ড কোম্পানী, লণ্ডন, ৮৪ পৃষ্ঠা, ১৯১২)

(২) ইন্ট্রোডাকৃশুন টু দি সায়েন্স অব এডুকেশুন (শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা, লংম্যান্স্ লণ্ডন, ১৭৩ পৃষ্ঠা, ১৯১৩), মেজর বামনদাস বসুর ভূমিকা সমন্বিত।

(৩) ষ্টেপ্স্ টু এ ইউনিভার্সিটি :—এ কোর্স অব ইনটেলেকচুয়াল কাল্চার অ্যাডাপ্টেড্ টু দি রিকোয়ারমেণ্টস্ অব বেঙ্গল (শিক্ষা-সোপান কলিকাতা, ৬৪ পৃষ্ঠা ১৯১৩)।

(৪) পেডাগজি অব দি হিন্দুজ্ (হিন্দু সমাজের শিক্ষা নীতি, ৪৮ পৃষ্ঠা, ১৯১৩)।

(৫) শুক্রনীতি (সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ, ৩০৬ পৃষ্ঠা, ১৯১৩, এলাহাবাদের পাণিনি আফিস হইতে প্রকাশিত)।

(৬) দি পজিটিভ ব্যাকগ্রাউণ্ড সব হিন্দু সোসিঅলজি (হিন্দু-সমাজ জীবনের বাস্তবভিত্তি) প্রথম খণ্ড, অ-রাষ্ট্রীয় (৩৯০ পৃষ্ঠা ১৯১৪, প্রকাশক পাণিনি আফিস)। ডকুটর স্থার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল লিখিত কতিপয় প্রবন্ধ এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট স্বরূপ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমস্যা

"নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" গ্রন্থের অন্যতম আলোচ্য বিষয় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমস্যা। এই গ্রন্থে এই বিষয়ে যে সকল মত প্রচার করা হইয়াছে তাহার পশ্চাতে একটা ক্রম-বিকাশের ধারা আছে। বোম্বাইয়ের "ইণ্ডিয়ান ডেলি মেল" কাগজের মোলাকাতে (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫) বিনয়বাবু এই চিন্তা-ধারার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। "গ্রীটিংস্ টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সেই কথোপকথন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

গ্রন্থকার বলিতেছেন :—

"কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য অন্যান্য সকল লোকের মতনই, আমিও— যখন জীবন সুরু করি তখন, প্রাচ্যের আদর্শকে পাশ্চাত্যের আদর্শ হইতে পুরাপুরি পৃথকরূপে স্বতঃসিদ্ধের মতন স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। এই স্বতঃসিদ্ধ কতটা টেকসই ও যুক্তিপূর্ণ তাহা স্বাধীন ভাবে যাচাই করিয়া দেখি নাই। কিন্তু পরে দুনিয়ার সভ্যতার গতি ও গড়ন সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করিবার ফলে এই মত বদলাইতে বাধ্য হইয়াছি। যুগের পর যুগ ধরিয়া জীবন-যাত্রার দফায় দফায় গভীরতর আলোচনা করিতে করিতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, কোনো কোনো বিষয়ে সপ্তদশ

Außen-Institut der Sächsischen Technischen Hochschule

Professor **Benoy Kumar**

SARKAR

Direktor des Bengalischen Instituts für Wirtschafts-Wissenschaften in Kalkutta

hält im **Hörsaal 77** der Technischen Hochschule am Bismarckplatz **abends 8 Uhr** folgende Vorträge:

Mittwoch, den 1. Juli:

1. Die staatlichen und wirtschaftlichen Einrichtungen des indischen Volkes im Rahmen der indogermanischen Kultur.

Freitag, den 3. Juli:

2. Die industriellen und kommerziellen Wandlungen im heutigen Indien.

Honorar für einen Vortrag RM. 1.—

Vorverkauf in der **Akademischen Buchhandlung Focken & Oltmanns,** Bismarckplatz 14, und bei den **Kastellanen** der **Technischen Hochschule,** Bismarckplatz 18 und Helmholtzstraße 5.

Verkauf der Eintrittskarten auch an der Abendkasse

ড্রেসডেনের টেকনলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনয়বাবুর জার্ম্মাণ ভাষায় বক্তৃতা (১ জুলাই ও ৩ জুলাই, ১৯৩১),—বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

শতাব্দীর "রেণেসান্স" বা নবাভ্যুদয় পর্য্যন্ত আর অন্যান্য বিষয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের শিল্প-বিপ্লব পর্য্যন্ত প্রাচ্যের ধরণ-ধারণে আর পাশ্চাত্যের ধরণ-ধারণে কেনো প্রভেদ ছিল না। যে ধরণের তথা-কথিত প্রভেদ দেখানো একালের সুধীসমাজের দস্তুর তাহার কোনো ইতিহাস-প্রতিষ্ঠিত ও বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তি নাই।

"বিদেশে বসবাসের সময়ে নানা কেন্দ্রের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিশ্ব-বিদ্যালয়, পণ্ডিত-সঙ্ঘ ও পরিষৎ-পত্রিকার পরিচালকগণের নিকট হইতে মানব-সভ্যতা বিষয়ক আমার প্রচারিত এই নূতন ব্যাখ্যা-প্রণালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার ও প্রবন্ধ লিখিবার সুযোগ জুটিয়াছে।"

খুঁটিয়া খুঁটিয়া "দফায় দফায়" বিশ্লেষণ, গভীরতর আলোচনা, "ইণ্টেনসিভ্" ইনভেষ্টিগেশ্যন্‌স্ ইত্যাদি শব্দে বিনয়বাবু যাহা বুঝিতেছেন, তাহার সর্ব্বপ্রথম পরিচয় তাঁহার অনুষ্ঠিত সংস্কৃত শুক্রনীতির অনুবাদ (১৯১২-১৩) এবং এই অনুবাদের ভূমিকা স্বরূপ "পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোসিঅলজি" (হিন্দু সমাজ তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি, ১৯১৩-১৪) নামক গ্রন্থ রচনা। বই দুইটা তাঁহার দেশে থাকিতে থাকিতে বাহির হইয়াছিল। প্রাচ্যে—পাশ্চাত্যে সাম্যসাদৃশ্য-বিষয়ক যে মত এই "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" গ্রন্থে জোরের সহিত প্রচারিত হইতেছে সেই মত তিনি বিদেশ হইতে আমদানী করেন নাই। স্বদেশেই এই মতের সূত্রপাত। সংস্কৃত সাহিত্যই, হিন্দুর নীতিশাস্ত্রই বিনয়বাবুকে প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে সাম্য-সাদৃশ্যের খুঁটাগুলা আবিষ্কার করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। পরে ভূয়োদর্শনের ফলে এবং ঘটনাচক্রে দেশ-বিদেশের নর-নারীর সঙ্গে নিবিড় ও বিস্তৃত লেনদেনের ফলে এই মত আরও পুষ্ট হইয়া বর্ত্তমান আকারে দেখা দিয়াছে।

Stadtzeitung

Mai 1930 Nr 130

Indien in München.

Eine Unterredung mit Professor Sarkar.

Seit kurzer Zeit weilt der indische Forscher und Gelehrte Prof Benoy Kumar Sark[ar] aus Kalkutta in München, um auf Einladung der bayerischen Staatsregierung durch Be[ra]tung und mit Unterstützung der [deutschen] Akademie als Gast-Professor an [der] Technischen Hochschule Vorlesungen über indische Volkswirtschaft der Gegenwart zu [halten].

In einem kleinen, stillen Stübchen an der Karlstraße sitze ich einem schlanken, jung aussehenden Mann gegenüber, dessen faltenloses, braunes Antlitz mit den blitzenden Augen und glatten schwarzen Haaren den Inder verrät. Das jugendliche Aussehen läßt in dem sonnenbraunen Herrn kaum einen Gelehrten vermuten, dessen Forschungen und zahlreiche Veröffentlichungen in der Kulturwelt großes Aufsehen erregten. Das Problem, das Prof Benoy Kumar Sarkar beschäftigt, ist das Weltwirtschaftsproblem in seiner Beziehung auf Indien, das heute politisch und wirtschaftlich-kulturell aufgewühlte Land, das „erwachende Indien". Wenn auch heute der Name Sarkar noch nicht so volkstümlich geworden ist und von Scheu und Bewunderung getragen von Mund zu Mund fliegt, wie etwa der Ghandis, so sind die Forschungen Sarkars doch vielleicht grundlegend, um eines Tages unsere Anschauungen über Indien vollkommen zu ändern. Als Pionier Indiens geht Sarkar von seinem wirtschaftlichen und soziologischen Standpunkt aus vollkommen mit den Erweckern und Trägern der neuen Zeit in Indien einig.

Während wir über die kulturelle Stellung der Führer des heutigen Indiens plaudern, habe ich plötzlich gar nicht das Gefühl einem Ausländer, einem Exoten sogar, dessen Heimat, in der seine Vorstellungen doch verwurzelt sind, Tausende von Meilen von hier liegt, gegenüberzusitzen. Nicht allein darum, weil Prof Sarkar fließend deutsch spricht, im Bannkreis der Frauentürme sehen sich vielmehr die von uns berührten indischen Probleme so an, als wären es eigene. Fast natürlich finde ich es, daß Sarkars Gattin, die am Nebentisch sitzt und bisweilen mit klugen Bemerkungen am Gespräch sich beteiligt, namentlich, wenn von Frauenfragen die Rede ist, wie sich herausstellt eine waschechte — Tirolerin ist.

Wir sprechen von dem Gegensatz zweier Gefühlswelten, der orientalisch-indischen und der christlich-deutschen, von der zwei Kulturen des Orients und des Okzidents. „Ein Gegensatz zwischen Osten und Westen?" lacht Sarkar und fügt ernst hinzu: „Ein Gegensatz zwischen Indiens und Europas Kultur, Geschichte des Altertums und des Mittelalters bis in die neue Zeit herein existiert überhaupt nicht! Ueberlieferungsgemäß ist allerdings jeder Wissenschaftler der Meinung, daß die Weltanschauung des Ostens sehr verschieden sei von der des Abendlandes. Meine Mission hingegen ist es gerade, gestützt auf meine elfeinhalbjährigen Studien und Forschungen auf dem Gebiete der Industrie, Erziehung, Literatur, Kunst, Wissenschaft und des Sozialbereiches in vielen Ländern der Welt, in Aegypten, England, Schottland, Irland, in den Vereinigten Staaten, Hawai, Japan, Korea, Mandschurei, China, Frankreich, Deutschland, Oesterreich, Schweiz und Italien, in diesem Punkt aufklärend zu wirken. In Deutschland sehe ich nur den jüngeren Bruder," erklärt Sarkar, der Deutschland seit 1921 genau kennt und viele Beziehungen zu deutschen Wissenschaftlern und Politikern unterhält. „Indien braucht heute diesen Bruder, der ihm ein Vorbild ist, dem es aber auch viel zu geben hat. Deutschland und Indien, den Osten und den Westen, trennte bis zur Erfindung der Dampfmaschine nichts." Sarkar hat in seinen Forschungen und erstaunlich vielen Veröffentlichungen die These aufgestellt, daß objektiv und chronologisch kein Unterschied in der Ideologie und in den wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen der Ost- und Westvölker durch Jahrtausende besteht. Das mittelalterliche materialistische und geistige Leben Indiens und des katholischen Europas, die verfassungsrechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen waren fast vollkommen gleich. Auch in der alten Geschichte läßt sich bis auf 5000 Jahre zurück die Gleichheit der Weltanschauungen nicht nur in geistigem und metaphysischem Sinne, sondern auch im materialistischen Element verfolgen. Mit dem Aufkommen der Dampfmaschine in der Weltgeschichte hingegen trat zum erstenmal ein wichtiger Unterschied im Leben der östlichen und westlichen Völker ein. Die östlichen Völker blieben in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zurück, die westlichen industrialisierten sich unter der Herrschaft der Maschine. Seit dem Jahre 1875 aber griff die Industrialisierung auch auf Indien über. Die Weltgeschichte ist noch nicht, aber sie wird wieder ausgeglichen. Den Vorsprung des Abendlandes können Indien und der Osten nicht auf einmal einholen. Aber, wie Geheimrat Prof. Dr Ossana bei der Einführung des indischen Gelehrten in unserer Technischen Hochschule ausführte: „Nationalökonomen und Großindustrielle in Deutschland können nur irregeführt werden, wenn sie annehmen, daß die indische Volkswirtschaft der Gegenwart ausschließlich Agrarwirtschaft ist. Die allmähliche Entwicklung der Industrien auf indischem Boden bildet heute eines der wichtigsten Merkmale der Weltwirtschaft."

Das ist das indische Problem, wie es, im Bannkreis der Frauentürme aufgerollt, sich ansieht. Der Anteil Deutschlands an Indiens Wirtschaft ist im Geben und Nehmen nicht gering. Deutschland hat im Ein- und Verkaufsmarkt heute sogar bereits wieder seinen vorkriegszeitlichen Stand erlangt, und mit dem Fortschritt der Industrialisierung Indiens, die in raschem Tempo vor sich geht, werden, abgesehen von seiner angestrebten politischen und wirtschaftlichen Freiheit, die Verhältnisse für Deutschland, das als altes Kulturland sich höchster Achtung bei den Indiern erfreut, noch günstiger.

Von diesem Standpunkt aus ist die wissenschaftliche Aufklärungsarbeit, die der große indische Gelehrte leistet, für uns sehr bedeutungsvoll. Er hat zum erstenmal die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Welt auf die [innere] Uebereinstimmung des Ostens und Westens gelenkt und große Beachtung gefunden. Das Wort Europa [und] Orient, Osten und Westen wird nach seiner Ueberzeugung, einmal verschwinden, und es wird nur noch die Begriffe Altertum, Mittelalter und neue Zeit geben. Die eigenartige Betrachtungsweise Sarkars, dessen Schriften in allen Kultursprachen, besonders englisch und deutsch, erschienen sind, der große nationalökonomische Zeitschriften begründete und herausgibt und das bengalische Institut für Nationalökonomie zu weiterer Forschertätigkeit in seinem Sinne ins Leben rief, wird manche Hemmungen und Vorurteile im Verkehr mit Indien bei uns Deutschen hinwegräumen.

Das kleine Stübchen wurde zur weiten Welt. Ich sah das Sonnenland Indien, das heute in Erregung sich befindet, im Aufstieg und wirtschaftlicher und kultureller [Gemeinsch]heit mit uns, dem einstigen Abendland. ge.

"ম্যিন্‌চেনার ৎসাইটুঙ" নামক মিউনিকের দৈনিকে বিনয়বাবুর রচনাবলী ও কর্ম্মবিষয়ক আলোচনা (১৩ মে, ১৯৩০)।

"সাধনা", "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" ও "শিক্ষা-সমালোচনা" গ্রন্থাবলী (১৯০৭—১১) আর "গ্রীটিংস্ টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" ও "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" (১৯২৭—৩২) রচনা সমূহের ভিতর আত্মিক পুল স্বরূপ বিরাজ করিতেছে "শুক্রনীতি"-"পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড"-"বিশ্বশক্তি" গ্রন্থরাজি (১৯১২—১৯১৪)। "বর্ত্তমান জগৎ" এবং প্রবাসে লিখিত বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীর ভিতর এই পুল পার হইয়া যাইবার পরবর্ত্তী অবস্থা ধাপে ধাপে মূর্ত্তি পাইয়াছে। "ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" (যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা, লাইপৎসিগ্ ১৯২২) গ্রন্থে এই জীবন-দর্শনের যুক্তিশাস্ত্র স্পষ্টরূপে ধরিতে পারা যায়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে আদর্শগত বা জীবনগত প্রভেদ ছিল না। বর্ত্তমান কালেও নাই। অতএব যতদূর দেখা যায়, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। সুতরাং ইয়োরামেরিকায় বিগত ৬০।৭৫।১০০। ১২৫ বৎসরের ভিতর আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কর্ম্ম ও চিন্তাক্ষেত্রে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, এশিয়ায়ও আগামী ৩০।৪৫।৬৫ বৎসরের ভিতর তাহার প্রায় সব কিছুই ঘটিবে। বলা বাহুল্য ভারতেও সেই সব দেখিতে পাইব। এই হইতেছে বিদেশে লিখিত "ইকনমিক্ ডেভেলপ্‌মেণ্ট" (আর্থিক ক্রমবিকাশ) গ্রন্থের (১৯২৬) শেষ সিদ্ধান্ত।

আধ্যাত্মিকতার চিন্তায় বা কর্ম্মে পাশ্চাত্য (খৃষ্টিয়ান) নর-নারী প্রাচ্য (হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান) নরনারীর চেয়ে কোনো দিন খাটো নয়। আবার বৈষয়িকতার বা সংসার-নিষ্ঠার চিন্তায় বা কর্ম্মে প্রাচ্য কোনো দিনই পাশ্চাত্যের চেয়ে খাটো ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দুনিয়া খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে। তাহার পিছু পিছু ছুটিয়া তাহাকে পাকড়াও করিয়া তাহার সমান হইতে চেষ্টা করাই বিগত ৫০।৬০।৭৫ বৎসর ধরিয়া প্রাচ্যের সাধনা দেখা যাইতেছে। ইহাই সজ্ঞানে অজ্ঞানে

আরও কিছু কাল পর্য্যন্ত সমগ্র প্রাচ্যের আদর্শ ও লক্ষ্য থাকিবে। ভারতবর্ষ "সজ্ঞানে" এই আদর্শ ও লক্ষ্য অনুসারে চলিতে থাকুক।

এই ধরণের ধুয়াই "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" গ্রন্থের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে।

শিল্প-নিষ্ঠায় সাম্য-সম্বন্ধ

বর্ত্তমান কালে কোন্ দেশ কতটা আগাইয়া গিয়াছে তাহা ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের আঁকজোকের সাহায্যে মাপিয়া জুকিয়া আলোচনা করা বিনয় বাবুর একালের বিজ্ঞান-সেবার অন্যতম বিশেষত্ব। "দি ইকুয়েশুনস্ অব কম্প্যারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম" নামক সুবৃহৎ ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার ভিতর শিল্প-নিষ্ঠার তুলনাসাধন ও সাম্য-সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে।

ইয়োরামেরিকা বা পাশ্চাত্য জগতের সকল জনপদই সমান উন্নত নয়। এই সকল জনপদের অনেক অংশই এখনো প্রাচ্যের বহুসংখ্যক জনপদের সমান অবস্থায় রহিয়াছে। ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি ও আমেরিকা এবং বেলজিয়াম, সুইটসার্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ ভারতবর্ষের চেয়ে যত উন্নত এবং কাল হিসাবে যত অগ্রসর ইতালি, রুশিয়া, স্পেন ইত্যাদি দেশ তত উন্নত বা তত অগ্রসর নয়। বিনয় বাবুর মতে পৃথিবীর নিম্নলিখিত জনপদ মোটের উপরে বর্ত্তমান ভারতের অবস্থায়ই রহিয়াছে:—(১) বল্কান-চক্র:—রুমেণিয়া জুগোস্লোভিয়া, বুল্গেরিয়া, গ্রীস, তুর্কী, হাঙ্গারি, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড। (২) পূর্ব্ব ইয়োরোপ:—(ক) বাল্টিক জনপদ (খ) রুশিয়া। (৩) ল্যাটিন আমেরিকা। (৪) চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য জনপদ (জাপান বাদে) ভারতবর্ষের চেয়ে কিছু অবনত ও পশ্চাদ্ বর্ত্তী। ইতালি ও জাপান,

ভারতের চেয়ে অল্প মাত্র উন্নত। খানিকটা তাঁহারই ভাষায় গ্রন্থকারের মোটা কথা এইরূপ।

বৈদেশিক বিজ্ঞান-পরিষদে সম্বর্দ্ধনা

"নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" গ্রন্থের রচয়িতাকে কোনো নির্দ্দিষ্ট এক "বিদ্যার বেপারী" বিবেচনা করা সম্ভবপর নয়। তিনি বিজ্ঞান-সেবক হিসাবে বিদ্যারাজ্যের বহু শাখা-প্রশাখায় গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সকল গবেষণা দেশবিদেশের উচ্চতম সুধী-পরিষদে এবং পরিষৎ-পত্রিকায় সমাদৃত হইয়াছে। তাহাতে বাঙ্গালীর, ভারত-বাসীর এবং এশিয়াবাসীর ইজ্জৎও বাড়িয়াছে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা আর বিদেশী পত্রিকায় প্রবন্ধ-প্রকাশের সন তারিখ গুলা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, বাস্তবিক পক্ষে বিনয় বাবু অনেক ক্ষেত্রেই পথ-প্রদর্শক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী, ভারতসন্তান অথবা এশিয়ান।

১৯১২ সনে বিলাতের লংম্যানস্ কোম্পানী কর্ত্তৃক লণ্ডনে তাঁহার এক বই প্রকাশিত হয়। বিদেশে গ্রন্থ-প্রকাশ বিষয়ে তিনি ভারতের অন্যতম অগ্রণী। তখন তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। লংম্যান্স্ কোম্পানী তাঁহার লেখা চারখানা বই প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯১৫—১৬ সনে তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির নর্থ চায়না ব্র্যাঞ্চ কর্ত্তৃক বক্তৃতার জন্য আহুত হন। বক্তৃতাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি এই সোসাইটির আজীবন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১৯১৭ সনে নিউ ইয়র্কের 'স্কুল অ্যাণ্ড সোসাইটি" পত্রে এবং ১৯১৮ সনে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল জার্ণাল অব

এথিক্স্" ত্রৈমাসিকে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আমেরিকান, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান পত্রিকায় তাঁহার লেখা ৫৬টা সন্দর্ভ বাহির হইয়াছে। ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান আর রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত।

১৯১৭—২০ সনে তিনি আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

১৯২১ সনে প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষায় ছয়টা বক্তৃতা দেওয়ার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটা ফরাসী আকাদেমীতে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করা আর ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া,—এসবও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অত্যুচ্চ সম্বর্দ্ধনা-প্রাপ্তির পরিচায়ক। এক জগদীশচন্দ্র ছাড়া এরূপ সম্বর্দ্ধনা ১৯২১ সনের পূর্ব্বে বোধ হয় আর কোনো ভারত-সন্তান পান নাই।

১৯২২ সনে বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য পণ্ডিত-পরিষদে তিনি জার্ম্মাণ ভাষায় বক্তৃতা করেন। ১৯৩০—৩১ সনে তিনি মিউনিকে জার্ম্মাণ অধ্যাপকদের সমপদস্থ রূপে অধ্যাপনা করিয়াছেন। এই শ্রেণীর পদ কোনো এশিয়ান পূর্ব্বে কখনো জার্ম্মাণিতে পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

১৯৩০ সনে তিনি ইতালিয়ান ভাষায় প্রথম বক্তৃতা করেন,—মিলানের বক্কনি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯৩১ সনে রোমে অনুষ্ঠিত লোকবল বিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের অর্থ-নৈতিক শাখায় তিনি অন্যতম সভাপতি ছিলেন। কোনো আন্তর্জ্জাতিক বিজ্ঞান-সম্মেলনে কোনো ভারতসন্তান ইহার পূর্ব্বে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন কিনা জানা নাই।

বিনয় বাবুর প্রথম ফরাসী লেখা বাহির হয় ১৯২১ সনে, প্রথম জার্ম্মাণ লেখা ১৯২২ সনে, আর প্রথম ইতালিয়ান লেখা ১৯২৫ সনে।

তাঁহার ইংরেজি, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান রচনাবলী সম্বন্ধে দেশবিদেশের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বহুসংখ্যক সুবিস্তৃত সমালোচনা বাহির হইয়াছে। নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার প্রবীণতম প্রতিনিধিরা নিজ নামে এই সকল সমালোচনা ছাপিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত সিদ্ধান্তগুলা একালের বিজ্ঞান-জগতে একটা নূতন চিন্তাধারা সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল কথা জানা থাকিলে বাঙ্গলার উদীয়মান লেখক-গবেষকেরা উৎসাহের সহিত নিজ নিজ আলোচ্য ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালাইতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। বিনয় বাবুর বিজ্ঞান-সাধনা আমাদের অনেকের পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপনা জোগাইতে সমর্থ।

বিদেশী গুণগ্রাহীদের মধ্যে নৃতত্ত্ববিৎ ম্যারেট (লণ্ডন), লাওফার (শিকাগো) ও হাউসহোফার (মিউনিক), সমাজতত্ত্ববিৎ হবহাউস (লণ্ডন), প্যাট্রিক গেডীজ (এডিনবারা), সরকিন (হার্ভার্ড), স্পান (ভিয়েনা), বুগ্‌লে (প্যারিস) ও বার্ণস (নিউ ইয়র্ক), অর্থশাস্ত্রী মার্শ্যাল (কেম্ব্রিজ), টাওসিগ (হার্ভার্ড), সেলিগ্‌ম্যান (নিউ ইয়র্ক), ইভ-গীয়ো (প্যারিস), পান্তালেঅনি (রোম), মর্ত্তারা (মিলান), ও শুমাখার (বার্লিন), রাষ্ট্রবিজ্ঞানাধ্যাপক বার্কার (লণ্ডন, অক্‌সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ), গার্ণার (ইলিনয়), হাসবাগেন (বন্), ভারততত্ত্ববিৎ যোলি (হ্বুর্ৎসবুর্গ), হিল্লেব্রাণ্ট (ব্রেসলাও), ম্যাকডোনেল (অক্‌সফোর্ড), গাইগার (মিউনিক), গ্রীক সাহিত্যাধ্যাপক গিলবার্ট মারে (অক্‌সফোর্ড), ইংরেজি সাহিত্যাধ্যাপক আলোআ ব্রাণ্ডল্ (বার্লিন), দার্শনিক ডুয়ী (নিউ ইয়র্ক), অয়কেন

(য়েনা , রাসেল (কেম্ব্রিজ , স্প্রাঙ্গার (বার্লিন ৷ ইত্যাদি পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে ৷

রামেন্দ্রসুন্দর, অক্ষয়চন্দ্র, ও হরপ্রসাদের বাণী

বিশ বৎসর পূর্ব্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিনয়বাবুর "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে যাইয়া নিম্নস্থ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন —

"অর্দ্ধশত বৎসরের উপর হইল, ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয় এদেশে স্থাপিত হইয়াছে ...কিন্তু এই ইতিহাস বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা কখনও আমাদের মধ্যে আসে নাই।...

স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কথা আলোচনা করিয়া তাহা হইতে শিক্ষা লাভের চেষ্টা দেখি না। এদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিকে এজন্য ব্যাকুল হইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কেবল একটী উদাহরণ মনে পড়ে, সে স্বর্গগত ভূদেব মুখোপাধ্যায়।...বাঙ্গালা দেশে একটী ভূদেব বই জন্মিল না। হায় বাঙ্গলা দেশ!

...শ্রীমান্ বিনয় কুমার সরকার উৎসাহশীল অধ্যবসায়শীল যুবা। ইঁহার অন্তরে আকাঙ্খা আছে, ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অনুরাগ আছে। এই তরুণ বয়সে ইঁহার উদ্যমের পরিচয় পাইয়া আশার সঞ্চার হয়। ইনি স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কথা আলোচনা করিয়াছেন, সেই তুলনামূলক আলোচনায় যে উপদেশ পাওয়া যায় তাহার অর্জ্জনে উদ্যম করিতেছেন।"

(ফাল্গুন, ১৩১৮)

সেই সময়েই বিনয় বাবুর "সাধনা" গ্রন্থের ভূমিকায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন :—

"এই গ্রন্থ একটি বিরাট সাধনা। * * এমন গুরুতর বিষয়ে এমন সর্ব্বজনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে এমন আড়ম্বরশূন্য অলঙ্কারশূন্য নিরেট ভাষায় এত কথার আলোচনা,—বোধ হয় বাঙ্গালায় আর নাই।

'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে' নাই, 'অনুশীলনতত্ত্বে' নাই, 'ভক্তিযোগে' নাই, বোধ করি আর কোথাও নাই।" (১৩ ই শ্রাবণ ১৩১৯)।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বিনয়কুমার-সম্বর্দ্ধনার উপলক্ষ্যে (১৩২৭) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও রামেন্দ্র সুন্দর আর অক্ষয় চন্দ্রের বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী সমাজে বিনয়বাবুর স্থান সম্বন্ধে হরপ্রসাদ যাহা বলিয়াছেন তাহা দেশবাসীর অনেকেরই অন্তরের কথা (পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য)।

"নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, রামমোহনের "নয়া বাঙ্গলা"র পর বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিম-ভূদেবের নয়া বাঙ্গলা গড়িয়া উঠিয়াছিল। একালে বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর সেই ভিত্তির উপর যে "নয়া বাঙ্গলা" গড়িতেছিলেন বর্ত্তমান গ্রন্থকারের "নয়া বাঙ্গলা" বাঙ্গালীর জীবন-ধারায় তাহারও পরবর্ত্তী ধাপের ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে।

বিনয়বাবুর সঙ্গে আমাদের প্রকাশ-ভবনের একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধও আছে। সেই স্বদেশীর যুগে আমরা যখন বইয়ের দোকান খুলিতে অগ্রসর হই তখন তাঁহাকে আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের অন্যতমরূপে পাইয়াছিলাম। আজ বিশ বাইশ বৎসর পরে তাঁহার লেখা "নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" আমাদের তদবিরেই বাহির হইল এই জন্য আনন্দ বোধ করিতেছি।

কলিকাতা, ১০ই মে, ১৯৩২

নয়া বাঙ্গলার গোড়া-পত্তন

নবীন দুনিয়ার সূত্রপাত *

দুনিয়ার মাপে ভারত

পশ্চিমা সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে পূরবী সমাজ ও সভ্যতার তুলনা সাধন করা দেশী-বিদেশী সকল চিন্তাশীল লোকেরই দর্শন-আলোচনার অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু তুলনায় সমালোচনা চালাইতে হইলে যে মাপকাঠি দরকার হয়, সেই মাপকাঠি লইয়া প্রায় সকল লেখক এবং বক্তাই গোলে পড়িয়া থাকেন।

পশ্চিমের ভাবুক মহলে একটা রব উঠিয়াছে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা পঞ্চত্ব পাইতে বসিয়াছে। এই রব শুনা যায় প্রধানতঃ সোশ্যালিষ্ট বা কমিউনিষ্ট কিম্বা এই সকল শ্রেণী-ঘেঁশা সমাজ-সংস্কারকের মহলে মহলে। এই সূত্রে রুশ-পণ্ডিত ক্রোপট্‌কিন এবং ফরাসী সাহিত্যবীর রমাঁ রলাঁ ইত্যাদির নাম ভারতে সুপরিচিত।

আমাদের দেশেও পশ্চিমা ভাবুকদের এই মতটা বেশ চলিতেছে। বিগত মহা লড়াইয়ের সময় বোধ হয় ভারতের লেখক এবং বক্তারা এই সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই রাখেন নাই। আমাদের সাহিত্যসেবী,

---

* বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠিত (১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫) সম্বর্দ্ধনার উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম। পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য।

সাংবাদিক, দর্শনাধ্যাপক, রাষ্ট্রিক, সমাজ-সমালোচক, ধর্ম্মপ্রচারক, সকল আসরেই পশ্চিমের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি এক প্রকার প্রথম স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, "পশ্চিমের আদর্শ"কে এবং ইয়োরামেরিকার সমাজকে কেওড়াতলায় পাঠাইয়াই ভারতীয় দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিতেরা নিজ নিজ আলোচনা খতম করেন না। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার বাজারে বাজারে প্রাচ্যকে, পূরবী "আদর্শ"কে, এশিয়ার সভ্যতাকে একচ্ছত্র রাজত্ব ভোগের দলিল দেওয়াও আমাদের অনুসন্ধান-গবেষণার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। এশিয়া দুনিয়াকে চালাইবে,—আর এশিয়ার ব্রাহ্মণ যে ভারতসন্তান সেই ভারতসন্তানই বিশ্ববাসীকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার পাইতেছি, এইরূপ চিন্তাপ্রণালী ভারতীয় নরনারীর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যারপর নাই প্রবল আকারে দেখা যায়।

কিন্তু কি পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কারকের কর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শবাদ ও ভাবুকতা, কি ভারতীয় সভ্যতার দাবী-প্রচারকের আকাশকুসুম-কল্পনা, —উভয়েরই পশ্চাতে একটা বিপুল গোঁজামিল ও হযবরল বিরাজ করিতেছে। এই গোঁজামিল ও হযবরল'র দরুণ পশ্চিমা আদর্শবাদীদের বেশী কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কেননা,—সংস্কারকের চাবুক খাইয়া খাইয়া ইয়োরামেরিকার নরনারীরা সর্ব্বদা সজাগভাবে নিজ নিজ সমাজ, রাষ্ট্র, আর্থিক ব্যবস্থা ও ধর্ম্মকর্ম্ম শুধরাইয়া লইতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু ভারতে আমরা পশ্চিমের নিন্দা, দুর্গতি এবং তথাকথিত সর্ব্বনাশের সংবাদ প্রচার করিয়া অতি মাত্রায় আলস্য এবং নিশ্চেষ্টতার প্রশ্রয় দিতেছি মাত্র। "ছোট মুখে বড় কথা" যে বস্তু আজকালকার ভারতসন্তানের পক্ষে বিশ্ববাসীর উপর গুরুগিরি চালাইবার কথা আলোচনা করা তাহার চেয়েও খারাপ কিছু। যুবক ভারতের চিন্তা ও কর্ম্মকে একদম জাহান্নমে

পাঠাইতে যাঁহারা চান, একমাত্র তাঁহাদের পক্ষেই পশ্চিমা সভ্যতা ও আদর্শের গঙ্গাযাত্রা প্রচার করা শোভা পায়।

কোনো কোনো পশ্চিমা আদর্শবাদী পশ্চিমের নিন্দা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের কথাগুলি পূরবী আমরা বিনা বিচারে বেদ-বাক্যের মতন গিলিয়া ফেলিব কেন? সভ্যতার প্রত্যেক ধাপে, যুগে আর স্তরেই সু-কু দুইই থাকে। কাজেই প্রত্যেক অবস্থায়ই সমাজ-সংস্কারকেরা কু'র অখ্যাতি রটাইতে বাধ্য, এবং তাহার ঠাঁইয়ে নতুন কিছু কায়েম করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। পশ্চিমের পরিবার, পশ্চিমের সামাজিক লেন-দেন, পশ্চিমের দেশ-শাসন, পশ্চিমের মজুর-কিষাণ আজ যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই অবস্থায় সেখানকার ঘরে-বাইরে নানা অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে, এবং আছেও নিশ্চয়। পশ্চিমের স্বদেশ-সেবকেরা নিজ নিজ দেশোন্নতির জন্য চৌপর দিনরাত নয়া নয়া মোসাবিদা করিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে?

কিন্তু পশ্চিমে আজ ১৯২৫ সনে যে-যে গলদ দেখা দিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের নালিশগুলা স্বাভাবিক বলিয়া কি প্রাচ্যের নরনারীও —আহাম্মুকের মতন বুঝিয়া-না-বুঝিয়া,—পশ্চিমের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের বর্ত্তমান "কোঠ" হইতে এই সকল তিরস্কার বেমালুম চালাইতে অধিকারী? যদি কোনো পশ্চিমা দার্শনিক কোনো পূরবীকে পশ্চিমের উপর গালি-গালাজ করিবার এইরূপ অধিকার দিয়া বসেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দার্শনিক মহাশয় তুলনামূলক সমালোচনার মাপকাঠি সম্বন্ধে আনাড়ি। আধুনিক পশ্চিমের সভ্যতা, জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং আধ্যাত্মিক ধরণ-ধারণ, আজকালকার প্রাচ্যসমাজ, আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতার অনেক ধাপ উপরে অবস্থিত,—এই কথাটা তাঁহার অজানা, অথবা জানা থাকিলেও

তাঁহার জ্ঞান এই সম্বন্ধে নেহাৎ অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে। কাজেই তাঁহার চিন্তাপ্রণালীতে গণ্ডগোল অথবা হেঁয়ালিময় ভাবুকতাপূর্ণ বস্তুনিষ্ঠাহীন মিথ্যারাশি প্রবেশ করিয়াছে। পশ্চিমা মিথ্যার উপর ভর করিয়া ভারতীয়েরা গোঁজামিলে-ভরা অসংখ্য বুজ্‌রুকি চালাইতেছেন। মোটের উপর, দুনিয়ার চিন্তাক্ষেত্রে একটা গোলক-ধাঁধার চক্রান্ত চলিতেছে।

ধরা যাউক যেন, আমি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া দু-দুগুণে চার, চার-দুগুণে আট ইত্যাদি মুখস্থ করিতে করিতে হয়রাণ হইয়া পড়িলাম। তাহার পর আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কিন্তু ঐটুকু দখল করিতে করিতেই "ইচড়ে পাকা" হইয়া বসিলাম। আর আমার মুখে "বাণী" বাহির হইল,—"আঃ! দুনিয়া কি অনন্ত! জ্ঞান-বিজ্ঞান কি অসীম! জগতের কিনারা পাওয়া কি মুখের কথা?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই "অসীম"-তত্ত্ব প্রচার করিয়া আমি হয়ত একটা প্রকাণ্ড সত্যই প্রচার করিলাম সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে হয়ত খানিকটা নিজের নম্রতা এবং "জ্ঞানে মৌনং"ই বা জাহির করা হইল। কিন্তু নিউটন যখন নিজকে জ্ঞান-সমুদ্রের কিনারায় মাত্র অবস্থিত দেখে, আর অসীমের ইঙ্গিত করে, সেই বিনয় কি আমার শটকে মুখস্থ করার পর অনাদ্যন্ত দুনিয়ার অসীমতা প্রচারের সমান? অথবা আইনষ্টাইন আজ গণিত আর পদার্থ-বিজ্ঞানের যে কোঠায় দাঁড়াইয়া বলিতেছেন যে, "দুনিয়ার সীমানা এখনো চোখে ঠেকিতেছে না, চিন্তায়ও কল্পনা করিতে পারিতেছি না" সেই কোঠার অসীম-তত্ত্ব আর নিউটনের অসীম-তত্ত্ব কি একই বস্তু? না, আমার দু-দুগুণে চার, চার-দুগুণে আট ইত্যাদির দৌড় আর আইনষ্টাইনের আঁক কষা একই আখড়ার মাল? নিউটনের অসম্পূর্ণতা দেখাইতেছেন কোনো কোনো পশ্চিমা সুধী। আবার কেহ কেহ বা আইনষ্টাইনেরও গলদ বাহির করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা

বলিয়া নিউটন আইনষ্টাইনের গলদ দেখাইয়া ইয়োরামেরিকার দোষ, দুর্গতি ও সর্ব্বনাশ দেখাইতে বসা আর্য্যভট-ভাস্করাচার্য্যের মুখে সাজে কি? অথচ আজকালকার দেশী-বিদেশী দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিতেরা ঠিক এই অশোভন কাজই করিতেছেন।

সভ্যতা জরীপ করিবার মাপকাঠিটা লইয়াই যত আপদ। পণ্ডিত মহলে সাধারণতঃ এই সম্বন্ধে কোনো বাস্তব যন্ত্র চোখের সম্মুখে রাখা হয় না। প্রায় সর্ব্বত্রই কতকগুলা বিশেষ্য ও বিশেষণ অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া যেখানে-সেখানে আওড়াইয়া যাওয়া দেশী-বিদেশী উভয় জাতীয় সমালোচকেরই দস্তুর। তাহার জোরে পাশ্চাত্য সমাজকে যেন তেন প্রকারেণ সয়তানের নরককুণ্ড সপ্রমাণ করিতে পারিলেই ভারতীয় স্বদেশ-সেবকেরা খুসী হন। পশ্চিমা সভ্যতার ভিতর নিরেট মাল কিছুই নাই অথবা থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়; কাজেই ইয়োরামেরিকার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে অথবা এমন কি উহা ইতিমধ্যেই সভ্যতা-লীলা সংবরণ করিয়াছে,—এইরূপ কল্পনা করিয়া আমাদের দর্শনাভিমানী বক্তা, কবি, রাষ্ট্রবীর, সমাজ-সংস্কারক ইত্যাদি শ্রেণীর অনেকেই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া গোঁপে চাড়া মারিতে অভ্যস্ত।

পাশ্চাত্য সভ্যতা মরিয়াছে বা মরিতেছে কি? অতি শীঘ্রই বা এই সভ্যতার মরিবার সম্ভাবনা আছে কি? সভ্যতার চিকিৎসকদের পক্ষে এই বিষয়ে জবাব দেওয়া নেহাৎ কঠিন নয়। জীবনবত্তা মাপিয়া জুকিয়া আলোচনা করা সম্ভব। তাহার জন্য বাস্তব যন্ত্র কায়েম করাও সম্ভব। যখন তখন যেখানে সেখানে বুজরুকি বা হেঁয়ালিপূর্ণ তথ্যহীন শব্দের আড়ম্বর চালাইবার দরকার নাই। ইয়োরামেরিকা এশিয়ার গুরু, কি এশিয়া ইয়োরামেরিকার গুরু, এই কথাটা অতি সহজেই সোজা চোখে,

রক্তমাংসের হাত-পার প্রমাণের সাহায্যে বুঝিয়া উঠিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইবে না।

১৯১৪-১৮ সনের লড়াইয়ের আওতায় ভাবুকেরা ভাবিতেছিলেন, "বার বার এইবার। ইয়োরামেরিকার সভ্যতাকে বাঁচাইবার আর কোনো উপায় নাই। পাশ্চাত্য নরনারী এ যাত্রায় মরিবেই মরিবে।" কিন্তু ১৯১৯-২০ সনের পুনর্গঠনে ইয়োরামেরিকার অবস্থা কিরূপ দেখিতেছি? পাশ্চাত্য সভ্যতা এক অপূর্ব্ব নবযৌবনের পরশে চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে যে নবীন জীবন-যাত্রার সূত্রপাত হইতেছে, তাহাকে এক বিরাট যুগান্তরের প্রাথমিক ভিত্তি মাত্র বিবেচনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। তাহার তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সবই ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছু নয়। ইয়োরামেরিকার মানুষ বিংশ শতাব্দীর বিশ্ববাসীকে এক অভিনব দুনিয়া উপহার দিবার ক্ষমতা দেখাইতেছে। তাহাদের জ্যান্ত হাত-পার জোরে এই যে নবীন জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে তাহার আধ্যাত্মিকতা বুঝিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা আজকালকার এশিয়াবাসীর আছে কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমানের ভারতীয় মগজের পক্ষে ১৯১৯-২০ সনের ইয়োরামেরিকান জীবনবত্তা সমঝিয়া উঠা বড় সহজ কথা নয়।

বাড়তির পথে দুনিয়া

দফায় দফায় খুঁটিয়া খুঁটিয়া এই আধ্যাত্মিকতার, এই নবীন জীবন-বত্তার কয়েকটা বাস্তব লক্ষণ দেখাইতেছি। মামুলি চোখ কানের সাহায্যেই মালুম হইবে যে সত্যসত্যই ইয়োরামেরিকা মরে নাই। বরং ইয়োরামেরিকাই গোটা দুনিয়াকে বাঁচাইয়া রাখিয়া জগদ্‌বাসীর জীবন-স্পন্দন বাড়াইয়া তুলিবার নানা কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে। আর এই সকল আবিষ্কারে এশিয়ার নরনারী স্বাধীনভাবে হিস্‌সা লইবার অধিকারী

হইতে পারিলেই তাহারাও "বাপের বেটা" বলিয়া পরিচিত হইবার দাবী চালাইতে সমর্থ হইবে।

১৮৭০ সনের সমসমকালে ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্র এবং জাপানেও সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা হয়। সেই আইন ভারতে আজ ১৯২৫ সনেও ষোলকলায় কায়েম হয় নাই। মাত্র কোনো কোনো নগরের কোনো কোনো মহাল্লায় নির্ধনদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারিবে, এইরূপ আইন জারি হইয়াছে। কিন্তু এই আইন-মাফিক কাজ এখনো বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

১৯১৯-২০ সনের ইয়োরামেরিকা এই কর্ম্মক্ষেত্রে কতদূর উঠিয়াছে? পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০।৫০ বৎসর ধরিয়া আইনটা খাটিত মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে। কিন্তু বিগত সাত বৎসর ধরিয়া ইয়োরোপের কোনো কোনো দেশে আঠার বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের প্রত্যেক তরুণ-তরুণী এই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা-পদ্ধতির অধীন হইয়া পড়িয়াছে।

আঠার বৎসর বয়স,—এই বস্তুর অর্থ কি? সেকালে আমরা এই বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পাশ করিতে পারিতাম। আজকালকার নিয়মে অন্ততঃ পক্ষে ইণ্টারমীডিয়েট পাশ করা সম্ভব। বুঝিতে হইবে যে, ১৯১৯-২০ সনের আইন অনুসারে পশ্চিমের অগ্রগামী দেশে আঠার বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক লোকই ভারতীয় মাপের ইণ্টারমীডিয়েট বা বি. এ., বি. এস্-সি. উপাধিধারীর সমান হইতে চলিল। ঝাড়ুদার, ভিস্তী, মুটে, কেহই আর ঐ সকল সমাজে ইণ্টামীডিয়েটের কম বিদ্যাওয়ালা লোক থাকিতে পারিবে না। ব্যাঙ্ক, ফ্যাক্টরি ইত্যাদি সকল কর্ম্মকেন্দ্রই আঠার বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও মজুরকে বিনা পয়সায় শিক্ষা প্রদান করিতে বাধ্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতা মরিতে বসিয়াছে কি ? এই সভ্যতার আবহাওয়ায় যে সকল নরনারী চলা ফেরা করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে ভারতীয় নরনারী টক্কর দিতে পারিবে কি ? আর তাহাদের শিক্ষা-প্রণালীতে দু'চার দশটা দোষ যদি থাকেই, তাহা হইলে সে সব লইয়া আমরা ভারতে ইয়োরামেরিকার কুৎসা রটাইতে ঝুঁকিয়াছি কিসের জোরে ? "স পাপিষ্ঠ স্ততোঽধিকঃ" সেই লোকগুলা নয় কি, যাহারা রাস্তায় রাস্তায় বলিয়া বেড়াইতেছে :—"ইয়োরামেরিকা মরিয়াছে। এইবার দুনিয়ায় গুরুগিরি করিবে ভারতের নরনারী ?" যে জাতের অভিজ্ঞতায় এবং জীবনযাত্রায় ১৮৭০ সনই এখনো আসে নাই, সে জাত ১৯২৫ সনের দুনিয়ার উপর ওস্তাদি চালে সমালোচক সাজিতে অগ্রসর হয় কোন্ সাহসে ?

জীবনবত্তার জরীপ করা যাউক আর এক দিক হইতে। ইয়োরামেরিকার ইস্কুল-কলেজের অধ্যাপকেরা নিজ নিজ বিদ্যার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান-গবেষণা ইত্যাদি চালাইয়া থাকেন। একথা আমাদের অজানা নাই। বিদ্যার সীমানা বাড়াইবার আয়োজন ঐ সকল দেশে দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার প্রভাবে একমাত্র পাশ্চাত্য নরনারীর জীবনই বদলাইয়া যাইতেছে এমন নয়। এশিয়ায় আমরাও পশ্চিমা আবিষ্কারের আওতায় পড়িয়া নানা উপায়ে জীবনীশক্তি বাড়াইয়া তুলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি।

১৯১৯-২০ সনের যুগে পশ্চিমা লোকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চৌহদ্দি বাড়াইয়া দিবার জন্য তুমুল আন্দোলন সুরু করিয়াছে। দুজন চারজন বা দশবিশজন নামজাদা করিৎকর্ম্মা বিজ্ঞান-বীরের স্বাধীন খেয়ালের উপর ইয়োরামেরিকার আবিষ্কার-শক্তি আর নির্ভর করিতেছে না। ইস্কুল-কলেজে এই সকল অনুসন্ধান-কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে বহুবিধ সুযোগ সৃষ্ট করা হইয়াছে। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড,

আমেরিকা ইত্যাদি মুল্লুকে গবেষণা-ভবন, অনুসন্ধানালয়, পরীক্ষা-গৃহ, রিসার্চ্-ইন্‌ষ্টিটিউট্ ইত্যাদি নামের জ্ঞান-বিজ্ঞান-কেন্দ্র বিপুল আকারে মাথা তুলিতেছে। এইগুলির কোনো কোনোটা ঠিক যেন এক একটা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে। কয়লা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, চামড়া, চিনি, কাচ, দুধ, তুলা, রেশম ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তু লইয়াই অতি উচু দরের ল্যাবরেটরি, কর্ম্মশালা বা পরীক্ষা-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই সমুদয়ের তদারক করিবার জন্য ডজন ডজন পাকা মাথা চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েম আছে।

এ সব পয়সার খেলা সন্দেহ নাই। ক্রোর ক্রোর টাকা পশ্চিমা নরনারী এই সকল রিসার্চ্ ইন্‌ষ্টিটিউটে ঢালিতেছে। এই সমুদয়ের সাহায্যে দুনিয়ায় বিজ্ঞানের উন্নতি দেখা যাইতেছে, দেশে দেশে আর্থিক উন্নতিও ঘটিতেছে। লোকেরা চোখ কান খুলিয়া সতেজে সজাগ ভাবে চলা ফেরা করিতেছে। জগৎখানাকে লইয়া ভাঙা-গড়ার আনন্দ উপভোগ করা পশ্চিমা সমাজের অলিতে গলিতে দেখিতে পাইতেছি। বিদ্যার জোরে "অমৃত" চাখা যদি কবি-কল্পনা মাত্র না হয় তাহা হইলে ১৯১৯-২০ সনের পুনর্গঠিত ইয়োরামেরিকা যে নবীন অমৃতের সন্ধানে রণ-যাত্রা করিয়াছে সেই অমৃতের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী শত বৎসরের অমৃত নেহাৎ "পান্সা" বা "ফিকে" কিম্বা "দুধের বদলে ঘোল" মাত্র বিবেচিত হইবে। সেই নয়া অমৃতের আর আধ্যাত্মিক জীবনীশক্তির আন্দাজ পর্য্যন্ত করা আজকালকার যুবক-ভারতের পক্ষে অতিমাত্রায় কঠিন বলিলেও কিছু নরম করিয়া বলা হইবে! যুবক-ভারতও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমানা বাড়াইবার আন্দোলনে কিছু কিছু হিস্যা লইতে সুরু করিয়াছে। একথা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই হিসাবে ১৯২৫ সনের দুনিয়ায় আমরা মোটের উপর ১৮৫০ সনের অবস্থায় আছি কি ১৮৭০-৮৫

সনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন যুগে রহিয়াছি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার বিষয়।

ইয়োরামেরিকার মরিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। আবার আর এক দফায় জীবনবত্তা জরীপ করিবার জন্য বাস্তব যন্ত্র ব্যবহার করিতেছি। শিল্প-কারখানার পরিচালনা সম্বন্ধে ১৯১৯-২০ সনের পশ্চিম এক জবর আইন কায়েম করিয়াছে। আইনটা সুরু হয় অষ্ট্রীয়ায়, ক্রমশঃ ইহার ধারাগুলা চেকোস্লোভোকিয়া হইতে আটলান্টিকের অপর পার পর্য্যন্ত নানা দেশে অল্পবিস্তর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আইনটা এই। যে-যে ফ্যাক্টরিতে অন্ততঃ বিশজন মজুর,—কেরাণী ও কুলী,—কাজ করে, সেই সকল ফ্যাক্টরীতে এই সকল মজুর-কেরাণী-কুলীর নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি ফ্যাক্টরির প্রত্যেক কাজকর্ম্মে মালিক এবং কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে এক আসনে বসিয়া বাদানুবাদ, তর্কপ্রশ্ন এবং মোসাবিদা চালাইতে অধিকারী। অর্থাৎ একমাত্র ধনজীবী শিল্প-পতি অথবা মস্তিষ্কজীবী এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক এবং ব্যাঙ্কার মহাশয়েরাই ১৯১৯ সনের পুনর্গঠিত ইয়োরামেরিকায় সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা নয়। শ্রমজীবী এবং মসীজীবীরাও নিজ নিজ চৌহদ্দিতে দেশের আর্থিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবার এক্তিয়ার পাইয়াছে।

এই তথ্যটা যুবক-ভারত বুঝিতে পারিবে কি? সহজে নয়। কেননা, মাত্র এই বৎসরের প্রথম দিকে ভারতে "ট্রেড্ ইউনিয়ন্ অ্যাক্ট্" জারি হইয়াছে। এই আইন বিলাতে আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পুরোণো চিজ্। আর ভারতীয় ট্রেড্-ইউনিয়ন্ অ্যাক্ট্টা (১৯২৫) এমন কিছু হাতী ঘোড়াও নয়। মজুরেরা নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে, আর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক ও আর্থিক স্বার্থ পুষ্ট করিতে সমর্থ হইবে। এই সকল অ, আ, ক, খ ছাড়া আর বেশী কিছু এই আইনের

বিধানে নাই। পাশ্চাত্য নরনারী আজ যে ধরণের গভীর ও সুবিস্তৃত "আর্থিক স্বরাজ" ভোগ করিতে চলিল, তাহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বপ্নেরও অতীত।

এই "আর্থিক স্বরাজ"টাকে এখনো খাঁটি বোলশেহ্বিক স্বরাজ বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মামুলি সোশ্যালিজম্ই একশ' বৎসর টোল্ খাইতে খাইতে এই অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাহা ছাড়া খাঁটি "রাষ্ট্রীয় স্বরাজের" রঙও সোশ্যালিষ্টদের প্রভাবে ইয়োরামেরিকার সর্ব্বত্রই বদলাইয়া গিয়াছে। "মজুর-রাজ" অথবা মজুর-ঘেঁষা রাষ্ট্রীয় দলের কর্ত্তৃত্ব পশ্চিমা মুল্লুকের সর্ব্বত্রই আজকাল এক প্রকার প্রথম স্বতঃসিদ্ধে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। ভারতে এখনো খাঁটি মজুর সংখ্যা হিসাবে সমাজে বিশেষ পুরুও নয়, আর প্রভাবেও কিছু প্রবল নয়। অধিকন্তু মজুরের রাষ্ট্রীয় দল অথবা মজুর-পক্ষীয় মস্তিষ্কজীবীর দল এখনো পরিষ্কাররূপে দানা বাঁধে নাই। তবে বোধ হয় দানা বাঁধ' বাঁধ' হইয়াছে। কাজেই সোশ্যালিজমের দিগ্‌বিজয়ের যুগে যুবক-ভারতের দৌড় কতটুকু তাহা সহজেই অনুমেয়। পশ্চিমাদের স্বরাজ কোথায় গিয়া ঠেকিতেছে, তাহা কোনো পুরাতনপন্থী নরনারীর পক্ষে কল্পনা করা এক প্রকার অসম্ভব। উদীয়মান নয়া স্বরাজের তুলনায় আজকাল দুনিয়ায় যে স্বরাজ চলিতেছে তাহাকে স্বরাজ বলাই চলিবে না। ১৯১৯-২০ সনের পাশ্চাত্য নরনারী সত্য সত্যই এক বিশাল নবজীবনের সূত্রপাত করিয়া বসে নাই কি?

এখন জমিজমার কথা কিছু বলিব। ভারতে আজও জমিদারী প্রথার জয় জয়কার চলিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে "রাইয়ত"—"বাবু"র সম্বন্ধ। জার্ম্মাণিতে এই ধরণের ব্যবস্থা চলিয়াছিল ১৮৪৮ পর্য্যন্ত। ফ্রান্সে এই প্রথা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষা-

শেষি। কাজেই রাইয়ত-প্রধান ভারত-সন্তানের পক্ষে আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনের আধ্যাত্মিকতা সহজে হজম করা সম্ভব নয়।

তাহার উপর ১৮৯৫ সনের পর হইতে জার্ম্মাণিতে এবং জার্ম্মাণির দেখাদেখি ডেন্‌মার্কে, ইংল্যাণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে জমিহীন মজুরকে ছোট ছোট জমির মালিকে পরিণত করা হইতেছে। আর ছোট ছোট মালিককে কথঞ্চিৎ বড় মালিক দাঁড়াইয়া যাইবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

কিন্তু এই সকল জমি জুটিতেছে কোথা হইতে? বড় বড় জমির মালিককে নিজ নিজ সরকারের নিকট জমি বিক্রী করিতে বাধ্য করা হইতেছে। কোনো জার্ম্মাণ জমিদার এক্ষণে ৮০০।৯০০ বিঘার বেশী জমি নিজ দখলে রাখিতে অধিকারী নয়। বড় বড় জমিদারদের জমি কিনিয়া গবর্ণমেণ্ট মজুরদের নিকট অথবা ছোট ছোট জমির মালিকদের নিকট সহজ সর্ত্তে বিক্রী করিবার ভার লইতেছে। এই গেল পুনর্গঠিত জার্ম্মাণির ১৯১৯ সন। যে বৎসর দুনিয়ার হেঁয়ালি-প্রচারক, ভাবপন্থীরা ভাবিতেছিলেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা খাটে উঠ' উঠ', সেই বৎসরই নতুন জীবন-যৌবনের ডিক্রী হাতে করিয়া পশ্চিমের নরনারী জমি-জমা সম্বন্ধে একটা আধ্যাত্মিক বিপ্লব খাড়া করিয়াছে।

এশিয়ায় (বিশেষতঃ ভারতে) বোধ হয় এই বিপ্লবের কাহিনী এখনো পৌঁছেই নাই। পৌঁছিলেই এশিয়ায় নরনারী আঁত্‌কাইয়া উঠিয়া বলিতে থাকিবে,—"তাইত! এ যে বোলশেহ্বিকীর লঙ্কাকাণ্ড?" ভিতরকার কথা, এসব আইন বোলশেহ্বিক পথের লাগাও কোনো কোনো পথে চলিতেছে বটে। কিন্তু খাঁটি বোলশেহ্বিজ্‌ম আরও অনেক দূরে। কেননা রুশিয়ার সমাজ-সংস্কারকেরা জমিজমা "কাড়িয়া লয়",—(অন্ততঃ পক্ষে লইত)—তাহার জন্য মালিককে ক্ষতি পূরণের টাকা দিতে মাথা

থামায় না। তবে ১৯২২—২৩ সনের পর এই কাড়াকাড়ি কাণ্ড থামিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণ আর ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে জমি জমা বেচিতে বাধ্য করে বটে, কিন্তু "কথঞ্চিৎ" উচিত মূল্যে এই সকল জমির দাম দিতে গররাজি নয়। যুবক-ভারত এই জার্ম্মাণ-ডেন-বিলাতী আইনগুলা ঘাঁটিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইবে কি? এই সব ব্যবস্থা আমাদের দেশে কায়েম হইতে এখনো অনেক দেরি! তবে "কত ধানে কত চাল" বুঝিয়া রাখাটা মন্দ নয়।

নারী-সমস্যার একটা খুঁটা তুলিয়া বর্ত্তমান আলোচনা শেষ করিব। পাশ্চাত্য সভ্যতার সজীবতা হাতে হাতে ধরা পড়িবে। ভারতে আমরা আজও বিধবার অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে বসিবামাত্রই "ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ" ইত্যাদি জন্মজন্মান্তরের স্বামী-স্ত্রীর অনন্ত সম্বন্ধটা কল্পনার চোখে দেখিয়া ফেলি। আপত্তি নাই। ইয়োরামেরিকার রোমান ক্যাথলিক-পন্থী বিধবারাও লাখে লাখে,—এতদূর চরম মাত্রায় না হউক—অনেকটা এই "আদর্শেই" জীবন গড়িয়া চলিতে অভ্যস্ত। বিধবার বিবাহ ঐ সকল সমাজে নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তাদের অনেক বিধবাই সুযোগ সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করে না।

কিন্তু একমাত্র এই "আদর্শই" বিধবা-জীবনের সর্ব্বস্ব নয়। বাস্তব জীবনের তরফ হইতে বিধবা সমস্যার মীমাংসা অনেকখানি সাধিত হইতে পারে। পশ্চিমারা তাহা করিয়াছেও। এই মীমাংসাটা বর্ত্তমান অবস্থায় ভারত-সন্তানের মাথায় প্রবেশ করা কঠিন। তবে প্রণালীটা যে অতি সহজ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে যে সকল লোক গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করে, একমাত্র তাহারাই বুড়া হইবার পর মৃত্যু পর্য্যন্ত বিনা কাজেই "পেন্‌শুন" পায়। অন্যান্য কর্ম্মকেন্দ্রে যে সকল লোক কেরাণী বা কর্ম্মকর্ত্তা তাহাদিগকে

পেন্‌শ্যন দিবার বোধ হয় কোনো ব্যবস্থা নাই। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট কোনো প্রকার জীবন-বীমার আইন জারি করিয়া কর্ম্মকেন্দ্রের মালিকদিগকে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা করে নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের গলি-ঘোচে ও বাধ্যতামূলক বীমা-প্রথা আজ পঁচিশ ত্রিশবৎসর ধরিয়া জারি আছে। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রবীর বিস্‌মার্ককে দুনিয়ার এই নিয়মের জন্মদাতারূপে বিবৃত করা যাইতে পারে।

এই গেল পেন্‌শ্যনের এক দিক। অপর দিক আরও বিচিত্র। ভারতে যে সকল লোক পেন্‌শ্যন পায়, তাহাদের আয়ু ফুরাইবা মাত্র সরকারী দায়িত্বও ফুরাইয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য মুল্লুকে বিধবা (এবং পুত্র কন্যারাও বাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) একটা নির্দ্দিষ্ট হারে মৃত স্বামীর পেন্‌শ্যন ভোগ করিতে অধিকারী। পদ হিসাবে পেন্‌শ্যনের হার বাঁধা আছে। কাজেই ভারতীয় বিধবার হাহুতাশ আজকালকার খ্রীষ্টিয়ান সমাজে দেখা যায় না।

আমাদের বিধবারা যখন কাঁদে তখন তাহারা মরা-স্বামীর প্রতি সতীত্ব দেখাইবার জন্য কাঁদে? না অন্নচিন্তা চমৎকারা বলিয়া কাঁদে? এই প্রশ্নটা বাস্তব যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে যুবক-ভারত অগ্রসর হউক। বিধবা-সমস্যার ভিতর যেসব আজগুবি হেঁয়ালি প্রবেশ করানো হইয়া থাকে,—কম-সে-কম চিন্তাক্ষেত্র হইতে সেই সব হেঁয়ালি দূরীভূত হইতে পারিবে। আর্থিক তাড়নার দীর্ঘশ্বাস বিধবার প্রাণ হইতে পেন্‌শ্যন পাইবার পর ভারতীয় নারীত্বের অন্দরে আধ্যাত্মিকতা কতখানি আছে তাহার যাচাই করা সম্ভব হইবে। সেই যাচাইয়ের আখড়ায় পশ্চিমা নারীরা ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। ভারতীয় নারী আধ্যাত্মিকতার নবীন ডাকে সাড়া দিবার পর্য্যন্ত উপযুক্ত কিনা এখনো তাহা অনিশ্চিত।

অসংখ্য খুঁটি নাটিই উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোনটাই মন-গড়া অলীক বাগাড়ম্বর মাত্র নয়। সহজ বুদ্ধির লোক চোখে চাহিয়া কানে শুনিয়া পায়ে হাঁটিয়া হাতে ছুঁইয়া যে সকল তথ্য বুঝিতে পারে, সেই সব নিরেট তথ্যের জোরেই দেখিতেছি যে, এশিয়া ইয়োরামেরিকার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম চিরকাল একই পথে চলিয়াছে এবং একই আদর্শের প্রভাবে জীবনযাত্রা চালাইয়া আসিয়াছে। আজও দুনিয়া সর্ব্বত্রই এক পথে অগ্রসর হইতেছে। আবার কালও,—বহুকাল পর্য্যন্ত—যতদূর দৃষ্টি যায়,—দুনিয়ার গতি থাকিবে একই দিকে। পূর্ব্বে পশ্চিমে কোনো "আদর্শ-গত" প্রভেদ নাই। তবে জীবনবত্তা, আধ্যাত্মিকতা, রক্তের স্রোত, চিন্তা ও কর্ম্মরাশির জোয়ার ইত্যাদি যা কিছু সবই—শতকরা নিরানব্বই অংশ বর্ত্তমান কালে পশ্চিমাদেরই সমাজে ও সভ্যতায় ছুটিতেছে। ১৯১৯—২০ সনের পুনর্গঠিত ইয়োরামেরিকা এক অদ্ভুত নবীন দুনিয়ার সূত্রপাত করিয়াছে। বিনা গোঁজা মিলে বুজরুকিহীনভাবে এই তথ্যটা স্বীকার করিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত যুবক-ভারতের শক্তিযোগ পদে পদে অনর্থক বাজে কাজে নষ্ট হইতে থাকিবে। নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তনে যে সকল স্বদেশ-সেবক মোতায়েন আছেন তাঁহারা এই সকল "কেঠো" নিরেট তেতো সত্যের সাহায্যে নিজেদের এবং সহযোগী কর্ম্মিবৃন্দের মগজটা চাঁছিয়া-ছুলিয়া মেরামত করিতে অগ্রসর হউন। তাজা বস্তুনিষ্ঠ জীবন-দর্শনের দৌলতে বাঙালীর ভাবুকতা ও শক্তিযোগ একটা নবীন যুগান্তর সৃষ্টি করুক।

ব্যাঙ্ক-গঠন ও দেশোন্নতি *

ভারতবাসীর আধুনিক ব্যাঙ্ক

আজকাল ভারতে ভারতবাসীর তাঁবে মাত্র ২৯ টা জয়েণ্ট-ষ্টক ব্যাঙ্ক চলিতেছে। কোনোটার মূলধনই ৫ লাখ টাকার কম নয়। এই সমুদয়ে লোকজনের গচ্ছিত টাকা খাটিতেছে ৫৩ কোটি।

১৯০৫ সনে এই ধরণের ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৯টা মাত্র। আর তাহাদের খাতায় গচ্ছিত ছিল ১২ কোটি। দেখা যাইতেছে যে, বিশ বাইশ বৎসরে ব্যাঙ্ক-সংখা বাড়িয়াছে ৩ গুণের বেশী আর গচ্ছিতের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৪ গুণের বেশী।

ভারত-সন্তানের পরিচালিত আধুনিক ব্যাঙ্ক আরও আছে। এইগুলার সংখ্যা ৪০। প্রত্যেকটার মূলধন এক লাখ হইতে ৫ লাখ টাকা পর্য্যন্ত। এইগুলাকে "মাঝারি" ব্যাঙ্ক বলা চলে।

তাহা ছাড়া "ছোট" "ছোট" ব্যাঙ্কও গুন্‌তিতে আজকাল মন্দ নয়। গোটা ভারতে প্রায় ৭০০ ছিল ১৯২৪ সনের শেষ পর্য্যন্ত। ব্যাঙ্ক প্রতি তাহাদের পুঁজির পরিমাণ ১ লাখের নীচে।

ভারতে বিদেশী ব্যাঙ্ক

ভারতীয় আধুনিক ব্যাঙ্ক বলিতে ৭৪০ টা ছোট ও মাঝারি আর ২৯টা বড় প্রতিষ্ঠান বুঝিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক-সম্পদ্ বলিলে

---

* জাতীয় শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম (ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬)। বক্তৃতা অনুসারে লেখক তাহেরউদ্দিন আহম্মদ। "আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ" নামে ছয়টা বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। এই প্রবন্ধ তাহার প্রথম।

বিদেশী কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলার নাম করাও দরকার। তাহাদের সংখ্যা ১৮। এইগুলার সংখ্যা ১৯০৫ সনে ছিল মাত্র ১০। ১৯০৫ সনে লোকজনের টাকা গচ্ছিত ছিল ১৭ কোটি। আজকাল পরিমাণটা ৭১ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ এই কয় বৎসরে গচ্ছিত অর্থ ৪ গুণের কিছু বেশী বাড়িয়াছে। বাড়্‌তির অনুপাতটা স্বদেশী বড় ব্যাঙ্কেরও এইরূপ।

এই ১৮টা ব্যাঙ্ককে দুইভাগে বিভক্ত করা সম্ভব। প্রথম ভাগে পড়ে ৫টা। এইগুলার কারবার অধিকাংশই ভারতের ভিতর চলে। অপর ১৩টার আসল কারবার চলে বিদেশে। ভারতে এই সকল প্রতিষ্ঠান বিদেশী কেন্দ্র-কারবারের শাখা বা প্রতিনিধিমাত্র।

১৮টা ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটাই বিদেশে রেজেষ্টারীকৃত। ইহাদের মূলধনও বিদেশী মুদ্রায় জমা এবং গণনা করা হয়। তবে ভারতের কারবারে স্বদেশী টাকার চল আছে।

এই ব্যাঙ্কগুলাকে "এক্‌স্‌চেঞ্জ"-ব্যাঙ্ক বা বিনিময়-ব্যাঙ্ক বলে। বিদেশী টাকাকড়ির লেনদেন এইসকল ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোনো ব্যাঙ্কে চলিতে পারে না। বিনিময়ের কারবারটা এই সকল বিদেশী ব্যাঙ্কের একচেটিয়া।

এই গেল ভারতীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যাতত্ত্ব। অঙ্কগুলা সর্ব্বদা নজরে রাখিয়া ব্যাঙ্ক-গঠন ও দেশোন্নতির আলোচনা করা যাউক।

টাকা-কড়ির বাজার

ব্যাঙ্ক আর বাজারের মধ্যে কোনো তফাৎ নাই। বাজারে মাছ-দুধ কেনা-বেচা হয়, আর ব্যাঙ্কে টাকা-পয়সা কেনা-বেচা হয়। সত্যি সত্যি টাকা কেনা-বেচা হয় না—আসলে ওখানে ধার নেওয়া আর দেওয়া হয়। যে টাকা ধার নেওয়া হয়, সেটা আবার আর একজনকে ধার দিতেও হয়।

এই টাকা লইয়া টাকা লাগাইতে গেলে কিছু মুনাফা দাঁড়াইয়া যায়।

কিন্তু ইহা করিতে কোনো দর্শনের সাহায্য লইতে হয় না, বা কোনো অতি-গভীর যুক্তিশীলতার দরকার হয় না। আমি পাঁচ হাজার টাকা লইব, বৎসরে চার টাকা সুদ। এই টাকা লইয়া আমি পুঁতিয়া রাখিতে পারি না। আমি যে টাকা লইব ঐ টাকা যাহাতে খাটাইতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি এই টাকা আর কাউকে ধার দিতে চাই তবে সেটা কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে? কোনো লোক ধার চাহিলে তাহাকে বলিতে হইবে "আমি নিজে চার টাকা সুদ দিতেছি তাহার চেয়ে যদি বেশী সুদ আমায় দাও, তাহা হইলে তোমাকে ধার দিতে পারি।" ব্যাঙ্কের মূল কথাটা হইতেছে এইটুকু।

ধরুন যদি শতকরা ৪৲ টাকা সুদে টাকা আনিয়া শতকরা ৭৲ টাকা সুদে লাগান যায়, তাহা হইলে অন্ততঃ ৩৲ টাকা লাভ থাকে। কখনো তিন টাকা, কখনো সাত টাকা, কখনো দশ টাকা, কখনো বা আঠার টাকা ইত্যাদি। এই তিন টাকা, দশ টাকা, আঠার টাকার উপরেই বিপুল বিপুল ইমারত গড়িয়া উঠে। পাঁচ শ,' সাত শ' কি হাজার লোক খাটানো সম্ভব হয়। তিন চার হাজার টাকা মাহিনা দিয়া ম্যানেজার রাখা চলে। বড় বড় ফ্যাক্টরী, ইনশিউর‍্যান্স কোম্পানী, বহির্ব্বাণিজ্যের বড় বড় সৌধমালা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

জীবনযাত্রার বাস্তব মাপকাঠি

ব্যাঙ্ক অতি সোজা বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু আবার এই সোজা কথাটার মধ্যে একটা গভীর কথাও আছে। দেশোন্নতি, আর্থিক উন্নতি, জাতীয় চরিত্র,"আধুনিকতা"এই ব্যাঙ্ক-গঠনের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ, এই ব্যাঙ্কের দ্বারা একটা জাতির ভিতরকার আসল কথাগুলা পাকড়াও করা যাইতে পারে। যে দেশে ব্যাঙ্ক নাই, অথবা তাহার সংখ্যা কম,

বুঝিতে হইবে সে দেশে আধুনিক ঢঙের ধনসম্পদ নাই। নব্য বনিয়াদের উপর তাহার ভিত্তি নয়। ব্যাঙ্ক "একালের" ধন-সম্পদের ভিত্তি।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান একটা যন্ত্রবিশেষ,—দেশের ধনদৌলত জরীপ করিবার, আর্থিক জীবন মাপিবার যন্ত্র। একটা জাতের আর্থিক দৌড় কতদূর, তাহা তাহার ব্যাঙ্কগুলার একতলা বাড়ী কি দোতলা বাড়ী, সেখানে ৫০০ লোক খাটে কি পাঁচহাজার লোক খাটে, সেই সবের শাখা আফিস কতগুলি—এই সব দেখিলেই বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কাজেই দেশটা বড় কি ছোট তাহার একটা বড় সাক্ষী হইতেছে ব্যাঙ্কের আকার-প্রকার। এক জায়গার চেয়ে আর এক জায়গা কত বেশী গরম তাহা যেমন থার্মোমেটার যন্ত্র বলিয়া দেয়, তেম্নি এদেশটা ওদেশের চেয়ে কত বড় বা কত ছোট তাহা এই ব্যাঙ্ক-যন্ত্রের মাপজোকে আমরা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারি।

তৃতীয়তঃ, একটা গুরুতর কথা ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানে ধরা পড়ে। যে জাত ব্যাঙ্ক চালাইতে জানে না, সেটা নেহাৎ অপদার্থ। যে জাতের তাঁবে একটা ব্যাঙ্কও নাই, তাহাকে শুধু দরিদ্র বলিতে হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হইবে তাহার চরিত্র অতি ঘৃণ্য, সভ্যসমাজে তাহার নামোল্লেখ করা যায় না। নরনারীর জীবনীশক্তি মাপিবার যন্ত্র হইতেছে ব্যাঙ্ক। জাতীয় চরিত্র, নৈতিক জীবন, আধ্যাত্মিকতা—এসব মাপিবার, বুঝিবার বিপুল যন্ত্র ব্যাঙ্ক।

যাঁহারা কতকগুলা বিশেষ্য বিশেষণ কায়েম করিয়া কোনো জাতি সম্বন্ধে বা তাহার চরিত্র সম্বন্ধে মতামত জাহির করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা একটা মস্ত দোষ করিয়া ফেলেন। কারণ, বস্তুনিষ্ঠ ভাবে জাতিকে, জাতির জীবনকে, তাহার নৈতিক চরিত্র প্রভৃতিকে বুঝিবার জন্য তাঁহারা কোনো বিশেষ মাপকাঠি ব্যবহার করেন না। তাঁহাদিগকে বলিতে চাই

যে "হাজার উপায়ে বাস্তব প্রণালীতে জাতির চরিত্র বুঝা সম্ভব। ব্যাঙ্ক হইতেছে এই কাজের অন্যতম বিপুল যন্ত্র। এ যন্ত্র কায়েম করিলে জাতীয় চরিত্র সমঝিবার পক্ষে কোনো গোঁজামিল দিবার সম্ভাবনা থাকে না।"

বিশ্বাস-তত্ত্ব ও জাতীয় চরিত্র

ব্যাঙ্কের প্রাণ হইতেছে বিশ্বাস (ক্রেডিট্)। ইয়োরামেরিকার সব জাতির মধ্যেই ব্যাঙ্ক শব্দটা প্রচলিত। তবে ভিন্ন ভিন্ন জাতি তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শব্দটার উচ্চারণ একটু অদল-বদল করিয়া লয়। যথা,—ফরাসী বাঁক, জার্ম্মাণ বাঙ্ক, ইতালিয়ান বাঙ্কা ইত্যাদি।

কিন্তু ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের জন্য "ক্রেডিট্" শব্দ বেশী ব্যবহার করিয়া থাকে ফরাসীরা, ইতালিয়ানরা,আর জার্ম্মাণরা। বিলাতে আর আমেরিকায় এই শব্দের রেওয়াজ এক প্রকার নাই। 'ব্যাঙ্ক'ই এই দুই মুল্লুকে একমাত্র শব্দ। কিন্তু জার্ম্মাণিতে 'ক্রেডিট্ আন্‌ষ্টাণ্ট' 'ক্রেডিট্ প্রতিষ্ঠান' নামে অনেক ব্যাঙ্ক প্রচলিত। অষ্ট্রীয়া, সুইটসারল্যাণ্ড ইত্যাদি জার্ম্মাণ-ভাষী দেশেও এইরূপ। ফরাসীরা 'সোসিয়েতে ক্রেদি' নামে ব্যাঙ্কের পরিচয় দিতে অভ্যস্ত। ইতালিতে এই সম্পর্কে "ক্রেদিত" শব্দের রেওয়াজ আছে।

ধার দেওয়া আর ধার লওয়া পরস্পরের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই যে শব্দের অর্থ বিশ্বাস, সেই শব্দেই ধার দেওয়া-লওয়ার কর্ম্মকেন্দ্রও বুঝাইতেছে। তুমি তোমার টাকা হাজির করিয়াছ বলিয়াই তোমাকে ব্যাঙ্ক বিশ্বাস করিতে পারে না। অপরিচিত লোকের জন্য প্রতিনিধি দরকার হয় বা বিশ্বাস প্রতিপন্ন করিবার জন্য দুই একজনের চিঠি আনা প্রয়োজন হয়। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই টাকার লেনা দেনা

চলিয়া থাকে। যে জাতের মধ্যে ব্যাঙ্ক নাই, বুঝিতে হইবে তাহার নরনারীর ভিতর পরস্পর বিশ্বাস, আস্থা জিনিসটাও নাই; সে জাতের লোক কখনও কেউ কাউকে বিশ্বাস করিতে পারে না। থার্ম্মোমেটার যেমন তাপের মাত্রা কতখানি বলিয়া দিবে, ব্যারোমেটার যেমন হাওয়ার চাপের পরিমাণ বলিয়া দিবে—আকাশ জরীপ করিবার প্রয়োজন হইবে না, ব্যাঙ্কও তেম্নি একটা জাতের নৈতিক দৌড় কতদূর সহজেই বলিয়া দিবে। টাকা-পয়সা বিনিময়ের বিশ্বাস যে জাতটার মধ্যে নাই, আধ্যাত্মিক হিসাবে সে জাতটা অধঃপতিত। ইহা অতি সোজা কথা।

বর্ত্তমান ভারতের ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান

যদিও ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান সকলের কথাই আজ আপনাদিগকে কিছু কিছু বলিব, কিন্তু আমার প্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে আমার দেশ। এ দেশটা কোন্ অবস্থায় আছে? অন্যান্য জাতের সমকক্ষ হইতে ইহার কতদিন লাগিবে? বাংলায় ব্যাঙ্ক-গঠন কোন্ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? আবার কিছু কিছু অঙ্কগুলার শরণাপন্ন হইতে হইবে।

প্রথমতঃ, এক রকম ব্যাঙ্ক যাহা আমাদের দেশে প্রায় পাঁচ সাত শত বছর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ঐ যাহাকে বলে কিনা হুণ্ডি ব্যাঙ্ক। পুঁজিপতির নিকট যত টাকা আছে, প্রধানতঃ তাহা দিয়া নিজে নিজে কারবার চালানো সম্ভব। হুণ্ডি-ব্যাঙ্কের কাজ এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত কাজ। পরের টাকা ধার লওয়া হয় না, পরকে টাকা ধার দেওয়াই প্রায় একমাত্র ব্যবসা। এই সব ব্যাঙ্ক সমস্তই ভারত-সন্তানের হাতে।

দ্বিতীয় রকম ব্যাঙ্ক যাহা কিনা বিদেশীদের হাতে। পরের টাকা ধার লওয়া হয়। এই ধার লওয়া টাকা আবার অন্যকে ধার দেওয়াও হয়।

বহির্বাণিজ্য, বড় বড় কারবার, রেলওয়ে, জাহাজ-কোম্পানী ইত্যাদি যাহা কিছু সবই এই সকল ব্যাঙ্কের সাহায্যে চলিতেছে। বিদেশী টাকা-পয়সাও এই ধরণের ব্যাঙ্কে ভাঙানো চলে। বিদেশীদের তাঁবে এই সব চলিতেছে বটে, কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কে আমাদের দেশী লোকের টাকাও বিস্তর মজুত আছে। এই সব বিদেশী প্রতিষ্ঠান ভারতে না থাকিলে বহু ভারতবাসীর অনেক ক্ষতি হইত। আমাদের যাঁহারা অগাধ টাকার মালিক, তাঁহাদের কেবলই ভাবিয়া মরিতে হইত—এই সব টাকা দিয়া তাঁহারা কি করিবেন—যদি এই ধরণের ব্যাঙ্ক এদেশে না থাকিত। এই সব ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া এ দেশের ধনীরা আর কিছু না হউক নিরাপদে ঘুমাইতে পারেন। বিদেশী-পরিচালিত ব্যাঙ্ক হইলেও আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে এইগুলি হইতে অনেক সময়েই বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়। কাজেই স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, আমাদের আর্থিক উন্নতি বিষয়েও এই সব বিদেশী ব্যাঙ্ক কিছু কিছু সাহায্য করিতেছে।

তৃতীয়তঃ, যে সব ব্যাঙ্ক আমাদের নিজের হাতে অর্থাৎ যাহার মূলধন আমাদের দেশী লোকের, আর যাহার পরিচালনাও আমাদেরই করিৎকর্ম্মা লোকের অধীনে। ভারতে এই রকম ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেশী নয়, তবে আস্তে আস্তে বাড়িতেছে। এইগুলাকে কোনো মতে ফরাসী, জার্ম্মাণ ইত্যাদি জাতীয় কোনো কোনো ব্যাঙ্কের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। অন্ততঃপক্ষে এই সব ভারতীয় ও বিদেশী ব্যাঙ্কগুলা একই জাতের। ছোটবড়, উচ্চনীচ ভেদ আলাদা কথা। ভারতে আবার বাঙালীদের ব্যাঙ্কের কোনই ইজ্জৎ নাই।

ভারতের মধ্যে একমাত্র "সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক"ই কিছু মর্য্যাদা-সম্মান দাবী পারে; কিন্তু এইটা পার্শীদের তাঁবে। ইহার মধ্যে বাঙালীর কিছু নাই। ইহার সমস্ত কর্ম্মচারী—সেই নীচের দরোয়ান হইতে সুরু

করিয়া উচ্চতম ম্যানেজার পর্য্যন্ত—প্রায় আগাগোড়া পার্শী। বোম্বাইয়ের বড় আফিসের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। এই ব্যাঙ্ক একমাত্র ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। ইহার মূলধন আড়াই কোটী; বর্ত্তমানে এই ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছে কমসে কম পনর কোটী টাকা। ইহার পরে আসন দিতে পারি "পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক"কে। পাঞ্জাবীদের বাঙালীরা কি চক্ষে দেখে জানি না, তবে এই জাতটা ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বাঙালীকে অনেক-কিছু শিখাইয়া দিতে পারে,—যদিও এই পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রভেদ আকাশপাতাল। "বেনারস ব্যাঙ্ক" বলিয়া আর একটা ব্যাঙ্ক আছে। এটা নেহাৎ ছোট হইলেও এরণ্ড যেমন "দ্রুম", সেইরূপ আমাদের দেশের ব্যাঙ্কের মধ্যে এইটিও নিজের আসন দাবী করিতে পারে।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় বাঙালীর দৌড়

আর আমাদের বাংলায় আছে "বেঙ্গল ন্যাশলান ব্যাঙ্ক"। সেটার ভিত্তি ১৯০৫-৭ সনের স্বদেশী আন্দোলনের আওতায় গড়িয়া উঠে। সেই যুগে "কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক" বাঙালীর কর্ত্তৃত্বে মাথা তুলে। এখনো তার টিকি দেখা যাইতেছে বটে, তবে সেটা জাঁকিয়া উঠিতে পারে নাই। দেশে ফিরিয়া আসিবার পর "মহাজন ব্যাঙ্ক" বলিয়া আর একটা ব্যাঙ্কের নাম শুনিতে পাইতেছি। ইহার মূলধন কত হইবে জানি না, তবে পঞ্চাশ ষাট হাজারের বেশী মূলধন বোধ হয় নয়;—লাখেও যাইয়া পৌঁছাইয়া থাকিতে পারে। যদি এখন আপনারা জানিতে চাহেন এই দেড়টা, দু'টা কি আড়াইটা বা এই ধরণের আর কয়েকটা ব্যাঙ্কের মূলধন একত্রে কত দাঁড়াইবে, তবে বলিতে পারি, আজ পর্য্যন্ত মাত্র,—যদি খুব বেশী করিয়া ধরা যায়, তবে ৩০ হইতে ৪০ লাখ। ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত এই আমাদের দৌড়।

কিন্তু এই সব ব্যাঙ্ক ছাড়াও বাংলার মফঃস্বলে কতকগুলি ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। এগুলিকে সাধারণতঃ "লোন আফিস" বলা হয়। এই বাংলাদেশেই কমসে কম দু-তিন শ লোন আফিস আছে, শুনিতে পাইতেছি। যদিও এগুলিকে যথাযথভাবে ব্যাঙ্ক বলা চলে না, কিন্তু এইগুলিই ভবিষ্যতে বড় বড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি গড়িয়া তুলিবে। পাঁচজন, দশজন, ত্রিশজন মিলিয়া এক একটা বিশ্বাস-স্থাপনের প্রতিষ্ঠান, ধার লওয়া-দেওয়ার কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতেছে। এই সব ছোট ছোট লোন-আফিসের দ্বারা আর যাই হউক না কেন, একটা বিশ্বাসের ক্ষেত্র, আস্থাস্থাপনের কর্ম্মভূমি, পরস্পর-মৈত্রীর বাস্তব কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

এখন কথা হইতেছে, কেমন করিয়া এই সব "লোন আফিস"কে খাঁটি ব্যাঙ্কে পরিণত করা যাইতে পারে। এইটাই বর্ত্তমানে নব্য বাঙালীর এক বড় সমস্যা। থার্ম্মোমেটার, ব্যারোমেটারে উত্তাপ আর আবহাওয়া মাপা যাইতে পারে। দড়ি ধরিয়া মাপিয়া দেওয়া চলে হিমালয়ের কত নীচে রকি পর্ব্বত। আবার তেমি ব্যাঙ্কের কথা উঠিলে আর সব দেশের তুলনায় বলা চলে বাঙালী জাতটা ঐ বঙ্গোপসাগরের তলে বাস করিতেছে।

বিলাতী ব্যাঙ্কের বহর

বিলাতের অনেক "বাঘা" "বাঘা" বড় লোকের নাম আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। এই সব লোকের মধ্যে ম্যাককেনা একজন মস্ত লোক। ফরাসী, আমেরিকান, জার্ম্মাণ্‌রা সকলেই এ লোকটাকে জবরদস্ত বিবেচনা করিয়া থাকে। টাকার বাজারে ম্যাককেনার মত বাঘা লোক অতি কমই আছে। এই ম্যাককেনা "মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কে"র

একজন কর্ণধার। এই ব্যাঙ্কের ১৯২৫ সনের যে রিপোর্ট আমি পাইয়াছি, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "এই মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের ২২০০টি শাখা স্থাপিত হইয়াছে এবং এগুলি কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে স্থাপিত।"এই সব কয়টি দেশ মিলিয়া আমাদের গোটা বাংলার সমান। অথচ ইহাদের কাছে বাঙালীর স্থান কত নীচে। আমাদের দেশের "ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে" ও এক শতের বেশী শাখা নাই—কারণ তাহা থাকিবারই আইন নাই।

এই রকম মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের মত আরও কয়েকটা বাঘা বাঘা ব্যাঙ্ক বিলাতে রহিয়াছে। একটা হইতেছে "বার্কলেস্ ব্যাঙ্ক"—ইহার শাখা হইতেছে ১৭০০ ; "লয়েডস্ ব্যাঙ্ক", "ওয়েষ্ট মিনষ্টার ব্যাঙ্ক", "ন্যাশন্যাল প্রোভিন্‌শ্যাল ব্যাঙ্ক"—এই ৫টা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাঙ্ক লণ্ডন সহরে আছে। ম্যানচেষ্টার সহরটা নিজেই একটা বিপুল সাম্রাজ্যের রাজধানী হইতে পারে। তেম্নি লিবারপুলও একটা সাম্রাজ্য চালাইতে পারে। এই দুই সহরেই একাধিক বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে। বিলাতের অলিতে গলিতে যে অসংখ্য ছোট-খাট ব্যাঙ্ক রহিয়াছে, সে সব ছাড়িয়া দিলেও মোটামুটী বড় বড় ব্যাঙ্কের শাখা এই ১৯২৬ সনে আট হাজার দাঁড়াইবে। এই শাখা দিয়া একমাত্র বিলাতেই বলিতে হয় কমসে কম আট হাজার ব্যাঙ্ক চলিতেছে। এখন আমাদের দেশের সঙ্গে ও দেশটার তুলনা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? কোথায় গৌরীশৃঙ্গ আর কোথায় বঙ্গোপসাগর!

জার্ম্মাণ ও আমেরিকান ব্যাঙ্কের কথা

এইবার জার্ম্মাণির "ডায়চে বাঙ্কের" কথা বলি। বার্লিনের যে পাড়ায় এই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত সেখানে গেলে আপনাদের গোলকধাঁধা লাগিয়া

যাইবে। লম্বা চওড়ায় বহর তাহার এই কলেজ স্কোয়ার হইতে সেনট্রাল অ্যাভিনিউ। ইহার বিপুলকায় বাড়ীগুলি দেখিতে দেখিতে চোখে ছানাবড়া লাগিয়া যায়।

তারপর আমেরিকার কথা। ইয়োরোপের বড় বড় দেশে কোটী কোটী লইয়া কারবার; কিন্তু আমেরিকার আর কোটীতে কুলায় না। সেখানে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ! সে দেশের এক ডলার আমাদের তিন টাকার উপর। তাহার পিছনে আবার কেবল শূন্য। চেক কাকে বলে এই আমেরিকায় তাহা বুঝা যায়। এখানে পাঁচসিকা, এমন কি পাঁচ গণ্ডা পয়সার সওদায়ও চেক চলে। "পানওয়ালী", "বিড়িওয়ালা", মুচি ইহাদের পয়সাকড়ি পর্য্যন্ত চেকে দেওয়া যায়। এমনিতর আজগুবি দেশ এই আমেরিকা।

চেক-খালাসে ভারত ও দুনিয়া

ভারতে আজকাল ৭টা "ক্লীয়ারিং হাউস" বা চেক-খালাস-ভবন চলিতেছে। কলিকাতা, বম্বে, মান্দ্রাজ, করাচি ও রেঙ্গুন এই পাঁচ সহরে এতদিন পাঁচটা ছিল। ১৯২০ সনে কানপুরে একটা আর ১৯২১ সনে লাহোরে একটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯২০ সনে ৩১,৪৯, ১৮,০০,০০০ টাকার চেক খালাস হইবার জন্য এই সকল ভবনে আসিয়াছিল। এত বেশী আর কখনো ভারতে দেখা যায় নাই। ১৯২৩ সনের পরিমাণ ১৮,৭৬,১৯,০০,০০০ টাকা।

এই হিসাবে ভারতের সঙ্গে বিলাতের তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের চেক-অভ্যাসটার ওজন করা সম্ভব। ১৯২৩ সনে বিলাতে চেক খালাস হইয়াছিল ৩৬,৬২৭,৫৯২,০০০। এই অঙ্কটা সেই বৎসরের ভারতীয় অঙ্কের ৩০ গুণেরও বেশী।

মার্কিণ মুল্লুক বিলাতকেও হারায়। ইংরেজ-খালাসের ২॥০ গুণ বেশী খালাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যুক্তরাষ্ট্রে সেই বৎসর। সেদেশে প্রায় ২৫০টা ক্লীয়ারিং হাউস আছে। কোথায় আমরা আর কোথায় তারা!

ভারতীয় ব্যাঙ্কের হিসাব পত্র

ভারতে যে সব "এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক" কাজ করিতেছে তাহাদের ১৮টির প্রাপ্ত মূলধন এবং গচ্ছিত টাকার সমষ্টি ১৯২৪ সনে ১৩ কোটি পাউণ্ডের উপর উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাদের জমা দাঁড়াইয়াছে ৭ কোটি ১০ লাখ পাউণ্ড এবং নগদ ফাজিল হইয়াছে ১ কোটি ৬০ লাখ পাউণ্ড।

৬৯টি "জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্কের" শাখার সংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় ৫০০ শত। ১৯২৪ সনে এই সব ব্যাঙ্কের প্রাপ্ত মূলধন এবং গচ্ছিত টাকার সমষ্টি হইয়াছিল ১১,৭৮ লক্ষ টাকা। জমা দাঁড়ায় ৫৫,১৭ লক্ষ এবং নগদ ফাজিল হয় ১১,৬৪ লক্ষ টাকা।

ভারতের সকল প্রকার ব্যাঙ্কের মোট জমা ১৯১৫ সনে ছিল ৯৬ কোটি টাকা। তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৪ সনে দাঁড়াইয়াছে ২১০ কোটি টাকা। ১৯২৪ সনে যত জমা হয়, তাহার মধ্যে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের অংশ শতকরা ৪০ ভাগ, এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কের ৩৪ ভাগ এবং জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্কগুলির ২৬ ভাগ।

১৯২৪ সনের শেষে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে আমানতী জমার অনুপাতে নগদ ফাজিল ছিল শতকরা ১৮ ভাগ। এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্কের ঐ অনুপাত ছিল শতকরা ২০ ভাগ। আর যে সমস্ত এক্‌স্‌চেঞ্জ ব্যাঙ্ক ভারতের বাহিরে বেশী কাজ করে, তাহাদের ঐ অনুপাত শতকরা ৩১ ভাগ দাঁড়াইয়াছিল। যে সমস্ত ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্কগুলির মূলধন ও

গচ্ছিত টাকা ৫,০০,০০০ এবং তাহার উপর, তাহাদের নগদ ফাজিল হইয়াছিল শতকরা ২১ ভাগ এবং যাহাদের মূলধন কম, তাহাদের হইয়াছিল শতকরা ২০ ভাগ।

ভারতের কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কগুলাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ‘ক’-শ্রেণী—যাহাদের পাঁচ লক্ষ ও তদূর্দ্ধ টাকা মূলধন। ‘খ’-শ্রেণী—যাহাদের মূলধন এক লক্ষের উপর এবং পাঁচ লক্ষের কম। ১৯১৫-১৬ সনে ‘ক’-শ্রেণীর ব্যাঙ্ক মাত্র দুইটি ছিল, ১৯২৪-২৫ সনে হইয়াছে ৮টি। জমা এবং ঋণদান ১৯ লাখ ৪৬ হাজার টাকা হইতে ৪ কোটি ৫১ লাখ ৪১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। ‘খ’-শ্রেণীর ১৯১৫-১৬ সনে ছিল ১৮টি, ১৯২৪-২৫ সনে হইয়াছে ৯০টি। ১৯২৪-২৫ সনে মূলধন ও গচ্ছিত টাকা হইয়াছে ১ কোটি ৬৬ লাখ ৮১ হাজার টাকা এবং জমা ও ঋণদান ৭ কোটি ৯৪ লাখ ৪৭ হাজার টাকা।

রকমারি ব্যাঙ্ক-ব্যবসা

ভারতীয় ব্যাঙ্কের টাকাকড়ির ওজন বড় ভারী কিছু নয় বুঝাই যাইতেছে। তবে ব্যাঙ্ক-ব্যবসার দিকে বাঙালী জাতির নজর যে গিয়াছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা, কারবারে ব্যাঙ্কের টাকা খাটানো ইত্যাদি কাজের স্বভাব বাঙালী সমাজে যে ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে তাহাও সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তবে খাঁটি ব্যাঙ্কের ব্যবসা যত প্রকারের হইতে পারে তাহার অনেক কিছুই এখনো আমাদের রপ্ত হয় নাই।

ব্যাঙ্ক-ব্যবসার আসল কারবারটা কি বা কি কি? মোটের উপর ১৫।১৬ প্রকার। কারবারগুলা নিম্নরূপ:—(১) সোনা-রূপার বেচা-কেনা, (২) টাকাকড়ি ভাঙ্গানো বা পোদ্দারি (৩) লোকের টাকাকড়ি জমা রাখা,

(৪) যে সকল লোক ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি জমা রাখিয়াছে তাহাদের পরস্পর দেনা-পাওনা কাটাকাটি করা। এ জন্য টাকার চলাচল আবশ্যক হয় না। ব্যাঙ্কের খাতা-পত্রে একজনের জমা হইতে খরচ লিখিয়া আর একজনের হিসাবে জমা করা হয় মাত্র। খাঁটি ব্যাঙ্কিং বলিলে এই কারবারটার কথাই খুব বেশী মনে পড়ে। ব্যবসায়িমহলে এই কাণ্ড অহরহ চলিতেছে। (৫) ব্যবসাদারদের "চিঠিপত্র" বা কাগজ "ভাঙানো"। বর্ত্তমান জগতে এই কাগজ-বস্তুটার রেওয়াজ খুব বেশী। রামার নিকট টাকা পাইবে শ্যামা। রামা দিল শ্যামাকে একখানা চিরকুট। শ্যামা এই চিরকুটের জোরে আবদুলের নিকট হইতে মাল খরিদ করিল। আবদুল শেষ পর্য্যন্ত রামার নিকট টাকা সমঝিয়া লইতে আসিল। রামার নিকটও আসিবার দরকার নাই। রামা যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবার করে সেই ব্যাঙ্কই আবদুলকে চিরকুটটা ভাঙাইয়া দিবে। এই হইল অতি সহজ ধরণের বাণিজ্য-কাগজ। এই চিরকুটটা যখন এক সহর হইতে আর এক সহরে যায় অথবা যখন এক দেশের লোক আর এক দেশের লোকের নামে চিরকুট ঝাড়ে, তখন তাহার নাম হয় আর-কিছু। এই সব পারিভাষিকে সম্প্রতি প্রবেশ করিবার দরকার নাই। তৃতীয় শ্রেণীর "কাগজ" হইতেছে "চেক"। আর এক প্রকার কাগজ হইতেছে গুদাম-জাত মালপত্রের সার্টিফিকেট বা রসিদ। এই কাগজটা দেখিয়া ব্যাঙ্ক বুঝে যে কাগজওয়ালার তাঁবে অমুক জায়গায় অত পরিমাণ মাল আছে। আবাদের ফসল সম্বন্ধেও এইরূপ গুদামি রসিদ চলিতে পারে। এই সকল রকমারি কাগজ, চিরকুট, হুণ্ডি, চেক, রসিদ ভাঙানো ব্যাঙ্ক-ব্যবসার বড় কাজ। এই দিকে বাঙালীর হাতেখড়ি সুরু হইতেছে মাত্র।

(৬) মক্কেলদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট হইতে তাহাদের

পাওনা টাকাকড়ি আদায় করিয়া দেওয়া। (৭) এক সহর বা দেশ হইতে অন্য সহরে বা দেশে টাকা পাঠাইবার জন্য বাটা আদায় করা হইয়া থাকে। (৮) ভিন্ন ভিন্ন সহরে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের রকমারি "কাগজের" সওদা করা। এক স্থানের কাগজ কিনিয়া অন্য স্থানে বেচা হইয়া থাকে। টাকা চলাচলের দরকার উঠিয়া যায় (৪নং দ্রষ্টব্য)। এই ধরণের কাগজ ভাঙাভাঙি করা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে একটা মস্ত ব্যবসা। বাঙালী এখনো এই পথের পথিক হইতে শিখে নাই বলিলেই চলে। বর্ত্তমান জগতের ইহা একটা বিশেষত্ব। এই হিসাবে বাঙালীরা এখনো বর্ত্তমান জগতের লোক নয়।

(৯) "কাগজ"গুলা লইয়া অন্যান্য ভাঙাভাঙি ও স্বতন্ত্র কারবার। তাহার একটাকে বলে কাগজ "ডিস্কাউণ্ট" করা। আবদুলের সইওয়ালা অর্থাৎ দেনার স্বীকারওয়ালা কাগজটা রামার নিকট হইতে লইয়া কোনো ব্যাঙ্ক যদি তাহাকে তৎক্ষণাৎ নগদ টাকা সমঝিয়া দেয় তাহা হইলে ব্যাঙ্ক কাগজটা "ডিস্কাউণ্ট" করিল। এই ডিস্কাউণ্ট কাণ্ডে ঝুঁকি অনেক, বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে-দেশে ব্যাঙ্ক এই ঝুঁকি লইতে সাহসী হয় না, সেই দেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়া স্বীকার করা চলে না। এই কষ্টিপাথরে ঘষিলে দেখিব বাঙালীসমাজ এখনো প্রায় ব্যাঙ্ক-হীন অবস্থায়ই যেন রহিয়াছে।

কাগজ ভাঙাইবার আর এক কায়দাকে ফরাসীতে বলে "আক্‌সেপ্‌-তাঁস", জার্ম্মাণে "আকৎ সেপ্‌ট্", আর আমাদের চল্‌তি ইংরেজি "অ্যাকসেপ্‌ট্যান্স"। সোজা কথায় কাগজ স্বীকার করা বুঝিতেছি। এই "স্বীকার" বা "গ্রহণ" করাটা নগদ টাকা দিয়া দেওয়ার সামিল নয়। ব্যাঙ্ক কাগজটার উপর সহি দিয়া বলে মাত্র,—"যদু, তোর মালপত্র বা সম্পত্তি বা পুঁজি সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস আছে"। যদু ব্যাঙ্কের এইরূপ

সহিওয়ালা চিরকুট লইয়া অন্য এক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ টাকা পাইতে পারে। এই দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক "ডিস্কাউন্ট" করিল,—প্রথম ব্যাঙ্কটা করিয়াছে মাত্র "অ্যাকসেপ্ট" অর্থাৎ স্বীকার, গ্রহণ বা বিশ্বাস। নগদ টাকা দিল দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক প্রথম ব্যাঙ্কের ঝুঁকিতে। যদি যদুর অবস্থা কাহিল হয়, তাহা হইলে স্বীকারকারী প্রথম ব্যাঙ্কের ঘাড় ভাঙা হইবে। কাজেই "আক্‌সেপ্‌তাঁস" ব্যবসাটা গুরুতর রকমের।

(১০) চল্‌তি হিসাবে খাতাপত্র রাখা। বাজার হইতে মক্কেলদের জন্য তাহাদের পাওনা টাকা উস্থল করা আর মক্কেলদের পক্ষ হইতে তাহাদের দেনা শুধিয়া দেওয়া ব্যাঙ্কের এই শ্রেণীর কাজ। সংখ্যা এবং পরিমাণ হিসাবে এই কাজ খুবই বেশী,—কেননা প্রত্যেক মক্কেলের জন্য প্রতিদিনই এই ধরণের কাজ কিছু না কিছু সামলাইতে হয়ই হয়। ব্যাঙ্কের খাতায় প্রতিদিনই মক্কেলদের জমাখরচের হিসাব চলিতে থাকে।

(১১) নোট ছাড়ার কাজ। যে যে লোককে টাকা দিতে হইবে তাহাদিগকে নগদ টাকা না দিয়া একটা প্রতিজ্ঞাপত্র দেওয়ার নাম নোট জারি করা। আগেকার দিনে একাধিক ব্যাঙ্কের এই ক্ষমতা ছিল। কিন্তু প্রায় সকল দেশেই গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবসাটা শেষ পর্য্যন্ত কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্কের একচেটিয়া কারবারে পরিণত করিয়া দিয়াছে। প্রতিজ্ঞাপত্র বা নোট জারি করিবার নিয়ম-কানুন বিলাতে, জার্ম্মাণিতে এবং ফ্রান্সে পৃথক পৃথক। বাঙালী এই ব্যবসা একদম জানেই না। আর জানিবার সম্ভাবনাও আমাদের নাই। তবে এখন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই হিড়িকে দেশের লোকের ভিতর নোট, কাগজী টাকা, নোট-ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কের প্রতিজ্ঞা-পত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা এবং তর্কপ্রশ্ন সুরু হইতেছে।

(১২) সওদাগরি মাল বা মাল চালানের রসিদ বন্ধক রাখিয়া মক্কেলকে টাকা দেওয়া। চাষ আবাদের ফসল সার্ব্বজনিক গোলায় ("ধর্ম্মগোলায়") বন্ধক রাখিয়াও ব্যাঙ্ক চাষীদিগকে নগদ টাকা দেয়। (১৩) এই ধরণের তৃতীয় বন্ধকি কারবার হইতেছে জমিজমার বন্ধকে টাকা দেওয়া। সকল প্রকারের বন্ধকি রসিদই অন্যান্য বাণিজ্য-চিরকুটের মতন বাজারে কেনা-বেচা চলে। আর এই কেনা-বেচার কাজও ব্যাঙ্কে করা হয়। এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা বাংলাদেশে কিছু কিছু সুরু হইয়াছে। কিন্তু কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

(১৪) রেল-কোম্পানী, শিল্প-কারখানা, বা ঐ জাতীয় কারবারের সঙ্ঘেরা বাজারে টাকা ধার করিতে চাহিলে তাহাদের হইয়া ব্যাঙ্ক ঐ কর্জ্জ চায় কিংবা এই সঙ্ঘের "শেয়ার" বেচিবার ভারও ব্যাঙ্কেরা লইয়া থাকে।

(১৫) বাজারে জনসাধারণের নিকট হইতে "কর্জ্জ" না চাহিয়া অথবা জনসাধারণের নিকট "শেয়ার" বেচিবার চেষ্টা না করিয়া ব্যাঙ্কগুলা খোদই কারবারী সঙ্ঘগুলাকে কর্জ্জ দেয় এবং তাহাদের শেয়ার খরিদ করে। এই সব "এলাহি কারখানা" বাঙালীর পক্ষে সম্প্রতি সুদূর ভবিষ্যতের কথা। ফ্রান্সেও সকল ব্যাঙ্ক এই সব দিকে মাথা খেলাইতে সাহস পায় না। এজন্য ট্যাঁকে টাকার জোর থাকা চাই খুবই বেশী।

(১৬) ষ্টক-এক্স্‌চেঞ্জে যত রকমের "কাগজ" লইয়া লেনাদেনা চলে, তাহার ভিতর নাক গুঁজিয়া রাখাও ব্যাঙ্কের এক বড় কারবার। ষ্টক-বাজারের দালালদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়। মক্কেলদের জন্য নানা প্রকার কাগজ কেনা বেচা করিতে করিতে ব্যাঙ্কগুলাকে খানিকটা জুয়াড়ি হইয়া পড়িতে হয়। ইহাতে ঝুঁকির পরিমাণ প্রচুর। বাঙালী ব্যাঙ্কের পক্ষে এই কারবার সম্প্রতি স্বপ্নাতীত।

পূর্ব্ব বনাম পশ্চিম

এখন কথা হইতেছে আমাদের আর ওদের তফাৎ কোন্‌খানটায়? আপনারা হয়ত বলিবেন "ওরা হল পশ্চিমের দেশ, পশ্চিমের লোক, পশ্চিমা জাত—ওদের এসব সাজে। আর আমরা হলাম পূবের দেশ, আধ্যাত্মিকতার দেশ। ওরা হল ছোট জাত, নেহাৎ ছোট, ওরা কেবল টাকা, টাকা, টাকা এই লইয়াই থাকে। আমাদের হইল মুনিঋষির দেশ, আমরা পার্থিব চিন্তাকে ছোট কাজ বলিয়া মনে করি"। আপনাদেরকে পাল্টা জবাব দিয়া ওরা বলে—"তোরা হলি পূবের লোক, সুয়েজের ওধারে ব্যাঙ্ক গড়া সাজে না। তুরস্ক, জাপান, ভারত—এরা ব্যাঙ্কের কোনো কদর জানে না।"

এসব শুনিয়া কিন্তু আমাদের লোকেরা চটিয়া লাল। এঁরা বলেন :— "বটে রে! তোরা হলি অতি ছোট জাত, কতকগুলি টাকা জমাইয়াছিস্ বই তো নয়। টাকাকে যদি ভাল বলিয়া জ্ঞান করিতাম, তবে আমরাও জমাইতে পারিতাম। আমাদের ঠাকুরদাদারাই তো বলিয়া গিয়াছে "অর্থমনর্থং"। আমাদের এইটা হইল মুনি-ঋষি-মহাত্মা-সন্ন্যাসী-স্বামী-বাবার দেশ। পশ্চিমের জাতগুলোর আমরা হইলাম গুরু। উহাদের শিক্ষার ভার লইবার জন্যইতো আমাদের পয়দা। উহাদেরকে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দিব আমরা, উহাদের টাকা শেষে আপনাআপনি আমাদের পায়ে আসিয়া লুটাইবে, কেননা আমরা হইতেছি "আধ্যাত্মিক" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল বাক্যের লড়াইয়ে যাঁহার যাঁহার ইচ্ছা মাতিয়া থাকুন। আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বলিয়া কোনো কথা আমি বিশ্বাস করি না। এই দুই আসলে এক জিনিষ। কেবল-

মাত্র আগু-পিছু প্রভেদ। জাতের, ধর্ম্মের, রক্তের, আদর্শের কোনো তফাৎ নাই। আমি বুঝি কেবল লোকগুলা পয়লা, দোস্‌রা কি তেস্‌রা ইত্যাদি। বাজারে আলু পটোল দেখিয়া যেমন বলিয়া দেওয়া যায় কোন্‌টা পয়লা, কোন্‌টা দোস্‌রা, কোন্‌টা তেস্‌রা নম্বরের, তেম্নি ব্যাঙ্কের দ্বারাও জাত বাছাই হয়। কেউ আগে, কেউ পরে। পূরবী বনাম পশ্চিমা নামক সমস্যা খাড়া করা আমার মতে আহাম্মুকি। যদি পশ্চিমেও কতকগুলি নরনারী বা নরনারীর দল আধ্যাত্মিক থাকে, তাহা হইলে এই পূরবী পশ্চিমার পার্থক্যটা টেঁকে কি? যদি পূর্ব্বেও পশ্চিমের মত কেউ ব্যাঙ্কে যায় বা কেউ বীমায় যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কি পূর্ব্বে, কি পশ্চিমে দুই দুনিয়াতেই লোকেদের গতিবিধি একই প্রকারের। সভ্যতার পথ, জীবনের চলাফেরা ইত্যাদি সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আবিষ্কার করা অসম্ভব।

ইতালি ও ভারত

আর এককথা। ইয়োরোপ বলিতে কেবল জার্ম্মাণি ইংলণ্ডকেই বুঝায় না। ধরুন না, এই ইতালির কথা। এ দেশের লোকেরা তো পশ্চিমের একটা বড় জাত। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? এই ইতালিয়ানরা একেবারে ভারতবাসীর মাসতুতু ভাই। উহাদের ভার্জ্জিল আমাদের কালিদাস। উহারাও যেমন ভার্জ্জিল-সাহিত্য লইয়া গর্ব্ব করিতেছে, আমরাও তেমনি আমাদের কালিদাসকে সপ্তমে চড়াইয়াছি।

এই যে ইতালি, যাহার রাজধানী রোম,—"রোমেশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"—সেই রোমে আজ কি দেখিতে পাই? ম্যালেরিয়া রোমকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। কোনো ইংরেজ যদি রোমের যে-কোনো বাড়ীতে বাস করিতে পারে, তবে তাহাকে নিশ্চয়ই বাহাদুর ছেলে বলিতে হইবে।

ফ্লোরেন্স ইতালির আর একটা বড় সহর। এইটি আর আমাদের কাশী ঠিক যেন এক ছাঁচে ঢালা।

আপনারা সকলেই হ্বেনিসের নাম শুনিয়াছেন। হ্বেনিসের মত রম্য সহর আর নাই—এইতো আপনাদের ধারণা। কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, কি মনোরম রেণেসাঁসের ছাঁচে গড়া ঘরবাড়ী—যেন ছবি! খালের ধারের এক একটা প্রাসাদ যেন এক একটা তাজমহল। কিন্তু এ সব বাড়ীগুলির অবস্থা কিরূপ শুনিবেন? ঐ হুগলীর ধার দিয়া গঙ্গার ঘাটে কতকগুলি বাড়ী আছে না—যাহা আমাদের ঠাকুরদাদারা করিয়া গিয়াছে? চূন-শুরকী খসিয়া পড়িতেছে, নাতিরা আর তাহার জীর্ণ-সংস্কার করিতে বা তাহার চাইতে বেশী কিছু করিতে পারে নাই। হ্বেনিসের এই সব বাড়ী যেন এক একটা প্রত্নতত্ত্বের গবেষণাগার! অর্থাৎ কবরের মুল্লুক! এখানে তাজা প্রাণবান মাল বিরল। টুরিষ্টদের বরাদ্দ এখানে আড়াই রাত!

একবার ইতালির কোনো এক সহরে এক জমীদার ভদ্রলোকের অতিথি হইয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমার কিছু টাকার প্রয়োজন। আমার একখানা চেক আছে, তুমি এইটা রাখিয়া তোমার কিছু লিয়ার দাও।" এই ভদ্রলোকটি আবার একজন খ্যাতনামা অস্ত্র-চিকিৎসক; চার চারটা ভাষা তাঁহার দখলে—জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, ফরাসী, ইংরেজী। নিজে আবার অধ্যাপকও বটে। ইহা ছাড়া আরও যতরকম গুণাবলী থাকা দরকার, তাহা ইঁহার আছে। তিনি চেকখানা দেখিলেন। সেটা সুইট্‌সারল্যাণ্ডের এক ব্যাঙ্কের, আর জার্ম্মাণ ভাষায় লেখা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি করিতে হইবে?" আমি বলিলাম "আমাকে লিয়ার দাও। মাত্র আমার ৭৫৲ টঙ্কা দরকার।" লোকটি আবার আমার বন্ধু—এম্নি ধারে চাহিলেও পাইতাম, কিন্তু মনে করিলাম

চেক যখন আছে, তখন এটা ভাঙ্গাইয়াই লওয়া যাইবে। যাক্, তিনি বলিলেন, "এই চেক লইয়া আমি কি করিব"? বলিতে কি, তাঁহার মত অত বড় শিক্ষিতকেও আমায় বুঝাইতে হইল তিনি চেক দিয়া কি করিবেন! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কিছুতেই চেক লইতে রাজী করিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, "ধরুন, যদি ব্যাঙ্কটা উঠিয়াই যায়!" এই তো ইতালির অবস্থা। অবশ্য সকল ইতালিয়ান পণ্ডিতই এমন হুসিয়ার, এরূপ ভাবিবার কারণ নাই।

চেকের চলন

আমার বক্তব্য হইতেছে যে, কেবল বাংলা দেশই দুনিয়ার একমাত্র দেশ নয়, যেখানে লোকেরা ব্যাঙ্ক বা চেক বোঝে না; পরন্তু সুয়েজের ওপারেও ঠিক এমনি দেশ আছে—সেইটি হইতেছে, মহাকবি ভার্জ্জিলের দেশ। চেক জিনিষটা ইতালির জনসাধারণ বোঝে না—হয়ত দশ বিশ জন, দুশ' পাঁচশ' লোকে জানে বা বোঝে। কিন্তু জাতকে জাত এ বস্তুটা বোঝে, একথা কোনো মতেই বলা চলে না বা স্বীকার করা যাইতে পারে না। তাহার অনেক পরিচয় আমি ইতালির পল্লীতে সহরে পাইয়াছি। দশ বিশজন হয়ত বা ব্যাঙ্কে টাকা রাখিল বা ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনা দেনা চালাইল, কিন্তু জাতকে জাত ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে—এমন জিনিষ ইতালিতে এখন পর্য্যন্তও সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

জার্ম্মাণ দেশটাতেই এই মাত্র পঁচিশ ত্রিশ বছর হইতে চেক চলিয়া আসিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এমন কি ইংলণ্ডেও চেকের চল বড় বেশী ছিল না। শুধু প্রাচ্যেই ইহার একমাত্র অভাব পরিলক্ষিত হয়, এইরূপ ভাবিলে আমাদের উপর অবিচার করা হইবে। পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, রুমাণিয়া প্রভৃতি ইয়োরোপের অনেক দেশে এখনও চেকের চলন হয় নাই।

পশ্চিমা খ্রীষ্টিয়ানদের অনেকেই আমাদের পূরবী হিন্দু-মুসলমানের অবস্থায়ই রহিয়াছে।

জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের ত্রিশ বৎসর

এইবার আরও গুরুতর কথা বলিব। এক সময়—সে বড় বেশী দিনের কথা নয়—এই ব্যাঙ্ক কথাটা ইতিহাসেই ছিল না, ইয়োরোপে ব্যাঙ্কবস্তু দেখা যাইত না। জার্ম্মাণির কথা বলিলেই বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইবে। জার্ম্মাণিতে—যেখানে কিনা আজ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাঙ্ক দেখিতে পাইতেছি—সেখানে ব্যাঙ্কগুলা মাত্র সেইদিন গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ জার্ম্মাণিতে অনেকগুলি "ডে" ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেছি। "ডি" (যাহার জার্ম্মাণ উচ্চারণ হইতেছে "ডে") অক্ষর দিয়া যে সকল নাম সুরু হয়, সেইগুলিকে বলে "ডে" ব্যাঙ্ক। এইগুলির একটু আশ্চর্য্য-রকম ইতিহাস রহিয়াছে। ইহা বুঝিতে হইলে ১৮৭০ সনে ফিরিয়া যাইতে হয়।

১৮৭০ সনে এমন কোনো ব্যাঙ্ক জার্ম্মাণিতে ছিল না যাহার কিনা আর একটি মাত্র স্বতন্ত্র শাখা-আফিসও ছিল। এই সময় "ড্যয়চে বাঙ্কে"র পর্য্যন্ত মাত্র একটা আফিস ছিল। এই যদি ১৮৭০ সনের জার্ম্মাণি হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রাচ্য না প্রতীচ্য বলিব? সেই যুগে বড় বড় ব্যাঙ্কগুলার সমবেত মূলধন ছিল মাত্র আট কোটি টাকা। ১৮৭০ থেকে ১৮৯৫ পর্য্যন্ত পঁচিশ বছরে মূলধনের দৌড় ত্রিশ কোটিতে গিয়া পৌঁছাইয়া-ছিল। ইহা হাতী-ঘোড়া এমন কিছু নয়। আজকালকার ভারতবাসীর পক্ষে ইহা কল্পনা করা আর নেহাৎ অসাধ্য নয়। ১৯০০ সন পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে লণ্ডন সহরে একটা শাখা স্থাপন করিবার সাহস "ড্যয়চে বাঙ্ক" ছাড়া আর কোনো জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কের হয় নাই। তাহা

ছাড়া ১৮৭০--১৯০৫ এই সময়ের মধ্যে কেউ ব্যাঙ্ককে টাকা ধার দিত না। কোনো ব্যাঙ্ক এই যুগে চেক চালাইতে সাহসী হয় নাই।

এই জার্ম্মাণি আজ দুনিয়ার এক সেরা দেশ। কিন্তু ইহার এই ৩৫ বছরের জীবনের সাথে তুলনায় বাঙালী-জীবনে কোনো তফাৎ দেখা যায় কি? কিছুই না। "অর্থমনর্থং" খ্রীষ্টীয় সাহিত্যেও যথেষ্ট রহিয়াছে। জার্ম্মাণ সমাজেও আজ পর্য্যন্ত ব্যবসা করা একটা হীন কাজ। জুতা মেরামত করা একটা বড়-কিছু বিবেচিত হয় না। যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন, তাঁহাদের সঙ্গে জার্ম্মাণির কুলীনরা সামাজিক বন্ধন রাখেন না—বিবাহাদি দেন না। বিলাতী সমাজেও এমনিতর ধারণা কিছু-কিছু আছে। তবে সর্ব্বত্রই কিছু-কিছু "সমাজ-সংস্কার" এখন দেখা যাইতেছে।

এই পঁয়ত্রিশ বছরের ঘটনা ভাবিয়া দেখিতে গেলে কি দেখা যায়? এই পঁয়ত্রিশ বছরে যেমন "খোকা হাঁটে পা পা" ঠিক তেম্নি আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া ফেলিয়া জার্ম্মাণ জাতটা অগ্রসর হইয়াছে। একদিনেই ইহাদের এই বর্ত্তমান বিপুল কারবার, ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ ফুলিয়া উঠে নাই। যদি জার্ম্মাণির অবস্থা বছর পঞ্চাশেক আগে প্রায় আজকালকার বাঙালীর মতনই হইতে পারে, তাহা হইলে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে প্রভেদটা কোথায়? এই বিগত পঞ্চাশ বছরের পেছনে তাকাইলে দেখিতে পাই, ইয়োরোপেও এমন যুগ গিয়াছে, যে যুগে দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা উহাদেরও মজ্জাগত ছিল।

যাক্, আর প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মামলায় সময় কাটাইতে চাহি না। এখন দেখিতে হইবে, কেমন করিয়া আমাদের জাতটা ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলায় কর্ম্মদক্ষ হইতে পারে। জার্ম্মাণি এই পঞ্চাশ বছরে বিপুল বিপুল ব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলিয়াছে বলিয়া আমরাও পারিব না কেন—তাহা লইয়া মাথা গরম করিবার দরকার নাই। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে

আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা আজ একদম শিশু। একথা স্বীকার না করিয়া লইলে লোকসান ছাড়া লাভ নাই।

ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানের একনম্বর কথা হইতেছে অংশীদারদের মূলধন (শেয়ার ক্যাপিটাল)। দুই নম্বর ব্যাঙ্কের শাখা-স্থাপন। তিন নম্বর হইতেছে চেক। উদ্ভিদতত্ত্ব জানা থাকিলে গাছের পাতা বা শিকড় দেখিয়া যেমন বলিয়া দেওয়া যায়, এইটা কি গাছ, জীবতত্ত্বজ্ঞ যেমন একখানা হাড় দেখিয়া বলিয়া দিবে এইটা অমুক জানোয়ারের হাড়, তেমি শেয়ার ক্যাপিটাল দেখিয়া বলা যাইতে পারে, ব্যাঙ্কটা কি অবস্থায় রহিয়াছে। ব্যাঙ্কের শাখা দেখিয়া বলা যাইতে পারে, এ ব্যাঙ্ক উন্নত শ্রেণীর কিনা। জার্ম্মাণি তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় আসিতে আধা শতাব্দী লইয়াছিল।

১৮৭০ সনের ফরাসী ব্যাঙ্ক

বছর পঞ্চাশেক আগে ফ্রান্স কি অবস্থায় ছিল? ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণিতে এই সময় একটা যুদ্ধ হয়। সেই হইতে ফ্রান্সে নব যুগের সৃষ্টি। ঐ সময় ফ্রান্সের তিরাশীটা "দেপার্ৎমাঁ" বা জেলার ভিতর মাত্র উনিশটাতে ব্যাঙ্ক ছিল। এইটা হইতেছে ১৮৭০ সনের কথা। কেবল মাত্র উনিশটা জেলায় ব্যাঙ্ক। আবার প্যারিসের মতন পাঁচ ছয়টা বড় সহর ছাড়া আর কোনো সহরে একাধিক ব্যাঙ্ক ছিল না।

আর এক পা পেছনে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখিতে পাই? ১৮৪৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় "কঁতোআর দেস্কঁৎ"। এইটাই ফ্রান্সের প্রথম "আধুনিক" ব্যাঙ্ক। কিন্তু আধুনিকতা ফরাসী সমাজে শিকড় গাড়িতে সমর্থ হয় ১৮৭০ সনের হিড়িকে। ১৮৪৮-১৮৭০ যুগ যেমন ইয়োরোপে, প্রায় তেমি হইতেছে ১৯০৫-১৯২৫ আমাদের এই বাংলায় বা ভারতে।

১৯২৬ সনের বাণী

আমরা এই বিশ বৎসরে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। আমাদের কৃতিত্ব যারপর নাই ছোট দরের। আজ ১৯২৬ সন। আজ কি দেখিতে পাই? জগৎ অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। যুবক-ভারত আসিয়া ঠেকিয়াছে অল্প দূরে মাত্র। চোখের সাম্‌নে, এই ধরুন বিলাতী "লেবার পার্টি"র কথা। বিশ বছর আগে ইহার কথা কেহই জানিত না—লেবার পার্টি বলিয়া এমন কোনো জিনিষই ছিল না। আজ এই বিশ বছরের চেষ্টায় তাহা গোটা দেশের শাসন কাজে তাহাদের মধ্য হইতে একজন প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে পারিয়াছে। আর দুনিয়ার সর্ব্বত্রই মজুর-রাজ না হয় মজুর-ঘেঁসা দলের রাজত্ব চলিতেছে। ১৯০৫ সনের যুগে ইয়োরোপের বিকার-গ্রস্ত নরনারীও এসব কল্পনা করিতে পারিত না। কিন্তু আমরা ভারতে ১৯০৫ সনের পর হইতে এতখানি অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিয়াছি কি? পারি নাই। যাক্‌ সে কথা।

আমাদের জাতটাকে আমরা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাই। হেগেল, ম্যাক্সমুলার ইত্যাদি পণ্ডিতের মতন পাপী আর নাই। তাঁহারা তাঁহাদের মন-গড়া দর্শন দিয়া ভারত-সন্তানকে ভারতীয় চরিত্র সম্বন্ধে অসংখ্য বুজরুকি শিখাইয়াছেন। সেই পাপ বাংলার মগজ হইতে ঝাড়িয়া বাহির করিয়া দিতে হইবে। ইঁহারাই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূরবই বা কোথায় আর পশ্চিমই বা কোথায়? পূরব-পশ্চিমের মধ্যে তো মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছরের তফাৎ।

এখন কথা হইতেছে, আমরা এই পঞ্চাশ বছর দখল করিতে পারিব কি? ভারতে অনেক বড় বড় যুগ চলিয়া গিয়াছে। মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্তের যুগ, মারাঠা-মোগলদের যুগ। সে সব আজ "সেকেলে" কথা। আবার

১৯০৫ সনের স্বদেশী যুগ। কিন্তু ১৯০৫-২৫ এইটাকেও আজ "প্রাগৈতিহাসিক যুগ" বলিতে চাই। ইহাকে "সেকেলে," মান্ধাতার আমল, প্রত্নতত্ত্বের যুগ বলিতে চাই। ইহার মোহে অন্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। চাই জীবনের বাড়তি, চাই নবীন জীবনবত্তা।

ছুনিয়ার ১৮৬০-১৮৭০ সনের কোঠায়ই আমরা ভারতে আজও রহিয়াছি। কথাটা বিনা গোঁজামিলে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমরা কতখানি পশ্চাৎপদ তাহা একটা কথা বলিলেই মালুম হইবে। ১৮৭০ সনের যুগে প্রাথমিক শিক্ষা ছুনিয়ার সকল সভ্যদেশে সার্ব্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হয়, যাহা কিনা ভারতে বর্ত্তমানেও নাই। আর এই যে বিলাতী, ফরাসী, জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলার কথা বলা হইল, সে সবও ১৮৭০ সনের এ-পিঠে আর ও-পিঠে মাথা খাড়া করিয়াছে।

যুবক বঙ্গের নবীন সাধনা

আমাদের আজ ছোট হইতেই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। বাংলায় যে দেড়শ-দুশ "লোন আফিস" আছে, তাহাদিগকে খাঁটি ব্যাঙ্কে পরিণত করিতে হইবে। ১৯২৬ সনের যুবক-বাংলার পক্ষে এই হইতেছে অন্যতম বিপুল সাধনার ক্ষেত্র। আমাদের গোটা জাতের নিকট এই এক বিরাট সমস্যা। এই সব লোন-আফিসকে খাঁটি ব্যাঙ্কে পরিণত করার পর কলিকাতার কোনো কোনো সেণ্ট্রাল আফিসে এই প্রতিষ্ঠানগুলাকে কেন্দ্রীভূত করা আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা। ইহার ফলে গোটা বাঙালী জাতের ধনশক্তি কতকগুলা বড় বড় ঘাঁটিতে জমাট বাঁধিয়া উঠিতে থাকিবে। আর সেই ধনশক্তির সাহায্যে নরনারীর আর্থিক উন্নতি সাধন করা এবং নতুন নতুন পল্লী-সহর গড়িয়া তোলা হইতেছে আমাদের নবীন জীবন-দর্শনের প্রাথমিক বনিয়াদ।

বাংলাদেশে বাঙ্গালীর তাঁবে আধ-কোটি বা কোটি টাকা মূলধনের ব্যাঙ্ক অল্পকালের ভিতরই গড়িয়া উঠিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। মফঃস্বলের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সমন্বয়ে এক একটা "কেন্দ্রীকৃত" ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। বিলাত, জার্ম্মাণি, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের ব্যাঙ্ক-গঠন গত শতাব্দীতে ধাপের পর ধাপে যে-প্রণালীতে উঠিয়াছে, ভারতেও সেই প্রণালীরই দিগ্‌বিজয় দেখিতে পাইব। বাঙ্গালীর আর্থিক অভিজ্ঞতা পাকিয়া উঠিতেছে। যুবক-বাংলাকে অনতিদূর ভবিষ্যতে বড় বড় পুঁজিওয়ালা ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়িত্ব লইতে হইবে। সম্প্রতি এই বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাই না।

তবে শুধু একটা প্রস্তাব করিব। বাংলা দেশে আজকাল ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে অন্ততঃপক্ষে হাজার চার পাঁচ লোক লাগিয়া আছেন। কেরাণী হিসাবে, ম্যানেজার হিসাবে, খাতাপত্রের পরীক্ষক হিসাবে, আর ডিরেক্টর হিসাবে এতগুলি বাঙালী ব্যাঙ্ক লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছে। এই সকল অভিজ্ঞতাওয়ালা লোকের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। মফঃস্বলের কোনো কোনো কেন্দ্রে অথবা কলিকাতায় তাঁহারা মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইতে থাকুন। বাঙালী ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা আর তাহা উন্নত করিবার উপায় সম্বন্ধে কর্ম্মদক্ষ ও চিন্তাদক্ষ লোকেরা মিলিয়া মিশিয়া পরামর্শ করুন। "বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘ" নামে একটা প্রতিষ্ঠান এই আয়োজনের দায়িত্ব লইতে পারে।

ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব বীমা *

ভারতবাসীর মাথার ঘী

আমার কথা অতি সামান্য, আর বলিবার জিনিষও মাত্র একটী ডাইনে বাঁয়ে, "ঝালে ঝোলে অম্বলে", যেদিকে যাই, ঘুরিতে ফিরিতে সামনে-পিছনে সেই এক জায়গায় গিয়া পৌঁছি। যদি কেহ আমাকে গভীর দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে বলেন, আর সে বিষয়ে আমার যদি কোনো দখল থাকে, তাহা হইলেও ঠেকিতে ঠেকিতে সেইখানে গিয়াই পৌঁছিব।

কথাটা এই, আমরা আজকাল আছি কোথায়? আমাদের দেশটা ঠিক্ কোন্ অবস্থায় রহিয়াছে? এইটা জরিপ করা আমার ব্যবসা। এজন্য আমাদের দেশের লোকের মাথাটা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টাও জরিপ করা আমার কাজ। মাথার বাহিরের দিক্‌টা মাপা যায়, আর ভিতরটাও মাপা যায়। মাথার বাহির লইয়া কারবার সাধারণতঃ আমি করি না। ভিতরটাতে, মগজের মধ্যে ঘী কতটা আছে, আমাদের মাথায় কতটা আছে, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, মার্কিণ ইহাদের মাথায়ই বা কতটা আছে, এই সব মাপাজোপা আর তুলনা করা আমার পেশার অন্তর্গত।

মাঝে মাঝে অতীতের কথাও বলিয়া থাকি। সেকেলে গ্রীস, রোম, চীন, ভারত, পারস্য ইত্যাদি নানাদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকি। তাহাতেও প্রশ্ন একই। গ্রীকই হউক, হিন্দুই হউক, খৃষ্টানই হউক আর মুসলমানই হউক, তাহাদের মাথায় ঘী কতটা ছিল? তাহা মাপিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ্য বিশেষণ ব্যবহার করা আমার রেওয়াজ নয়, রেওয়াজ

---

* জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত (ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড বিবরণ। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চোধুরী শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন।

কতকগুলি বস্তু আবিষ্কার করা আর তাহার সাহায্যে মাথার ভিতরকার ধী ও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টা পাকড়াও করিবার কৌশল উদ্ভাবন করা। এই হইতেছে আমার একমাত্র আলোচনার বিষয়।

অতীতই হউক আর বর্ত্তমানই হউক, এই ধী মাপামাপির কারবারে লক্ষ্য আমার নির্দ্দিষ্ট। কি তত্ত্ব-হিসাবে, কি আলোচনা-প্রণালী-হিসাবে, সকল হিসাবেই আমার একমাত্র ধ্যেয়—ভারতবর্ষ।

বর্ত্তমান জগতের নানা স্তর

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া বর্ত্তমান যুগটাকে আমি চার ভাগে ভাগ করিয়াছি :—(১) ১৮৪৮-৭৫ খৃঃ; (২) ১৮৭৫-১৮৯৫ খৃঃ; (৩) ১৮৯৫-১৯০৫ খৃঃ; ৩) ১৯০৫-২৫ খৃঃ। দেখিতে হইবে আমরা এখন ইহার কোন্ জায়গায় আছি। আপনারা বলিবেন "আমরা পূর্ব্বের লোক। আমাদের ল্যাটিচিউড অত, আমাদের লঙ্গিচিউড অত" ইত্যাদি। আমি বলিতেছি আমরা পূর্ব্বেরও নই, পশ্চিমেরও নই। আমরা আছি কোন একটা বিশ্বব্যাপী সিঁড়ির নির্দ্দিষ্ট ধাপে। আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি, জগতের লোকও ক্রমাগত ছুটিয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে দেখি, কেহ সিঁড়ির ৪র্থ ধাপে, কেহ ৩য় ধাপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমরা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি সেটা ১৯২৫।২৬ সালের ধাপ নয়, এমন কি ১৮৭০ সালের ধাপও কি না সন্দেহ আছে। বোধ হয় কোন কোন দফায় আমরা ১৮৪৮ সনের ধাপেই আছি। কড়াক্রান্তিতে হিসাব করিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, হয়ত আমরা ১৮৭০ সনের আগে কি পরে, ডাইনে কি বাঁয়ে কোন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এই হইল ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমার কথা।

ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈব বীমা (বীমা—বোমা নয়) এই তিনটি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও আমরা বেশ জানিতে পারিব আমরা ঠিক্ কোথায়

আছি। আপনারা প্রথমেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন, বীমা জিনিষ আমাদের দেশে নাই। ব্যাঙ্ক আছে। বীমা নাই। একথা বলিলে হয়ত মিথ্যা কথা বলা হয়, কেননা স্বদেশী আন্দোলনের সময় বীমা বস্তু কিছু কিছু হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বীমা-প্রথা বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু আমি যে দরের বীমার কথা বলিতেছি, সেইটি ভারতের ত্রিসীমানায় নাই। এই দিক্ হইতে যদি আলোচনা করি তাহা হইলে আমরা কোথায় আছি তাহা সহজেই ধরা পড়িয়া যাইবে। আজ সে হিসাবে আলোচনা করিব না, অন্যান্য তরফ হইতে মাত্র কয়েকটা কথা বলিব।

ব্যাধি, বার্দ্ধক্য আর দৈব এই তিন বীমা তিন স্বতন্ত্র বস্তু। একটার সঙ্গে আর একটার যোগ নাই। এই জিনিষগুলা কি তাহাই বিশ্লেষণ করা আমার বিশেষ উদ্দেশ্য।

স্বদেশ-সেবা কাহাকে বলে?

১৯০৫ সনে যখন লড়াই হয়, রুশ-জাপানী লড়াই, তখন আমরা "জন্মগ্রহণ" করিয়াছি বা করিতেছি। যুবক-ভারত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তখন অনেক কথা শুনিয়াছি ও শুনাইয়াছি, শিখিয়াছি ও শিখাইয়াছি। তারপর আজ একুশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই, জাপানীদের মতন স্বদেশ-সেবক জাতি পৃথিবীতে কম। স্বদেশী বক্তৃতা করিতে হইলে আমরা আগে জাপানের দৃষ্টান্ত দিই। বিদেশী জাতিকে সম্মান করা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু বিষয়টা তলাইয়া দেখা দরকার। জাপানে গিয়াছি সেই লড়াইয়ের অনেকদিন পরে।

স্বদেশ-সেবা বস্তুটা কি আমরা বেশ জানি, অন্ততঃ পক্ষে ১৯০৫-১৪ সন আমার বেশ জানা আছে। এই বৎসর দশেক ধরিয়া আমাদের এই ধারণা ছিল যে, যে স্বদেশ-সেবক সে না খাইয়া মরিবে, তাহার ঘরে হাঁড়ি

চড়িবে না, হয়ত চড়িবে একবেলা। দুবেলা আঁচানো, তাহার কপালে লেখা নাই। তাহার রোজগার করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু সে রোজগার করিবে না। ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে তবু সে কাজ করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি ধারণা আমাদের আছে এবং ছিল। এই কয় বৎসরের খবর যাঁহারা রাখেন তাঁহারা জানেন যে, বাংলায় হাজার হাজার না হউক অন্ততঃ শত শত লোক ছিল, যাহারা বাস্তবিকই এক, দুই বা আড়াই বৎসর ঐরূপভাবে চলিয়াছে। চিরকাল চলিয়াছে তাহা বলি না।

জাপানের স্বদেশ-সেবক রাষ্ট্র

তারপর জাপানে গেলাম। তার আগে বিলাতে গিয়াছি। ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখাশুনা করিয়াছি,জাপানীদের সঙ্গে সেইরূপই করিয়াছি। পরে ফরাসীদেশে গিয়াছি, জার্ম্মাণিতে গিয়াছি ইত্যাদি। আমাদিগকে অতি অপদার্থ জাতি বলা হয়; আমরা স্বদেশ-সেবক জাতি নই, আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই, যখন তখন আমাদিগকে এইরূপ তিরস্কার করা হইয়া থাকে। কিন্তু নিজ চক্ষে কি দেখিয়া আসিলাম?

জাপানের প্রথম কথা—রাষ্ট্রশক্তি। ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিণের প্রধান কথা রাষ্ট্রশক্তি। স্বদেশ-সেবা কোথায়? ওসকল দেশে স্বদেশ-সেবক কৈ? জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি সর্ব্বত্র দেখিলাম,—স্বদেশ-সেবা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে দরের স্বদেশ-সেবা সে সকল দেশে নাই। কাজ করিব আর না খাইয়া মরিব, ৫।৭।১০ বৎসর ধরিয়া এইভাবে জীবন সমর্পণ করিতে হইবে,—এ ধারণা, এ রকম কার্য্য-প্রণালী সেখানে দেখি নাই। তাহা হইলে ওসব দেশ কি করিয়া চলিতেছে? আপনারা বলিবেন—"এত বড় লড়াই চলিল, লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল—তাহারা স্বদেশ-সেবক নয়!" আমি বলি—ঢাকের

বাজানার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া অসংখ্য লোক যখন এক সঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া ছুটিয়া চলে, তখন এমন কেহ থাকেনা যে মৃত্যুর কথা ভাবিতে পারে। যাহা হয় হউক এই ভাবিয়া তাহারা হুজুগে ছুটিয়া চলে। তাহারা ভাবে "আমি গেলাম, না হয় লড়াইয়ে মরিতে। আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার, বাপদাদা, মাসীপিসী ইহাদের ভার ত একজন লইতেছে ?"

মহাভারতের আদর্শ

মহাভারতেও এ প্রশ্ন, এ সমস্যা উঠিয়াছিল। অমুক রাজাকে কোন ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'মহারাজ, এই যে লোকেরা লড়াইয়ে যাইতেছে, ইহারা মরিলে ইহাদের পরিবার-প্রতিপালনের দায়িত্ব লইয়াছ ত ?" এইখানে কথা এই, যাহারা যুদ্ধে যায় তাহাদের পরিবারের ভরণপোষণ করে রাষ্ট্র। যুদ্ধে এক লক্ষ কি বিশ পঁচিশ হাজার জাপানী শ্রেণীবদ্ধভাবে জুতো পায়ে, মদ খাইয়া সঙ্গীত গাহিয়া চলিল। কারণ তাহারা জানে যাহারা তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগকে, যাহারা দেশে রহিল তাহারা প্রতিপালন করিবে। কাজেই তাহাদের ভাবনা নাই। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা সর্ব্বত্রই তাই।

রাইনল্যাণ্ডের জার্ম্মাণ দৃষ্টান্ত

ধরুন জার্ম্মাণিতে এই রাইনল্যাণ্ড লইয়া কি বিপুল আন্দোলন হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে "আমরা না খাইয়া মরিয়া যাইতেছি, জার্ম্মাণি রসাতলে গেল" ইত্যাদি। এই সময় কয়জন লোক, কয়জন উকিল, ডাক্তার, নিজের গাঁট হইতে পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়া কোনো দুঃস্থ লোককে উদ্ধার করিয়াছে ? অতি কম। এই জার্ম্মাণ জাতির যাহারা মরিয়া যাইতেছে, নিজের দেশের সেসব লোকের জন্য, তাহাদের পরিবারের লোকের জন্য দান-ধ্যান করিতেছে, এমন লোক অতি অল্পই আছে।

ভাবিবেন না, আমি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি। এই জিনিষের এই সব দেশে আদৌ প্রয়োজন নাই। কেন প্রয়োজন নাই? মনে করুন, একজন পণ্ডিত রসায়ন চর্চ্চা করিতে করিতে মরিয়া গেলেন। তাঁহার পরিবারের সংস্থানের জন্য একটা সরকারী ব্যবস্থা রহিয়াছে। কুলী, মজুর, কেরাণী প্রত্যেকের বেলায়ই এইরূপ। মহাভারতেও অন্ততঃ "আদর্শ" হিসাবে এ প্রশ্ন উঠিয়াছিল। রাজা সে ভার লইত। এখন রাষ্ট্র যাহা করে মান্ধাতার আমলে রাজা সেইটা করিত। তখন রাষ্ট্র ছিল রাজা। সেই জন্য মহাভারত বলিয়াছেন "রাজা কালস্য কারণম্"। এসব ব্যবস্থা করা ছিল রাজার "কর্ত্তব্য"। আজকাল জার্ম্মাণিতে, জাপানে রাষ্ট্র এই সব করিতেছে। ঐ সকল মুল্লুকে স্বদেশ-সেবা বলিয়া বস্তু আছে কিনা বুঝিতে হইলে মাথা ঘামানো আবশ্যক। মনে রাখিবেন, ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব-বীমা সম্বন্ধে আমি খেই হারাই নাই।

কর্ম্ম-দক্ষতার ভিত্তি

দ্বিতীয় কথা, এক একটা লোক কর্ম্মদক্ষ হয় কি করিয়া? কি ঐতিহাসিক, কি বৈজ্ঞানিক, সে যে কাজটা লইয়া রহিয়াছে সেই কাজটা লইয়া চিরকাল থাকিবে কি করিয়া? এই হইতেছে প্রশ্ন। যে কোন বিষয় লইয়া আলোচনা করি না কেন, যে লোক কাজ করিতেছে, সে ছয় মাস, দেড় বৎসর কি দুই বৎসর মাথা ঠিক রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে যদি কাজ করিতে না পারে, দর্শনই বলুন, বিজ্ঞানই বলুন, আর যাই বলুন, কিছুই গড়িয়া উঠিতে পারে না। যে লোক কাজ করিতেছে যাহাতে সে বরাবর নির্ভাবনায় ধীর-স্থিরভাবে কোন একটা মত বা প্রণালী দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাস, বৎসর ধরিয়া প্রতিপালন করিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। বাঙ্গালী

আমরা একজনও তাহা পারি না। আপনারা সকলেই জানেন ম্যালেরিয়ায় ভুগে নাই এমন বাঙালী একটিও আছে কিনা সন্দেহ। কাজ করিতে করিতে মাথা ধরে নাই এমন লোক কয়জন আছে জানি না। এক দিন, দু দিন, না হয় তিন দিন,—চতুর্থ দিন মাথা ধরিবেই ধরিবে। ব্যাধি একটা কিছু আছেই আছে।

এসব কথা গভীরভাবে ভাবা ও বুঝা দরকার। জাতিহিসাবে আমাদের কর্ম্মদক্ষতা আছে কিনা বুঝা দরকার।

দুঃখ-নিবারণের সেকেলে দাওয়াই

মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে বুড়ো হইতেই হইবে। তেমনি মানুষ হইয়া জন্মিলে তাহার ব্যাধি হয়ই হয়। ফরাসী, জার্ম্মাণ ও আমেরিকান —তাহাদেরও হয়। মানুষ সকলেই, কেহ জানোয়ারও নয় দেবতাও নয়। তেমনি, মানুষ মরিলেই বুড়ো মা-বাপ, বিধবা স্ত্রী, অনাথ শিশু তাহার থাকিবেই থাকিবে। বিধবা-সমস্যা আছেই আছে।

এইসব কথা যদি গভীর দার্শনিক হিসাবে আলোচনা করিতে যান, তাহারও একটা হদিশ আছে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, মানুষ হইলে দুঃখ থাকিবেই, দুঃখ থাকিলে তাহার কারণও আছে, সে কারণ নিবারণের উপায় সম্বন্ধেও তিনি নানা কথা বলিয়া গিয়াছেন। "সত্য-চতুষ্টয়" আর "অষ্ট পথ" অতি প্রসিদ্ধ কথা। মানুষ মাথা খাটাইয়া উপায় উদ্ভাবন করিয়া ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, দৈব, মৃত্যু, বিধবা, অনাথ ইত্যাদি সমস্যার মীমাংসা করিয়া গিয়াছে। ইহাকে দুঃখবাদ বলিতে হয় বলুন। কথা হইতেছে রক্তমাংসের শরীরে এইসব জিনিষ আছেই। আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, তাহা যদি থাকে ভারতবর্ষে সেটা নিবারণ করা যাইবে কি করিয়া? মান্ধাতার আমলের লোকেরা—যথা সেণ্টপল, জার্ম্মাণ দার্শনিক ব্যেমে

ইত্যাদি সাধু ঋষিরা (খৃষ্টান মুল্লুকেও হাজার হাজার সাধু ঋষি আছেন) এবং আমাদের দেশের সাধুরাও কেহ কেহ এক রকম উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। বলিয়াছেন,—"কুছ পরোয়া নেই। না জন্মিলেই হইল। সংসারের কথা বেশী চিন্তা না করিয়া, সংযম-টংযম করিয়া বনে যাইয়া ধ্যানধারণা তপস্যায় কাটাইয়া দিলেই হইল। জন্মাইবার দরকার নাই" ইত্যাদি। আমি এই ধরণের মতকে হাস্যাস্পদ মনে করি না। মানুষের মাথার পক্ষে ইহাও একটা বড় আবিষ্কার। এই ধরণের আবিষ্কার কেবল ভারতে হইয়াছে তাহা নয়, কেবল চীনে হইয়াছে তাহা নয়, মুসলমান খৃষ্টান সকল মুল্লুকেই হইয়াছে।

যুগ-প্রবর্ত্তক বিস্‌মার্ক

আজ-কালকার দিনেও আবার মানুষ এই দিকে মাথা খাটাইয়া দেখিয়াছে। যদি মানব-জীবনকে সুখময় করিতে হয়, কর্ম্মদক্ষ করিতে হয়, মানুষকে যদি মৃত্যু পর্য্যন্ত নির্ভাবনায় কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা হইলে তার জন্য আর কোনো প্রণালী অবলম্বন করা যায় কিনা, মানুষের মাথা সেদিকেও খেলিয়াছে। যেমন ষ্টীম এঞ্জিন আগে পৃথিবীর কোন কারখানায় ব্যবহৃত হইত না, মানুষ মাথা খাটাইয়া সেইটি বাহির করিয়া তাহাকে কাজে লাগাইয়াছে, ঠিক তেমনি ১৮৮৩ সনে একটা জিনিষ মানুষের মাথা হইতে বাহির হইল—দেবতার মাথা হইতে নয়, জানোয়ারের মাথা হইতেও নয়, ঋষির কল্পনা হইতেও নয়—মানুষেরই চিন্তার ফলে আসিয়াছে। সে আবিষ্কার বৎসর চল্লিশেকের ভিতর পৃথিবীর সকল দেশে অল্পবিস্তর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ভারতে এখনও তাহার নাম পর্য্যন্ত অনেকে জানে না। সেই ১৮৮৩ সনের জিনিষটার আবিষ্কর্ত্তা ঘটনাচক্রে একজন জার্ম্মাণ। যে সে জার্ম্মাণ নয়, তাঁহার নাম

বিস্‌মার্ক। তাঁহাকে লোকে লড়াইয়ের বিস্‌মার্ক বলিয়া জানে। যিনি ফরাসীকে কুপোকথা করিয়া রাষ্ট্রনীতির দ্বারা সমস্ত ইয়োরোপকে ভেদ করিয়া জার্ম্মাণিকে বড় করিয়াছেন, সেই বিস্‌মার্ক।

আমি বলিতে চাই, সেইটি তাঁহার অন্যতম বড় কাজ বটে। কিন্তু আর একটা বড় জিনিষও তাঁহার মাথা হইতে বাহির হইয়াছে। সে জিনিষ জগতের এক অপূর্ব্ব অমৃত। সেইটা এই—মানুষের ব্যাধি,বার্দ্ধক্য, মৃত্যু হয়; কিন্তু মানুষকে ব্যাধিজয়ী, বার্দ্ধক্যজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়রূপেও গড়িয়া তোলা সম্ভব। এ সকল দুঃখের প্রতীকারের যে উপায়, তাহাকে বিস্‌মার্ক আইনবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া খাড়া করিয়াছেন। আমরা মন্ত্র আওড়াইয়া থাকি:—

"জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ" তেমনি এই যে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে তাহার সূত্রপাতের যুগে মানবজাতির জন্য যে হিত-প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রবর্ত্তক সম্বন্ধেও বলা চলে— "জগদ্ধিতায় বিস্‌মার্কায় জার্ম্মাণায় নমোনমঃ।" ভারতবর্ষ বীমা শব্দ জানে না তা নয়। এখানে বীমা কোম্পানী রহিয়াছে। কিন্তু ইহা এক জিনিষ, আর জার্ম্মাণিতে এবং জার্ম্মাণির দেখাদেখি অন্যান্য দেশে যাহা রহিয়াছে সে আর এক জিনিষ। বিস্‌মার্ক বর্ত্তমান জগতের অন্যতম যুগ-প্রবর্ত্তক।

ইতালির দুরবস্থা

এই যে "সামাজিক" আইনকানুন ইহাতে সাধিত হইতেছে কি? আজ যে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে, এইটা তাহার একটা ফল-বিশেষ। তাহার ভিত্তিও বটে। একজন ইতালিয়ান পণ্ডিত বলিতেছেন, "ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-দৈব বীমা ইত্যাদি সমাজ-ঘটিত বীমা বিষয়ক

আইন-কানুন কোন ধনী, বদান্য ব্যক্তির দান নয়। দুনিয়ার সকল সভ্যদেশেই এ জিনিষ গোটা দেশের সার্ব্বজনীন বনিয়াদরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইতালিতে যখন এই রকম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, খবরের কাগজওয়ালারা বলিল 'এতবড় কঠিন, দুরাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ জিনিষ,—আমাদের দেশে হওয়া সম্ভব নয়।' আর আজ যতটুকু বীমা-প্রথা ইতালিতে প্রচলিত আছে, তাহার ভিতর দেখিতেছি কেবল ব্যভিচার আর দুর্নীতি।"

অন্য দেশ অপেক্ষা ইতালির সঙ্গে বোধ হয় ভারতের তুলনা বেশী চলিতে পারে। এই রকম প্রস্তাব উঠিলে আমাদের দেশের লোকও বলিবে—"জিনিষটা এত কঠিন, এ দেশে চলিবে না।" ইতালিয়ান পণ্ডিত আবার বলিতেছেন—"ইহাতে বুঝিতে হইবে আমরা অনভিজ্ঞ। জিনিষটা আমরা বুঝিতে পারি না। সকল সভ্যদেশের মাপকাঠিতেই আমরা একেবারে জঘন্য জাতি। এই যে বার্দ্ধক্য, দৈব, মৃত্যু এবং ব্যাধি চার রকমের বীমা, আজ যাহা সমস্ত সভ্যজগতে অ, আ, ক, খ হইয়া গিয়াছে, সে জিনিষের একটা মাত্র ইতালিতে সবে সুরু হইয়াছে, সেইটা দৈব বীমা।" ইতালিয়ানরা কোন্ অবস্থায় রহিয়াছে, তাহার তুলনায় আমরা কোথায় আছি, ঐতিহাসিক ভাবে সে আলোচনা সম্প্রতি করিব না। বিস্‌মার্কের মাথাটা লইয়া, মাথার ভিতরকার "ঘিলুটা" লইয়া কিছুক্ষণ কাটাইতে চাই।

দেড় কোটি জার্ম্মাণের ব্যাধি-বীমা

বিস্‌মার্ক দেখিল, মানুষ যখন জন্মিয়াছে তখন তাহার অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অসুখ যদি হয়, তাহার জন্য দায়ী থাকিবে কে? আমরা বলিব, "ব্যক্তি স্বয়ংই দায়ী।" উহারা বলিতেছে"তাহা পুরাপুরি ঠিক নয়।

গোটা সমাজ বা দেশকে সেইজন্য দায়ী করিতে হইবে।" পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে আমি একজন, আমার অসুখ হইয়া থাকে সেইটা আমার ব্যাপার, আমার পয়সা না থাকে আমি ভিন্ন আর কে সেজন্য দায়ী থাকিবে? উহারা বলিতেছে "দেশও সেজন্য দায়ী।" খালি বলিলে হইবে না। আমি কোন-না কোন জায়গায় চাকুরী করি। যে আমাকে অন্ন দিতেছে তাহার দায়িত্ব আমার জীবন সম্বন্ধে রহিয়াছে। আমাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য প্রথম দায়িত্ব অন্ন-দাতার, দ্বিতীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কারণ রাষ্ট্র সকলকে মানুষ করিয়া বাঁচাইয়া রাখে। অবশ্য নিজের দায়িত্বও আছেই।

রামচন্দ্র পোদ্দার ১০০৲ টাকার চাকুরী করে, কি ইস্কুল মাষ্টারী করে। আফিসে হউক, কারখানায় হউক, মজুর ভাবে হউক, কুলীরূপে হউক, কেরাণীরূপে হউক, দুনিয়ার সকল দেশেই বহু লোক চাকুরী করে। ১০০৲ টাকা যদি একজনের মাহিয়ানা হয়, বীমা-ভাণ্ডারে ধরা যাউক যে ৫৲ টাকা কারখানার মালিক দিল, ৫৲ টাকা নিজে দিল, ৫৲ টাকা গবর্ণমেণ্ট দিল, মোট ১৫৲ টাকা মাসে মাসে জমা হইতে লাগিল। এইভাবে টাকা জমা হইতে থাকিলে, যখন তাহার অসুখ হইবে, তখন তাহার মা-বাপ, স্ত্রী-ছেলের দায়িত্ব কিছু নাই। তাহার যে মনিব অন্নদাতা সে তাহাকে এম্বুল্যান্স গাড়ীতে করিয়া হাসপাতালে পাঠাইবে। হাসপাতালে যত শীঘ্র অসুখ সারে সে চেষ্টা হইবে। তাহা যদি সে করে, তবে বলিব তাহার দায়িত্ব পালন করা হইল।

যখন আমি চাকুরী করিতে ঢুকিয়াছি তখন আমার মনিব এই রকম ভাবে আমাকে বাঁচাইতে আইনতঃ বাধ্য। যদি না করে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ চলিবে, গভর্ণমেণ্ট মোকদ্দমা চালাইবে। তাহার নানারকম আইনকানুন আছে। তাহার জন্য স্বতন্ত্র উকিলের দরকার, খবরের কাগজের দরকার, ব্যাখ্যার দরকার হয়। বিপুল কাণ্ড। তাহা আমাদের কল্পনা করাও কঠিন।

আমাদের দেশে যেমন পাঁচ কোটি লোক,জার্ম্মাণিতে ৫॥০ কোটি লোক। তাহার মধ্যে দেড় কোটি লোকের সম্বন্ধে এই রকম নিয়ম জারি আছে। এই দেড় কোটি লোকের যদি অসুখ হয়, তাহার বাপ দাদা ভাই স্ত্রীর দায়িত্ব অতি কম। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য এমন একটা টাকা আছে, যে টাকা যথাসময়ে তাহার জন্য খরচ হইবে। এই ভাবে তাহারা তেইশ হাজার কর্ম্মকেন্দ্রে সঙ্ঘবদ্ধ। গভর্ণমেণ্টের কারখানায় হউক, পোষ্ট আফিসে হউক, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ১৯০৪ সনে ব্যাধি-বীমা-সমিতি দ্বারা এতগুলি লোক প্রতিপালিত হইয়াছে।

ধরুন, আমি কাজ করিতে গিয়াছি, অসুখ হইয়াছে। তিন মাস থাকিতে হইবে দার্জ্জিলিঙে। আমার পয়সা কোথায়? দরকার হইলে দার্জ্জিলিং কি রাঁচি পাঠানো আমার মনিবের দায়িত্ব। দেড় কোটি লোকের সে দায়িত্ব নাই। জার্ম্মাণিতে এই রকম ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের দেশে যদি সে রকম ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে যখন-তখন যে-সে লোকের বানপ্রস্থে যাওয়ার প্রয়োজন হইত না। মাথা খাটাইয়া দেখা গিয়াছে, এই দেড় কোটি লোককে এমন করিয়া কর্ম্মদক্ষ করা যায়, ম্যালেরিয়া হউক, কালাজ্বর হউক যে কোন অসুখ হউক, দার্জ্জিলিঙে, দরকার হইলে মক্কায়, কামস্কাট্‌কায়ও পাঠান যাইতে পারে। তাহা হইলে বুঝুন স্বদেশসেবার প্রয়োজন কোথায়? খাওয়া পরার ব্যবস্থা থাকিলে অসমসাহসিক, দুঃসাধ্য কাজে কে না ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে?

আমরা কর্ম্মদক্ষ নই। দেখিতে হইবে আমরা কি করিয়া কর্ম্মদক্ষ হইব। যে কাজটা করিতেছি সে কাজটা ঠিক সমানভাবে ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কেমন করিয়া চালান যায়? সম্ভব কিনা সেটা বুঝিবার জন্য অন্যান্য জাতি কি করে তাহা দেখা উচিত। তাহার প্রথম নম্বর ব্যাধি-বীমা।

দৈব-বীমা

দ্বিতীয় নম্বর দৈব-বীমা। এইটা আলাদা বস্তু। মনিবের কাজের জন্য রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে মোটর-চাপা পড়া সম্ভব। রেলে যাইতে যাইতে কলিশুনে মরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে করিতে আঙ্গুলের একটুকু কাটিয়া গেল। কে প্রতীকার করিবে ? তাহার জন্য আইন হইল ১৮৮৪ সনে। তাহার আগাগোড়া মজার কথা। আমার কিছু পয়সা দিতে হইবে না। আমাকে বাঁচাইবার জন্য কাণাকড়ি পর্য্যন্ত যে খরচ সে সব কারখানার মালিক দিতে বাধ্য। ডাক্তারকে ডাকিতে সে বাধ্য, ওষুধ পত্রের জন্য সে দায়ী। পরিবার প্রতিপালন করিতে মাসিক ভাতা দেওয়া দরকার, মনিব দিবে। হাস-পাতালে পাঠান দরকার, মনিব পাঠাইবে। আজকালকার কথা বলি না, আজকাল এত সমিতি হইয়াছে, নাম করিতে গেলে হয়রাণ হইতে হইবে। ১৯০৫ সনের কাছাকাছি সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় দুই কোটি লোক জার্ম্মাণিতে দৈব-বীমা করিয়াছিল। তাহারা হাসিয়া খেলিয়া অনেক কিছু করিতে পারিত, এখনও পারে। আমরা পারি না। তাহাদের চিরজীবনের ভার লইয়াছে অন্য লোক। ধরা যাউক যেন আজ সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিবামাত্র ডাক্তারকে ৪৲ টাকা ফি দিতে হইবে। সে কথা বাঙ্গালী কয় জন লোক না ভাবিয়া পারে ? কিন্তু জার্ম্মাণদের এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এমন একটা চিন্তা উহাদের মগজে আসিয়াছিল যাহাতে দৈব নামক বস্তু চিন্তা করিবার তাহাদের আর প্রয়োজন হয় না। জন্ম হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারা নিশ্চিন্তভাবে, বেপরোয়াভাবে কাজ করিয়া যায়। এখানে বলিতে চাই, এ ধরণের চিন্তায় যাহাদের জীবনটা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের সঙ্গে আমাদের টক্কর

দেওয়া সম্ভব কি? আমাদের কুলী মজুর, তাহাদের কুলী মজুরের সঙ্গে, আমাদের ব্যবসাদার তাহাদের ব্যবসাদারের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে কি করিয়া? পৌনে দুই কোটি লোক এই রকম স্বাধীন ও নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাপন করিতেছে।

বার্দ্ধক্য-বীমা

তারপর বিস্‌মার্কের মাথায় খেলিল—এইখানেই শেষ নয়, আরো কিছু চাই। মানুষ জন্মিয়াছে যখন বুড়ো হইবেই। বুড়ো হইলে অথর্ব্ব হইবেই। বুড়ো হওয়া আর অথর্ব্ব হওয়া সব ক্ষেত্রে এক নয়। কোন্ বয়সে কাকে বুড়ো বলে দেশ হিসাবে তাহা আলাদা। বিলাতে ৭০ বৎসর বয়সে, সুইট্‌সারল্যাণ্ডে ৬৫ বৎসর বয়সে, প্রুসিয়ায় ৭৫ বৎসর বয়সে বুড়ো হয়। আমরা না হয় ৪৫ বৎসর বয়সেই বুড়ো হই! আইন মতে বুড়ো। বিস্‌মার্ক ভাবিল "লোকগুলো বুড়ো হইবেই। বুড়ো হইলে তো ফেলিতে পারি না। আমাদেরই দেশের লোক, এতদিন খাটিয়াছে, ৬০।৬৫।৭০ বৎসর ধরিয়া দেশকে বড় করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে ফেলিয়া দিই কি করিয়া? এখন খাটিতে পারিতেছে না, তাহার জন্য কিছু করা দরকার।" আবার চালাইল বীমা, সে বীমা বার্দ্ধক্য-বীমা। পেন্‌শুন্-লিষ্ট খাড়া হইল। ইহার জন্য টাকা আসিতেছে খানিকটা গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে, খানিকটা ব্যক্তির কাছ হইতে, খানিকটা যেখানে সে কাজ করে সেখান হইতে। ১৮৮৯ সনে আইন কায়েম হয়। (১৯০৫ সনের কাছাকাছি) ইহার মধ্যে পড়িয়াছে পুরুষ-স্ত্রী লইয়া প্রায় দেড় কোটি লোক। ইহারা যখন বুড়ো হইবে, ৭০ বৎসর যখন ইহাদের বয়স হইবে তখন ইহারা পেনশুন-তালিকায় পড়িবে। নিয়ম হইল—বুড়ো হইবামাত্রই সরকার হইতে দেওয়া হইবে বৎসরে ৫০ মার্ক বা ৩৭৲ টাকা। বীমা কোম্পানীতে যে ফণ্ড হইল তাহা হইতে দেওয়া হইবে ২৩০

মার্ক বা ১৭০৲ টাকা। এই ২০৭৲ টাকা সে বৎসরে পাইবে। ইহা হইল পেন্সন-বীমা। কেবল তাহা নয়, অথর্ব্ব হওয়ার জন্য আরো কিছু আছে, তাহার সঙ্গে আরো কিছু টাকা জুড়িয়া দেওয়া হয়। ধরা যাক্ যেন হঠাৎ লোকটা পাগল হইয়া গেল, কি হাত-পা কাটিয়া গেল। তখন তাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। সেই জন্য বুড়োর চেয়ে সে কিছু বেশী পায়। গভর্ণমেণ্টের ভাতা ৫০ মার্ক ঠিকই আছে। কোম্পানী থেকে আরো কিছু বেশী দিতে হইবে (৪৫০ মার্ক—৩২০ টাকা)।

মৃত্যু-বীমা

তারপর মানুষ মরিবে—এইটিও বিস্‌মার্কের মাথায় আসিল। কেবল যে বুদ্ধদেবের মাথায় আসিয়াছিল, বা যীশুখৃষ্ট কি সেণ্টপলের মাথায় আসিয়াছিল তাহা নয়। তবে বিস্‌মার্কের মাথার একটা বিশেষত্ব আছে। তিনি ভাবিলেন,—একটা নয়া কৌশল বাহির করিতে হইবে। যেই মানুষ মরিল তখন তখনি কেওড়াতলায় পাঠাইবার খরচ আছে। সোজা কথা নয়, কেওড়াতলায় লোক পাঠাইতে দেড়শ, দুইশ, আড়াইশ টাকা খরচ হইবে। কোম্পানীর কাজে মরিলে কোম্পানী দায়ী। এই অবস্থায় হাসিয়া খেলিয়া মরিতে পারা যায়। আমি মরিলে যদি আমার পয়সা খরচ না হয়, যখন-তখন মরিতে রাজী আছি। তারপর মরালোকের আত্মীয়স্বজনকে প্রতিপালন করিতে হইবে। চার কন্যা, তিন পুত্র, বিধবা স্ত্রী রহিয়াছে, তাহাদের ভরণপোষণ করিতে হইবে। জার্ম্মাণিতে মা ষষ্ঠীর কৃপা যৎপরোনাস্তি। বিশ-একুশ বৎসর হয় নাই এমন অন্ততঃ সাত আটটী সন্তান অনেক পরিবারেরই গৌরব। এই বয়স পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কত করিয়া দেওয়া হইবে? কোনো লোকের একশ' টাকার চাকুরী থাকিলে মাসে কুড়ি টাকা দিতে হইবে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে, তারপর যে বিধবা স্ত্রী আছে, তাহাকেও সেই কুড়ি টাকা হারে দেওয়া হইবে।

বিধবা-সমস্যা

একজন বিধবা দুইটি মেয়ে লইয়া পথের ভিখারী হইল। আমাদের দেশে বিধবা-সমস্যা যেমন আছে উহাদের দেশেও তেমনই আছে। মাথা খাটাইয়া জীবনকে কত উপায়ে সুখময় করা যায়, তাহার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ইয়োরোপের বিধবা-সমস্যার মীমাংসা। বিসমার্ক ব্যবস্থা করিলেন তিন জনকে মাসে ষাট টঙ্কা দেওয়া হইবে। ভাবিয়া দেখুন বিধবার সব আছে, আসবাবপত্র বাড়ীঘর সব রহিয়াছে, স্বামী মরিয়া গেলে কিছু খরচ হইল না। তাহার উপর ৬০৲ টাকা মাসে মাসে পাইতেছে। বিধবারা, অনাথ শিশুরা তাহা হইলে আর কাঁদিবে কেন? বাস্তবিক পক্ষে চোখের জল ওসকল দেশে কমিয়া আসিয়াছে।

আর আমাদের দেশে কান্নাকাটির বিরাম নাই। আপনারা বলিবেন "স্বামীকে ভালবাসা আমাদের বিধবাদের একমাত্র ধর্ম্ম। আমাদের বিধবারা একেবারে সব সতীসাধ্বী এই জন্যই কাঁদে। যত অসতী সব ওদের দেশে।" প্রশ্ন করা যাউক—আমাদের দেশে বিধবারা যখন কাঁদে, কিসের জন্য কাঁদে? বাপ মরিলে আমরা যখন কাঁদি, কিসের জন্য কাঁদি, একবার আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? আমরা বাস্তবের কিছু জানিনা। আমরা জানি একটা বোল—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ"। কাজেই শাস্ত্র আওড়াইয়া আমরা তোতা পাখীর মত বলিয়া ফেলি যে, ঐ শ্লোক অনুসারেই আমরা কাঁদিয়া থাকি,—বাপকে ভালবাসি বলিয়া। কিন্তু এইটা মিথ্যা হইতেও পারে। সমস্যাটা যুবক ভারতের মনে জাগিয়াছে কি? বোধ হয় জাগে নাই, তাই তাহারা কল্পনারাজ্যে এখনও বিচরণ করিতেছে।

বিস্‌মার্কের মাথায় আসিল এই যে, স্বামী যখন মরিবে বিধবারা

কাঁদিবেই। এটা অতি স্বাভাবিক এবং প্রথম স্বীকার্য্য। কিন্তু বিধবার চোখের জল কমানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। অনেক বিধবা পশ্চিমা সমাজেও আছে, যাহারা মরা স্বামীর কথা ভাবিয়া কাঁদে। পুনর্ব্বিবাহের আইনতঃ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করে না, এমন হাজার হাজার স্ত্রীলোক জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ডের সমাজে আছে। তাহা থাকা সত্ত্বেও স্বামী মরিলে স্ত্রী কাঁদে। বাপ মরিলে ঐ সকল দেশেও ছেলে কাঁদে। ভালবাসার মুল্লুক, স্নেহ-মমতা ভক্তি-শ্রদ্ধার রাজ্য,খৃষ্টিয়ান-দেশে কম বিস্তৃত নয়। কিন্তু খাঁটি কথা, ক্রন্দন-তত্ত্বে আসল ভালবাসার চিহ্ন কতখানি আছে, অর্থ-চিন্তাই বা কতখানি আছে, যুবক ভারত একবার ভাবিতে সুরু করুন। বিস্‌মার্ক বলিল "মাথা মুড়াইয়া মরা স্বামীর চরণ বুকে করিয়া থাকাই অথবা ঐ রকম কিছু করাই বিধবার একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। বর্ত্তমান জগতের বিধবাকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ভুলাইয়া রাখা উচিত হইবে না। তাহাদের জন্যও সম্পূর্ণ মানবত্বের নতুন নতুন সুযোগ তৈয়ারী করিয়া দিতে হইবে।" তাহাই হইয়াছে।

বর্ত্তমান জগতের জন্ম

ভারতে বোধ হয় এমন কোনো পরিবার নাই যেখানে বিধবা নাই, এমন কোনো পরিবার নাই যেখানে কাজ করিতে করিতে চাকুর্‌্যে ৩৫।৩৮ বৎসর বয়সে মারা যায় নাই। তাহার ফলে এক একটা পরিবার হাহাকার করিতেছে, যেন আর কিছু করিবার নাই। হিন্দু-সমাজে আমাদের ঠাকুরদাদাদের আমলে আমরা হাহাকার করিয়াছি, বিস্‌মার্কের ঠাকুরদাদাদের আমলেও জার্ম্মাণরা তাহাই করিয়াছে। গ্যেটের আমলে এমন কোন ক্ষমতাবান্ জার্ম্মাণ ছিল না যে চিন্তা করিতে পারিত যে, দেড় দু'কোটি লোকের ভার লইবে কোনো এক প্রতিষ্ঠান। সেকালের

বিলাতেও কেহ এইরূপ বলিতে সাহস পায় নাই। চতুর্দ্দশ লুইয়ের সময় ফরাসীরাও বলিতে পারে নাই। বিস্‌মার্ক মাথা খাটাইয়া এক একটা প্রণালী, এক একটা কর্ম্ম-কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। মান্ধাতার আমলের কোন লোকের মাথায় তাহা আসে নাই। সোজাসুজি আমাদেরও বলা উচিত, হিন্দু-সমাজ এই লাইনে কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই। মামুলি যৌথপরিবারের ব্যবস্থায় অবশ্য সেকালের দুনিয়া এই দায়িত্ব কিছু কিছু সামলাইয়া চলিয়াছে। আসল কথা, নবীন জগতের সূত্রপাত হইয়াছে ১৮৭৫-৮৩ সনে; তাহার আগের কথা আলোচনা করিতে হয় কর, প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে কর, বাসি মাল হিসাবে কর। কিন্তু যৌবনের কথা যদি শুনিতে চাও, ১৮৭৫, ১৮৮৩, ১৮৯৫ ইত্যাদি সনের কথাই ভাবিতে হইবে। এই সকল তারিখেই বর্ত্তমান জগতের জন্ম। আমি এখানে আগে বলিয়াছি, ইতালি আহা উহু করিয়া বলিতেছে "অন্য জাতি বড় হইয়াছে আমরা কিছু করিতে পারিতেছি না। আমরা শুধু দৈব বীমা করিয়াছি, তাহাতেও জুয়াচুরি বাটপাড়ি রহিয়াছে, কিছু উপকার হইতেছে না ইত্যাদি ইত্যাদি।" যেই এই জিনিষ আবিষ্কার হইল, অমনি নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িল। অষ্ট্রীয়া, ডেন্‌মার্ক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িল। জার্ম্মাণির শিষ্য বলিয়া লয়েড জর্জ্জের খ্যাতি আছে। সে থাক্ না থাক্, তাঁহার মাথায় ও আসিয়াছিল বিলাতে কিছু করার দরকার। তখন বিলাতে "ওল্ড এজ পেন্‌শ্যান" প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল।

সরকারী আইন বনাম স্বাধীন বীমা

এখন জিজ্ঞাস্য, সমাজ-বীমা সম্বন্ধে "আইন" করা উচিত কি? না উহা স্বাধীন রাখিয়া দেওয়া ভাল? ইহা লইয়া প্রবল তর্কাতর্ক আছে। যেমন বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি চলিবে কি অবাধ নিয়ম চলিবে এই লইয়া

ঘোরতর তর্ক চলিতেছে, তেমনি বীমা-প্রথাটা গভর্ণমেণ্টের আইনের সাহায্যে চালানো উচিত, না লোকের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ফেলিয়া রাখা উচিত, এই লইয়াও লড়াই চলিতেছে। দুই রকম তর্ক আছে। একটা হইতেছে "তুমি যখন শেয়ানা মানুষ, নিজে বুঝিতেছ অসুখে পড়িবে, মরিবে, তোমার বিধবা স্ত্রী থাকিবে, ছেলেপিলে না খাইয়া মরিবে, অতএব তাহাদের ব্যবস্থার ভার তোমার উপর।" এ অতি সঙ্গত কথা, বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। উল্টা তর্ক নিম্নরূপ—"গভর্ণমেণ্ট এখন বলিবে, তুই যদি না করিস্ তোকে করাইতে বাধ্য করিব।"

এ আজগুবি চিন্তাপ্রণালী নয়। শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইহার নজির আছে। আমরা ইস্কুলে পড়িব কিনা? ঝি চাকরের ছেলে পড়িতে চায় না, উপদ্রব মনে করে, ব্যয় করিতে পারে না—একথা আমরা বলিয়া থাকি। ঠিক তাহার উল্টোও আছে। বহুত আচ্ছা, বাধ্যতামূলক একটা শিক্ষার বিধি কর, তবেই হইবে। তেমনি বীমা বিষয় লইয়া ধনী ও বিজ্ঞ মহলে বিপুল তর্ক চলিতেছে। আইন করা উচিত কিনা, করিলে বাধ্যতামূলক করা হইবে কিনা, সার্ব্বজনিক করা হইবে কিনা ইত্যাদি। আর সেই আইনের প্রত্যেক শব্দ লইয়া তোলপাড় হইয়াছে, অনেক কাণ্ড হইয়াছে। এখানে খানিকটা দলিল দেখাইতে চাই—ফরাসীর দলিল।

ফরাসী পণ্ডিতদের তর্ক

ফরাসীদেশে এ লইয়া অনেক বিতণ্ডা চলিতেছে। ফরাসী ধন-বিজ্ঞান-পরিষদের হোমরা-চোমরা লোকেরা তাহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। তাহার অনেক কারণ আছে, একটা কারণ এই। ফরাসী পণ্ডিতেরা বলিতেছেন "বিস্‌মার্ক এই কাজ করিয়াছিল কেন জান? অবশ্য তাহার কোন মতলব ছিল। সে সময় কার্ল মার্ক্‌স্ নামে একটা লোক এবং তাহার বন্ধু

এঙ্গেলস্ দুই জনে মিলিয়া জার্ম্মাণিতে ভয়ানক আন্দোলন চালাইতেছিল। আর এক জন লোক তাহাদের তাঁবে আসিয়াছিল। নাম তার লাসাল। এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় দল জার্ম্মাণিতে প্রবল ছিল। তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল সোশ্যালিজম বলিয়া একটা জিনিষ। তাহারা মুটে মজুরের দল। সাম্রাজ্যবাদী দল জার্ম্মাণদেরকে বলিত "জাতীয়তা বা সামরিকতা ১৮৭০ সনে ফরাসীর হাড় ভাঙ্গিয়া চূরিয়া দিয়াছে। দরকার হইলে আবার লড়াই করিতে হইবে। সকলের মধ্যে একমাত্র কথা দেশ, তাহাকে বড় করিতে হইবে।" ইহাকেই বলে "ন্যাশন্যালিজ্ম্"।

জার্ম্মাণির মত বিলাতেও ন্যাশন্যালিজম আছে, ফ্রান্সেও তাহাই আছে। সেই সব চিজ আমাদের দেশেও আছে। তাহার তত্ত্বকথা এই— "আগে এদেশের লোক স্বাধীন হউক তারপর চাষীদের বড় করিব, আগে স্বরাজ গড়িয়া উঠুক, তারপর আর সব হইবে, ইত্যাদি"। সমস্ত পৃথিবীতে একই শাস্ত্র চলিতেছে।

কার্ল মার্কস্ বনাম বিস্মার্ক

যাক্, জার্ম্মাণি সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিতদের মতামত আলোচনা করিতেছি। ফরাসীরা বলিয়া থাকেন—তখন একটা মত চলিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে আর একটা মত দাঁড়াইল, সমাজ-সাম্যদল। তাহারা মজুরগুলিকে বলিতে শিখাইল—"মজুরদের স্বার্থ এমন কিছু যাহা বস্তুতঃ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। অভিজাত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শাসিত যে দেশ, তাহার সেবা করিলে মজুরদের স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না।" ফরাসী পণ্ডিত-সঙ্ঘ—আমিও যাহার মেম্বর—তাহারা বলিয়াছে "বিস্মার্ক ত্যাঁদড় লোক। কার্ল মার্কসের মগজে ছিল মজুর-জগতকে করায়ত্ত করা। বিসমার্ক ভাবিল এমন একটা কিছু করা দরকার যাহাতে কার্ল মার্কসের

কথা আর শুনিবার প্রয়োজন না থাকে। মরিলে আমি সাহায্য করিব, ব্যাধি হইলে ওষুধপত্র দিব, যত রকম উপায় থাকিতে পারে সব দিক্ দিয়া যদি মজুর, গরীব, কেরাণী, ইস্কুলমাষ্টার ইত্যাদিকে সাহায্য করি তবে আন্দোলন চালাইবে কে? পেট যতক্ষণ ঠাণ্ডা থাকিবে ততক্ষণ কেহ কিছু করিবে না। অতএব দাও উহাদের রুটী, তাহার উপর দাও একটু মাখন, তারপর মাংস, তারপর আর একটু রুটী।"

ফরাসীরা একটু রুটী আর খুব জোর একটু কফি খায়। জার্ম্মাণদের লাগে আগে রুটী, তারপর মাখন, তারপর মাংস। তাহারা খাইতে খাইতে চলে, কাজ কর্ম্ম করে, পাঁচ পাঁচ বার খায়, আর তাহাদের মজুর চাষীরা পর্য্যন্ত মোটা হইয়া উঠে। বিস্‌মার্ক বলিল—"সব লোককে পাঁচ বেলা খাওয়াও, তাহা হইলে 'স্বদেশী' বক্তৃতা দিবার বা শুনিবার সময় থাকিবে না। যাহারা আন্দোলন চালাইতেছে, তাহাদের মুখ বন্ধ হইয়া থাকিবে। পেট ভর্ত্তি করিলে মুখ বন্ধ হয়। তাই বিস্‌মার্ক তাহাদের পেট ভর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে" ইত্যাদি ধরণের ব্যাখ্যা পাই ফরাসী পণ্ডিত-মহলে।

ফরাসীদের আত্ম-প্রশংসা

ফরাসীরা বলিতেছে "জার্ম্মাণদের সমাজ পচা, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তাহারা একটা কিছু করিতেছে। আমরা ফরাসী, সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টান্ত-স্থল, পৃথিবীর যত বড় বড় চিন্তা বা আদর্শ সব আমরা, এই ফরাসীজাতি আবিষ্কার করিয়াছি। আমাদের লোককে শিখাইবে উহারা! আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার যারপর নাই সংযমী, তাহাদিগকে সংযম শিখাইবার প্রয়োজন নাই।" আমি গল্প করিতেছি না। আমি সেই পণ্ডিত-সঙ্ঘের সভ্য। তাহারা আমাকে বলিয়াছে, "তুমি ভারতে গিয়া আমাদের এই মত প্রচার করিও"।

জার্ম্মাণির যেমন ক্রুপ ফ্যাক্টরী তেমনি ফরাসীদেরও একটা কোম্পানী আছে, তাহার যে বড় এঞ্জিনিয়ার, তাহার নাম পিনো। এক বইয়ে সে লিখিয়াছে—"সরকারী বীমার কোন প্রয়োজন নাই, একমাত্র বীমা কেন প্রত্যেক জিনিষই লোকেরা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্রভাবে নিজ স্বার্থ অনুসরণ করিয়া গড়িয়া লুতুক। আইন করিবার প্রয়োজন নাই।" ফরাসী পণ্ডিত-সঙ্ঘের হোমরা-চোমরা লোক আইন করিবার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। তাহারা আইন করিতে দিবে না। ১৯২৪ সনে এই সম্বন্ধে পিনোর বই বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে দেখাইতে চাই তাহাদের যুক্তিটা কি। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইয়া কুলী মজুরদের জন্য ফরাসীরা কি করিয়াছে তাহার একটা বিবরণ সে বইয়ে আছে, এবং আইন না থাকা সত্ত্বেও ফরাসীরা কি করিতে পারিয়াছে তাহারও কতকগুলি দৃষ্টান্ত আছে। যুক্তিটা কি এখানে আমি শুধু তাহাই দেখাইব।

ফ্রান্সের বিশেষত্ব

বইয়ে আছে—"জার্ম্মাণির অবস্থা আর ফ্রান্সের অবস্থা কি এক? জার্ম্মাণির যে নরনারী—তাহারা স্বভাবতঃ শৃঙ্খলীকৃত ও সঙ্ঘবদ্ধ; সেখানকার নরনারী যখন তখন যে-কোন সঙ্ঘের ভিতর ঢুকিতে পারে। বক্তৃতা দিয়া শিখাইতে হয় না, সঙ্ঘের ভিতর ঢুকা অতি সহজ, আর সেখানকার সুবিধাগুলা তাহারা সহজেই নিজস্ব করিতে পারে। সেখানে তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতেও জার্ম্মাণদের ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বাধীনতার স্বাদ জার্ম্মাণি জানে না। ফরাসীও কি তাই? ফরাসীরা কেমন? যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রত্যেক সমাজে, সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে ফরাসীজাতের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় উঠিতে স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিয়াছে, সেই ফরাসীমহলে

কি এই নিয়ম খাটিতে পারে? কি রকম ফরাসী? যে ফরাসী জমি-জমার আইন এমন করিয়া ফেলিয়াছে, যাহার ফলে সব জমি ছোট ছোট টুকুরো টুকুরো। তাহাতে জমিদার নামক বস্তু নাই, যদি থাকে সে জমিদার কি রকম? ছোট ছোট জমির স্বাধীন মালিক। যেখানে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এত বেশী সেই ফরাসী দেশে কিনা আইন করিতে হইবে? এই যে ফরাসী কারখানা, এই যে শিল্প, ইহাতে কি দেখিতে পাই? যেখানে সকলে ছোট ছোট শিল্পের মালিক, অল্প মূলধন-বিশিষ্ট কারখানার মালিক, সে সমাজে আবার আইন? এ জিনিষ ফরাসীর বিশেষত্ব—

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার ফরাসী ভূমি।

এ জিনিষটা না আছে বিলাতে, না আছে জার্ম্মাণিতে, না আছে আমেরিকায়।" এভাবের বক্তৃতা চলিয়াছে। বাঙালী চরিত্রেও অনেকটা এইরূপই দেখা যায়। বক্তৃতা করিতে করিতে আমরা বলিয়া থাকি,—"বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, যে আন্দোলনের ঢেউ জাপান পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, সেই জাপান হইতে ইত্যাদি।" সেইরূপ গাল-ভরা বুকনিই শুনিতেছি এই ফরাসী পণ্ডিতের মুখে। তিনি আবার বলিতেছেন—"স্বল্প মূলধন-বিশিষ্ট অল্পায়তন কারখানার মালিক, যাহাদিগকে কোন দিন বিশাল-আয়তন কারখানার মালিকেরা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে নাই, ছোট ছোট মালিক, যাহারা বড়দের আশ্রয়েই মানুষ হইয়াছে, বড়গুলা যাহাদিগকে ধ্বংস করে নাই,—সেজন্য বড়দের নিকট ছোটদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত" ইত্যাদি।

বীমা আইন সম্বন্ধে ফরাসী মজুর

এখানে মালিক নিজকে নিজেই ধন্যবাদ দিতেছেন। বইখানি কে লিখিয়াছেন? ধরুন যেন টাটা কোম্পানীর মালিক লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি মজুরদের জন্য যাহা করিয়াছেন পৃথিবীতে আর কেহ তাহা করে নাই। কুলী-মজুর-কেরাণী তাহারা কি সেকথা বলিবে? তাহারা বলিবে—"তাহা ত আমরা জানি না।" সেইরূপ বড় একটা ফরাসী কারখানার মালিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"কেরাণী ও গরীবদের জন্য আমরা যাহা করিয়াছি, কেহ কখনও তাহা করে নাই, আমরা গরীবদের কখনো বাঁধিয়া রাখি নাই।" গরীবদের জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে—"উহার মত জুয়াচোর, বাটপাড় কেহ নাই। যুক্তি দেখাইতেছেন, জার্ম্মাণিতে যে রকম আইন, ফরাসী দেশে তাহার দরকার নাই। কারণ ছোট ছোট মালিক, ছোট ছোট জমিদার, ছোট ছোট কারিগর, ছোট ছোট কুটীর-শিল্পী এই হইতেছে আমাদের দেশের—ফরাসীদেশের বিপুল সমাজ-শক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুল আর্থিক শক্তি। যেন ফরাসী পুঁজিপতি আর জার্ম্মাণ পুঁজিপতি জাতে ফারাক!"

ঐরূপ লোক থাকা সত্ত্বেও ফরাসীরা এতদিনে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছে (১৯৩০)। কাহারা করিয়াছে? মজুরদের প্রতিনিধিরা। উহাদের দেশে চার কোটি লোক। তাহার মধ্যে প্রায় এক কোটি লোক এই আইনে পড়িয়াছে। তাহাদের খরচ দেওয়া হইবে। অর্দ্ধেক দিতেছে মজুররা আর অর্দ্ধেক দিতেছে কারখানার মালিকরা।

যুবক ভারতের সমস্যা

কি ফ্রান্স, কি জার্ম্মাণি, কি ইংলণ্ড সকল সভ্য দেশেই জনসাধারণ ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও দৈব-বীমা দ্বারা পেন্সন পাইতেছে। আমাদের পক্ষে

সে রকম ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা জানিনা। ১৯২৬ সনে এ জিনিষ আমরা ধারণা করিতে পারি কি? অথচ এ ব্যবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না করিব, কর্ম্মদক্ষতা বলিয়া জিনিষ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিব না। স্বদেশসেবা হিসাবে যদি কাজ করিতে চাই, পারিব না। ইয়োরোপের সঙ্গে যদি টক্কর দিতে হয়, পারিব না। যে কোন দেশের সঙ্গেই টক্কর দিতে হয়, পারিব না। আমাদের টক্কর দিতে হইবে কাহার কাহার সঙ্গে? একবার ভাবি কি? চোখের সামনে দেখি লড়াইয়ে জার্ম্মাণির হাড় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিস্‌মার্কের সাধের সাম্রাজ্য ঠুঁটা হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের আথিক দৃঢ়তা অটুট আছে। বিস্‌মার্কের আধখানা কাজ ষোল কলায়ই খাড়া রহিয়াছে। তাহা যতক্ষণ ঠিক থাকিবে ঐ দেশকে কেহ নড়াইতে পারিবে না। জার্ম্মাণি ত জার্ম্মাণি, মনে হয় ইতালি আমাদের চেয়ে একটু কিছু বেশী বটে; কিন্তু আমরা ইতালির কাছাকাছিও নহি। আমরা কারু সঙ্গেই টক্কর দিবার পথে আজ দাঁড়াইতে পারি না।

বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে এই সব করিয়া উঠা কঠিন হইলেও ইহার কথা ভাবিতে হইবে। পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে দেড় কোটি বাঙ্গালী এমন আইন-কানুনে বদ্ধ হইবে, যাহার ফলে আমরা আর্থিক হিসাবে স্বাধীন ভাবে, নিশ্চিন্ত ভাবে এবং নিরুদ্বেগে যার যার কাজকর্ম্ম করিয়া যাইব। এইটা ১৯২৬ সনে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব মনে হইতেছে। কিন্তু এই সব প্রণালী অবলম্বিত না হইলে আমরা বড় গোছের কিছু করিতে পারিব না। আর ইহা যদি করিতে পারি, তাহা হইলে অহরহ যে সব বুজরুকি ও আজগুবি কথা বলিতে আমরা অভ্যস্ত, সে সব কথা আওড়াইবার প্রয়োজন হইবে না।

জমিজমার আইন-কানুন *

চাষী আর পল্লী ভারতের একচেটিয়া নহে

খাওয়া-পরার সঙ্গে জমিজমার সম্বন্ধ অতি নিবিড়। এ কেবল আমাদের দেশে নহে,—সকল দেশেই চাষ-আবাদ আর আর্থিক উন্নতি খুব লাগালাগি চীজ্। কথাটা ভাল করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। কেননা আমাদের দেশে একটা বুখ্‌নি চালানো হইয়া থাকে যে, ভারত হইতেছে কৃষি-প্রধান দেশ, আর দুনিয়ার অন্যান্য মুল্লুক হইল শিল্প-প্রধান জনপদ। ভারতের ধাতে নাকি শিল্প-কারখানা সহ্য হয় না আর দুনিয়াখানার আর কোথাও নাকি চাষ-আবাদ বরদাস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

চাষ বনাম শিল্প মামলায় ভারতবর্ষকে একটা সৃষ্টি-ছাড়া মুল্লুক বিবেচনা করা আমাদের স্বদেশসেবকদের, "দার্শনিক" পণ্ডিতদের, ধনতাত্ত্বিক মহাশয়দের একটা প্রকাণ্ড বাতিকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বাতিকটার আগাগোড়া সবই বুজরুকি। ইয়োরামেরিকার ধনদৌলত-ঘটিত আর নরনারী-ঘটিত ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌সের অঙ্কগুলা দেখিলেই বুজরুকি হাতে হাতে ধরা পড়িতে বাধ্য। চাষের জন্য লাখ-লাখ কোটি কোটি লোক ইয়োরামেরিকার দেশে দেশে আজও বাহাল আছে। হয় খোদ চাষী হিসাবে না হয় চাষীদের নিয়োগকর্ত্তা মনিব হিসাবে এই সকল লোকেরা অন্ন সংস্থান করিয়া থাকে। এই যে দুনিয়ায় আজকাল শিল্প-বিপ্লবের তুমুল প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, এই যুগেও আদমসুমারিতে

---

* জাতীয় শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬।

চাষীদের আর চাষী-মালিকদের সংখ্যা খুবই বেশী। কোথাও আধাআধি, কোথাও শতকরা ৬০।৭৫ পর্য্যন্ত। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও লোক-সংখ্যার ভিতর চাষীদের ওজন বেশ-কিছু ভারী।

আর তার পর যদি খানিকটা উজাইয়া—অর্থাৎ "সেকালের" দিকে যাত্রা করি,—যখন ইয়োরামেরিকার খৃষ্টিয়ান সমাজে যন্ত্রপাতির দৌড় বড় বেশী ছিল না, শিল্প-কারখানা সবে দেখা দিতেছিল মাত্র, তখনকার অবস্থায় কি দেখিতে পাই? তখনকার "পশ্চিমা" সমাজে চাষীরাই ছিল লোকসংখ্যার আসল অংশ। দেশের লোক বলিলে তাহারা বুঝিত প্রধানতঃ বা একমাত্র কিষাণ বা চাষী। ধনদৌলতের মূর্ত্তিমাত্রই ছিল প্রধানভাবে আবাদের সন্তান। সমাজের মেরুদণ্ড, আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্র ইত্যাদি যা-কিছু চাও না কেন সবই পাওয়া যাইত চাষ-আবাদে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগল-মারাঠা আমলের ইয়োরোপীয়ানরা সবই ছিল চাষীর জাত। অতদূর উজাইয়া যাইতে চাহি না। এই সেদিনকার উনবিংশ শতাব্দীর আর্থিক শ্রেণীবিভাগ বা সামাজিক জাতিভেদটার কথা বলিতেছি। দুনিয়ার গতি-স্থিতি বেশ বুঝা যাইবে। ১৮৪৬ সনের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ফ্রান্সের কথা বলিতে চাই। তখনকার দিনে ফরাসীরা ছিল গুণতিতে প্রায় ৩॥০ কোটি। এই ফ্রান্সে যদি কোনো ভারতসন্তান শফর করিতে যাইত, তাহা হইলে তার চোখে ফরাসী সমাজ কেমন ঠেকিত? ফরাসীরা "অতি-মাত্রায়" শহুরে লোক মালুম হইত কি? পাশ্চাত্য সভ্যতাকে একমাত্র নগর-জীবনেরই পৃষ্ঠ-পোষক বিবেচনা করা চলিত কি? ফ্রান্সে তখনকার আদমসুমারিতে ছিল প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ পল্লীবাসী অর্থাৎ শতকরা ৭৫।৮০ জন লোক ছিল ফ্রান্সে "পল্লীজননীর সুসন্তান।" আর জমিজমার কল্যাণেই তাহাদের ভরণপোষণ চলিত। অর্থাৎ চাষবাস যদি একটা "আধ্যাত্মিক"

কিছু হয়, তাহা হইলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গো-খাদক ফরাসী খৃষ্টিয়ানদের কম সে কম বার আনা লোক ছিল আধ্যাত্মিক।

সেই সময়ে জার্ম্মাণরাও ছিল বিলকুল এইরূপ। ১৮৪৩ সনের আদম সুমারিতে দেখিতে পাই যে প্রুশিয়া জনপদে শতকরা ৭১।৭২ জনের ভাত কাপড় জুটিতেছে জমিজমার চাষবাসে। প্রুশিয়ার জার্ম্মাণরা অতিমাত্রায় সহর-ঘেঁশা লোক ছিল না। শতকরা ২৮ জন মাত্র ছিল শহুরো নরনারী। ৩০,০০০ নরনারী অথবা তার চেয়ে বেশী লোক বাস করিত কটা শহরে? মাত্র ১৫ টায়। কাজেই পল্লীসেবায় জার্ম্মাণরা এশিয়ার নরনারীকে কুর্ণিশ করিয়া চলিতে রাজী হইবে কেন?

ধাত হিসাবে,জাতি-গত চরিত্র হিসাবে এশিয়ায় আর ইয়োরামেরিকায় ফারাক আবিষ্কার করা অসম্ভব। অন্যান্য তরফেও দেখিয়াছি, চাষ-আবাদ, জমিজমা আর পল্লীবাস ইত্যাদি দফায়ও দেখিতে পাইতেছি তাই। এই সকল হিসাবে একটা একচেটিয়া কিছু বা অতি-মাত্রায় বিশেষত্বপূর্ণ কোনো কথা ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় পাওয়া যাইবে না। যাঁহা পূর্ব তাঁহা পশ্চিম—চাষবাসে আর পল্লীকথায়।

কৃষিকর্ম্মের নব-বিধান

আজ জমিজমার কথা বলিতে আসিয়াছি বটে। কিন্তু চাষবাসের কথা বলিব না। জমির সার, কৃষি-রসায়ণ ইত্যাদি বস্তু আজকের আলোচ্য নয়। হাল বদল, "ট্র্যাকটর", বা অন্যান্য নবীনপ্রবীণ-যন্ত্রপাতির খতিয়ানও আজ হইবে না। তা ছাড়া যানবাহনের সাহায্যে বাজারে ফসল চালান দিবার প্রণালী সম্বন্ধেও কিছু বলিতে আসি নাই। অপর দিকে কিষাণদের পুঁজিপাটা বাড়াইবার উপায় বাতলাইতে চাই না। সমবায়-নিয়ন্ত্রিত কৃষি-ব্যবস্থাও এই আলোচনার বহির্ভূত। অধিকন্তু

গো-বীমা, কৃষি-বীমা ইত্যাদি নতুন নতুন বীমার কথা শুনানোও আজ আমার মতলব নহে। কৃষি-রসায়ণ, কৃষি-এঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি-ব্যাঙ্ক ইত্যাদি কৃষি-বিজ্ঞানের নানা বিভাগ একালের ইয়োরামেরিকায় যারপর নাই বাড়তির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই সকল বিষয়েও—অন্যান্য বিষয়ের মতনই,—নবীন দুনিয়ার নিকট যুবক ভারতের অনেক-কিছু শিখিবার আছে। কৃষিকর্ম্মের নব-বিধান গুলা আমাদের খুবই কাজে লাগিবে। কিন্তু সে সব পথ আজ মাড়াইব না।

আজ আলোচনা করিতে চাই একমাত্র আইনের কথা। জমিজমার আইন-কানুন ছাড়া অন্যান্য বিধি-বিধান এই সঙ্গে বিবৃত হইবে না। জমিজমার বিধানগুলাও আকারে প্রকারে বিপুল। একটা বিশ্বকোষ আওড়ানো সম্ভব নহে। কয়েকটা মোটা মোটা কথা বলিয়া যাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য।

"ভিলেজ কমিউনিটি"র প্রাচ্য পাশ্চাত্য

মজার কথা, এই জমিজমার আইন-কানুন সম্বন্ধেও ভারতে আমরা একটা কিম্ভূত-কিমাকার মত পুষিয়া আসিতেছি। ভারতের ভূমি-ব্যবস্থাকে অন্যতম ভারতীয় "বিশেষত্ব" রূপে জাহির করা আমাদের দস্তুর। এমন কি, পাশ-করা উকীলেরাও অজ্ঞানে-সজ্ঞানে এই মতই চালাইয়া আসিতেছেন। ইয়োরামেরিকার ভূমি-ব্যবস্থায় আর ভারতের ভূমি-ব্যবস্থায় যে একটা আকৃতি-প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ও সাম্য আছে এই কথা ভারতীয় আইন-ব্যবসায়ীদের জানা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহারাও এই মহলে মাথা খেলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। তাঁহারা মগজ খেলাইলে অন্ততঃ একটা বুজরুকি ভারতের "দার্শনিক" আধ্‌ভায় কল্কে পাইত না।

সেকেলে ভূমি-ব্যবস্থার সমাজ-তত্ত্ব বা ধন-তত্ত্ব লইয়া সময় কাটানো আজকার এই আসরে সম্ভবপর নয়। শুধু বলিতে যাইতেছি সিদ্ধান্তটা মাত্র। ভারতীয় পণ্ডিতেরা "ভিলেজ কমিউনিটি" অর্থাৎ "পল্লী-সাম্য," যৌথ-ভূমি, "পল্লী-স্বরাজ" বা "পল্লী-সমবায়" নামক কোনো একটা বস্তুকে ভারতাত্মার খাশ প্রতিমূর্ত্তি সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত। আসল কথা, যুগের পর যুগ ধরিয়া এই পল্লী-স্বরাজ নামক আর্থিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান পশ্চিমের খৃষ্টিয়ান সমাজে—মায় ইংল্যাণ্ডেও জবরভাবে চলিয়াছে। নৃ-তত্ত্ব বা অ্যান্থ্রপলজি বিদ্যার কোঠে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে একটা মামুলি অ, আ, ক, খ মাত্র।

তারপর এই "ভিলেজ কমিউনিটি"র ভাঙন-লাগা ব্যাধিটাও আবার ভারতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একচেটিয়া ব্যারাম নয়। দুনিয়ার অন্যান্য সমাজ-কলেবরেও এই ব্যামোটা দেখা গিয়াছে। এই ব্যাধির অর্থাৎ ভাঙনের ফলে সমাজে যে সকল নবীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আইন,—সে সব চীজ দুনিয়ার অন্যান্য জনপদের মতন ভারতেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সু-কু সর্ব্বত্রই এক প্রকার। অর্থাৎ কি বৃটিশ-ভারতের আর্থিক ভাঙন-গড়নে, কি সেকেলে স্বাধীন ভারতের অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে, জমিজমার ঠিকুজি, জমিজমার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য একটা অসম্ভব রকমের প্রাচ্য-কিছু নয়। অন্যান্য দেশের আর্থিক ইতিহাসে হাতে খড়ি হইবা মাত্র সকলেই ভূমি-ব্যবস্থায় মানবজাতির বিকাশ-ধারা একরূপই দেখিতে বাধ্য হইবে।

হিন্দু আইনে রোমাণ ব্যক্তি-নিষ্ঠা

এইবার আরও কিছু রগড়ের কথা বলি। ভারতবর্ষের যে লিখিতটা হিন্দু আইন, তাতে "ভিলেজ কমিউনিটি" বা "যৌথ-পল্লীর" খেয়াল বোধ

হয় একদম নাই। আমাদের ঋষি, মহর্ষি, মহাপ্রভুরা সকলেই প্রায় পূরাপূরি অ-পল্লীনিষ্ঠ। তাঁদের মাথায় পল্লী-"সাম্য", পল্লী-"স্বরাজ", "যৌথ" সম্পত্তি ইত্যাদির তত্ত্ব কখনো খেলিয়াছে কিনা সন্দেহ। কি যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজ, কি প্রপিতামহ মনু, কি সেকালের কৌটিল্য আর কি একালের শুক্রাচার্য্য, কি বাঙালী জীমূতবাহন আর কি অ-বাঙালী বিজ্ঞানেশ্বর, এঁরা সকলেই ব্যক্তিত্বের প্রচারক। এঁদের কানুনে কোন জনপদের জমিজমার উপর নরনারীর সমবেত স্বত্বাধিকার বিলকুল অজ্ঞাত। অর্থাৎ মধ্যযুগের ইয়োরোপে জমিজমার রোমাণ-আইন যে চীজ আর আমাদের আধ্যাত্মিক ভারতে ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, মিতাক্ষরা, দায়ভাগও অবিকল সেই চীজ।

অথচ ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম অঞ্চলে যৌথ-পল্লী বা পল্লী-স্বরাজ কখনো ছিল না একথা বলিতেছি না। ইয়োরোপের জনপদে জনপদে যুগের পর যুগ ধরিয়া "ভিলেজ কমিউনিটি"র অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা সম্ভব,—রোমাণ-আইনের ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও। ঠিক সেইরূপই ভারতীয় "লোকাচারের","চরিত্রের" ("কাষ্টমে"র) ভিতর নানা কালে নানা স্থানে পল্লী-স্বরাজ আর যৌথ জমি দেখা গিয়াছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের চোলমণ্ডলে এই প্রথার সবিশেষ চলন দেখিতে পাই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যে সকল পুঁথি-গ্রন্থ "ধর্ম্ম", "অর্থ" বা "নীতি" বিষয়ক "শাস্ত্র" নামে পরিচিত তার ভিতর এই প্রথার টিকি পর্য্যন্ত নজরে আসে না।

কথাটা চরম ভাবে জোরের সহিত বলিয়া যাইতেছি, কেননা প্রত্নতত্ত্বের হাবিজাবির ভিতর ঢুঁ মারার অভ্যাস আমার কিছু কিছু আছে। "ভিলেজ কমিউনিটি"র অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ এই হিন্দু আইন-সাহিত্যের ভিতর আজও ঢুঁড়িয়া পাই নাই। যদি কেহ পাইয়া থাকেন জানাইবেন। আমার মত শুধরাইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু জানিয়া রাখিবেন যে, যেখানেই "পল্লী" শব্দ পাইতেছেন, সেখানেই "পল্লী-স্বরাজ" পাকড়াও করা

চলিবে না। তবে বলিয়া রাখি যে, প্রমাণের কুচো কাচা পাওয়া নেহাৎ অসম্ভব নয়। আগেই বলিয়া চুকিয়াছি যে, যৌথ পল্লী নামক প্রতিষ্ঠান ভারতে ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ভারতীয় "আধ্যাত্মিকতার" আসল প্রচারক যাঁরা,—নীতি-স্মৃতি-ধর্ম্ম শাস্ত্রকারেরা, তাঁরা এই বস্তুটাকে লইয়া মাতামতি আবশ্যক বোধ করেন নাই। তাঁরা জমিজমাকে সোজা-সুজি ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমঝিয়াই কানুন কায়েম করিতে বসিয়াছিলেন। যৌথপল্লীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁরা নির্ব্বিকার।

যাক্। দেখা যাইতেছে যে "ভিলেজ কমিনিউটি" "ভিলেজ কমিনিউটি" করিয়া ক্ষেপিয়া বেড়াইলেই তথাকথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অথবা ভারতীয় বিশেষত্বের পাণ্ডা হওয়া সম্ভবপর নয়। আবার ব্যক্তিনিষ্ঠা, ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি চীজ রোমাণ আইনে আছে বলিয়া সে সবকে অ-হিন্দু, অ-ভারতীয় বা অনাধ্যাত্মিক কিছু রূপে নিন্দা করা চলিবে না। জমিজমার ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যদি "পাশ্চাত্য", "খৃষ্টিয়ান" বা ইয়োরোপীয়ান বলিয়া বর্জ্জনীয় বস্তু হয়, তাহা হইলে আমাদের ঋষি-মহর্ষি মহাপ্রভুদের সকল পাতিই পাশ্চাত্য দোষদুষ্ট, খৃষ্টিয়ানি গন্ধে ভরপুর, ইয়োরোপীয়ান রঙের মাল, এক কথায় বর্জ্জনীয়। রাজী আছেন কি? আমি দেখিতেছি যাঁহা পূব, তাঁহা পশ্চিম। তবে বর্জ্জন-ঠর্জ্জনের কথা আলাদা।

আমি দেখিতেছি, আর্থিক সভ্যতার গতি, পূবই হউক বা পশ্চিম হউক,—একদিকে। আমাদের বেলায় যেটা সু সেটা যদি ওদের থাকে তাহা হইলে সেটাও সু নিশ্চয়। ভালয় মন্দয় পূব পশ্চিম এক পথেরই পথিক। কাজেই সমস্যাগুলা সর্ব্বত্রই একশ্রেণীর অন্তর্গত। সমস্যার মীমাংসা অর্থাৎ ব্যারামের দাওয়াইও পূর্ব্বে পশ্চিমে এক-প্রকার হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

ইতালির কিষাণ-মালিক আধিয়া আর লাতিফন্দি

বৃটিশ ভারতের অথবা অবৃটিশ, বর্ত্তমান ভারতের ভূমি-ব্যবস্থায় একটা "ভারতীয়" ছাপ কিছু আছে কি? ইয়োরোপের যে কোন দেশের জমি-বন্দোবস্ত-প্রণালী দেখিলে এই সম্বন্ধে চোখ খুলিয়া যাইবে।

ধরা যাউক ইতালির কথা। এদেশে চার কোটির বেশী নরনারীর বাস। কিন্তু মাত্র চল্লিশ লাখ লোক নিজ নিজ জমির আর ঘরবাড়ীর মালিক, অর্থাৎ ভূমির উপর একৃতিয়ার ভোগ করে ইতালিতে শতকরা মাত্র ৯।১০ জন লোক। অপর ৯০ জন ইতালিয়ান পরের বাস্তুভিটায় ঘর করে, আর দরকার হইলে "ক্ষেতি" চালায়। এই দৃশ্যটা কি সুয়েজ খালের অপর পারেরই, সূর্য্যাস্ত দেশেরই একচেটিয়া? সুয়েজ খালের এপারে,—আমাদের এশিয়ায় এই দৃশ্য কোন মিঞার নজরে পড়ে না কি?

আর্থিক ইতালির আর এক কথা "এমফিতয়সিস" মালিক। এই শ্রেণীর লোক খোদ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জমি "ভাড়া" করিয়া লয়। খাজনা দিতে হয় গবর্ণমেণ্টকে। ভাড়াটেয়ারা জমিটা আজীবন রাখিতে অধিকারী। তবে অনেক সময় এই ধরণের রাইয়ত একটা মোটা টাকা দিয়া জমিটা কিনিয়া লয়। তারপর হইতে খাস মহাল পরিণত হয় ব্যক্তিগত বে-সরকারী সম্পত্তিতে। রাইয়তেরা তখন পেজান্ট-প্রোপ্রাইটার বা কিষাণ-মালিক। তারা নিজেরাই নিজের পুঁজিতে নিজ জমি চাষ করে। এই দৃশ্য এশিয়ার কোথাও দেখা যায় না কি?

ইতালিয়ান ভূমি-ব্যবস্থায় "মেৎসাদ্রিয়া" নামক এক প্রকার বন্দোবস্ত আছে। এই ব্যবস্থায় জমিটা খোদ চাষীর সম্পত্তি নয়। জমির মালিক আর চাষী দুই বিভিন্ন লোক। মালিকের সঙ্গে চাষী আধাআধি বখরায় ব্যবস্থা করে। চাষী নিজ হাতে পায়ে খাটে আর মামুলি খরচপত্রের

স্থায়ী থাকে। আর জমির মালিক চাষীকে চাষের জন্য বাস্তভিটা তৈরি করিয়া দেয়। আবাদের জানোয়ারও আসে মালিকের পুঁজি থেকে। এই "আধিয়া" প্রথা তস্কানা প্রদেশে চলিতেছে। এই জনপদের প্রসিদ্ধ শহর ফ্লরেন্স।

তা ছাড়া আর এক প্রকার ভূমি-ব্যবস্থা ইতালিতে দেখা যায়। নাম তার "লাতিফন্দি"। সুবিস্তৃত জনপদের মালিক কোন ব্যক্তিবিশেষ। তাঁদের কাছ থেকে চাষীরা দশ বিশ বিঘা জমি রাইয়ত হিসাবে ভাড়া করিয়া লয়। ভাড়াটা সমঝাইয়া দেওয়া হয় ফসলে অথবা টাকায়। "লাতিফন্দি"র মালিকদের সঙ্গে চাষীদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ বড় একটা দেখা যায় না। এই দুই শ্রেণীর লোকের ভিতর পর পর একাধিক, বহুসংখ্যক নিম্-মালিক আর ভাড়াটে বিরাজ করে। প্রথাটা নতুন কিছু নয়। সেই রোমাণ সাম্রাজ্যের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত ইতালির মধ্য ও দক্ষিণ প্রদেশে আর সিসিলি দ্বীপে "লাতিফন্দি"র ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। এই "মধ্যবর্ত্তী" নিম্-মালিক আর ভাড়াটের স্তর-বিন্যাস বাঙালী কিষাণ, ভদ্রলোক আর উকিল-মহলে অজ্ঞাত কি ?

ফরাসী সমাজের ভূমি-ব্যবস্থা

এইবার ফ্রান্সের সমাজ-বিন্যাস দেখা যাউক। কিষাণ-মালিক হইতেছে এই মুল্লুকে ভূমি-ব্যবস্থার বড় কথা। ভূমির উপর এক্তিয়ার ভোগ করে ফরাসীরা শতকরা ৯৩ জন। এই হিসাবে ফ্রান্স হইতেছে ইতালির ঠিক উল্টা, অর্থাৎ ইয়োরোপ নামক ঐক্যবিশিষ্ট কোনো দুনিয়া নাই। ইয়োরোপ বহুত্বময়, বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্নতায় ভরা জগৎ। কাজেই ভারতেও যদি জমিজমার ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আর বিভিন্নতা থাকে তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ?

ইতালিয়ান "মেৎসাদ্রিয়া" বা আধিয়া প্রথার জুড়িদার ফ্রান্সেও আছে। মালিকেরা চাষীর সঙ্গে আধা-আধির বখরা করে। কিছু কিছু পুঁজি জোগানো তাদের দায়িত্ব। চাষীকে অন্যান্য বিষয়ে নিজ ভার বহন করিতে হয়।

আর খাঁটি জমিদারীর প্রথাও ফ্রান্সে চলিতেছে। মালিকের নিকট হইতে জমি ভাড়া করিয়া লওয়া হয়। চাষীর সঙ্গে মালিকের কোনো সম্বন্ধ নাই। নির্দ্দিষ্ট ভাড়া সমঝিয়া দিলেই হইল। চাষ-আবাদের ভালমন্দর জন্য চাষী নিজে দায়ী।

ভূমি-গোলামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ইতালিয়ান আর ফরাসী সমাজের বিবরণ শুনিলে ভারতসন্তানের অজানা কোনো ভূমি-ব্যবস্থার কথা মনে পড়ে কি? শুধু ফ্রান্স আর ইতালি কেন? জার্ম্মাণি, রুশিয়া ইত্যাদি দেশেও ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আর্থিক গড়ন ছিল বা এখনো কথঞ্চিৎ আছে,তাহাতে ভারতের সুপরিচিত বিধিব্যবস্থারই এপিঠ ওপিঠ দেখা যায়। একটা অদ্ভুত কিছু ইয়োরোপে আবিষ্কৃত হয় নাই। আর ভারতসন্তানও একটা অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করে নাই।

এপর্য্যন্ত যাহা কিছু বলিয়া যাইতেছি সবই এককথায় রোমাণ-আইনের আওতায় শাসিত ইয়োরোপের বৃত্তান্ত। তাহাকেই মোটের উপর জুড়িদার বলিতেছি হিন্দু-ব্রিটিশ আইনের আওতায় শাসিত ভারতীয় একাল-সেকালের। কিন্তু পৃথিবী চুপ করিয়া বসিয়া নাই। আর্থিক আইন-কানুনও বেশ-কিছু ছুটিয়া চলিয়াছে।

রোমাণ আইনের আবহাওয়ায় অথবা লোকাচারের আওতায় ইয়োরোপের নানা জনপদে ভূমি-দাস্য ("স্ভর্ফ্-ডম") সুপ্রচলিত ছিল। দাস-

খতের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয়ানরা বিদ্রোহ করে। ফরাসী বিপ্লব এই বিদ্রোহের এক বড় খুঁটা (১৭৮৯-৯৩)। ফ্রান্সের দেখাদেখি জার্ম্মাণরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৮০৭-১২) দাসখত তুলিয়া দেয়। ষ্টাইন আর হার্ডেনব্যর্গ এই সংস্কারের জন্য বিখ্যাত। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া রুশিয়ায় দাস খতের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছে তুমুল ভাবে। বোলশেহ্বিক বিপ্লবের দিগ্‌বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে "স্যর্ফ"-প্রথার শেষ চিহ্নও রুশ মুল্লুক হইতে উড়িয়া গিয়াছে (১৯১৮-১৯)। বল্কান অঞ্চলের কোনো কোনো জনপদে,—রুমেনিয়ায়, জুগোস্লাভিয়ায়, আজও "স্যর্ফ"-প্রথাকে সমূলে উৎপাটন করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে। আইনতঃ অবশ্য ভূমি-গোলামী আর নাই, অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যের আমলেই সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে মহালড়াইয়ের পরও অনেক গলৎ রহিয়া গিয়াছে। ইয়োরোপে থাকিবার সময় নব-গঠিত দেশসমূহের স্বদেশ-সেবকদেরকে আইনের সাহায্যে জমিজমার জঞ্জালগুলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার কাজে মোতায়েন দেখিয়া আসিয়াছি।

ভারতে ভূমি-গোলামী আজও কোথায় কোথায় আছে জানি না। যদি কোথাও না থাকে বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তি হিসাবে ভারতীয় চাষীরা ইয়োরোপের সকল দেশের চাষীর মতনই স্বাধীন জীব। আবার পূর্ব্বে বা পশ্চিমে সাম্য বা সাদৃশ্য।

স্বাধীনতা—(১) আইনগত (২) রাষ্ট্রগত (৩) অর্থগত

কিন্তু এই স্বাধীনতায় গুড় মাখানো নাই। "আইন"-গত স্বাধীনতার জোরে চাষীরা কোনো লোকের গোলাম আর থাকিল না। কোনো জমির ভাগ্যের সঙ্গে কোনো চাষীর ভাগ্য বাঁধাও রহিল না। এই স্বাধীনতা

একটা বড় জিনিষ সন্দেহ নাই, আর সঙ্গে সঙ্গে যদি "রাষ্ট্রীয়" স্বাধীনতাও থাকে তাহা হইলে "সোনায় সোহাগা"।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কাহাকে বলে? প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে, গোটা দেশটা অন্য কোনো দেশের অধীন নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ইত্যাদি দেশ অবশ্য মোটের উপর আগাগোড়া রাষ্ট্রীয় হিসাবে স্বাধীন। কিন্তু চাষীদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বলিলে একটা শ্রেণী-বিশেষের কথা বুঝিতে হইবে। চাষীরা যদি সরকারী প্রতিষ্ঠানে—পার্ল্যামেণ্ট, ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্ব্লি ইত্যাদি সভায় ভোট দিবার অধিকার পায়, তাহা হইলে তাহারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে বুঝিতে হইবে। এ হইতেছে "ডেমোক্রেসী"র অর্থাৎ আত্মকর্তৃত্বের মামলা। ফরাসী বিপ্লবের সময় ইয়োরোপে এই স্বরাজ অর্থাৎ জনগণের আত্মকর্তৃত্ব খানিকটা মাথা তুলিয়াছে। তার পরবর্ত্তী ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের ভিতর নানা দেশে এইদিকে নানা আন্দোলন চলিয়াছে। আসল ফল যদিও বেশী দেখা যায় নাই, তবুও মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাষীদের হাতেও আসিয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, আইনের চোখে একপ্রকার স্বাধীনতা আর রাষ্ট্রীয় জীব হিসাবে দুই প্রকার স্বাধীনতা চাষীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপে কোথাও কোথাও ভোগ করিয়াছে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর তিন প্রকার স্বাধীনতায় তাদের পেট ভরিয়াছে কি? ভরে নাই। তাই চলিয়াছে ওসব দেশে আবার আন্দোলন, আবার বিপ্লব। জমিজমার আইন-কানুন কোথাও আসিয়া একটা স্বর্ণযুগে ঠেকে নাই। আবার তাহাকে ভাঙ্গিয়া নতুন গড়ন দিবার আয়োজন হইয়াছে। কথাটা ভারতের স্বদেশ-সেবকগণের পক্ষে ঢোঁক গিলিয়া গিলিয়া হজম করা উচিত।

সমস্যাটা কোথায়? ফরাসী বিপ্লব আর ষ্টাইন-হার্ডেনব্যর্গের সংস্কার

ফরাসী-জার্ম্মাণ চাষীকে স্বর্গে ঠেলিয়া তুলিতে পারে নাই। দুই শ্রেণীর স্বাধীনতা খাইয়াও তাহাদের "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" আর "সুখ-পিপাসা" মিটে নাই। এই দুই শ্রেণীর স্বাধীনতার বাহিরেও আর এক শ্রেণীর স্বাধীনতা আছে। সেটা অর্থগত—আর্থিক। খাওয়া-পরার দুর্দ্দশা, ভাত-কাপড়ের টান মানুষের যতদিন থাকে ততদিন পর্য্যন্ত আইনের চোখে স্বাধীন জীব আর পার্ল্যামেণ্টের ভোটার-মেম্বার হইয়াও নরনারীর আসল দুঃখ ঘুচে না। এই মামুলি তত্ত্বটা ইয়োরোপে "আবিষ্কৃত" হইল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় পাদে। জার্ম্মাণদেরকে এই আবিষ্কারের পথ-প্রদর্শক বলিতে পারি,—বিশেষতঃ চাষী কিষাণদের কর্ম্মক্ষেত্রে।

১৮৫০ সনে দেখা গেল যে, জার্ম্মাণিতে "স্তার্ফ" বা ভূমি-গোলাম আর কেহ নাই বটে। কিন্তু ৪,০০,০০০ "স্বাধীন" চাষীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। স্বাধীনতা তাদের আলবৎ আছে। আধ্যাত্মিক জীব হিসাবে তাদের কোনো অভাব নাই। অভাব যা-কিছু অন্ন-বস্ত্রের। তাদের প্রত্যেকের হিস্যায় জমির পরিমাণ এত কম যে প্রাণপণে আবাদ চালাইলেও তাতে "দুবেলা হাঁড়ী চড়ানো" অসম্ভব। সবই আছে,—নাই কেবল আর্থিক স্বাধীনতা, নিরুদ্বেগ জীবন যাপনের ব্যবস্থা। সমস্যাটা আবিষ্কৃত হইল নিম্নরূপ :—ফী চাষী প্রতি যথেষ্ট জমির অভাব।

চাষী প্রতি জমির পরিমাণ

এই যে সমস্যা,—জার্ম্মাণ এবং অনেকটা সার্ব্বজনিক ইয়োরোপীয়ান সমস্যা,—ইহা ইয়োরোপের বাহিরেও সনাতন সমস্যা। ভারতে এই সমস্যার কথা জানে না কে? ভারতে প্রথম দুই শ্রেণীর স্বাধীনতা চাষীমজুর গরীবগুর্ব্বো ধনী মহাজন সকলেই অল্পবিস্তর ভোগ করিতেছে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রথম দিকটা আজকাল এদেশে অজ্ঞাত। কিন্তু

প্রধানতঃ আইনগত স্বাধীনতা আর কিছু কিছু আত্মকর্তৃত্বসংক্রান্ত স্বাধীনতা ১৯২৬ সনের ভারতসন্তান ভোগ করে। তা চরমপন্থী রাষ্ট্রিকদের পক্ষেও স্বীকার করা সম্ভব। এই দুই তরফে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতীয়ের খানিকটা সাম্য দেখা যাইতেছে। এইবার বলছি যে "ততঃ কিম্" নামক অবস্থা ইয়োরোপের পক্ষেও যেরূপ আমাদের ভারতের পক্ষেও সেইরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানক্ষেত্রে জমিজমার কথা বলা হইতেছে। ভারতীয় চাষীদের আর্থিক স্বাধীনতা কোথায়? ১৮৫০ সনের জার্ম্মাণ অবস্থা ১৯২৬ সনের ভারতীয় অবস্থারই সমান। ভারতে ফী চাষী প্রতি "দুবেলা হাঁড়ী চড়াবার" উপযুক্ত যথেষ্ট জমি আছে কি? এই হইতেছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সনাতন সমস্যা।

শুধু বাঙ্‌লাদেশের কথা বলিতেছি। আমাদের ২৭ জেলার ১৫টায় ইতিমধ্যে "সেট্‌লমেণ্টের" বা জমিজমার দখল, অধিকার, চৌহদ্দি ইত্যাদির স্থিরীকরণ সাধিত হইয়াছে, সরকারী শাসন বিভাগের আওতায়। তাতে চাষীদের জমির পরিমাণ কিরূপ দেখিতে পাই? বাঙ্‌লার চাষীদের কপালে গড়পড়তা বিঘা তিনেক জমি পড়ে। তিন বিঘা জমির ফসলে এক এক চাষীর ভরণপোষণ সম্ভবপর কি? এই প্রশ্নটা আজও ভারতবাসীর মাথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিনা জানি না। হয়ত বা কাহারো কাহারো মাথায় পৌঁছিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণরা আমাদের দুই তিন পুরুষ আগে এই লইয়া মগজ খেলাইয়াছে। আর জার্ম্মাণদের দেখাদেখি দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও লোকেরা আর্থিক স্বাধীনতার এই "চাষীপ্রতি ভূমির পরিমাণ" তরফটা আলোচনা করিতে শিখিয়াছে।

বাঙলা দেশে বেশী লোকের মাথায় যে "ভূমির পরিমাণ" সমস্যাটা প্রবেশ করে নাই তার একটা বড় প্রমাণ আমরা যখন তখন পাই। আজ-কাল দেশে যেখানে-সেখানে শুনিতেছি,—ছেলে ছোকরা যুবা মাষ্টার

উকিল সকলকেই স্বদেশসেবকরা পরামর্শ দিতেছেন "ছাড়িয়া দাও লেখা-পড়ার কাজ,—লাগিয়া যাও চাষ-আবাদে।" "সহর ছাড়িয়া যাও চলিয়া পল্লীতে" নামে একটা বয়েৎ আছে আমাদের আবহাওয়ায়। ঠিক তারই মাসতুত ভাই হইতেছে এই চাষবাসে লাগিয়া যাওয়ার প্রপাগাণ্ডা।

যাঁরা "আর্থিক স্বাধীনতা"র কথা, চাষীদের নিরুদ্বেগ জীবন যাপনের কথা, মাথা প্রতি ফী কিষাণের যথেষ্ট জমির পরিমাণের কথা বস্তুনিষ্ঠ ভাবে ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁদের মুখে এরূপ পাঁতি বাহির হইতে পারে না। দু'চার জন লোককে তাদের অবস্থা বুঝিয়া হয়ত বা এরূপ পরামর্শ দেওয়া যুক্তিসঙ্গতই বটে। কিন্তু সমগ্র দেশের পক্ষে একটা কর্ত্তব্য-তালিকা নির্দ্ধারণের বেলায় এই পাঁতি দিতে গেলে মগজের দেউলিয়া অবস্থাই প্রমাণিত হয়।

বিলাতের "ছোট্ট চাষী"-বিষয়ক আইন

এইবার বিলাতের কথা কিছু বলি। ইংরেজদের সমস্যাও "গোত্র" হিসাবে বাঙালী আর জার্ম্মাণ সমস্যারই অনুরূপ। ভাতকাপড় জুটাইবার মতন জমি চাষীদের আছে কিনা,—ইংরেজরা এই ভাবনায় অনেক দিন কাটাইয়াছে। প্রত্যেক চাষীকে যথেষ্ট পরিমাণ জমি দিবার জন্য তাহারা প্রাণপাতও করিয়াছে আর আজও করিতেছে। ১৯০৮ সনে এরা "স্মল হোল্‌ডিংস্ অ্যাক্ট" জারি করিয়া "ছোট্ট কিষাণ" কাকে বলে বুঝাইয়া দিয়াছে। এতটা জমি এক এক চাষী-পরিবারের থাকা চাই যে, তাতে আবাদ চালাইয়া তারা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে পারে। যার চেয়ে কম পরিমাণে চলিবে না তাকেই বলে "ছোট্ট টুক্‌রা" বা "স্মল হোল্‌ডিং"। অবশ্য এই ছোট্ট টুক্‌রার মালিক স্বয়ং চাষী।

বিগত পনর ষোল সতর বৎসরের ভিতর ইংরেজরা এই লাইনে অনেক কিছু করিয়াছে। নতুন-নতুন আইন কায়েম হইয়াছে। সরকারী

তদন্ত বসিয়াছে। দেশ-বিদেশে তদন্তের অভিযান গিয়াছে। কনজার্ভেটিভ, লিবার‍্যল্, মজুরপন্থী সকল রাষ্ট্রীয় দলই সরকারী আর বে-সরকারী ভাবে "চাষী-প্রতি জমির পরিমাণ" সমস্তায় মাথা ঘামাইয়াছে। আর খোদ গবর্ণমেণ্টের খাজাঞ্জিখানা হইতে হাজার হাজার "ছোট্ট কিষাণকে" সাহায্য করার জন্য ক্রোর ক্রোর টাকা ঢালা হইয়াছে। বিলাতের ১৯০৮ সনটায় যে মীমাংসা পাঁতি, দাওয়াই বা দর্শন আছে তার দিকে যুবক ভারতের মতিগতি চালানো আবশ্যক।

বুঝা যাইতেছে যে যাদের জমি নাই অথবা কম আছে তাদেরকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট জমি দিয়াছে অথবা পাওয়াইয়া দিয়াছে। ব্যস্। বাঙালীকেও আজ তাই করিতে হইবে। জনপ্রতি তিন বিঘা জমীতে যখন বাঙালী চাষীর "ধড়ে প্রাণ রাখা" অসম্ভব, তখন ইংরেজরা নিজেদের জন্য যে দাওয়াই আবিষ্কার করিয়াছে সেই দাওয়াইটার ধরণ-ধারণ ভাল করিয়া রপ্ত করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। বিলাতী ১৯০৮ সন ভারতীয় আর্থিক উন্নতির মোসাবিদায় এক বড় আধ্যাত্মিক খুঁটা জোগাইতে পারিবে।

ইংরেজের ভুঁড়ি অবশ্য বেশ পুরু। তাদের উদরপূর্ত্তির জন্য ফী চাষী পরিবারকে ১৭৫ বিঘা জমি দিবার দস্তুর আছে। আজকাল আবার জীবন-যাত্রার মাপকাঠি বাড়িয়াছে। আন্দোলন চলিতেছে প্রত্যেক ছোট্ট কিষাণ পরিবারকে কম্-সে-কম ২২৫।২৫০ বিঘা জমি দিতে হইবে। বাঙালী চাষীর কপালে আজকাল জনপ্রতি বিঘা তিনেক বরাদ্দ। বিলাতী হিসাবে পরিবারে পাঁচজন করিয়া ধরিলে আজকাল বাঙ্লায় আছে চাষী-পরিবার প্রতি মাত্র ১৫ বিঘা। একে ঠেলিয়া ১৭৫ বিঘা পর্য্যন্ত তোলা আর্থিক ভারতের পক্ষে কোনো দিন সম্ভবপর হইবে কিনা সম্প্রতি আলোচনা করিতেছি না। বলিতেছি শুধু এই যে, ইংরেজরা এমন প্রস্তাবও ১৯২৪।২৫ সনে করিয়াছে যাতে গবর্ণমেণ্টকে ফী বৎসর ৭০,০০,০০০ পাউণ্ড

নিয়মিতরূপে খরচ করিতে হয়। আর তাতে চাষী-পরিবার মাত্রেই কম-সে-কম ২২৫।২৫০ বিঘা জমির মালিক হইবে। দেখিতেই পাইতেছেন জমিজমার আইনকামুনের গতি কোন্ দিকে।

ভুমি-বিধানে ব্যক্তি-নিষ্ঠা বনাম সমাজ-নিষ্ঠা

ছোট্ট কিষাণ-পরিবার সৃষ্টি করার অর্থ প্রথমতঃ যাদের অল্প পরিমাণ জমি আছে তাদেরকে বেশী পরিমাণ জমি পাওয়াইয়া দেওয়া। আর দ্বিতীয় প্রণালী হইতেছে একদম ভূমিহীন মজুরকে ভূমিস্বামীরূপে খাড়া করাইয়া দেওয়া। এসব সম্ভব হয় কি করিয়া? আইনের জোরে অথবা লুটপাটের জোরে ইংরেজ এইরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছে। আইনটার ধরণ-ধারণ কিরূপ? যাদের বেশী পরিমাণ জমি আছে তাদেরকে যাইয়া গবর্ণমেণ্ট বলিতেছে,—"বাবু সাহেব, তুই লাখ লাখ বিঘা জমি নিজ কব্জায় রাখিয়া কি করিতেছিস্? নিজের হাতে চাষ-আবাদ ত চালাইতে পারিস্ না। মজুর রাখিয়া আবাদের ব্যবসায়ে লাগিয়া যাওয়াত দেখিতেছি তোর স্বভাব নয়। আর মজুর রাখিয়া চাষ চালাইলেও লাখ লাখ বিঘা তুই কোনো দিনই আবাদ করিতে পারিবি না। অতএব তোর জমি-দারির খানিকটা দে বেচিয়া। আমরাই কিনিয়া লইতেছি। কিনিয়া ছোট্ট ছোট্ট টুক্‌রা তৈয়ারী করিয়া চাষীদের কাছে অথবা হবু-চাষীদের কাছে বেচিয়া দিতেছি।"

এ এক কিম্ভুতকিমাকার ব্যবস্থা নয় কি? না রোমাণ-হিন্দু আইন, না দেশাচারের হ্বিলেজ কমিউনিটি এই ব্যবস্থা হজম করিতে সমর্থ। গবর্ণমেণ্ট আসিয়া জমিদারকে বলিতেছে:—"তোর এত জমির দরকার নাই। দে বেচিয়া আমার কাছে।" এই দৃশ্য ব্যক্তিনিষ্ঠার আবহাওয়ায়, "স্বাধীনতা"র আবহাওয়ায় দেখা যাইতে পারে না। কেননা ব্যক্তিনিষ্ঠ

আর স্বাধীন জীব যে, সে বলিবে,—"আমার লাখ লাখ বিঘা জমি রহিয়াছে। বাপদাদাদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে অথবা নিজে খরিদ করিয়া জোৎজমা বাড়াইয়াছি। আরও বাড়াইয়া চলিব। আমার স্বাধীন খেয়ালে আমার সম্পত্তি বাড়িয়া চলিবে। তোমার ইচ্ছায় আমি কেনা-বেচা করিতে যাইব কেন? আমি জমি চষি বা না চষি, চষাই বা না চষাই, সে ত আমার খুসী। রোমাণ আইন আর হিন্দু আইন দুইই আমার স্বপক্ষে। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরামেরিকান আইন আর বৃটিশ-ভারতীয় আইনও আমার স্বপক্ষে। আমার নিজের পাঁঠা, আমি মুড়োয়ই কাটি বা ল্যাজেই কাটি তাতে অন্য কোনো লোকের মাথা ব্যথা করিবে কেন বাবা?"

গবর্ণমেণ্ট জবাব দিতেছে :—"দেখিতে পাইতেছিস্ না ভাই, দেশের লোকেরা আর চাষ-আবাদ করিতে পাইতেছে না। দিনকাল যা পড়িয়াছে তাতে প্রচুর পরিমাণ জমির মালিক না হইতে পাইলে চাষীরা গাঁ ছাড়িয়া সহরের ফ্যাক্টরিতে গিয়া ঢুকিবে। তখন চাষ-ব্যবসাটাই একদম পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইবে। সেই অবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক তরফ থেকে, আর্থিক তরফ থেকে, সামাজিক তরফ থেকে সকল দিক্ হইতেই যারপরনাই অমঙ্গলজনক। অতএব সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, দেশের জন্য তোকে তোর স্বাধীনতা কিছু কিছু বর্জ্জন করিতে হইবেই হইবে। আর যদি ভালয় ভালয় না বুঝিস্ তাহা হইলে তোর ঘাড় ভাঙ্গিয়া তোকে তোর জমিদারির কিয়দংশ আমাদের নিকট বেচাইবই বেচাইব।"

গবর্ণমেণ্টের এই নীতিই হইতেছে বিলাতী ১৯০৮ সনের আসল কথা। বিলাত এ বিষয়ে অগ্রণী নয়। বিলাতের আগে আগে গিয়াছে ডেন্মার্ক (১৮৯৯)। আর ডেন্মার্কেরও দীক্ষা-গুরু হইল জার্ম্মাণি (১৮৯০-৯১)।

জমিজমার আইনকানুনে এতদিন চল্‌ছিল রোমাণ-হিন্দু ব্যক্তিনিষ্ঠা। তাকে ভাঙ্গিয়া সমাজনিষ্ঠার, দেশনিষ্ঠার ভূমি-বিধান কায়েম করা হইতেছে জার্ম্মাণজাতির অন্যতম গৌরব। ১৮৯০-৯১ সনে জার্ম্মাণরা আর্থিক আইন-কানুনে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছে সেই বিপ্লবের যুগে দুনিয়া আজও চলিতেছে এবং আরও অনেক দিন চলিতে থাকিবে। যুবক-ভারতের সঙ্গে এই আইন-বিপ্লবের যোগাযোগ কায়েম হওয়া আবশ্যক। সেকালের মারাঠা পণ্ডিত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ১৮০৭-১২ সনের জার্ম্মাণ আইন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। সে ত মাত্র ভূমি-গোলামী নিবারণের ব্যবস্থা। ১৮৯০-৯১ সনের জার্ম্মাণ আবিষ্কার ভারতে আজও বোধ হয় একদম অজানা।

একালের সমাজ-নিষ্ঠা বনাম সেকেলে হ্বিলেজ কমিউনিটি

গবর্ণমেণ্ট বড় বড় ভূমিপতিদেরকে নিজের নিকট জমি বেচিতে বাধ্য করিতেছে। সমাজের বা দেশের সমবেত স্বার্থ হইতেছে এই ক্ষেত্রে সরকারের আসল লক্ষ্য। কথাটা শুনিবা মাত্রই মনে হইবে,—বুঝি বা আবার সেই মান্ধাতার আমলের "হ্বিলেজ কমিউনিটি" বর্ত্তমান জগতে ফিরিয়া আসিল। জিনিষটা অত সহজ নয়।

যে-যে দেশে যে-যে যুগে "হ্বিলেজ কমিউনিটি", পল্লী-সাম্য, পল্লী-স্বরাজ, বা যৌথপল্লী নামক প্রতিষ্ঠান ছিল, সেই সকল দেশে আর সেই সকল কালে মাঝে মাঝে সব জমি অথবা কোনো কোনো জমি আগা-গোড়া বিলি করা হইত। কোনো একজন লোককে বলা হইত না,—তোর জমি আমাদেরকে বেচিতেই হইবে। বিলি করা ছিল সার্ব্বজনিক দস্তুর। সেই ব্যবস্থায় কোনো জমিতে কোনো লোকের দাগ দেওয়া

ব্যক্তিত্ব-সূচক অধিকার পায়দা হইত না। সম্পত্তিটা সর্ব্বদাই পল্লীর পক্ষে যৌথ ধন। আজ এর হাতে আছে, কাল ওর হাতে যাইতেছে এই পর্য্যন্ত। তাতে কেনা-বেচার কথা উঠিতেই পারে না।

১৮৯০-৯১ সনের সমাজ-নিষ্ঠা অন্য গোত্রের চীজ। এই ক্ষেত্রে বড় ভূমিপতি, ছোট ভূমিপতি ইত্যাদি প্রভেদ প্রথম স্বীকার্য্য। দ্বিতীয় স্বীকার্য্য হইতেছে জমির কেনা-বেচা। তৃতীয় কথা জমিজমার ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার। এই ব্যবস্থায় হ্বিলেজ কমিউনিটির যুগের বিলি-প্রথা খাপই খায় না।

তবে এই সমাজ-নিষ্ঠাটা দেখা দিতেছে কোন্ কোন্ দিকে? প্রথমতঃ, কোন্ ব্যক্তি কত পরিমাণ জমির মালিক হইতে অধিকারী সেটা বলিয়া দিবার এক্তিয়ার আসিতেছে গবর্ণমেণ্টের (অর্থাৎ সমাজের বা দেশের) হাতে। দ্বিতীয়তঃ এই সূত্রে বলা যাইতে পারে যে, ভূ-সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার গবর্ণমেণ্টের শাসনে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হইতেছে। এই হিসাবে গবর্ণমেণ্টকে (অর্থাৎ দেশকে বা সমাজকে) জমিজমার "নিম-মালিক" বলিলে বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করা চলিবে না। এতে সেকেলে "যৌথ-সম্পত্তি"র চিহ্নোৎ কিছু নাই।

এর সঙ্গে আজকালকার সোশ্যালিজ্‌ম্ বা সমাজ-তন্ত্র আর কমিউনিজ্‌ম্ বা ধন-সাম্য (?) বিষয়ক বস্তু ও দর্শনের যোগাযোগ আছে বটে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই যে নিম-মালিকানা এক্তিয়ার অথবা লোকগণের ভূ-সম্পত্তিতে সরকারী শাসনের ব্যবস্থা,—তাকে হ্বিলেজ কমিউনিটির পুনরাবর্ত্তন বলিলে ভুল করা হইবে। বুঝিয়া রাখা দরকার যে, বর্ত্তমান জগতের সোশ্যালিজ্‌ম্ আর কমিউনিজ্‌ম্ জিনিষটার সঙ্গে সেকেলে ধন-সাম্যের কোন প্রকার আত্মিক সম্বন্ধ নাই। এ একদম কোরা নতুন চীজ।

আধুনিক সমাজ-নিষ্ঠার তৃতীয় কথা হইতেছে গবর্ণমেণ্টের একতিয়ার-বৃদ্ধি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইয়োরোপের লোকেরা গবর্ণমেণ্টকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিত। বলিত "হ্যাণ্ডস্ অফ্—হস্তক্ষেপ করিস্ না। লেস্‌সে ফেয়ার—লোকেরা যা করিতেছে করুক তাতে গবর্ণমেণ্টের নাক গুঁজিবার দরকার নাই।" ১৮৯০-৯১ সনের সমাজনিষ্ঠা বলিতেছে —"গবর্ণমেণ্টের সাহায্য সমাজের সকল কাজেই চাই। গবর্ণমেণ্ট উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে ভূমিহীনকে ভূমিপতি করিয়া তুলিবার কোনো উপায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।" কাজেই সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মগণ্ডী বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতবাসীরা যদি বর্ত্তমান যুগের আইনকানুন পছন্দ করে, তবে তাদেরকেও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মগণ্ডী, গবর্ণমেণ্টের একতিয়ার, গবর্ণমেণ্টের সমাজশাসন বাড়াইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

নবগঠিত চেকো-স্লোহ্বাকিয়া, জুগোস্লাহ্বিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমাণিয়া ইত্যাদি দেশে আজকাল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জমিদারী-লুট নীতি খুব জোরের সহিত চালানো হইতেছে। তবে এই লুট-কাণ্ডে জার্ম্মাণ-বিদ্বেষ খুব বেশীরূপ আছে। কেননা বলকানের এই সকল নূতন দেশে অনেক জমিদারই জার্ম্মাণজাতীয় লোক। যেন-তেন প্রকারেণ জার্ম্মাণ নরনারীর "ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন" করা নূতন রাষ্ট্রগুলার প্রাণের সাধ। তবে আইনগুলার ভিতর জার্ম্মাণ আবিষ্কারই বিরাজ করিতেছে। জার্ম্মানদের দাঁত ভাঙা হইতেছে জার্ম্মাণ নোড়ারই জোরে!

১৮৯০-৯১ সনের জার্ম্মাণ আইন-বিপ্লব

১৮৯০-৯১ সনের জার্ম্মাণ আইন কতকগুলা কিষাণ-মালিক (পেজাণ্ট প্রোপ্রাইটর) সৃষ্টি করিবার জন্য কায়েম হইয়াছিল। যতটা জমি

থাকিলে পরিবারের পক্ষে আর্থিক হিসাবে স্বাধীন জীবন যাপন করা সম্ভবপর হয়, বহুসংখ্যক চাষী পরিবারকে সেই পরিমাণ জমি দিবার ব্যবস্থা করা এই আইনের উদ্দেশ্য। "ছোট্ট কিষাণ", "ফ্যামিলি ফার্ম" (পারিবারিক আবাদ) ইত্যাদি বস্তু এই আইনের গোড়ার কথা। ভূমি-হীনকে ভূমিপতি করা অথবা নেহাৎ অল্প-পরিমাণ জমির মালিককে সঙ্গতিপন্ন "ছোট্ট কিষাণে" পরিণত করা এই ব্যবস্থার অন্তর্গত।

আইনটাকে কার্য্যে পরিণত করিবার কৌশল কিরূপ? প্রথমতঃ ধরা যাউক যেন চাষীরা গবর্ণমেণ্টকে আসিয়া বলিল,—"আমাদের 'ছোট্ট কিষাণ' বানাইয়া দাও। আমরা 'পারিবারিক আবাদ' চালাইয়া খাই।" দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট গেল বড় বড় জমিদারদের কাছে। বলিল,—"অমুক অমুক অঞ্চলে তোমার যে সব জমি আছে, সেগুলা আমাদের নিকট বেচিয়া ফেল। ন্যায্য দাম দিয়া দিতেছি।"

তৃতীয়তঃ, চাষীরা ত একপ্রকার "অগ্ধ ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" অবস্থায় রহিয়াছে। তারা কপর্দ্দকহীন, বলিতেছে—"সরকার বাহাদুর, পারিবারিক আবাদ যে কিনিতে চলিয়াছি দাম দিব কোথ্‌থেকে?" গবর্ণমেণ্ট বলিতেছে,—"কুছ্‌ পরোয়া নাই আমি তোকে টাকা ধার দিতেছি। এই টাকা হইবে তোর মূলধন। তাই দিয়া তুই জমিদারের জমিও খরিদ করিবি আর আবাদে হালবলদ বাস্তুভিটার ব্যবস্থাও করিবি।" কিষাণ বলিতেছে,—"শুধিব কি করিয়া?" গবর্ণমেণ্ট বলিতেছে—"আরে সবুর কর্‌। আমিই ত মহাজন। শুধিবার ফিকির আমিই বাত্‌লাইয়া দিব।"

চতুর্থতঃ, জমিদারবাবুর সন্দেহ পাছে তার জমিও যায় বিলি হইয়া, আর টাকাও না আসে ট্যাঁকে। বুঝি বা কেনা-বেচা সবই ফক্কিকার,—বর্ত্তমান জগতের একটা ধাপ্পাবাজি মাত্র। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছে,—

"পাগল, ব্যস্ত হইতেছিস্ কেন? জমিত কিনিয়াছি আমি তোর কাছ থেকে। চাষীরা ত কিনে নাই। দাম সুদে-আসলে আমার কাছ থেকেই পাইবি। ফী বৎসর কিছু কিছু করিয়া দিয়া যাইব। তোর টাকা মারা যাইবে না।"

দেখা যাইতেছে যে, কারবারটা আগাগোড়া গবর্ণমেণ্টের মাথাব্যথা ছাড়া আর কিছু নয়। টাকাকড়ির সকল ঝুঁকি গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে। প্রশ্ন হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এত টাকা পাইতেছে কোথায়? সরকারী খাজাঞ্চি-খানায়। আর খরচের জন্য আছে স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক। নাম "রেণ্ট-বাঙ্ক"। এই ব্যাঙ্কের মারফৎ দেদার টাকা ঢালিতে হয়।

প্রথম ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের ভিতর জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট প্রায় ২০,০০০ ছোট্ট কিষাণ গড়িয়া তুলিয়াছে। এই বাবদ প্রায় ১৮ কোটি টাকা ঢালিতে হইয়াছে। অর্থাৎ ফী বৎসর প্রায় ৫০ লাখ টাকার ঝুঁকি লইলে তবে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে চাষীদেরকে "আর্থিক স্বাধীনতা" বাঁটিয়া দেওয়া সম্ভব। আইন-বিপ্লবের এই হইল অর্থ-কথা।

ডেন্মার্কের কর্ম্ম-প্রণালী (১৮৯৯)

কথাটা বুঝাইতেছি ডেন্মার্কের কর্ম্মকৌশল বিশ্লেষণ করিয়া। জার্ম্মাণির নয় দশ বৎসর পরে ডেন্মার্ক জার্ম্মাণ আইনের এক জুড়িদার আইন কায়েম করে ১৮৯৯ সনে।

কতকগুলা কোম্পানী খাড়া হইল। এগুলাকে ব্যাঙ্ক বলাই উচিত। গবর্ণমেণ্ট দাঁড়াইল এই সবের মুরুব্বি। এরা জমিদারী কিনিয়া লইতে লাগিল আর "ছোট্ট টুক্‌রা"র ব্যবস্থা করিতে থাকিল। এই কোম্পানী-গুলার পুঁজিই আমাদের সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য করা উচিত।

তারপর হইতেছে "পারিবারিক আবাদ"গুলা বেচিবার পালা। চাষীরা

আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দিতেছে তাদেরকে ধার। কত? জমির দামের শতকরা ৯০ অংশ। অর্থাৎ হাজার টাকার জমি কিনিতে যে চায় তার যদি নিজের তহবিলে মাত্র ১০০৲ টাকাও থাকে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তার অবশিষ্ট ৯০০৲ টাকার জন্য জিম্মা লইতেছে। চাষীরা গবর্ণমেণ্টকে সুদ দিতেছে কত হারে? মাত্র শতকরা ৩৲ হিসাবে (প্রথম ৫ বৎসর ধরিয়া এই হার) পরে শতকরা ৪৲ দেওয়া হয়। তার ১৲ টাকা আবার যায় ধার শুধিবার খাতে। জমিটা কিছুকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের খাশ সম্পত্তি বিবেচিত হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে চাষীরা দামটা শোধ করিয়া দেয় সেই মুহূর্ত্তে তারাই আসল মালিক।

ডেন্মার্কের লোকজন ৪৫ বিঘা জমিকে "ছোট্ট" বা "পারিবারিক" আবাদ সমঝিতে অভ্যস্ত। এই পরিমাণ জমিই গড়ে প্রায় প্রত্যেক টুকরার হিস্যায় পড়িয়াছে। ২৩।২৪ বৎসরের ভিতর ডেন্মার্কে প্রায় ১০,০০০ নতুন "ছোট্ট কিষাণ" গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙালাদেশের দুই তিন জেলায় লাখ ত্রিশেক লোকের বাস। ডেন্মার্কের লোকসংখ্যা ঐ পর্য্যন্ত। তাতে যদি বিশ-পঁচিশ বৎসরের ভিতর হাজার দশেক স্বাধীন কিষাণ-মালিক সৃষ্টি করা যায় তার আর্থিক ও সামাজিক কিম্মৎ সহজেই অনুমেয়। খরচ পড়িয়াছে প্রায় ৪৷৷০ কোটি টাকা।

জমিদার-দলন-নীতির এক অধ্যায় (১৯১৯)

ভূমি-বিপ্লবটা সাধিত হইতেছে আইনের জোরে বটে। বোল-শেভিকদের লুটপাট মারকাট ইত্যাদি হাঙ্গামা দেখা যাইতেছে না সত্য। কিন্তু নেহাৎ গোলাপ-জলের পিচকারি দিয়া জমিজমার ভাগ-বাটোয়ারা চালানো হইতেছে এরূপ বুঝিবার কারণও নাই।

গবর্ণমেণ্ট জমিদারদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাকে সোজা

কথায় বলা উচিত অত্যাচার। প্রথম নম্বর,—জমিদারেরা নিজ নিজ জমি যখন-তখন বেচিতে বাধ্য হইতেছে। দ্বিতীয় নম্বর,—জমির আসল, ন্যায্য দাম প্রায়ই তারা পায় না। তৃতীয় নম্বর,—যে দামটা তাদের প্রাপ্য তাও আবার জুটে হোমিওপ্যাথিক "ডোজে"। বার্ষিক "অ্যান্নুয়িটি"র বা সুদের আকারে টাকাটা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাদের ট্যাকে আসিয়া পৌঁছে। বলা বাহুল্য, টাকাটা উসুল হইতে লাগে বহুকাল। চতুর্থ নম্বর,—কোনো কোনো ক্ষেত্রে, জমিদারদের কোনো কোনো জমি এক-প্রকার বেদখলই করা হইয়াছে। এই দফাটা পূরাপুরি বোলশেভিক কাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। তবে দাম দেওয়া হয়। এই যা। নয়া নয়া কিষাণ-মালিক। ছোট্ট চাষীর নজরে "জমিদারি-কেনাবেচার কোম্পানী" আর "রেণ্ট-বাঙ্ক"গুলা লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান সন্দেহ নাই। কিন্তু জমিদারের পক্ষে এইসব চক্ষুঃশূল।

ডেন্মার্কের একপ্রকার জমিদারি একদম তুলিয়াই দেওয়া হইয়াছে। তাতে বসানো হইয়াছে ২,০০০ কিষাণ-মালিক। প্রত্যেকে পাইয়াছে ৪৪।৪৫ বিঘা জমি। এই জমি ছিল গির্জ্জার সম্পত্তি (নাম "গ্লীব")।

আর একপ্রকার জমিদারির বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের নজর খুব কড়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়োরোপের সকল দেশেই একশ্রেণীর নয়া ঢঙের জমিদার দেখা দেয়। এরা আসলে কারখানার মালিক, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, ব্যবসা সঙ্ঘের সভাপতি ইত্যাদি জাতীয় লাখপতি বা ক্রোরপতি। অন্যান্য নবাব জমিদারদের মতন এদের বাতিক চাগিল যে এরাও ভূমিপতি বনিয়া যাইবে। যোজন যোজন বিস্তৃত জমিদারি কিনিয়া এই ধনী মহাজনেরা "বাগান-বাড়ী" কায়েম করিতে থাকিল। সমাজের চোখে, দেশের চোখে, রাষ্ট্রের চোখে এই জমিদারিগুলা আগাগোড়া বিলাস-সামগ্রী, ভূমি-শক্তির অপব্যয় মাত্র। এইখানে একটা পারিভাষিক

শব্দ ব্যবহার করিতেছি। এই ধরণের জমিদারিকে "ফিডাই-কোমিস" বলে।

ডেন্মার্কের গবর্ণমেণ্ট "ফিডাই কোমিস" ভাঙ্গিয়া ৪,০০০ নতুন কিষাণ-মালিক গড়িয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেক নয়া "পারিবারিক আবাদের" হিস্সায়ই ৪৪।৪৫ বিঘার বরাদ্দ।

এই যে দুরকম জমিদারি লোপ করার কথা বলা হইল তাতেও গবর্ণমেণ্ট জমিদারকে পয়সা দিয়াছে। একদম বিনা পয়সায় কোনো কারবার চলিতেছে না। তবে মনে রাখা আবশ্যক এই যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে জমিদারির "কিয়দংশ মাত্র" গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া লইয়াছে। আর এই দুই শ্রেণীর জমিদারি কিনিয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট বলিতেছে,—"ব্যস্। এর পরে এই ধরণের জমিদারি আমাদের দেশে আর থাকিবে না। এই ধরণের স্বত্বাধিকার এখানে খতম হইল।"

সকল তরফ হইতেই জমিদারদের স্বত্ব খর্ব্ব করা হইতেছে। প্রথমতঃ, কতটা জমি কার হাতে থাকিবে তার বিচারক গবর্ণমেণ্ট। জমিদার নিজ খেয়াল অনুসারে জমিদারি বাড়াইতে কমাইতে পারিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, জমিদার নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জমিদারি বেচিতে বাধ্য। কাকে বেচিবে, কতটা বেচিবে এই সব কথায় জমিদার আর স্বরাজী নয়। "ট্র্যান্স্ফার অব্ প্রপার্টি" অর্থাৎ সম্পত্তি-হস্তান্তর বিষয়ে জমিদারের স্বাধীনতা খাটো হইয়া যাইতেছে। তৃতীয়তঃ, বেচা জমির দাম নির্দ্ধারণ আর দাম উসুল সম্বন্ধেও জমিদার একপ্রকার এক্তিয়ার-হীন। বুঝিতে হইবে যে, "কণ্ট্রাক্ট" বা চুক্তির বাজারে জমিদারের ক্ষমতা কমিয়া আসিতেছে। আর চতুর্থতঃ, কতকগুলা বিশিষ্ট রকমের স্বত্বাধিকার বিলকুল লোপাট হইতেছে। দেশের আইন তা আর মানিতেছেই না।

১৮৯০ সনের আবহাওয়ায়,—বিস্মার্কের আমলে এই জমিদার-দলন নীতি জার্ম্মাণিতে সুরু হয়। স্বত্ববিধানের ব্যক্তিনিষ্ঠা, ধনদৌলতে স্বাধীনতা, জমিজমার স্বেচ্ছাচার—এককথায় রোমাণ-হিন্দু আইনের কতকগুলা বড় বড় খুঁটার মুণ্ডপাত সাধিত হয়। তারপর হইতে নয়া ঢঙের ভূমিবিধান ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ১৯১৯ সনে যখন,—লড়াইয়ের পর,—জার্ম্মাণ গণতন্ত্র (রিপাব্লিক) কায়েম হইল তখন এই নববিধানের এক চরম মূর্ত্তি দেখা গিয়াছে।

প্রথম কথা.— ফিডাই কোমিস"—প্রথাকে সমূলে উৎপাটিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা অতি ঘোরতর। শুনিলেই আঁৎকাইয়া উঠিতে হয় ৮৭৫ বিঘার চেয়ে বেশী জমি যে-লোকের আছে তাকে তার অতিরিক্ত জমির তিন ভাগের এক ভাগ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়-প্রাপ্ত জমি-কেনা-বেচার কোম্পানীর নিকট বেচিতে বাধ্য করা হইয়াছে। আইনটা সম্প্রতি কোনো কোনো জেলার ভিতর গণ্ডীবদ্ধ। কিন্তু ব্যাপারটা কি গুরুতর বুঝুন। এই আইনই ডেন্মার্কের মারফৎ ইংরেজও মক্স করিতেছে।

১৯২৬ সনের যুবক বাঙ্লা আজ ১৯১৯ সনের জার্ম্মাণ আইনটা বুঝিতে সমর্থ বা অধিকারী কি? আমরা যে এখনো ১৮৯০-৯১ সনের পরীক্ষায়ই পাশ হই নাই!

ক্ষুদ্রীকরণের আর্থিক ক্ষতি

আইনের জোরে না হয় "ছোট্ট কিষাণ" বা "পারিবারিক আবাদ" গড়িয়া দেওয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, ইংরেজদের মাপে ১৭৫।২৫০ বিঘা হইতেছে "ছোট্ট" আবাদের বহর। জার্ম্মাণরা ১২০ বিঘা আন্দাজ দিয়া থাকে। আর ডেন্মার্কের নজর বেশ খাটো। বিঘা ৪৫এর বেশী এদেশের গবর্ণমেণ্ট কাউকে দেয় না। ভারতবর্ষে যদি কখনো হাজার

হাজার "কিষাণ-মালিক" বা "ছোট্ট-কিষাণ" গড়িয়া তুলিবার মতিগতি দেখা দেয়, তাহা হলে আমাদের কোন্ প্রদেশে কত বিঘা জমিকে "পারিবারিক আবাদের" ভিত্তি বিবেচনা করা উচিত অঙ্ক কষিয়া খতাইয়া দেখিতে হইবে। সম্প্রতি সেকথা বলিতেছি না। জমিজমার আইন-কানুনের ধারা বিশ্লেষণ করা আর তার ভিতরকার ভাবার্থটা নিঙ্‌ড়াইয়া বাহির করা হইতেছে এ যাত্রায় মতলব।

৪৫, ১২০ অথবা ২৫০ বিঘা জমির মালিক বনিয়া যাওয়া বেশ সোজা কথা। গবর্ণমেণ্ট জমি কিনিতে টাকা ধার দিতেছে। আবাদ চালাইবার জন্যও গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। চাষীদের মা-বাপই যখন গবর্ণমেণ্ট তখন আর ভাবনা কি? আমরা ভারতে বসিয়া ঠিক এইরূপই মনে করিতেছি। আর ইয়োরোপের নরনারীও এইরূপই মনে করিত।

কিন্তু তবুও ভাবনা আছে। সমস্যা বেশ জটিল। বিপদটা কোথায়? আবার রোমাণ-হিন্দু ভূমি-বিধানের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। "আমার পাঁঠা আমি ল্যাজেই কাটি আর মুড়োয়ই কাটি—তাতে তোমার কি আসে যায় বাবা?"—এই নীতি হইতেছে যুস্তিনিয়ানের সংহিতায় আসল কথা। এই নীতি নেপোলিয়ানি-আইনের আসল কথা। এই নীতি আবার মনু-মিতাক্ষরারও আসল কথা।

সম্প্রতি সমস্যাটা "উত্তরাধিকার" ঘটিত। হাজার দেড়-দুই বৎসর ধরিয়া, "সভ্য" দুনিয়ায়—যথা ইয়োরোপে, ভারতে আর অন্যান্য দেশে,—যে আইন-কানুন চলিতেছে তাতে "ভিলেজ কমিউনিটি"র যৌথ সম্পত্তি, যৌথ স্বত্ব, যৌথ উত্তরাধিকার নামক বস্তু দেখা যায় না। দেখা যায়, সম্পত্তি-বিভাগ সম্বন্ধে "মোটের উপর"—অর্থাৎ একাধিক ব্যতিরেক সত্ত্বেও, "সাধারণতঃ"—মালিক মশায়ের স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতাটাও

অনেক জায়গায় এমন আকারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে—কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে,—যে সন্তানেরা প্রত্যেকেই বাপের সম্পত্তির সমান সমান বখরা পায়। অর্থাৎ ৪৫ বিঘাই হউক, ১২০ বিঘাই হউক বা ১৭৫।২৫০ বিঘাই হউক,—এক পুরুষের পর এই "পারিবারিক আবাদ" টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া যাইতে বাধ্য। রোমাণ আর হিন্দু আইন এই টুক্‌রা-টুক্‌রা হওয়া বা অংশীকরণ (ফ্র্যাগ্‌মেণ্টেশুন) নিবারণ করিতে অসমর্থ।

আবার ইয়োরোপে ভারতে সাম্য, সাদৃশ্য বা ঐক্য। জমিজমা যে প্রত্যেক পুরুষেই "ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতরং" হইতেছে এটা একমাত্র "ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার"ই সুগুণ বা দুর্গুণ নয়। ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশই অল্প বিস্তর,—বিলাত বাদে—এই আধ্যাত্মিকতার অতএব তার সুগুণ-দুর্গুণের অধিকারী। দুনিয়ার মুসলমান কানুনও এই অংশীকরণকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। এই আইনে মেয়েরাও হিস্সা পায়।

খাঁটি আইনের হিসাবে কোনো সম্পত্তি যখন-তখন যাকে-তাকে দিয়া যাইবার ক্ষমতাটা বোধ হয় ভালই। তাহা ছাড়া সম্পত্তিটার কোনো কোনো অংশ বেচিবার অধিকার থাকাও খাঁটি আইনের হিসাবে নিন্দনীয় নয়। তারপর সকল পুত্রকন্যার কপালে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সমানভাবে ঘটিলেও আইনটাকে নেহাৎ খারাপ বিবেচনা করা উচিত কিনা সন্দেহ। ব্যক্তিনিষ্ঠ, স্বাধীনতাপ্রিয় নরনারীর চোখে এই সকল আইন মোটের উপর প্রশংসা-যোগ্য বিবেচিত হইবার কথা।

কিন্তু উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে আইনের স্বাধীনতা আর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ছাড়াও মানুষের জীবন-নিয়ন্তা রূপে আর একটা জবর শক্তি দেখা দিয়াছে। আর্থিক উন্নতির পক্ষে কোন্ ব্যবস্থাটা ভাল, আর কোন্ ব্যবস্থাটা খারাপ, অতএব তার জন্য কিরূপ আইন, কিরূপ রাষ্ট্র থাকা উচিত তার চিন্তা "শিল্প-বিপ্লবের" যুগে এক বড় ও গভীর চিন্ত

দেখিতে পাইতেছি যে, ডেন্মার্কে ৪৫ বিঘা জমি না থাকিলে, কোনো "পাঁচমুখী" বা "পঞ্চানন" পরিবার ভাতকাপড় জুটাইতে অসমর্থ। জার্মাণিতে "পঞ্চাননে"র জন্য জরুরি ১২০ বিঘা। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে পঞ্চাননগুলার জন্য নানাপ্রকার আবাদের বহর। অতএব যদি ডেন্মার্কে আইনগত স্বাধীনতা আর রাষ্ট্রগত স্বাধীনতার দোহাই দিয়া লোকেরা বলে,—"আমার ৪৫ বিঘা জমি আমি আমার নয় সন্তানকে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিয়া যাইব। প্রত্যেকে পাইবে ৫ বিঘা করিয়া" —তাহা হইলে এই নয় সন্তানের আর্থিক অবস্থা দাঁড়াইবে কিরূপ? প্রত্যেকেই পাঁচ পাঁচ বিঘার দৌলতে এক একটি "পঞ্চানন-পরিবার" পুষিতে পারিবে কি? পারিবে না যে প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কেননা প্রত্যেকে পঞ্চাননের জন্য চাই ৪৫ বিঘা। অতএব সুবুদ্ধির কথা হইতেছে,—আর্থিক স্বার্থের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ স্বাধীনতা খর্ব্ব করুক। এই স্বাধীনতা-হ্রাসের পরিচয় আবার একালের উত্তরাধিকার-আইনে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

উত্তরাধিকারের আইনে যুগান্তর (১৮৮২)

আবার জার্ম্মাণরা আইন-সংস্কারে অগ্রণী। জার্ম্মাণির আইন-বিশেষজ্ঞেরা নয়া ঢঙের চিন্তা ও দর্শন আইনের আখড়ায় আনিয়া হাজির করিয়াছে। এরা বলিতেছে,—আইন দ্বিবিধ। একরকম আইন হইতেছে ব্যক্তি-বিষয়ক। দ্বিতীয় রকম আইন হইতেছে বস্তু-বিষয়ক। জমিজমার আইনে এই দুই রকম আইনই আছে। জমির মালিক তার সম্পত্তি সম্বন্ধে কি করিবে না করিবে এসব কথা হইতেছে ব্যক্তি-বিষয়ক আইনের অন্তর্গত। কিন্তু যে জমিটা সম্বন্ধে মালিকের একতিয়ার সেই মিটারও একটা সত্তা, একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। জমির এই যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তার

সম্বন্ধে আইনের বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। ব্যক্তিগত আইন বলিতেছে,—"আমার জমি। আমি এটাকে টুকরা করিব।" কিন্তু সেই সময়ে বস্তুগত আইন বলিতেছে—"হাঁ তুমি জমিটা টুকরা করিতে অধিকারী বটে। কিন্তু জমিটা নিজে এই টুকরা-করা সহিবে না। টুকরা করিতে গেলে এই জমির জমিত্ব বা জমিশক্তি থাকিবে না। জমির ইজ্জৎ বাঁচানোও আইনের কর্ত্তব্য।"

এই ধরণের "জাখেন-রেথ্‌ট্" (অর্থাৎ বস্তুগত আইন) বনাম "প্যর্জোনেন-রেথ্‌ট্" (অর্থাৎ ব্যক্তিগত আইন) বিষয়ক তর্কবিতর্ক জার্ম্মাণিতে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিস্তর চলিয়াছে। ১৮৯০ সনের জমিদারি-দলননীতি সুরু হইবার পূর্ব্বেই জার্ম্মাণরা বস্তু-গত আইনের,—জমির ইজ্জৎ রক্ষার জন্য কানুনের,—ব্যবস্থা করিয়াছিল। ১৮৮২ সনের কথা বলিতেছি। তখন আইনের দুনিয়ায় একটা বিপুল যুগান্তর হইয়া গিয়াছে। ভারতের হিন্দু-মুসলমান আজ ১৯২৬ সনে জমির ক্ষুদ্রীকরণ বা ফ্র্যাগ্‌মেণ্টেশ্যন নিবারণ করা কখনো সম্ভবপর কিনা ভাবিয়া আকুল। ঠিক ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণরা দুনিয়ার সকল দেশের দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য যে দাওয়াইটা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছে, তার খবর হয়ত আমরা একদম রাখিই না।

আইনটার মতলব হইতেছে জমিকে সটান পূরাপূরি এক হাত হইতে আর এক হাতে বদলি করা। উত্তরাধিকার জমির কোনো অংশ-বিশেষে আসিতে পাইবে না। উত্তরাধিকারী পাইবে সম্পূর্ণ জমি। মামুলি প্রচলিত আইন বলিতেছে,—বাপ তার চার ছেলে মেয়েকে ১২০ বিঘা জমি সমান চার অংশে বাঁটিয়া দিতে বাধ্য। ১৮৮২ সনের আইন বলিতেছে,—"সমান চার ভাগ হউক, আপত্তি নাই। কিন্তু জমিকে চার টুকরা করিতে পাইবে না। অর্থাৎ পুত্রকন্যার প্রত্যেককেই জমির

উত্তরাধিকারী হইতে দিব না। জমি থাকিবে অখণ্ড। উত্তরাধিকারী হইবে একজন। সে জ্যেষ্ঠ পুত্রই হউক বা চতুর্থ কন্যাই হউক। তাতে কিছু আসে যায় না।”

ব্যবস্থাটা নিম্নরূপ। ছেলে বা মেয়ে উত্তরাধিকারী হইল। হইয়া সে গোটা সম্পত্তির দাম যাচাই করাইয়া লয়। ধরা যাউক, দাম হইল ১,০০০৲। অতএব প্রত্যেকের হিস্যায় পড়িল ২৫০৲ টাকা করিয়া। উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারিণী বলিবে, “আমি তোদের তিনজনকে ২৫০৲ টাকা করিয়া ৭৫০৲ দিয়া দিতেছি। এখন হইতে হাজার টাকার সম্পত্তি ষোল আনা আমার।” তারপর থেকে ঐ তিন ভাই বোন জমিহীন। প্রত্যেকে ২৫০৲ টাকার পুঁজি লইয়া “চরিয়া খায়।”

আইনটার নাম “আন্‌-এর্বেন্‌স্‌-রেখ্‌ট্‌” (বাছাই-করা উত্তরাধিকারের আইন)। এক কথায় মহাভারত সারিতেছি। এসব বিষয়ে বাঙালীকে তন্ন তন্ন করিয়া অনেক-কিছু ভবিষ্যতে আলোচনা করিতে হইবে। এখন শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে ১৮৮২ সনের জার্ম্মাণ আইনের ব্যবস্থাটা জমিহীন সন্তানদের সুখদুঃখ সম্বন্ধে একদম নির্ব্বিকার নয়। উত্তরাধিকারী তার জমিহীন ভাইবোনকে “আপদ বিপদের সময়” ঘরবাড়ী দিতে আইনতঃ বাধ্য। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া, এই দিকে হামেশা আইন-সংস্কার চলিতেছে। কোনো একটা আইন খাড়া করিয়া, জার্ম্মাণরা নাকে তেল দিয়া ঘুমায় না। সর্ব্বদাই সু-কুর আলোচনা আর ওলট-পালটের ব্যবস্থা চলিতে থাকে।

যাক্। ১৮৯০-৯১ সনের জমিদারি-দলন বিষয়ক আর কিষাণ-মালিক সৃষ্টি বিষয়ক আইনটা যেই কায়েম হইল, তখনি অমনি ১৮৮২ সনের বাছাই করা উত্তরাধিকারের আইনটা চমৎকার কাজে লাগিয়া গেল। ১৮৯০-৯১ সনের আইনটা একদিকে বলিতেছে,—“জমিদার, তোকে ঠুঁটো

করিয়া দিতেছি জমিজমার কেনাবেচা ইত্যাদি সম্বন্ধে।" ঠিক একই সঙ্গে অপরদিকে এই আইনটা বলিতেছে—"কিষাণ, মনে রাখিস্ ১৮৮২ সনের উত্তরাধিকার-আইন। জমিটা কোনো দিনই টুক্‌রা করিতে পারিবি না।"

একটা কথা,—কিছু অবান্তর হইলেও,—এখানে বলিয়া রাখা ভাল। যে-লোকটা বাছাই-করা উত্তরাধিকারী হইতেছে, সে মূলধন পায় কোথায়? সে তার ভাইবোনকে টাকা দিয়া গোটা সম্পত্তিটা কিনিয়া লইতেছে কি করিয়া? সাধারণতঃ তার পুঁজি জুটে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে। ব্যাঙ্ক তার জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা দেয়। তাই দিয়া সে জীবন সুরু করে।

অপর দিকে, জমিহীনেরা "চরিয়া খাইতেছে" গিয়া কোন্ মুল্লুকে? কারখানায়, ফ্যাক্টরিতে, রেলওয়েতে, খাদে অথবা কোনো বড় জমিওয়ালার ক্ষেত্রে। দেশের আর্থিক অবস্থা এইরূপ নানা দিকে পরিপুষ্ট বলিয়াই ভিটেমাটি-ছাড়া লোকগুলার কোনো দুর্গতি ঘটে না।

চাষীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

জমিদারের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা ১৮৯০—৯১ সনের আইনের এক বিশেষত্ব সন্দেহ নাই। কিন্তু চাষীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপও এই আইনে কম হইতেছে না। কিষাণ-মালিক গড়িয়া তুলিবার জন্য গবর্মেণ্ট জমিদারদেরকে অনেক বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়া ছাড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া চাষীদেরকে স্বর্গে তোলাও আইনের মতলব নয়। নানা উপায়ে চাষীদের হাত পা বাঁধিয়া রাখা এই আইনের প্রয়াস।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, ১৮৮২ সনের উত্তরাধিকার-আইনটা মানিয়া চলিতে প্রত্যেক কিষাণ বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ চাষ-আবাদ সম্বন্ধে প্রত্যেক কিষাণ-মালিক কতকগুলা নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য। তৃতীয়তঃ,

জমিটা বিক্রী করা সম্ভব বটে। কিন্তু কড়াক্কড়ি অনেক। চতুর্থতঃ, ভাগাভাগি ত নিষিদ্ধ বটেই। এমন কি, অন্য কোনো জমির সঙ্গে নিজ জমি জুড়িয়া দেওয়াও নিষিদ্ধ। কোনো প্রকারেই আবাদের বহর বৃদ্ধি চলিবে না। পঞ্চমতঃ, জমিটার কোনো অংশ কিষাণ কাহাকেও ভাড়া দিতে পারিবে না। ষষ্ঠতঃ, আবাদের উপর ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিয়া কোন লোককে ভাড়া দেওয়াও বিলকুল আইন-বিরুদ্ধ। এই ধরণের আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাঁধা হইয়া নয়া নয়া কিষাণ-মালিক আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে।

বুঝিতে হইবে যে, বোলশেভিকরা একালে রুশিয়ায় যা-কিছু করিতেছে, তার অনেক কিছুই সোশ্যালিষ্ট-সূদন, কার্ল মার্কসের শত্রু, জবরদস্ত বিস্মার্ক স্বয়ং সুরু করিয়া গিয়াছেন। এই হিসাবে বোলশেভিকরা আইনের চোখে হাতী-ঘোড়া কিছু করে নাই। তবে এদের জমিদারী-লুটটা একদম নির্লজ্জ বেহায়ার মতন বিনা পয়সায় জমিদার-খেদানো। এইখানেই যা-কিছু বাড়াবাড়ি। জার্ম্মাণ-ইংরেজরা জমিদারদেরকে "মূল্য" দিয়া কথা কয়। তবে মূল্যটা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারদের মন-মাফিক হয় না। কিন্তু আইনের "তত্ত্বে" বিস্মার্ক আর লেনিন যে "অনেকটা" এক গোত্রেরই লোক একথা মাঝে মাঝে মনে রাখা ভাল। দুইয়েরই প্রাণের কথা হইতেছে, জমিটার উপর সরকারের তাঁব চালানো যখন যেমন দরকার।

ভূমি-ভারত কোথায়?

নানা যুগে ভারতে আর ইয়োরোপে সাম্য দেখিতে পাইতেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপ আমাদেরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই

জন্যই কি স্থিতিশীল ভারতকে "আধ্যাত্মিক" আর "জগদ্‌গুরু" বলিয়া পূজা করিব ।

ইয়োরোপের ১৯১৯ সন, ১৯০৮ সন, ১৮৯৯ সন, ১৮৯০ সন, ১৮৮২ সন—সবই আমাদের অভিজ্ঞতায়, আমাদের কর্ম্মজীবনে, ভূমি-ভারতের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে, হিন্দু-মুসলমানের আইন-কানুনে অজ্ঞাত। অথচ এই সকল সনের বস্তু সমূহ ভারতের প্রদেশে প্রদেশে যারপর নাই আবশ্যক। ইয়োরোপীয়ানরা ভারতীয় দুর্দ্দশায় পড়িয়াই এই সকল দাওয়াই কায়েম করিয়াছে। কিন্তু আহাম্মুকের মতন আমরা আজও আওড়াইয়া যাইতেছি যে,—পাশ্চাত্য মুল্লুক জাহান্নমে চলিয়াছে, তাদের নরনারীকে বাঁচাইয়া তুলিবে ভারতের নরনারী, এশিয়ার আধ্যাত্মিকতা। ইহার নাম "ছোট মুখে বড় কথা" নয় কি? মুখ সামলাইয়া আমাদের কথা বলা উচিত নয় কি?

আজ ১৯২৬ সন। একশ' বৎসরেরও আগে, ১৮২১ সনে,—জার্ম্মাণিতে একটা ভূমি-কানুন জারি হইয়াছিল। এমন কি এত পুরাণো আইনটাও এখন পর্য্যন্ত ভারতে আমরা আমদানি করিতে পারি নাই।

তখনকার দিনে পাঁচ সাত টুক্‌রা জমির কোনো এক মালিককে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ সাত জায়গায় জমি তদ্‌বির ও আবাদ করিতে হইত। কোনো এক জায়গায় পাঁচ সাত টুকরা একত্র ভাবে অনেক জার্ম্মাণ চাষীর ছিল না। বাঙালা দেশে আজও এই সেকেলে জার্ম্মাণ দুরবস্থা চলিতেছে। ১৮২১ সনের আইনে জার্ম্মাণরা তাহা দূর করিয়াছে। আমরা এখনো ভাবিতেছি, ইয়োরোপীয়ানদের উপর আমাদের গুরুগিরি কায়েম হইতে আর কত দেরি?

বস্তুনিষ্ঠার যুক্তিশাস্ত্র বলিতেছে, ভারত দুনিয়ার মাপকাঠিতে,—কম সে কম জমিজমার আইন সম্বন্ধে,—আজ ৩০।৪০।১০০ বৎসর

পশ্চাতে। এই যুগ-পরম্পরাটা তাড়াতাড়ি টপ্‌কিয়া পার হইবার ক্ষমতা, —এই ক্রমবিকাশটা রাতারাতি গুলিয়া খাইয়া আত্মপুষ্টি সাধন করিবার শক্তি যদি যুবক-ভারতের থাকে, তাহা হইলে দুনিয়ার লোক বলিবে—"বাপ্‌ কা বেটা!" ভারতীয় আর্থিক উন্নতির নানা ক্ষেত্রে চাই আজ একসঙ্গে বহুসংখ্যক চোখকান-খোলা, তথ্য-নিষ্ঠ, ইতিহাস-দক্ষ বাপ্‌কা বেটা।

মজুর-দুনিয়ায় নবীন স্বরাজ *

আমাদের আলোচনা করা হইতেছে আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ—ভারত, ইতালি, ফ্রান্স, জার্ম্মাণির কথা। আর্থিক উন্নতির এক মস্ত বড় খুঁটা টাকাকড়ি। লোকেরা নিজ নিজ পকেট হইতে টাকা পয়সা দিয়া কোনও এক কেন্দ্রে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। এই সব সঙ্ঘে টাকা পয়সার তোড়া শক্তির মানরূপে দেখা দেয়। যে শক্তি-কেন্দ্রে টাকা পয়সা জমা হয় সেই কেন্দ্রের নাম ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক গঠনের কথা তাই আর্থিক উন্নতির এক প্রধান কথা।

তারপর রক্তমাংসের কথা। কেমন করিয়া দেশের প্রত্যেক নরনারী কর্ম্মক্ষম, কার্য্যদক্ষ হইতে পারে, তাহার কথাও আর্থিক উন্নতিরই এক গোড়ার কথা। আর্থিক উন্নতির আর একটা মস্ত বড় খুঁটা হইতেছে চাষী, চাষ-আবাদ আর জমিজমা। পৃথিবীর যে কোন দেশেই আমরা যাই না কেন সর্ব্বত্রই চাষীর সংখ্যা খুব বেশী,—কোন জায়গায় সমগ্র দেশের লোক-সংখ্যার আধা-আধি, কোথায়ও বা তিনভাগের এক ভাগ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, ডেন্‌মার্ক, জার্ম্মাণি, ইতালি, বলকান, সকল অঞ্চলেই চাষীর আর্থিক অবস্থা দেখিয়া দেশের আর্থিক অবস্থা বুঝা যায়। চাষীর উন্নতি ও দেশের উন্নতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় এক কথা। জমিজমার বিধি-ব্যবস্থা, চাষী-সম্পর্কিত আইন-কানুন ইত্যাদির আলোচনা, আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ আলোচনারই বিশেষ অঙ্গ।

---

* জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম (ফেব্রুয়ারী ১৯২৩) বক্তৃতা অনুসারে লেখক—তাহেরউদ্দিন আহমদ।

আর্থিক জগতের স্তর-বিভাগ

আজকার কথা হইতেছে মজুর-দুনিয়ায় নবীন স্বরাজ। এতদিন যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে আছে মোটের উপর একটা ধূয়া। যে সব দেশের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অনেক পেছনে পড়িয়া আছি আমরা। যদিও আজ আমরা ১৯২৬ সনেই বাঁচিয়া আছি বটে, কিন্তু ১৯২৬ কি চিজ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। দুনিয়ার জমি-জমার আইন-কানুন এমন বদলিয়া যাইতেছে যে, সে সব বিষয়ে কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আমি আপনাদিগকে ১৮২১-১৮৮২-১৮৯৪-১৯১৯ এই সব তারিখের কথা বলিয়াছি। এই সব তারিখগুলি চাষীর আর্থিক অবস্থার ইতিহাসের সহিত অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাহাদের ভাত-কাপড়, তাহাদের খাওয়াপরা, তাহাদের ধনদৌলত, তাহাদের স্বাধীনতা, তাহাদের ব্যক্তিত্ব—যে দিকেই তাকাই না কেন, মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক উন্নতির সব দিক্‌ দিয়াই এই সব তারিখ-গুলি অত্যন্ত মূল্যবান। আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে কতকগুলি তারিখ মুখস্থ করি, ১৬৮৮-১৭৮৯-১৮১৫-১৮৫৭-১৯০৫ ইত্যাদি। এই তারিখগুলির দাম তাঁহাদের কাছে খুব বেশী, যাঁহারা "আন্তর্জ্জাতিক" অর্থাৎ পররাষ্ট্র-বিষয়ক বড় বড় কথা লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকেন। ঠিক সেইরূপই এই ১৮২১—১৯১৯ তারিখগুলি আর্থিক উন্নতির ইতিহাসে যারপরনাই দামী। জার্ম্মাণি বা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের যে যে তারিখের কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি, সেই সব তারিখগুলি চাষীদের আর্থিক জীবনের সহিত অতি নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট।

কিন্তু ইহার সকল তারিখের মর্ম্ম ভারতবাসীর মগজে এখন বসে কি? আমাদের তুলনায় ১৯২৬ সন এত দূরে অবস্থিত—যদিও কাল হিসাবে

নিকটে, কিন্তু মাল হিসাবে এত উপরে ও দূরে অবস্থিত যে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করাও কঠিন। চাষীর জমিজমা-সম্পর্কিত আইন-কানুন আমাদের দেশে আগেও যেমন ছিল এখনও প্রায় তেম্নি আছে। তবে জমিজমা কাণ্ডে দুনিয়ায় কত কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কত বিপ্লব-বিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে—এসবই আমরা বাহিরে থাকিয়াও কিছু কিছু বুঝিতে পারি না এমন নয়। কিন্তু মজুর-দুনিয়ায় নবীন স্বরাজ যে কি বস্তু তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের একদম নাই।

বুঝা কাহাকে বলে?

আপনারা বলিবেন, "তুই তো বড় আহাম্মুক। যুবক-ভারত যে কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে। ত্রিভুবনে এমন কিছু নাই যাহা তাহার মগজের বাহিরে। আমাদের ভগ্নীপতির ঠাকুরদাদার পিসতুত ভাইয়ের জ্যাঠারাই তো উপনিষদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই জাত কিনা এমন একটা খেলো কথা বুঝিতে পারে না? ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা যারা তর্কের খাঁড়ায় কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া আলোচনা করিতে পারিয়াছে তারা কি না এই সামান্য জিনিষটা বুঝিতে পারে না!" এর উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, বাস্তবিকই আমরা মজুর-স্বরাজ বুঝি না। জিনিষটা বেশ কিছু কঠিন। প্রথম কথা হইতেছে—আজকালকার দিনেই হউক বা ঠাকুর-দাদাদের আমলেই হউক, আমাদের দেশের লোকেরা ব্রহ্ম বস্তুটা কতটুকু বুঝিয়াছেন? কেউ কেউ হয়ত জিনিষটা বুঝিতেন; কিন্তু অনেকেই "শব্দ" কপ্চাইতেন মাত্র। অধিকাংশ লোকেই কেবল বোলটা লইয়া আলোচনা করিতেন, তর্ক করিতেন। বুলিটা যে মালের প্রতিশব্দ সেই মালটার দিকে নজর ফেলা অনেকের ক্ষমতায় কুলায় নাই। আর এখনও অবস্থা তদ্রূপ।

"বস্তু"টা হাতে হাতে পাকড়াও করিয়া গায়ে ঠুকিবার ক্ষমতা তাঁদের অনেকের ছিল না। উপনিষদের একটা টুকরা বা একটা গৎ আওড়াইতেন মাত্র। আর আজকালকার দিনে একটা গোটা শ্লোক মুখস্থ বলিবার ক্ষমতাই অনেকের নাই! কেউ বা এর আধখানা ওর একটুকু এই কপ্‌চাইতে পারেন মাত্র; কিন্তু মোটের উপর ইঁহাদের সকলেরই কারবার বস্তুটার সঙ্গে নয়, বস্তুর বোলটার সঙ্গে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের দৌড় এই পর্য্যন্ত। যে-কোন বিষয়েই আমরা আলোচনা করি না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যখন বস্তুটা সম্বন্ধে আমাদের খেয়াল থাকে না, তখন আমি একথা বলিবই বলিব যে, সে জিনিষটা আমরা মোটেই বুঝি না।

ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্প্রতি আমাদের মতলব নয়। বর্ত্তমানে আমি বলিতে চাই যে, আজ যাহা বলিতে যাইতেছি এইসব বিষয় আলোচনা করিবার, এমন কি চিন্তা করিবার অধিকারও আমাদের আছে কি না সন্দেহ। "মজুর-স্বরাজ" শব্দটার অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের জন্মে নাই এইরূপই আমার বিশ্বাস। শব্দটা বানান করিতে পারি, আওড়াইতেও পারি সন্দেহ নাই। শিল্প এবং কারখানা এসব ভাল বুঝিলে কথাটার অর্থ কতক মালুম হইতে পারে বটে। কিন্তু সম্প্রতি এসব শব্দ মাত্র বুঝিতে আমরা সমর্থ—এখনো আসল বস্তুটা আমরা বুঝি না।

১৯২৬ সনের ত্নুনিয়া

ধরুন আমি নিম্ন প্রাইমারী ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি। তারপর সেটা পাশ করা গেল, সেইখানেই আমার বিদ্যা খতম হইল। তারপর আর আমার অগ্রসর হওয়া হইল না। এখন যদি আমি বি, এ, বি, এস-সির কর্ম্মখালি দেখিয়া সেদিকে হাত বাড়াই, তাহা হইলে আমাকে আহাম্মুক ছাড়া

আর কি বলা চলে? আমি নিম্ন প্রাইমারী বা উচ্চ প্রাইমারী পাশ করিয়াছি—একেবারে বি, এ,র খবর লইতে পারি না, অন্ততঃ লইবার অধিকারী নই। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন "বি, এ,র খবর লওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিটি কে?" তাহা হইলে আমি বলিব ছাত্রবৃত্তি পাশ করা লোকটিও নহেন, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ লোকও নহেন। আই, এ পাশ বা আই, এ ক্লাসের কেউ কেউ মাত্র এ বিষয়ে কল্পনা করিতে কিছু কিছু সমর্থ এবং অধিকারী। ১৭৭০ সনে জমিদারি-ব্যাঙ্কের আইন প্রথম বিধিবদ্ধ হয়। সেই ১৭৭০-৮০এর যুগ ধাপের পর ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ১৮৭০এর জার্ম্মাণি বা ১৮৮০এর ফ্রান্স ইহারা কি কখনো ১৯২৬ সনের জার্ম্মাণি বা ফ্রান্সের সম্বন্ধে কল্পনা করিতেও পারিয়াছিল? ইংলণ্ড কি ১৮১৫-৩২ সনে কল্পনা করিতে পারিত যে, এক বিরাট তেলের খনিওয়ালা মেসোপটেমিয়া তাহার দখলে আসিবে? আলেকজান্দার, চন্দ্রগুপ্ত হয়ত বিশ্বসাম্রাজ্যের কল্পনা করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু ১৯১৮ সনের সন্ধির ফলে দুনিয়ায় যে বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে সেই বস্তুটা কল্পনা করা কাহারও ক্ষমতায় সম্ভব হয় নাই।

মজুর কোন প্রকার জীব?

আসল কথা—বস্তু, বস্তু-জ্ঞান, বস্তুনিষ্ঠা। মজুর-স্বরাজ! ইহার না মজুর না স্বরাজ এখন পর্য্যন্ত ভারতের ত্রিসীমানায় আসিয়া পৌছিয়াছে। আপনারা হয়ত বলিবেন "কি! মজুর পর্য্যন্ত ভারতে নাই! আমাদের বাড়ীতেই তো চাকর আছে—প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতেই দাসদাসী আছে।" আমি জবাব দিব, "আজ্ঞে না। মজুর আর দাসদাসী এক চিজ নয়। আমি যে মজুরের কথা বলিতেছি সে বস্তু বিলকুল নয়া,

এই ঊনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ বস্তুর পাত্তাই ছিল না দুনিয়ায়। না ছিল জার্ম্মাণিতে, না ফ্রান্সে, না ইংল্যাণ্ডে। মজুর এক অতি জটিল জীব। শব্দটাও পারিভাষিক "কটমট।" এখন এই ১৯২৬ সনে আমরা কি অবস্থায় আছি? মজুর যে যুগে পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়, সে যুগ ভারতে এখনও বড় বেশী দেখা দেয় নাই। আর সেই বস্তুটাই এখনও ভারতে এমন কাঁচা অবস্থায় রহিয়াছে যে, সে সম্বন্ধে বুঝিবার বা কল্পনা চালাইবার অধিকারও ভারতীয় নরনারীর জন্মে নাই।

মজুর জিনিষটা কি? আমাদের দেশের শ্রমজীবীরা আগেও যেমনটি ছিল, এখনও প্রায় সেইরূপই আছে। টাকা পয়সা রোজগারের দিকে তাহারা বড় একটা যত্নবান নহে। আল্‌সে কুঁড়ের মত দিন কাটাইবে, শেষে অভাবে পড়িলে ভিক্ষা করিবে। তবু নিজে খাটিয়া নিজের আর্থিক উন্নতি করার দিকে তাহাদের মেজাজ্ যায় না। "মজুর" বা "বর্ত্তমান যুগের শ্রমজীবী" হইতেছে সেই ব্যক্তি যে নিজের উন্নতি করিবার জন্য, যখন যাহা করা দরকার তাহারই জন্য—তাহার নিজের ক্ষমতা, তাহার নিজের মাংসপেশী চোস্ত দোরস্ত করিতে সদা সচেষ্ট। "মজুর" সেই লোক যাহাকে দেখিয়া মনিবের হাত-পা পেটের ভিতর সেঁদিয়া যায়; হাঁটু গাড়িয়া মনিবের গুণকীর্ত্তন যে করে সে মজুর নয়। সেই হইল বিংশ শতাব্দীর মজুর, যাহাকে দেখিয়া মনিব বা কারখানাদার হিমসিম খাইয়া যায়।

এই গোটা ভারতবর্ষ—যাহার লোকসংখ্যা ৩০ কোটি, সেখানে এই ১৯২৬ সনে বোধ হয় মাত্র ৮-১০-১৫ লাখ শ্রমজীবী আছে যাহারা এই বিংশ শতাব্দীর মজুরের কাছাকাছি না হউক দূর হইতে তাহাদের ধরণ-ধারণ যৎকিঞ্চিৎ সমঝিতে সমর্থ। গোটা ভারতে হাজার ছয়েক শিল্প-

কারখানা আছে। এই ছয় হাজার শিল্প-কারখানার কিম্মৎ, যন্ত্রপাতি ও কর্ম্মক্ষমতা, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও আমেরিকান কারখানাগুলির সঙ্গে তুলনা করিবার দরকার নাই। আমাদের এই কয়েক লাখ "আধা-মজুর", "সিকি-মজুর"কে ঐ শ্রেণীর শ্রমজীবীদের মাপকাঠিতে বিচার করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

মজুর-ভারতের লোকবল

কোনো কোনো বৎসর গড়ে প্রায় ১৫০,০০০ ভারতীয় শ্রমিক, স্ত্রী ও পুরুষ, ধর্ম্মঘট করিতে শিখিয়াছে। ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য ইয়োরামেরিকার শ্রমিকদের উদ্দেশ্য হইতে এক চুলও এদিক্-ওদিক্ নয়। অর্থাৎ সকলেরই আকাঙ্ক্ষা—"কম ঘণ্টা খাটিয়া বেশী পারিশ্রমিক লইব, ভাল বাসস্থান পাইব, এবং কর্ম্ম-শাসন বিষয়ক অনেক সুবিধা ভোগ করিব।" তবু বলিতে বাধ্য, ভারতের শ্রমিক আন্দোলন এখনও শৈশব অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও তাহার আত্ম-চৈতন্য সম্পূর্ণ ভাবে জাগে নাই। কেন একথা বলিতেছি তাহা পরবর্ত্তী বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে।

বাংলার বহু কয়লার খনি ও পাটের কল, আসাম ও বাংলার অনেকগুলি চা-বাগান এবং উত্তর-পশ্চিম ও মাদ্রাজ প্রদেশের অনেকগুলি পশমকলের মালিকগণ বিদেশী। শুধু ইহাদের বিরুদ্ধেই ভারতের শ্রমিক-আন্দোলন সুরু হইয়াছে একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির মালিক ত আর বিদেশী নয়; তাহারা ত দেশেরই লোক। তাহাদিগের বিরুদ্ধেও এ আন্দোলন বন্ধ থাকে নাই। বলা বাহুল্য, শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে এই মন-কষাকষি প্রায়ই কোনরূপ জাতিবিদ্বেষ-প্রসূত নয়। স্বদেশানুরাগ, জাতীয়তা বা রাজনীতির গন্ধও

ইহার মধ্যে এক প্রকার নাই। শুদ্ধমাত্র আর্থিক অবস্থার দরুণই এই আন্দোলনের সূত্রপাত।

অনধিক ৩০,০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া যে সমস্ত "ছোট-খাট" শিল্প-ব্যবসা চলিতেছে, তাহাদের কথা বর্ত্তমানে না হয় বাদই দিলাম। তাহাতে বেশী লোক খাটেও না এবং সেখানে ফ্যাক্টরি চালানোর সমস্যা বা শ্রমের অবস্থা তেমন সঙ্গীনও নয়।

কিন্তু "মাঝারি" ও "বিরাট" শিল্পকারখানাগুলিতেই শ্রমসমস্যা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তা সে কারখানাগুলি স্বদেশীরই হউক বা বিদেশীরই হউক। টাটার লৌহ-কারখানায় ২৭,০০০ হাজার, হুকুম চাঁদের পাটের কলে ৫,০০০ হাজার মজুর খাটে। কাপড়ের কলগুলায় গড়ে এক হাজারের উপর লোক কাজ করে। এ সমস্তই স্বদেশীয় কারখানা।

সরকারী গোলাগুলির কারখানার প্রত্যেকটিতে গড়ে প্রায় ১,৭০০ লোক খাটে। অন্যান্য শিল্প-কারখানায় যাহারা কাজ করে, তাহাদের গড় ১০০ হইতে ১৫০ পর্য্যন্ত। এইরূপ শ্রমিকসংখ্যার গড় (ফাক্টরি প্রতি) বৃটিশ ভারতে ২৩০ এবং দেশীয় রাজ্যে ১৪০।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুলিকে ঠিকের কাছাকাছি বলিয়া ধরিতে হইবে। যে সংখ্যা উপরে দেওয়া গেল সেটা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। জাপানে, ইতালিতে, এমন কি ফ্রান্সেও—এক একটা ফ্যাক্টরির কথা ধরিলে—অবস্থা এখানকার অবস্থা অপেক্ষা বেশী ঘোরালো নয়। শ্রমিক পুরুষ ও স্ত্রীর মোটসংখ্যা হয়ত ভারতবর্ষ অপেক্ষা সে সব জায়গায় বেশী। কিন্তু ফ্যাক্টরির শ্রম-বন্দোবস্ত-সমস্যা এবং মালিক ও ম্যানেজারদিগের উপর শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া ভারত ও বিদেশ সর্ব্বত্রই সমান। শিল্প-মজুরদের সমস্যা আজ আন্তর্জাতিক হিসাবে পৃথিবী ব্যাপিয়া বর্ত্তমান।

কিন্তু ভারতের সাধারণ জীবনে শ্রম এখনও একটি প্রধান শক্তিরূপে কাজ করিতেছে না। শ্রমিক-সংখ্যাই তাহা বলিয়া দিতেছে। শিল্প-মজুরের সংখ্যা ভারতে ২,৫০০,০০০ মাত্র। এই সংখ্যাকে ভারতের অধিবাসীর সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে বলিতে হইবে, ইহা নিতান্তই নগণ্য। রেলের লোক, জাহাজের খালাসী, খনির মজুর, চা-বাগানের কুলী, কারিগর এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রমিক ইত্যাদি সকলের (স্ত্রী ও পুরুষ ধরিয়া) সংখ্যা ধরিলে দেখা যায়, ভারতের অধিবাসীর শতকরা প্রায় দশ ভাগ লোক এই "শ্রেণী"র অন্তর্গত। তবু এই সংখ্যাটা গ্রেটবৃটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের "সঙ্ঘবদ্ধ" শিল্প-মজুরের তুলনায় খুব সামান্যই বলিতে হইবে।

শ্রমিক বনাম ধনিক

ভারতে শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা কিরূপভাবে পূর্ণ হইতেছে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তরে কেহ কেহ হয় ত বলিবেন—মন্দভাবে নয়। সপ্তাহে কত ঘণ্টা খাটিতে হইবে, তাহা জেনেহ্বার আন্তর্জাতিক শ্রমিক মজলিসে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতের ব্যবস্থাপক সভাও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রেট্‌বৃটেন, যুক্ত-রাষ্ট্র, জার্ম্মাণি ও অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ এখনও কিন্তু "আইনে" পরিণত হয় নাই। এই হিসাবে ভারতবর্ষকে আধুনিকতমই বলিতে হইবে। হয় ত একটু অকালেই তাহার এই আধুনিকতা।

কিন্তু এখনও অনেক কিছু করিবার আছে। শ্রমিকদের নেতারা একটি বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্রমিক স্ত্রীলোকদিগকে প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে কতকগুলি সুবিধা দেওয়ার জন্যই ঐ বিলের উত্থাপন। কিন্তু উহা এখনও পাশ হয় নাই। উহার পাশ

হইবার সম্ভাবনাও খুব কম। তাহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে একটি কারণ—কলের মালিকদিগের আপত্তি। মালিকদিগের সমিতি গভর্ণমেণ্টকে একখানি পত্রে জানাইয়াছেন যে, ঐ বিলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁহারা একমত। তাঁহারা তেজের সহিত বলিয়াছেন, ঐ বিষয়ে জনসাধারণের মত এখনও প্রবল নয়। ব্যবস্থাটা প্রবর্ত্তিত হইলে, ঐ বিষয়ে তদারক করাও কঠিন হইবে—ইত্যাদি। তাঁহাদের প্রদর্শিত কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, শ্রমিকেরা বিশেষভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই। আর একটি কারণ এই যে, স্ত্রী-ডাক্তারের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত নয়। সুতরাং বিলের সর্ত্তানুসারে ডাক্তারী-সাহায্য প্রদান করা শক্ত।

একপুরুষ আগে ঐ ধরণের যুক্তি ইয়োরোপেও শুনা যাইত। মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট এখনও জানেন না—বাধ্যতা-মূলক সার্ব্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষার আইন কি বস্তু! তাঁহাদের ব্যবস্থা হইতেই বেশ বুঝা যায়, আজ ভারতীয় শ্রমশক্তির দৌড় কত দূর এবং যে বিশ্ব-শ্রমের মধ্যে আজ সে আসন পাইয়াছে, তাহার পশ্চাদ্‌ভাগের কোন্ স্তরে তাহার অবস্থিতি। অবশ্য আর্থিক জগতে উন্নতি করিতে হইলে ভারতের পন্থা আধুনিক দেশের পন্থা হইতে বিভিন্ন হইবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। শ্রম-বীমা কি বস্তু তাহা কিন্তু ভারতে এখনও অজ্ঞাত। আকস্মিক বিপদ, রোগ অথবা বার্দ্ধক্যে শ্রমিক স্ত্রীপুরুষেরা বিশেষ কিছু সাহায্য পায় না। প্রথম "ট্রেড ইউনিয়ন বিল" আইনরূপে পরিগণিত হইয়াছে কেবল মাত্র ১৯২৫ সনের প্রথম ভাগে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোম্বাইয়ের কলের মালিকেরা ভারতবর্ষের লোক ইয়োরোপের লোক নন। জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার কোনো দিক্

দিয়াই তাঁহাদের আচরণ প্রাচ্যের প্রতি প্রাচ্যের অনুরূপ নয়, অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবহার ইংরেজ মালিকদের ব্যবহারেরই সমতুল। কাজে-কাজেই ভারতের মজুরেরা দেশীয় ও বিদেশীয় মালিকের মধ্যে কোনো রকম ইতর-বিশেষ করিতে পারে না। আজ তাই ভারতের শ্রমিক সমাজ পুঁজির বিপক্ষে, "ধনতন্ত্রে"র বিপক্ষে, দাঁড়াইতে শিখিতেছে। কোন্ জাত, কোন্ দেশের লোক, কোন্ ব্যক্তি-বিশেষ এই পুঁজির মালিক তাহার প্রতি তাহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই।

ভারতীয় শ্রমিক-পত্রিকা

ভারতের শ্রমিক এখন উদ্বুদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার মধ্যেই "নিখিল ভারতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস" দেখা দিয়াছে। তাহার শাখা-প্রশাখাও প্রদেশে প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং প্রতি বর্ষে তাহার বৈঠকও বসিতেছে। ত্রিশ বৎসর আগে কেবলমাত্র একখানি শ্রমিক-পত্রিকা ছিল। বোম্বাইয়ের স্বদেশ-প্রেমিক লখনদে গুজরাটী ভাষায় তাহা প্রকাশ করেন। তাহার নাম ছিল "দীনবন্ধু"। কিন্তু আজ সেইখানে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত প্রায় বিশখানি পত্রিকার নাম করা যায়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি শ্রমিকদের নিজেদের দ্বারাই পরিচালিত। অন্য সম্প্রদায়ের তাহাতে হাত নাই।

মারাঠী ভাষায় "কামগর উদয়" নামে একখানি পত্রিকা আছে। বোম্বাইয়ের 'সেণ্ট্র্যাল লেবার বোর্ড' কর্ত্তৃক তাহা প্রকাশিত। মারাঠী সাপ্তাহিক "কামকরী"ও বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হয়। আহম্মদাবাদে গুজরাটী ভাষায় "মজুর-সন্দেশ" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে। কানপুর হইতে হিন্দীতে "মজদূর" পত্রিকা সপ্তাহে দুইবার

করিয়া বাহির হয়। কলিকাতায় 'শ্রমিক' নামে একখানি সাপ্তাহিক আছে। তাহার দুইটী করিয়া সংস্করণ বাহির হয়, একটী বাংলাতে, আর একটী হিন্দীতে। কলিকাতার সাপ্তাহিক "লাঙল" উঠিয়া গিয়াছে। এখন দেখা দিয়াছে "গণ-বাণী"।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের স্বার্থের কথা প্রকাশ করিবার জন্য অনেকগুলি পত্রিকা ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের 'ইণ্ডিয়ান লেবার ইউনিয়ন'-কর্তৃক "ইণ্ডিয়ান লেবার জার্ণ্যাল" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সাঁতরাগাছি হইতে বাহির করা হয়। বোম্বাই হইতে গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে ইউনিয়ন কর্তৃক "জি, আই, পি, হ্যারল্ড" নামে একখানি পত্রিকা মাসে দুইবার করিয়া বাহির করা হইয়া থাকে। নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ইউনিয়ন-কর্তৃক একখানি সাপ্তাহিক লাহোর হইতে প্রকাশিত হয়। আউদ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে ইউনিয়ন-কর্তৃক 'মজদুর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হয়। সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ইউনিয়নের 'দি রেলওয়ে গার্জ্জিয়ান' একখানি সরকারী পত্রিকা। নাগপত্তন (মাদ্রাজ) হইতে উহা প্রকাশিত। তারপর 'রেলওয়ে টাইম্স' নামে একখানি সাপ্তাহিক আছে। ভারত-বর্ষের ও ব্রহ্মদেশের যাবতীয় রেলকর্ম্মচারীদের যা-কিছু সমস্যা, সে সমস্তই ইহাতে স্থান পায়। ঐ সব কর্ম্মচারীদের মিলনসঙ্ঘ-কর্তৃক মুখপত্ররূপে ইহা বোম্বাই হইতে বাহির করা হয়।

ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারীদেরও অনেকগুলি পত্রিকা আছে। বাংলা এবং আসামের পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক 'লেবার' নামে একখানি মাসিক-পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। আর একখানির নাম 'পোষ্টম্যান'। ইহা বোম্বাই প্রদেশের 'পিয়ন ইউনিয়নে'র মুখপত্র। উক্ত পত্রিকাদ্বয়ই ইংরেজীতে

লেখা হয়। বোম্বাই প্রদেশের পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-কর্ত্তৃক 'জেনারেল লেটার্স' নামে একখানি মাসিক বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই নামের আর একখানি মাসিক পত্রিকা পুনার পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। লাহোর হইতে পাঞ্জাব এবং নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন 'পাঞ্জাব কমরেড্' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কলিকাতা হইতে 'জেনারেল লেটার্স' নামে আর একখানি মাসিক নিখিল ভারতীয় (ব্রহ্মদেশ ধরিয়া) পোষ্ট্যাল ও রেলওয়ে মেল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়।

ইংরেজীতে দুইখানি শ্রমিক-পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। একখানি বোম্বাই হইতে প্রকাশিত। নাম 'সোশ্যালিষ্ট'। ইহা সাপ্তাহিক। আর একখানি মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত। নাম 'স্বধর্ম্ম'। ইহাও সাপ্তাহিক।

বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের 'লেবার বিউরো' মাসে মাসে একখানি বুলেটিন প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাতে দেশী-বিদেশী সকল প্রকার তথ্যই থাকে।

মজুর-সমস্যায় ভারত ও দুনিয়া

যাহা হউক এই ত্রিশকোটির মধ্যে বড় জোর পনর লাখ "মজুর"। ইহাদের ভিতর বড় জোর মাত্র পাঁচ লাখ হইতেছে ষোল কলায়—ষোল আনায় মজুর—বিংশ শতাব্দী-মাফিক মজুর।

ফ্রান্স অবশ্য একটা ছোট দেশ। এই বাংলা দেশটার মত—তাহার চাইতেও ছোট। ফ্রান্স এই গোটা বাংলা দেশটার তিনপোয়া। কিন্তু এই ফ্রান্সে ত্রিশ লাখ মজুর। আর ত্রিশকোটি নরনারীর ভারতে

মাত্র পনর লাখ! তবুও ফ্রান্স অনেক বিষয়ে "দ্বিতীয়" শ্রেণীর দেশ। ১৯২৬ সনের কিছু পেছনে ইহার স্থান। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, আমেরিকা বা জার্ম্মাণি, আমেরিকা, ইংলণ্ড বা আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি এই তিনটি দেশ দুনিয়ায় সেরা। এই তিনটি দেশের অভাবে দুনিয়া চলে না। ইহার বিশকোটি লোকের অভাবে পৃথিবী মারা যাইবে। ১৯২৬ সনে যদি কোন জাত জীবিত থাকে তো এই তিনটা।

বিলাতে কত মজুর বেকার বসিয়া আছে জানেন? বিশ লাখ। এখন মজুর কত ভাবুন। যুদ্ধের পর আমেরিকায় বেকার-সমস্যা খুব আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়ায়। সময় সময় পঁচাত্তর লক্ষ লোক বেকার বসিয়া ছিল। যে দেশে বেকারই এত, সে দেশের মজুর-শক্তির বিপুলতা ভারতবাসীর পক্ষে ঠাওরানো সম্ভব কি?

১৮৫০ সনের জার্ম্মাণি-ইংলণ্ড কি ১৯২৬ সনের জীবনকে কোনমতে বুঝিবার অধিকারী ছিল? আমরা ভারতে বোধ হয় এখনো ১৮৭৫ সনেই আছি। আমরা কেমন করিয়া এই দীর্ঘ সময়টা মারিয়া লইতে পারি? ১৯২৬ সনের জার্ম্মাণ-ফরাসী-ইংরেজ আইনের বোল কপচানো সম্ভব। রিসার্চ্চ গবেষণার দ্বারা হয়ত এইসব হাতের আগায় রাখা যায়। কিন্তু তাহা দ্বারা বস্তুটা পাকড়াও করা সম্ভব নয়।

মামুলি ট্রেড্ ইউনিয়ন

১৯২৬ সনে কি রকম মজুর-স্বরাজ গড়িয়া উঠিয়াছে? মজুর-স্বরাজের অর্থ "ট্রেড্ ইউনিয়ন" নয়। আবার "ট্রেড্ ইউনিয়ন"ও একটা ছোট খাট জিনিষ নয়। এই ট্রেড্ ইউনিয়নের জন্য কত কত পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়াছেন। মজুর রাষ্ট্রীয় দল, মজুর সামাজিক দল, মজুর দার্শনিক দল, মজুর সাহিত্যিক দল, ট্রেড্ ইউনিয়ন, ট্রেড্ ইউনিয়ন করিয়া

ক্ষেপিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মজুর-স্বরাজের দল ট্রেড ইউনিয়নের জন্ত মাতিয়াছিল। যে যে দেশে ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপিত হইয়াছে সেই সব দেশে বুঝিতে হইবে কারখানা-শিল্প চরমে উঠিয়াছে। সেই সব দেশে শিল্প-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কতক কতক বিষয়ে রাষ্ট্রীয় স্বরাজও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সিড্‌নি ওয়েব তাঁহার "ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল ডেমোক্রেসি" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন অনেক কিছু করিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন মজুরকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছে, ইহা একের সঙ্গে আর একজনের সখ্য স্থাপন করিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধ মজুর ক্যাপিটালিষ্টের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে। মজুরদের প্রতিনিধি-সর্দ্দার মনিবের কাছ হইতে তাহার দলের ন্যায্য অধিকার কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লয়। এই যে নামজাদা 'লেবার' গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার পেছনে ছিল ট্রেড ইউনিয়ন।

কিন্তু এহেন ট্রেড ইউনিয়নও বর্ত্তমানে যে জিনিষটি গড়িয়া উঠিতেছে তাহার কাছে হার মানিতে বাধ্য হইয়াছে।

ট্রেড ইউনিয়নের পরের ধাপ

ট্রেড ইউনিয়নের পরের ধাপে যে বস্তুটা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেইটি একদম ১৯১৮-১৯২৬ সনের আবিষ্কার একথা বলা হয়ত ঠিক হইবে না। কারণ জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে ছোটখাট ভাবে এই আন্দোলন আগে হইতেই চলিয়া আসিতেছিল।

অষ্ট্রীয়ার বেট্রিব্‌স্‌-রাট্

১৯১৮ সনে অষ্ট্রীয়ার সাধারণতন্ত্র (রিপাবলিক) গড়িয়া উঠিল। তাহার কনষ্টিটিউশনের ভিতরে একটা ধারা বসাইয়া দেওয়া হইল—

কারখানাতে "শিল্প-স্বরাজ" প্রবর্ত্তিত করিতেই হইবে। নাম তার "বেট্রীব্স্-রাট্" (কর্ম্মসভা)। ইহা দেশের আইন-কানুনের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইল। শিল্প-স্বরাজকে, মজুর-রাজকে অষ্ট্রীয়ানদের রিপাবলিকে শাসন-প্রণালীর ভিতরে স্থায়ীভাবে স্থান দেওয়া হইল। সেই আইনকানুন অতি বিস্তৃত ভাবে জার্ম্মাণিতে ও চেকোস্লোভাকিয়ায় নানা প্রকারে বিকাশলাভ করিয়াছে। ১৯২৬ সনে এই তিন দেশ ছাড়া আর কোন দেশে মজুর-রাজ সম্বন্ধে আইন প্রাথমিক ভাবেও দেখা দেয় নাই। তাহা হইলে দেখা যায়, এ জিনিষটা বাঙ্গালায় কায়েম করা কত কঠিন।

যেখানেই কোন কাজ হউক—সে কারখানা হউক বা খনি হউক, যে কোন কর্ম্মকেন্দ্রে মানুষ যাহা-কিছু কাজ করুক, চাই সে আফিস হউক হোটেল হউক বা আর কিছু—সর্ব্বত্রই কায়েম হইয়াছে "কর্ম্ম-সভা"। মজুর আর কেরাণী এ একই কথা। বিলাতে কেরাণীকে সাদা কলার-পরা গোলাম বলা হয়। গোলাম তো সকলেই। বেশী মাইনে যে পায় সেও মজুর, আবার অল্প মাইনের কুলী দারোয়ানও মজুর। এখন 'মজুর-স্বরাজ' কাহাকে বলে? যে কোন মজুর এবং যে কোন কর্ম্মচারীর স্বরাজকে বলে মজুর-স্বরাজ। শিল্প-ঘটিত যে কোন কর্ম্ম-কেন্দ্র ও যাহা কিছু কর্ম্ম তাহাতে মজুরদের আধিপত্য,—ব্যবসা এবং বাণিজ্য সম্পর্কিত মজুর ও কেরাণীদের আত্মকর্ত্তৃত্ব। রেল, তার, ডাকঘর, টেলিফোন এবং লড়াইয়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি যাহা সরকারের অধীনে, ইহারও প্রত্যেক কর্ম্মকেন্দ্র এই আইনের তাঁবে আসিয়াছে। একটা জিনিষ যাহা এখনও আইনের গণ্ডীর ভিতর আসে নাই, সেটা হইতেছে চাষবাস। কিন্তু তবুও প্রদেশে প্রদেশে চাষের ক্ষেত্রে মজুর-স্বরাজ দেখা দিয়াছে। এই অষ্ট্রীয়া দেশটা আমাদের বাঙ্গালা দেশের ২।৩ টা জেলার সমান। ধরুন

এই মেদিনীপুর আর ময়মনসিংহের সমান। ইহার নানা গাঁয়ে চাষ সম্বন্ধে কর্ম্মকেন্দ্র আছে। প্রত্যেকটিই ঐ সব আইনকানুন মানিয়া চলে।

বেট্রিব স্-রাটের রাজ্য-সীমা

কোন্ কোন্ জায়গায় কেরাণী ও মজুর-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য? যত জায়গাতে টাকাপয়সা রোজগার করিবার ব্যবসাবাণিজ্য-বিষয়ক যত কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, ঐ সব জায়গাতেই কেরাণী ও মজুরদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চাষআবাদ বিষয়ে যাহা কিছু ছোটখাট শিল্পকারখানা, যেখানে ঘোড়ার নাল লাগান হয়, মিস্ত্রির কাজ হয়, করাত মেরামত হয়, সে সব জায়গাতেও কেরাণী-ও মজুর-স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানুষ চলাচল আর মাল চলাচলের জন্য ট্রাম, রেলওয়ে ও অন্যান্য যানবাহন, সরকারী এবং বেসরকারী যত রকম ইমারত তৈয়ারী হইতেছে, সর্ব্বত্র,—কনট্রাক্টর এঞ্জিনিয়ারো যত লোক নিয়োজিত করিতেছে প্রত্যেকে নিজ নিজ মজুরকে স্বরাজ দিতে বাধ্য। টাকা পয়সা ধার নেওয়া সম্পর্কিত যত কেন্দ্র থাকিতে পারে—ব্যাঙ্ক, সেভিংস ব্যাঙ্ক, লোন আফিস—এই সব কেন্দ্রে মজুর ও কেরাণী স্বরাজ পাইয়াছে। সামাজিক বীমা প্রথার যত প্রকার আফিস থাকিবে, তাহার প্রত্যেকটীর যে কোন বিভাগে মজুর আজ হইতে স্বরাজ পাইয়াছে। আর্থিক জীবনের যাহা কিছু সঙ্ঘ থাকিতে পারে সেখানেও। প্রত্যেক দেশেই সরকারের একচেটে কতকগুলি ব্যবসা থাকে,—যেমন ভারতে গাঁজা আফিম প্রভৃতি, এই সমস্ত জায়গাতেও মজুর ও কেরাণীদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে কোন উকিল নিজের জন্য আফিস খাড়া করিবে, সে তাহার প্রত্যেক কেরাণীকে স্বরাজ দিতে বাধ্য। শরীর-বিষয়ক ও শারীরিক উন্নতি ও স্বাস্থ্যোন্নতির যত প্রকার হাসপাতাল, যত প্রকার প্রতিষ্ঠান থাকবে

সেখানে এই স্বরাজ থাকিবে। প্রত্যেক হোটেল, রেস্তরা, থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদির প্রত্যেক বাড়ীতে, প্রত্যেক জায়গায়, যেখানে আড্ডা মারা হয় বা আরাম বা গানের ক্লাবঘর আছে, তথায় মজুর ও কেরাণী স্বরাজ ভোগ করিতে অধিকারী।

মজুর ও কেরাণীর স্বরাজ

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে এটা আবার কি রকম স্বরাজ? এই সব লোকগুলা কি রকম স্বরাজ পাইল? কোন্ আইনের আমলে তাহারা আসিল? নতুন কি করা হইল যাহা পূর্ব্বে ছিল না? কথাটা একটু খতাইয়া বুঝা দরকার। ধরুন একজন উকিলের ঘরে আছে কেরাণী, টাইপ্‌বাবু প্রভৃতি ধরিয়া কম সে কম পাঁচজন "চাকর"। এখন ইহাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই স্বরাজটা পালন করা যায় কেমন করিয়া? এই পাঁচজন চাকর বাছাই করিয়া যে একজনকে মাতব্বর করিল, সে উকিল মহাশয়ের আফিস চালাইবার কাজে একেবারে মনিবের সামনে দাঁড়াইল।

৫-১০ জনে এক জন, ১০-২০ জনে দুই জন, ২০-৫০ জনে তিন জন, এমনি বাঁধা নিয়মে প্রতিনিধি বাছাই হয় এ সব কেরাণী ও মজুরের প্রতিনিধিরা মনিবদের সঙ্গে আলোচনা করিবে, তর্ক করিবে। ইহাতে রাজী আছেন তো? এরূপ স্বরাজ আমাদের দেশ সহিতে পারিবে কি? কোন্ কোন্ লোক এই প্রতিনিধি বাছাই করিতে অধিকারী? যেই আমি কোথাও একমাস কাজ করিয়াছি অমনি আমার অধিকার জন্মিয়াছে। একমাস কাজ করিবার পর আমি প্রতিনিধি বাছাই করিতে পারি। ছয় মাস কাজ করিলে পর আমি নিজেই প্রতিনিধি হইবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিলাম। একমাসে বাছাই,—ছ'মাসে একেবারে মনিবের "সমান"। এখন বুঝুন "স্বরাজ" কাহাকে বলে।

বেটী ব্‌স্‌-রাটের (কর্ম্মসভার) সঙ্গে মনিবের সম্বন্ধ

কি উদ্দেশ্যে এইসব কর্ম্মকেন্দ্র গঠিত হইল? মানুষের যাহা কিছু প্রতিষ্ঠান আছে প্রত্যেকটিতেই এই "বেটী্‌ব্‌স্‌-রাটের" হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে। কর্ম্মকেন্দ্রের যে কোন বিভাগেই এই "কর্ম্মসভা" গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। মজুর-সম্পর্কিত যত প্রকার নিয়ম কানুন করা হইবে, "কর্ম্মসভা" কর্ম্মকেন্দ্রে তা চালাইয়া লইবে। গভর্ণমেণ্ট মজুরের স্বার্থে মহাজনের বিরুদ্ধে যাহা কিছু আইন কায়েম করিবে তাহার তদ্‌বির করিবার ভারও এই "কর্ম্মসভার" হাতে। কাহাকে কত মাইনে দেওয়া হইবে, কাহাকে কোন্‌ সময় শাসন করা দরকার, এসব করিবে ঐ মজুরদের প্রতিনিধি, কারখানাদার নয়। এখন মনে রাখা আবশ্যক যে, যে সকল দেশে মামুলি মজুর-সমিতিই ভাল রকম গড়িয়া উঠে নাই সেই সকল দেশের লোক নাবালক মাত্র। নাবালকদের পক্ষে ট্রেড্‌ ইউনিয়নের পরের ধাপ "বেটী্‌ব্‌স্‌রাট বুঝিতে পারা অসাধ্য।"

যে যে স্থলে মনিবের সঙ্গে ট্রেড্‌ইউনিয়নের সঙ্ঘবদ্ধ চুক্তি করা হইয়াছে, সেই সকল স্থলে "কর্ম্মসভা" চুক্তি-মাফিক কাজ হইতেছে কিনা তাহার তদ্‌বির করে। আর যেখানে চুক্তি নাই সেখানে মজুরদের সঙ্গে মালিকের চুক্তি করানো হইতেছে মতলব। এই স্বরাজের ফলে কর্ম্ম-কেন্দ্রের ভিতরে বসিয়া ট্রেড্‌ ইউনিয়নের হুকুমগুলা জারি করানো সম্ভব। আমাদের দেশেও ট্রেডইউনিয়ন স্থাপিত হইয়াছে। এইটা কি জিনিষ তাহার কিছু কিছু ধারণা আমরা করিতে পারি। কিন্তু ট্রেড্‌ ইউনিয়নের হুকুম বা ইচ্ছা তামিল হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য "বেটী্‌ব্‌স্‌-রাট্‌" নাই। ধরা যাউক যেন ট্রেড্‌ইউনিয়ন বলিয়াছে ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আফিস চলিবে, ইহার বেশী নয়। যদি মনিব এ করিতে রাজী না

হয় তাহার উপায় কি? উপায় হইতেছে প্রত্যেক ট্রেড্ইউনিয়ন হরতাল রুজু করিতে পারে। তাহা ছাড়া আর কোন কর্ম্মপ্রণালী নাই।

কিন্তু যে যে দেশে "বেট্রীব্স্‌রাট" আছে, সেইসকল দেশে ফ্যাক্টরীর ভিতর, আফিসের ভিতর, ব্যাঙ্কের ভিতর, ইউনিয়নের কাজ হাসিল করিবার মতন যন্ত্র রহিয়াছে। কাজেই সহজে মালিককে জব্দ করা যাইতে পারে। ট্রেড্ ইউনিয়ন মজুরের সম্বন্ধে যে সব নিয়ম-কানুন বাঁধিয়া দেয়, প্রত্যেক মালিককে সেই অনুযায়ী চলিতে বাধ্য করানো আজকাল খুবই সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

ট্রেড্ ইউনিয়ন বাহিরের যন্ত্র; কিন্তু কারখানার ভিতরেই মজুরেরা তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিয়াছে। আজকাল ইহারা ঝাণ্ডা হাতে কারখানার বাহিরে দাঁড়াইয়া হুঙ্কার ছাড়ে না। লড়াই করিতে করিতে মজুরেরা কেল্লার ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে; আর সেখানে লাল নিশান খাড়া করিয়া দিয়াছে। মালিক তাহা কুর্ণিশ করিয়া চলিতেছে।

"বেট্রীব্স্‌-রাট্" একদিকে ট্রেড্ ইউনিয়নের অন্তরঙ্গ বন্ধু, অপর দিকে গভর্ণমেণ্টের যন্ত্র-বিশেষ রূপেও এই কর্ম্মসভার কিম্মৎ ঢের। গভর্ণমেণ্ট মজুরের স্বার্থরক্ষণের জন্য যে সব আইন করিয়াছে, মনিব তাহা না মানিলে মজুরদের প্রতিনিধি গভর্ণমেণ্টের কাছে নালিশ করিতে অধিকারী। সরকারী আইনকানুনগুলি অনুসারে কাজ বাগানো "কর্ম্ম-সভার" অন্যতম ধান্ধা।

মনিবের উপর মজুরের কর্ত্তামি

কারখানার প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে শাসনঘটিত যাহা কিছু নিয়ম করা আবশ্যক, মনিব মহাশয়েরা একলা তাহা কায়েম করিতে পারিবেন না। ৫টা কি ৫॥টা পর্য্যন্ত আফিস চলিবে, এ প্রশ্ন মজুরদের মত না

লইয়া মীমাংসা হইতে পারে না। আজ শিল্প-কারখানায় ডিস্‌মিস্ কে করিতেছে? কাল জরিমানা কে করিতেছে? এক দিকে ট্রেড্‌ ইউনিয়ন তো বাইরে পড়িয়া আছে। অপর দিকে, মালিকের যাহাকে তাহাকে যখন ইচ্ছা শাস্তি দেওয়ার অধিকার আর নাই। এসব করিতেছে মজুর-প্রতিনিধি। পঁচিশ বছরের পুরাণো কলে কাজ করিতে হাত ভাঙ্গিয়া যায়—পনর বছরের পুরাণো যন্ত্রে আর কাজ করা যাইতে পারে না। নতুন যন্ত্র চাই। এ জীর্ণ ঝাঁটায় আর ঝাড় দেওয়া চলে না, ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায়। মজুরদের "কর্ম্মসভা" এই সব বলিতেছে। আর মনিব তৎক্ষণাৎ এইসব অনুযোগ শুনিয়া তাহার প্রতীকার করিতে বাধ্য। তাহা হইলে বুঝুন—কোন পথে দুনিয়া চলিতেছে।

আপনারা বলিবেন, "ইহারা সব গোঁয়ারতামি করিতেছে। এই সব আবদারি লোকগুলাকে তাড়াইয়া দিলেই তো সব গোল মিটিয়া যায়।" কিন্তু মজার কথা,—ডিস্‌মিস্ করার অধিকারী কে? শাস্তি দেবে কে? সে সব "মজুর-রাজ!" মজুর-রাজ মনিবকে আদালতের বিচারে দাঁড় করায়। কোন মজুর-প্রতিনিধি যদি মনিবের অপ্রিয় থাকে কারণ সে মজুরের স্বার্থ ই বেশী দেখে আর সেদিকে বেশী সময় অতিবাহিত করে, তবে সে মজুরের স্বার্থ অধিক দেখিতেছে বলিয়া এক্ষেত্রে তাহাকে তাড়াইবার উপায় নাই। এই জন্য রীতিমত আইন রহিয়াছে। যদি এই সকল "কর্ম্ম-সভার" কাজ করিবার জন্য কোন প্রতিনিধি কর্ম্মকেন্দ্রের কাজ কিছু কম করে, তাহা হইলে তাহার মাইনে কাটা যাইতে পারে না। একেই বলে,—"তোমারই শিল তোমারই নোড়া, তোমারই ভাঙবো দাঁতের গোড়া।" মনিব যদি বলে—"আমার পয়সায় মানুষ, আমার ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে, আমার সময় ও সুযোগের দিকে মন দিতে মজুর আইনতঃ বাধ্য," আর এই অজুহাতে জবরদস্তি চালায়, তবে তার চরম জরিমানা

হইতে পারে দুই হাজার ক্রোন অর্থাৎ ১॥০ হাজার টাকা। মজুরের সঙ্গে বিরোধ করিলে ১॥ হইতে ৮ সপ্তাহ পর্য্যন্ত মনিবের জেল পর্য্যন্ত হইতে পারে।

বাঙ্গলার স্বদেশ-সেবকগণ, এইরূপ স্বরাজ হজম করিতে রাজি আছেন কি? মজুরেরা আজকাল আর ফ্যাক্টরির বাহিরে থাকিয়া আস্ফালন করিতেছে না। খাঁটি "শিল্প-স্বরাজ" আসিয়া গিয়াছে। "ট্রেড্ ইউনিয়ন" সে তো ছেলে খেলা মাত্র। ট্রেড্ ইউনিয়ন বাহিরে বাস করিতেছে। কেল্লা ফতে করিবার জন্য মজুরেরা ভিতরে ব্যাটালিয়ান পাঠাইয়াছে। "বেট্রিব্‌স্‌-রাট্" মনিবের বুকে বসিয়া দাড়ি ওপড়াইতেছে। একেই বলে মজুর-দুনিয়ায় নবীন স্বরাজ।

ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ *

নানা শক্তির সমাবেশ

আজকে ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠের কথা বলিব। আর্থিক বনিয়াদের অনেকগুলা খুঁটা। পৃথিবীটা কোনো এক, দুই বা তিন শক্তিতে চলে না। এক সঙ্গে সমানভাবে নানা শক্তি নানান কাজ করে। নানা আন্দোলন একত্রে দুনিয়াটাকে চালাইতেছে। অনেকে কেবল একটা দিক্ আলোচনা করেন, আর মনে করেন, পৃথিবীটা চলিতেছে কেবল এক শক্তির জোরে। আমি ঐরূপ অদ্বৈতবাদী নই। কোনো একটা মাত্র শক্তি জগৎকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

আর্থিক বনিয়াদের অন্যতম কেন্দ্র, ব্যাঙ্কের কথা বলিয়াছি। প্রত্যেক লোকের পকেটের টাকা, প্রত্যেক লোকের নিজ নিজ হাঁড়ির টাকা এই কেন্দ্রে দানাবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় কথা ছিল, প্রত্যেক মানুষকে করিতকর্ম্মা, কাজের লোকরূপে গড়িয়া তুলিবার কথা। প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মদক্ষরূপে স্বাধীন এবং নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করিতে পারে কি করিয়া সেই উপায় আলোচনা করিয়াছি। তৃতীয়তঃ, জমি-জমার আইন পৃথিবীতে বদলিয়া যাইতেছে একথা বলিয়াছি। রুশিয়ায় যা ঘটিয়াছে তা এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি প্রত্যেক দেশেই জমি-জমার আইন বদলিয়া যাইতেছে আগাগোড়া। ইহাতেও আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ অনেকটা প্রভাবান্বিত হইতেছে। চতুর্থতঃ,

* জাতীয় শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম্ম (ফেব্রুয়ারি ১৯২৬)। বক্তৃতা অনুসারে লেখক—তাহেরউদ্দিন আহমদ।

শিল্প-কারখানায় মজুর-রাজ সম্বন্ধে বলিয়াছি যে,—কি ব্যাঙ্ক, কি ডাকঘর, কি হোটেল—প্রত্যেক কর্ম্মকেন্দ্রে যত লোক কাজ করুক,—সে বাবু-শ্রমজীবীই হোক বা কুলী-শ্রমজীবীই হোক,—প্রত্যেকে এই সকল কেন্দ্রে স্বাধীনতা এবং কর্ম্মকেন্দ্র শাসন করিবার অধিকার ভোগ করিতেছে। তাই দেখিতে পাইতেছি যে, সকল দিক্ দিয়াই এই পৃথিবীর ধন-দৌলত নূতন নূতন উপায়ে নব নব প্রণালীতে বাড়িয়া যাইতেছে।

বিদ্যামাত্রই অর্থকরী

ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠও অন্যতম জবর শক্তি। আর্থিক উন্নতি সাধনের পশ্চাতে থাকে একটা বিপুল শক্তি। সেটা হইতেছে বিদ্যা। ধনোৎপাদনের জন্য বিদ্যাপীঠ আছে, ছেলে পিটিবার আখড়া আছে। টাকা রোজগার করা, টাকা পয়দা করা, ধনদৌলত সৃষ্টি করা—আর্থিক উন্নতির যত কিছু কর্ম্ম থাকিতে পারে, এ সবের একটা মস্তবড় বনিয়াদ হইতেছে ইস্কুল বা কলেজ।

দুনিয়ায় এমন কোনই স্কুল নাই, যেখানে ধনোৎপাদনের বিদ্যা প্রচারিত হয় না। যে দিন থেকে পাঠশালায় ধারাপাত সুরু করিয়াছি, সেইদিন থেকে ধনোৎপাদনের বিদ্যায় অনেক দূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। পুরুত-গিরির পাঠশালাও ধনোৎপাদনের বিদ্যাপীঠ। মন্তর পড়াও ব্যবসা। পুরুত মোল্লা হউন, আর খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রীই হউন,—এঁরা সবাই ধনোৎপাদনের জন্য তুকমুখ একটা কিছু শিখিয়া থয়েন। ওকালতী, মোটর চালানো, ডাক্তারী, পাটের দালালী যেমন ব্যবসা, পুরুতগিরি তেমনি ঠিক খাঁটি ব্যবসা। এই ব্যবসার জন্য তাঁরা শিক্ষাদীক্ষা লইয়া থাকেন তার জন্য এঁরা যে সব কর্ম্মকেন্দ্রে যান, সে টোল হোক, মাদ্রাসা মক্তব হোক, বা থিয়লজিক্যাল ডিভিনিটি কলেজ হোক,—সেসবই ধনোৎপাদনের বিদ্যাকেন্দ্র বটে।

খ্রীষ্টিয়ান জগতের পুরুত-বিদ্যালয়

এদেশে যাঁরা মোল্লা বা পণ্ডিত তাঁদের অনেকেই মন্ত্রতন্ত্র বেশী জানেন কিনা বলিতে পারি না। বাঙ্গলা শব্দের পেছনে যদি 'ং' 'ঃ' লাগান যায় তাহলেই সংস্কৃত হইল, আর সেটা দাঁড়াল শাস্ত্রের বচন! তেম্নি মুসলমানদের মোল্লা, যাঁদের প্রভাব পাড়াগাঁয়ে খুব বেশী, তাঁদের অনেকেই ঐ আরবী-পার্শী কোরাণ-দর্শন কতটা বোঝেন স্বয়ং আল্লাই জানেন। হয় ত কেউ কেউ বুঝিতে পারেন। এখন ভেতরকার কথা হইতেছে পণ্ডিতী, মোল্লাগিরি, পাদ্রীগিরি এ সবই অর্থকরী বিদ্যা। এঁদেরকে গৃহস্থরা খাইতে পরিতে দেয়, তঙ্কা দক্ষিণা দেয়।

আমরা ভারতে ইয়োরোপের এই খ্রীষ্টিয়ান জাতটাকে মহা অধার্ম্মিক বলিয়া থাকি। কিন্তু ওসব দেশে রামা-শ্যামা পুরুত হইতে পারে না। হইতে হইলে আলমারি আলমারি বই পড়িতে হয়, গণ্ডা গণ্ডা পাশ করিতে হয়। এই আমাদের দেশে এম, এ, বি, এল, পি, এইচ, ডি, ডি, এল, পড়িতে কত সময় লাগে? এনট্রান্স পাশের পর অন্ততঃ আট বছর পড়িলে পর যে ধরণের বিদ্যা হয়, জার্ম্মাণ দেশে পাদ্রীগিরি বিদ্যা দখল করিতে তত সময় ও মেহনৎ লাগে। কত কি ল্যাবোরেটরী, চার্চ্চ-কলেজ পাশ করার পর আবার যে সার্টিফিকেটটা জুটিয়া থাকে তার দ্বারাও পুরুতগিরি করা চলে না, পুরুত উপাধিটা পাওয়া যায় মাত্র। প্রথমে অনেকদিন অ্যাপ্রেন্টিশ হইতে হয়। পাঁচ সাত বছর পরে তবে পুরুতগিরি জুটিয়া থাকে। ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়সের আগে কোনো মিঞা জার্ম্মাণিতে গির্জ্জায় কর্ত্তামি করিতে পায় না। এদেশে কোনোদিন পুরুতগিরির সংস্কার সাধন করিতে হইলে আবার ঐ ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণির নজির মাঝে মাঝে আনিয়া দেখিতে হইবে।

যাক্‌,—ধারাপাত পড়া যেমন ধনোৎপাদনে হাত মক্‌স করা পুরুতগিরিও তেমনি। দুনিয়ার এমন কোনো বিদ্যা নাই, যা অর্থকরী নয়। ঋগ্বেদের যুগে, হোমারের আমলে, মৌর্য্য-ভারতে বা মোগল-ভারতে যে সব পাঠশালা ছিল, সেগুলিও ধনোৎপাদনেরই পাঠশালা। এই যে পলটন বা ফৌজের কাজ ইহাও সেই ভাতকাপড়ের জন্য। কি প্রাচীন কাল, কি মধ্যযুগ, কি এশিয়া কি ইয়োরোপ এসবের সকল পাঠশালাই ধনোৎপাদনের আখড়া।

"ভোকেশন্যাল স্কুল" জগতের নবীন আবিষ্কার

বিদেশে থাকিবার সময় একটা কথা ভারতীয় মহলে বার বার শুনিতে পাওয়া যাইত। কথাটা "ভোকেশন্যাল স্কুল।" ভোকেশন মানে তো ব্যবসা। মানুষ যা-কিছু করে সবই তো "ভোকেশন"। আমাদের জননায়ক ও ইউনিভার্সিটী পরিচালকরা সকলেই বলিতেছেন "ভোকে-শন্যাল ইস্কুল কর"। আমি বলি, "ভোকেশন্যাল ইস্কুল তো রহিয়াছে। দুনিয়ায় যত কিছু কারবার আছে বা হইতেছে, লাগাৎ পুরুতগিরি—এ সবই তো ভোকেশন্যাল স্কুলে শেখা হইয়া থাকে।"

আসল কথা, জননায়কগণ কেবল কথাটাই ব্যবহার করিতে শিখিয়া-ছেন, কিন্তু বস্তুটা বোঝেন না। আপনারা বলিবেন, এর আর বুঝাবুঝি কি? আমার জবাব এই যে, যে ধরণের ভোকেশন্যাল ইস্কুল দুনিয়াতে চলিতেছে, সে বিষয়ে ভারতবাসী সজাগ নয়। আপনারা হয়ত টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বলিবেন, "ল কলেজ ভোকেশন্যাল ইস্কুল নয়? এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, কেরাণীগিরি এ সব যে সব স্কুলে শেখান হয়, সে সব ভোকে-শন্যাল নয়?" আমি ত প্রথমেই বলিয়া চুকাইয়াছি,—"নিশ্চয়ই, এ সব আলবৎ ভোকেশন্যাল।" কিন্তু আমি বলিব আপনারা মাত্র শব্দটি

বোঝেন, আসল জিনিষটা বোঝেন না। "ভোকেশন" একটা আধুনিক পারিভাষিক শব্দ। ১৯১৮ সনের এদিকে ওদিকে "ভোকেশন্যাল স্কুল" বলে যে জিনিষটা দাঁড়াইয়াছে, সেটা একেবারে নতুন আবিষ্কার। এই হিসাবে, এটা ১৯১৮ সনের দুনিয়ায় একদম নতুন বস্তু। ১৯১৮ সনের দুনিয়াটাকে আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? আমরা যে আজও বর্ত্তমান জগতের মাপকাঠিতে শিক্ষার আসরে বোধ হয় ১৮৪৮ সনেই রহিয়াছি।

ভারতের কেউ কেউ হয়ত ১৯১৮-২৬ সনের দুনিয়াটা কিছু-কিছু বোঝেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় অনেকেই বোঝেন না। এই "ভোকেশন্যাল স্কুল" চাইবার সত্যিকার কথাটা কি? ইয়োরামেরিকায় এই বস্তু দশ বিশ বৎসর পূর্ব্বে জানাই ছিল না।

জার্ম্মাণিতে একটা আইন জারী করা হইয়াছে ১৯১৮ সনে। ফ্রান্সের আইনটাও প্রায় এই রকমেরই। যে-কোন লোক যেখানে-সেখানে যে-কোন কাজই করুক না কেন—টাকা রোজগারই করুক বা বিনা পয়সায় কাজই করুক—প্রত্যেকে কি স্ত্রী কি পুরুষ—১৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত ইস্কুলে লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য। ১৮ বছর পর্য্যন্ত ফ্রান্সের বা জার্ম্মাণির লেড়কা লেড়কী যে যে-কাজই করুক না কেন, তাকে স্কুলে পড়িতেই হইবে। দশ বছরের বাঙ্গালী ছেলেকে যদি এরূপ হুকুম করা হয়, তাহা হইলে ক'টা বাপ এ কথা শুনিবে? আর আঠার বছর বয়স, এটি যে সে জিনিষ নয়! আমাদের সে যুগে,—১৯০৫ সনের যুগে—এ বয়সে বি, এ পর্য্যন্ত পাশ করা যাইত। এই বয়স পর্য্যন্ত আজকাল প্রত্যেক জার্ম্মাণ ও ফরাসী নরনারীকে বিনা পয়সায় স্কুলে যাইতে বাধ্য করা হইয়াছে। এই সব স্কুল স্থাপন করে কে বা কাহারা? জার্ম্মাণি বা ফ্রান্সের নরনারী যেখানে নকরি করে সেখানকার মনিব এই সব বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিতে বাধ্য। মনিব না করিলে পল্লী করিবে। পল্লী

না করিলে জেলা এটা করিবে। জেলাও যদি না করে, সরকার এই সব স্কুল গড়িয়া তুলিতে বাধ্য।

১৯১৮ সনের জার্ম্মাণ-ফরাসী আইন

এই চিজটা ভারত-সন্তান বুঝিতে পারিবে কি? তাই বলিতেছি যে, "ভোকেশন্যাল স্কুল" আমাদের জননায়কগণের মাথায় আছে, এ আমি বিশ্বাস করি না। মামুলি টেক্‌নিক্যাল স্কুল ভোকেশন্যাল স্কুল নয়। রেল আফিসে বাপ কাজ করে, তার ছেলেকে সাধারণ শিক্ষা দিবার জন্য সেই আফিসের মানব স্কুল করিয়া দিতে বাধ্য। ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ১৮১০ সনের আইনে কি স্ত্রী কি পুরুষ বিনা পয়সায় সর্ব্বত্র সাধারণ শিক্ষা পাইতে অধিকারী। সে ত মামুলি, মান্ধাতার আমলের চিজ। "ভোকেশন্যাল স্কুল" অর্থে বুঝিব সার্ব্বজনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র—১৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত। এখন দেখুন ক'জন এ দেশে ভোকেশন্যাল স্কুল বোঝে।

ভারত কোথায়

আমাদের দেশ এখন কোথায়? আমি ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি, ইংলণ্ড এদের কথা প্রায়ই বলি; এতে আমার স্বদেশী ভায়ারা অনেকে খুব অসন্তুষ্ট। আপনারা ভাবেন, "লোকটা বলে কি? আমরা কি কিছুই নই?" আমার এটা ভয়ানক পাপ। কেন এই সব দেশের লোকের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করি? এই তুলনা করাটা আমার ব্যবসা। এই যে তুলনা করিতেছি, তার দ্বারা বুঝাইতে চাই পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বলিয়া কোন বস্তু পৃথিবীতে নাই। পৃথিবীটা এক কাঠির মাপে চলিয়াছে। তাতেই দেখিতে পাইতেছি কোন্ দেশ ১ম, ২য়, ৩য়, ৭ম, ১০ম ধাপে রহিয়াছে। এই পরিমাপে ঐ সব দেশ যদি হিমালয়ের ২৯০০২

ফুট উপরে থাকে, তাহা হইলে আমরা আছি একেবারে বঙ্গোপসাগরের অতলতলে। দুনিয়া এক পথে চলিয়াছে, এক আদর্শে। এর কোন তফাৎ নাই। ওদের ১৮১৫-৩২ সনে ট্রেড্ ইউনিয়ন গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাদের প্রথম ট্রেড্ ইউনিয়ন আইন কায়েম হইয়াছে ১৯২৫ সনে। ওদের দেশেও এক সময় যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত শিল্প-কারখানা ছিল না। মজুর-আন্দোলন তার পরের ধাপ, ইত্যাদি। আমরা ঠিক ওদের পিছু পিছুই চলিয়াছি—একই পথে একই জীবন-সাধনায়।

১৯১৮সনের কোঠায় পৌঁছাইতে ওদের প্রায় ১০০,৯০,৮০ বছর লাগিয়াছিল। আমাদেরও ঠিক ৭০।৮০ বছর, কি তারও বেশী বা কম সময় লাগিবে, সম্প্রতি তার আলোচনা করিতে চাই না। বলিতেছি মাত্র এই যে, আমরা কোনো কোনো বিষয়ে ১৮৪০—৭০ সনের ধাপে রহিয়াছি, কোনো কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে ১৮৭৫—৮৬ সনের কোঠায় আছি, ইত্যাদি। গুরু আমাদের ওরা। আধ্যাত্মিক জীবনে ওদের সাকৃরেতি করা আমাদের বর্ত্তমান স্বধর্ম্ম। এই হইতেছে বর্ত্তমান ভারতের কেঠো নীরস চরম সত্য।

চাই নতুন নতুন আয়ের পথ

আমরা ভোকেশন্যাল স্কুল শব্দটা মাত্র ব্যবহার করি—না বুঝি এর মামুলী অর্থ না বুঝি পারিভাষিক অর্থ। যাক্, শব্দটা ছাড়িয়া দিই, ও বিষয়ে আর আলোচনা করিব না।

আমাদের দেশের লোক ধনোৎপাদনের নতুন নতুন উপায় চায়—এইটাই হইতেছে সকলের প্রাণের কথা। বেশ!

শেষ পর্য্যন্ত কথাটা এই দাঁড়ায় যে, যে সব স্কুলে নতুন নতুন ধনোৎপাদনের উপায় হয়, তাহাই আমরা চাই। ডাক্তারী, উকিলী ছাড়া

আরও অন্যান্য পন্থার দরকার। বুঝিতে হইবে যে, যে-পথে এতদিন ধনোৎপাদন হইতেছিল, কেবলমাত্র সেই সেই পথে চলিলে ধনোৎপাদন বড় বেশী হইবে না। পৃথিবীতে ধনোৎপাদনের রূপান্তর ঘটিয়াছে ও ঘটিবে। ধনোৎপাদনের নতুন নতুন পথ চাই। নতুন নতুন পাঠশালা স্কুল কলেজ হওয়া চাই। বলিয়া রাখি যে, আমি উকিলী, ডাক্তারী, স্কুল মাষ্টারী, কেরাণীগিরি বা ঐ জাতীয় অন্যান্য সুপরিচিত ব্যবসাকে নিন্দনীয় মনে করি না। এই সব কাজও ষোল আনাই ধনোৎপাদনের সহায় অর্থাৎ পুরামাত্রায় 'ভোকেশন্যাল'।

দুনিয়ায় ফ্রান্সের ঠাঁই

ইতালি, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংলণ্ড, সকলের কথাই বলিয়াছি। আজকে প্রধানতঃ ফ্রান্সের কথা বলিব। ফ্রান্স দেশটাকে চুমরিয়া লওয়া সোজা। ফ্রান্সের মাত্র সাড়ে তিন কোটি লোক। আপনারা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, তা হইলে ইতালির কথা বলি না কেন? জবাব—ইতালি বর্ত্তমান জগতের মাপকাঠিতে অনেকটা ছোট—প্রায় যেন আমাদের বাড়ীর কাছে ঘেঁসা। ফ্রান্স বেশ উপরে, এতটা উপরে যে, অনেক বিষয়ে সে প্রায় জার্ম্মাণি পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকে। আমার বিবেচনায়, জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড, আমেরিকা—এই তিনটা হইল পৃথিবীর সেরা দেশ। আজকাল সভ্যতা-শিক্ষা-শিল্পের মাঠে যে ঘোড়দৌড় চলিয়াছে, তাহাতে ইংরেজ, জার্ম্মাণ আর মার্কিণ প্রায় সমানে সমানে নং ক,—১ অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর প্রথম।

ফ্রান্সকে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় অর্থাৎ ক,—২ ধরিয়া লওয়া আমার দস্তুর। ফ্রান্সে সাড়ে তিন কোটি লোকের বাস। এর যেখানেই যান না কেন, ময়লা-পচা দুর্গন্ধ কিছু-না-কিছু সর্ব্বত্রই পাইবেন। ওদের রেনাসাঁসের

ঘরবাড়ী অট্টালিকা খুবই মনোরম সন্দেহ নাই, কিন্তু সহরে হাঁটিতে গেলে এখানে ময়লা, ওখানে পচা। মেরামতের অভাব সহরে পল্লীতে যথেষ্ট। এসব দর্শকের চোখ এড়াইতে পারে না। ঠিক যেন কিছু কিছু আমাদের দেশেরই মত। তবে আমরা অবশ্য এ বিষয়ে ফ্রান্সের অনেক নীচে। কিন্তু জার্ম্মাণিতে আমেরিকায় ওসব হইবার জোটি নাই। ওসব দেশে একেবারে সবই চকচকে, ঝকঝকে। আমেরিকা ও জার্ম্মাণির স্কুল, টাউনহল, গবর্ণমেণ্টের বিপুলকায় প্রাসাদ, রাজপথ, গলি—সর্ব্বত্রই দেখিবেন কেবল খট্‌খটে নিটোল দৃশ্য। সবই মাজাঘসা পালিশ। আমাদের দেশের ঘরের মেজেতে শুইতে অনেকের আপত্তি আছে; কিন্তু এই সব দেশের যে-কোন রাস্তায় খালি গায়ে শুইয়া থাকিতে আমি রাজি আছি। স্বাস্থ্যরক্ষা, সৌন্দর্য্য, পারিপাট্য, মানুষের শরীরকে সুখী করিবার যত কিছু উপায় ও কৌশল তাহা এরা কায়েম করিয়াছে। ফ্রান্স এই সব বিষয়ে এই দুই দেশের অনেক পেছনে পড়িয়া আছে। যাক, তবুও ফ্রান্সকে আদর্শ করিয়া চলিলে বাঙ্গালীর এখনো লম্বা এক যুগ চলিতে পারে।

সাড়ে তিন কোটির দেশে একলাখ এঞ্জিনিয়ার

এই ফ্রান্সে,— সাড়ে তিন কোটি নরনারীর ফ্রান্সে,—প্রায় এক লাখ এঞ্জিনিয়ার আছে। ঘরবাড়ী তৈয়ারী-মেরামতের এঞ্জিনিয়ার, শিল্প-কারখানার এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার—এই সব ধরে ৮৫—৯৫ হাজার ঠিক এই একলাখ এঞ্জিনিয়ারের মধ্যে দশ হাজার পয়লা নম্বরের শিল্প-সেনাপতি।

এই সকল শিল্প-সেনাপতি বা শিল্পনায়কের অধীনে প্রায় পঞ্চাশ লাখ কর্ম্মী, পঞ্চাশ লাখ মজুর-ফৌজ আছে। গড়ে তাহা হইলে প্রত্যেক পঞ্চাশ জনের এক একজন সেনাপতি।

পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়সে এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাপীঠ থেকে কত এঞ্জিনিয়ার বাহির হইতেছে তার হিসাব করা যাউক। মোটের উপর আজকাল গড়ে প্রতি বৎসর ২২—২৫ বছরের শিল্পপতি আড়াই হাজার বাহির হয়। সাড়ে তিন কোটি নরনারীর দেশে আড়াই হাজার লোক শিল্প-কারখানায় দায়িত্ব লইবার জন্য প্রস্তুত হয়। এই আড়াই হাজারের মধ্যে ইউনিভার্সিটির টেক্‌নিক্যাল কলেজ থেকে বাহির হয় মাত্র গড়ে তিন শ'। আর বাকী ইউনিভার্সিটির বাহিরের টেক্‌নিক্যাল স্কুল থেকে বাহির হয়। কারখানায় কাজ করিতে করিতে ছোট পদ থেকে ধাপে ধাপে বড় পদে উঠিতে উঠিতে কেহ কেহ শিল্প-নায়ক হইয়া পড়ে। একদিন একটা লোক সামান্য কুলি মজুর ছিল, সময়ে সে-ই—এঞ্জিনিয়ার-শিল্পপতি দাঁড়াইয়া যায়। ফ্রান্সের কারখানা থেকে গড়ে এইরূপ শ' চারেক এঞ্জিনিয়ার বাহির হয়।

ফ্রান্সে তেরটা বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটিগুলিতে ধনোৎপাদনের কি রকম শিক্ষা দেওয়া হয়? ফ্রান্স বাঙ্গলা প্রদেশের মত কতকগুলি জেলায় বিভক্ত। এগুলিকে দেপার্ৎমাঁ বলা হয়। এরূপ ৮০।৯০ দেপার্ৎমাঁয় গোটা ফ্রান্স বিভক্ত। এ হইল শাসনকেন্দ্রের বিভাগ। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগ স্বতন্ত্র। সে বিভাগকে বলে "আকাদেমী" বা পরিষৎ। এইরূপ শিক্ষার ১২ কি ১৩ পরিষদে ফ্রান্স বিভক্ত। এর প্রত্যেক বিভাগে এক একটা ইউনিভার্সিটি আছে। এইরূপ তেরটা শিক্ষাকেন্দ্র আছে। বাঙ্গালায় সাড়ে চার কোটি লোকের বাস। ফরাসা মাপে এখানে ১৮টা আকাদেমী বা পরিষৎ এবং ততগুলা ইউনিভার্সিটি থাকা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প-বিভাগ

শ' চার পাঁচেক এঞ্জিনিয়ার ফী বৎসর ফ্রান্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হয়। অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মাণি, সুইট্‌সার ল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের অনুকরণে ফরাসীরাও নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্‌নিক্যাল ফ্যাকাল্‌টি কায়েম করিয়াছে। প্রত্যেক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জনপদ হিসাবে বিশেষ বিশেষ টেক্‌নিক্যাল জিনিষ শিখানো হয়। কোথাও বিদ্যুতের কারবার প্রধান স্থান অধিকার করে। "অঁাস্তিতিউ শিমিক" বা রসায়ন-বিদ্যালয় কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব।

সকল ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করিবার দরকার নাই। তবে বলিয়া রাখা উচিত যে, শিল্পশিক্ষা হিসাবে ফ্রান্সের সেরা কেন্দ্র প্যারিস নয়।

টেক্‌নিক্যাল তরফ হইতে ফ্রান্সের নামজাদা শিক্ষাকেন্দ্র তিনটি। আল্পস জেলার গ্রেণোব সহর এক বড় কেন্দ্র। উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের নাঁসি সহর এই হিসাবে নামজাদা। আর পশ্চিম জনপদের তুলুজও সুপ্রসিদ্ধ।

এখন দেখা যাউক অন্যান্য হাজার দেড়েক এঞ্জিনিয়ার পয়দা হয় কোথা হইতে। সে আলাদা স্কুল। ঐ ধরণের স্কুল ফ্রান্সে আছে ৯২।৯৩টি। এইগুলাকে জনপদগত শিক্ষালয় বলা যাইতে পারে। আর্থিক হিসাবে ফরাসী ধন-বিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা ফ্রান্সকে ১১ বিভাগে (রেজঁ্য'য়) ভাগ করিয়াছেন। শাসনের তরফ হইতে ৮০।৯০টি "দেপার্ৎমঁা"য় (জেলায়) ফ্রান্সকে ভাগ করা হইয়া থাকে। ধনবিজ্ঞানবিদেরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ফ্রান্সকে ১১ "রেজঁ্য" বা আর্থিক জনপদে বিভক্ত করিয়াছেন।

আর্থিক জনপদ

এই ধরুন বর্দ্ধমান বিভাগ। হুগলী ও মেদিনীপুর তো আর এক হইতে পারে না। সব জেলার আর্থিক এবং ভৌগোলিক প্রকৃতি এক বলা মস্ত ভুল। উত্তর বঙ্গের পাবনা বগুড়া কাছাকাছি হইলেও এক নয়। তেমনি পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা ও বরিশাল প্রকৃতিতে এক নয়। কোথাও হয়ত পাট বেশী হয়, কোথাও কয়লার খাদ রহিয়াছে, কোথাও মাছের ব্যবাসা, কোথাও লোহালক্কড়ের কারখানা, কোথাও বা তেল। এইরূপ এক একটা জায়গা এক একটা বিশেষ জিনিষের জন্য স্বাভাবিক কারণেই প্রসিদ্ধ। গোয়ালন্দ একটা বড় আড্ডা। একে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটা জেলা লইয়া একটা আর্থিক জনপদ গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। বাংলাদেশে একদিন না একদিন এরূপ করিতেই হইবে। গোটা বাংলাদেশকে এরূপভাবে কতকগুলি আর্থিক জনপদে ভাগ করা যাইতে পারে। এইরূপ ১০টা কি ১৫টা আর্থিক জনপদ গড়িয়া উঠিতে পারে। ফ্রান্সের ১১টি রেজ্যঁর প্রত্যেকটিতে ৮।১০টি করিয়া টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে। বাংলায় এরূপ ১৫টি আর্থিক জনপদে অন্ততঃ দেড়শ'টা টেক্‌নিক্যাল স্কুল থাকা উচিত। এইসব স্কুলে ফ্যাক্টরির মজুর থেকে যে সামান্য জুতা সেলাই করে সেও আসিতে অধিকারী।

ফ্রান্সের এগার জনপদ

উত্তর ফ্রান্স প্যারিস থেকে তিন ঘণ্টার পথ। তিন ঘণ্টাও নয়, দেড়-দুই ঘণ্টার রাস্তা। আমেদাবাদ বলিলে আমরা যা বুঝি এ মুল্লুকটা সেইরূপ বয়ন-শিল্পের কেন্দ্র। তুর্কোআঁ উত্তর জনপদের কেন্দ্র। এখানে তুলা পশমের কারবার। এইরূপ লোহা লক্কড়ের কারবারের একটি কেন্দ্র

হইতেছে নাঁসি। জামশেদপুরে যেমন কেবল লোহা ইস্পাতের কারবার চলে, এই নাঁসিতেও ঠিক তেম্নি। আল্পসের মাথায় গ্রেণোব বলিয়া একটা জায়গায় বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কারবার চলে। এখানকার বিজলী-কেন্দ্রে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা সমস্ত ফ্রান্সে গাড়ী চালাইবার আন্দোলন চলিতেছে। ক্রোর ক্রোর টাকা ঢালিয়া ফরাসীরা পল্লীর রূপ একেবারে বদলাইয়া ফেলিবে। এর বাজেট পর্য্যন্ত হইয়া আছে।

আর একটি জায়গা মঁপেইয়ে। সেখানে আঙ্গুরের চাষ-আবাদ হয়। সেই আঙ্গুরে "হ্বঁ্যা" নামক একপ্রকার মদ তৈয়ারী হয়। কিন্তু "হ্বঁ্যা" বস্তুটা "মারাত্মক" মদ নয়,আমাদের দেশে যেমন ডাবের রস, আকের রস, ফ্রান্সে "হ্বঁ্যা"ও প্রায় সেইরূপ। ফ্রান্সে এটা জলের বদলে ব্যবহৃত হয়। আমাদের তো ধারণা ফ্রান্সের মত মাতাল জাত আর দুনিয়ায় নাই। কিন্তু এদের দেশে যে মদ তৈয়ারী হয় তাতে সাধারণতঃ কত পার্সেণ্ট অ্যালকহল থাকে জানেন? পাঁচ সাত পার্সেণ্ট। অসহযোগের যুগে আমাদের দেশের কতকগুলি লোক ফ্রান্সে যাইয়া হাজির। মতলব ফ্রান্সের মদ ভারতে আমদানি করা। মদের আড্ডায় এদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করাইয়া দেওয়া গেল। কিন্তু 'আধ্যাত্মিক' ভারতে যে মদের দরকার হয়, তা ফ্রান্সের কারখানায় প্রস্তুত করিবার আইনই নাই। অতিমাত্রায় চড়া পরিমাণ অ্যালকহল আধ্যাত্মিক ভারতের জন্য আবশ্যক। এই 'হ্বঁ্যা"র দুএক গ্লাস আট দশ বছরের শিশুকে খাওয়াইলেও তার একটুও নেশা হইবে না। কিন্তু আমাদের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দরকার ৭৫ পার্সেণ্ট অ্যালকহল। ফরাসী আইনে যে চরম মদ চলিতে পারে তাও এদের কাছে ফেল মারিল। ভারতীয় পাণ্ডারা বলিলেন, 'এ সব চলিবে না।' অতঃপর তাদের বিলাতে যাওয়াই সাব্যস্ত হইল।

গোটা শ'য়েক টেক্‌নিক্যাল স্কুল

ফ্রান্সে এগারটি আর্থিক জনপদ। ভিন্ন ভিন্ন জনপদে ভিন্ন ভিন্ন কারবার। মঁপেইয়ে—কৃষি, দুধ, গোপালন, মৌচাক, বন, বনের কাঠ ইত্যাদির কেন্দ্র। তুর্কোআঁ এঞ্জিনিয়ারিং ঘটিত লোহালক্কড় ইস্পাত ইত্যাদি বিস্তার কেন্দ্র। নাঁসিতে খনিঘটিত বিস্তার স্কুল। আল্পসের গ্রেণোবে দস্তানা তৈয়ারীর ব্যবসা ও বিস্তালয়। গোটা দুনিয়ায় ঐ দস্তানা রপ্তানি হইয়া থাকে।

মধ্যফ্রান্সে এক রকম, উত্তর ফ্রান্সে অন্য রকম, আবার দক্ষিণ ফ্রান্সে আর এক রকম—এইরূপ এগারটা বিভিন্ন মুল্লুকে বিভিন্ন রকমের ধনোৎপাদন শিখানো হইয়া থাকে। স্যাঁৎ এতিয়েন রেজ্যঁ ঠিক মধ্য ফ্রান্সে অবস্থিত। আমাদের দেশ যেমন ধনধান্য পুষ্পে ভরা, এটিও সেই রকম। এখানকার স্কুলে ছাত্রসংখ্যা প্রায় শ'ছয়েক।

এই যে সব স্কুলের নাম করা যাইতেছে বিদেশীরাও সেই সব স্কুলে ঢুকিতে পারে। কোনো বাধা নাই। "এ-কল প্রাতিক দ্যকম্যার্স এ দ্যাঁদুস্ত্রী" (শিল্প-বাণিজ্যের কার্য্যকরী পাঠশালা) এই সব স্কুলের সাধারণ নাম। এই ধরণের স্কুল থেকে, প্রায় ১০০টা বিদ্যাকেন্দ্র থেকে, বছরে ১৫০০ এঞ্জিনিয়ার বাহির হইয়া আসিতেছে।

ফ্রান্সে এই শিল্পশিক্ষা ও ব্যবসাশিক্ষা দুইটা তাঁবে চলে। এক নম্বর হইতেছে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট (শিক্ষাবিভাগ), এটা চলে শিক্ষা-সচিবের তদ্‌বিরে। অপর বিভাগ কৃষি-সংক্রান্ত। তাহার সঙ্গে শিক্ষা-সচিবের এবং শিক্ষা-বিভাগের কোনো সংস্রব নাই। সেটা আগাগোড়া কৃষিসচিবের এবং কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

একমাত্র মেয়েদের জন্যও কতকগুলা কৃষি-বিস্তালয় আছে। তাহা ছাড়া, প্রত্যেক আর্থিক জনপদেই একটা দু'টা করিয়া স্বতন্ত্র স্কুল মেয়েদের

জন্য রহিয়াছে। এই সব স্কুলে ছোট ছোট শিল্প কাজ থেকে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থালী, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুপালন প্রভৃতি সবই শিক্ষা দেওয়া হয়। ফরাসী জাত এই রকম বিশটা ধনোৎপাদনের বিদ্যালয় মেয়েদের জন্য আল্‌গা করিয়া রাখিয়াছে।

ফ্রান্সে কৃষি-শিক্ষা

কৃষি-কলেজ বা কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে যা-কিছু বোঝা যায়, ফ্রান্সে ঐ ধরণের মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান আছে। গ্রিণো, মঁপেইয়ে আর রান্,—উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ফ্রান্সে,—এই তিনটি জায়গায় এই শিক্ষাকেন্দ্র কয়টা অবস্থিত। আড়াই বছর এই সব বিদ্যালয়ে থাকিতে হয়। যাঁরা হাতে কলমে কাজ করেন কেবল মাত্র তাঁদেরকেই ঐ সব স্কুলে ঢুকিতে দেওয়া হয়। চাষ আবাদ, জমিজমার কাজের জন্য অথবা সরকারী কৃষিকার্য্যের ইন্‌স্পেক্টারী ইত্যাদি কাজের জন্যও শিক্ষা লওয়া যায়। আমাদের দেশে এম, এ, এম, এস-সি লাইনে যে রকম বিদ্যা হয়, এই সব বিদ্যালয়ে আড়াই বছরে ঠিক ততখানি বিদ্যা হয়। এই সব বিদ্যালয় সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ দুনিয়ার সকল রকম পদার্থ বিদ্যা ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ, চাষ-আবাদ, গোপালন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিদ্যা। তৃতীয়তঃ, ধনবিজ্ঞান, পল্লীসভ্যতা, আর্থিক আইন-কানুন, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি পাঠ চর্চ্চা।

ফ্রান্সের শিল্প-বিদ্যালয়ের আর একটি বিশেষত্ব—সেখানে সাধারণতঃ কোনো বিদেশী অধ্যাপক নাই। ফ্রান্সে কোনো বিদেশী কোনো রকমের চাকরী পাইবে না। আইনেই আটক। বিদেশী সেখানে একটি পয়সা রোজগার করিয়া লইবে এ হইবার জো নাই, ডাক্তারী ওকালতী করিয়াও নয়। পর্য্যটক বা ছাত্র হিসাবে ফ্রান্সে বিদেশীরা থাকিতে পারে। নিজের

পয়সা খাটাইয়া তেজারতি করিতে বাধা নাই। বিদেশীরা ফ্রান্সে নিজ নিজ পরিষদ্ও স্থাপন করিতে সমর্থ। প্যারিসের আকাদেমী এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি বলিলেন, "তোমরাতো ভারি আহাম্মক লোক। এই প্যারিসে দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে। গোটা দুনিয়াকে প্যারিস অনুপ্রেরণা দিতেছে। ফ্রান্স তোমাদিগকেও ত ডাকিতেছে। তোমাদের নেমন্তন্ন করিয়া পাঠাইতেছে। তোমরা এখানে একটা পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা কর। তুমি দেশে গিয়া তোমার দেশের লোককে বল—তারা কিছু টাকা তুলিয়া ভারত-পরিষদ্, ভারতীয় অ্যাঁস্তিতিউ নামে একটা-কিছু খাড়া করুক। তাতে তোমাদের দেশ থেকে কয়েকজন অধ্যাপক, বক্তা, ছবি-আঁকনেওয়ালা, লিখনেওয়ালা এই সব কতকগুলি পাঠাইয়া দিও। এই পরিষদকে আমরা ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামিল করিয়া লইব।"

জার্ম্মাণি বনাম ফ্রান্স

শিল্প-শিক্ষার মুল্লুকে আমেরিকা ও জার্ম্মাণি ফ্রান্সের চেয়ে সেরা। জার্ম্মাণি একটা বিপুল মুল্লুক। বিশেষতঃ জার্ম্মাণির বিধি-ব্যবস্থা এত জটিল যে তাতে থৈ পাওয়া মুস্কিল। সেখানকার বড় বড় পণ্ডিত আমাকে বলিয়াছেন, "তুমি এই জার্ম্মাণিতে ১।২ বা ৩।৪ বছর থাকিয়াই আমাদেরকে জরীপ করিয়া বগলদেবে দেশে লইয়া যাইবে ভাবিয়াছ! আমরা এই মন্ত্রীগিরি করিতে করিতে চুল দাড়ি পাকাইয়া ফেলিয়াছি। বয়স হইল ৬০।৬৫ বছর। আমরা সেরূপ কল্পনা করিতে পারি না। জার্ম্মাণিতে কতগুলা টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে? এমন একজনও জার্ম্মাণ নাই যে সে অঙ্ক কষিয়া এক নিমেষে বলিয়া দিতে পারে যে ঠিক এতগুলো।" আকাশের তারা গুনিয়া যেমন শেষ করা যায় না। (শেষ করা যায় না

বলিতে পারি না; হয়ত এমন কোন জ্যোতির্ব্বিদ আছেন যিনি পারেন) ঠিক সেইরূপ কতগুলো টেক্‌নিক্যাল স্কুল জার্ম্মাণিতে রহিয়াছে তার ঠিক খবর কেউ বলিয়া দিতে পারে না।

চাই ফ্রান্সে বাঙ্গালীর অভিযান

এহেন জার্ম্মাণির পাত্তা পাওয়া আমাদের মুস্কিল হইবে। তাই ফ্রান্সের কথা বলা গেল। ভারতে ঐ "ভোকেশন্যাল স্কুল" যে যে অর্থেই ব্যবহার করুন না কেন, যদি তাহাদ্বারা আমরা কিছু করিয়া উঠিতে চাই, তাহা হইলে সম্প্রতি ঐ ফ্রান্সের পথে দুর্গা বলিয়া যাত্রা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ফ্রান্সের যে সব জনপদে কৃষিশিল্প বেশ গুলজার, যদি আমাদের বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক জেলা থেকে দু'জন করিয়া সেই সব কেন্দ্রে কিছু দিন কাটাইয়া আসেন, তাহা হইলে ধনোৎপাদন জিনিষটা আর তার বিদ্যাটা কিছু কিছু তাঁদের পেটে পড়িতে পারে। শুধু একটা ডিগ্রী নেওয়ার-উদ্দেশ্যে কয়েক বছর থাকিয়া আসিলে বেশী ফল দাঁড়াইবে না। বাস্তবিক শিখিবার, বুঝিবার আর তাহা নিজের দেশে খাটাইবার মতলব লইয়া যাইতে হইবে। তার জন্য করিৎকর্ম্মা, বাস্তব অভিজ্ঞতা-ওয়ালা লোকেদের যাইতে হইবে। আপনারা যাঁরা মফঃস্বল থেকে কলিকাতায় ডিগ্রী লইতে আসিয়াছেন, তাঁরা কলকাতার কতটুকু বোঝেন বা জানেন? হয়ত ইউনিভার্সিটি, গোলদীঘি, কলেজ ষ্ট্রীটটা চেনেন। এর বেশী নয়। দেড়শ' থেকে দু'শ' টাকা মাস খরচ করিয়া কেউ যদি বার্লিন, প্যারিস বা নিউ ইয়র্কে আদা-নুণ খাইয়া ডিগ্রি লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া যায়, তাহা হইলে সে সেখানকার দেশ বা সমাজের চরিত্র কতটুকু বুঝিয়া উঠিতে পারে? বড় বেশী নয়।

আমেরিক এবং জার্ম্মাণি সম্বন্ধে যত আলোচনা করিতে পারি, ততই

ভাল। এ সব দেশ সম্বন্ধে যত জানি, ততই ভাল; কিন্তু আঁটিয়া ধরিতে পারি কোনটাকে? যদি আঁটিয়া ধরিতে হয় তা হইলে ঐ ফ্রান্সকে। ফ্রান্সের মফঃস্বলে মফঃস্বলে, পল্লীতে পল্লীতে বাঙ্গালী চাষী, শিল্পী, কারিগরদের শিখিবার অনেক চিজ আছে। এই সকল কেন্দ্রে তিন চার বছর বাস করিয়া, সেখানকার গণ্ডা গণ্ডা এঞ্জিনিয়ার আর শত শত চাষী, মিস্ত্রি, আড়তদার ইত্যাদির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া, এদের সঙ্গে মিশিয়া এদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু আমল করিয়া তবে নিজের দেশে ধনোৎপাদন বিষয়ক বিদ্যাপীঠের প্রাথমিক ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে পারিব—এইরূপই আমার বিশ্বাস।

নিজের চোখে একবার ফ্রান্স, ইতালি জার্ম্মাণির অবস্থাটা হাতে কলমে জরীপ করিয়া আসি না কেন? দরকার হইলে এক গ্লাস "হর্ব্যা" পর্য্যন্ত খাইয়া ধনোৎপাদনের গণ্ডা গণ্ডা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দহরম মহরম করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে না কেন? বিদেশের নিবিড় অভিজ্ঞতাওয়ালা বাঙ্গালীই বাঙ্গালার পাকা সমালোচক এবং স্বদেশসেবক হইবার উপযুক্ত। এযুগে বিদেশে বাঙ্গালীর প্রবাসই আমাদের দেশোন্নতির আধ্যাত্মিক শক্তি। ফ্রান্সে একটা "বৃহত্তর বঙ্গ" গড়িয়া উঠুক।

আর্থিক জগতে আধুনিক নারী *

যা কিছু আমি বলিয়া যাই তার অনেকটা আপনাদের পছন্দসই নয়। তার কারণ,—আপনারা শুনিতে চাহেন আমি বলিয়া যাই বা আর কেহ বলিয়া যাউক যে, পাশ্চাত্য লোকেরা ভারতবাসীর শিষ্যত্ব করিবে, আমাদের পায়ে তারা মাথা ঠেকাইয়া চলিবে। আপনাদের যাঁরা অতদূর চরমে যাইতে রাজী নহেন, তাঁরা অন্ততঃ পক্ষে এটা শুনিতে ইচ্ছা করেন যে, "বেশ তো, ইয়োরোপ আর আমেরিকা, তারা হইতেছে সুয়েজ খালের ওপারের লোক, আমরা হইতেছি সুয়েজ খালের এপারের লোক। ওপারের যে পথ সে ওপারের দস্তুর; আমাদের এ পারের যে পথ সে হইতেছে আমাদের পূরবী লোকের বিশেষত্ব। ওরা যে পথে চলিয়াছে চলুক, আমরা আমাদের পথে চলিতেছি চলিব।" কাজেই আপনারা চাহেন না যে, আমি মুখামুখি পশ্চিমের সঙ্গে পূরবের তুলনা করি কিংবা কখনো কখনো বলি যে, পশ্চিম যে পথে চলিয়াছে পূরবও সেই পথেই চলিবে।

এশিয়া ইয়োরামেরিকার গুরু নয়

যাক্, আমার কথাগুলি আপনাদের পছন্দসই হউক বা না হউক আমার বক্তব্য সোজা। এই যে দুই মত, এ দু'এরই আমি ঘোরতর বিরোধী। আমার কথা এই,—এশিয়ার নরনারী ইয়োরামেরিকান অর্থাৎ পশ্চিমা নরনারীর গুরু কোন মতেই নয়। আজ ত নয়ই।

* জাতীয় শিল্পপরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত (ফেব্রুয়ারি ১৯২৬)। শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী।

আগামী ভবিষ্যৎ যতদূর দেখা যায়, সেই অনতিদূর কিংবা কিছুদূর কিংবা অতিদূর ভবিষ্যতে ভারতের কিংবা এশিয়ার লোক যে ইয়োরামেরিকার গুরু হইবার উপযুক্ত হইবে, আমি তা সম্প্রতি কল্পনাও করিতে পারি না। আর সঙ্গে সঙ্গে বলিতে চাই যে, কি মধ্যযুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর আগে, কিংবা প্রাচীন যুগে—সেই গ্রীস রোমের আমলে,—তখনও কি হিন্দু, কি চীনা, এরা কোন দিন ইয়োরোপের গুরু ছিল, এ কথা সজোরে বলা চলে না। প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম এবং মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ইয়োরোপকে সভ্যতার হিসাবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিসাবে খুব বেশী রকম হারাইয়া এশিয়ার লোক দুনিয়াতে বিশেষ কিছু দেখাইতে পারিয়াছে এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কাজেই, গুরুগিরি করার যে একটা দাবী সেটা ইতিহাসগত দাবী নয়। বড় জোর আমাদের ঠাকুরদাদা কি ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদারা কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে ইয়োরোপের আজকালকার লোকের ঠাকুরদাদার, কি ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদার সমানে সমানে চলিয়াছে। এই পর্য্যন্ত। কখনো কখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক ছটাক আধ ছটাক আগে পাছে হয়ত কিছু কিছু ছিল। কিন্তু তাদেরকে ছাড়াইয়া একটা নূতন অতি-কিছু দেখানো আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ক্ষমতায় কখনো কুলায় নাই। এ হইতেছে দুনিয়ার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আমার শেষ কথা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল প্রকার প্রত্নতত্ত্বের নির্গলিতার্থ আমার বিবেচনায় এইরূপ। আপনাদের যাঁর যেরূপ মর্জ্জি আপনারা তুলনা চালাইয়া ইতিহাস ঘাঁটিয়া দেখিতে পারেন। আমার আপত্তি নাই। যদি কখনো আপনারা আমাকে নতুন নতুন তথ্য ও যুক্তি দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার মত বদলাইতে প্রস্তুত আছি।

পশ্চিমের যে পথ পূরবেরও সেই পথ

তারপর আপনারা বলিবেন, পূরবের পথ আর পশ্চিমের পথ আলাদা আলাদা। ওরা যে পথে চলে, সে পথের পথিক নাকি আমরা নহি। আমরা যে পথে চলি সে পথের পথিক নাকি ওরা নয় ইত্যাদি। আমি বলি—এই মতটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই মতের পশ্চাতে কোন তথ্য, কোন যুক্তি নাই। সেই গ্রীক আমল হইতে উনবিংশ শতাব্দীর আমল পর্য্যন্ত—জমিজমার আইন, জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্বন্ধ, স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ, স্ত্রীর স্বত্বাধিকার, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ, বাদসাহের গোলামী করা, কুর্ণিস করা—যা-কিছু আমরা ইয়োরোপে দেখি ভারতেও ঠিক তাই দেখি। অর্থাৎ এশিয়া যা কিছু দেখাইয়াছে ইয়োরোপও যুগে যুগে ঠিক সে সবই দেখাইয়াছে।

তারপর বাষ্পযন্ত্র নামক একটা জানোয়ার পৃথিবীতে দেখা দিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। যন্ত্রটা প্রথম তুলার কারবারে দেখা দিল বিলাতে। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই যে ১২৫ ১৫০ বৎসর, আমরা—ভারত, চীন, পারস্য, জাপান—ঠিক তাই করিতেছি, যা কিছু করিয়াছে ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, আমেরিকান ও ইতালিয়ান। ওরা ট্রেড্ ইউনিয়ান কায়েম করিয়াছে, আমরাও ট্রেড্ ইউনিয়ান করিতেছি। ওরা ফ্যাক্টরী আইন করিল, আমরাও ফ্যাক্টরী আইন করিলাম। ওরা এক রকম কানুন করিল, তার নাম হইল নগর-স্বরাজ বিষয়ক আইন। আমাদের দেশেও একটা কানুন তৈয়ারী হইল, তার নাম হইল নগর-স্বরাজ বিষয়ক আইন। অবশ্য খাঁটি স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক আইন বলিতে যা বুঝায়, আমাদের দেশে ঠিক তা এখনো হয় নাই। ওরা ইস্কুল করে, বিশ্ববিদ্যালয় করে, আমরাও ইস্কুল করি, বিশ্ববিদ্যালয় করি—ঠিক একই প্রণালীতে।

এই ক্রমবিকাশ এমন জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়াছে যে, ওরা যতখানি যে লাইনের চরমে যাইতে চায় আমরাও ঠিক ততখানি সে লাইনের চরমে যাইতে চাই। আর যেখানে ওদের সমান সমান যাইতে না পারি, সেখানে ওদের বোলচাল, ওদের বুখ্নীগুলি বেমালুম গাপ্ করিয়া থাকি। এই হইতেছে বর্ত্তমান এশিয়ার ধরণ-ধারণ। বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় আধুনিক এশিয়াকে আমি প্রায় সকল বিষয়েই আধুনিক ইয়োরামেরিকার শিষ্য সমঝিতেই অভ্যস্ত।

কাজেই আমার কাছে যদি কেহ বলেন, পশ্চিমের পথ এদিকে, পূরবের পথ ওদিকে,—তাঁকে আমি সম্মান করিতে অসমর্থ। দেশের লোক কিন্তু আমাদেরকে ডাইনে বাঁয়ে, এখানে ওখানে, কবিতা লিখিতে লিখিতে, গল্প লিখিতে লিখিতে, বক্তৃতা করিতে করিতে, কংগ্রেসে দলাদলি করিতে করিতে খবরের কাগজে বকিতে বকিতে শিখাইতেছে ঐ এক "খাড়া বড়ি থোড়": বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়, গোলদীঘির হাওয়ায় যা কিছু আমরা শিখিতেছি, সে সবের অর্থ হইতেছে, "ওদের পথ এক, আমাদের পথ আর।" আমি দেখিতে পাইতেছি যে, ওদের পথ যা, আমাদের পথও তাই। মান্ধাতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত একটা পথেই পৃথিবী চলিতেছে ঘটনাচক্রে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ওরা চলিতেছে আগে আগে, আমরা ওদের লেজুড় ধরিয়া লেজুড়ের পিছনে পিছনে ছুটিতে চেষ্টা করিতেছি। কাজেই কথাগুলি আপনাদের ভাল লাগে না, লাগিবার কথাও নয়। কিন্তু এ কথা আমার পক্ষে একমাত্র বেদান্ত।

আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ

এ কয়দিন আলোচনা করিতেছি, আর্থিক উন্নতির বনিয়াদ। বর্ত্তমান যুগে, বিশেষতঃ বিগত ৩০।৩৫ বৎসরের ভিতর, কোন্ কোন্

লাইন, কোন্ কোন্ কর্ম্ম-প্রণালী মানুষকে আর্থিক হিসাবে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। তার প্রথম কথা দেখিতেছি,—আজকাল মানুষের টাকা-পয়সাগুলি নিজের নিজের তোরঙ্গের ভিতর থাকে না অথবা হাঁড়ির ভিতর মাটির নীচে পোতা থাকে না। সেগুলি যেমন করিয়া হউক, পাখায় উড়িয়াই আসুক কিংবা কোন পাখীতে লইয়াই আসুক, কোন এক জায়গায় কেন্দ্রীকৃত হয়। অর্থাৎ তাতে ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় কথা, দুনিয়ার নরনারী সাবেক কালে, এমন কি, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে চলিত। বেশ আছে, যদি হঠাৎ সর্দ্দি লাগে, কি হইবে? সরকারের চাকুরী করিতে পারিব না, মাহিনা কাটা যাইবে। কুলী-কেরাণী, মজুর-চাষী প্রত্যেকের ভাবনা রেলে যাইতে যাইতে যদি ধাক্কা লাগে, কলিশন হয়! হঠাৎ যদি পথে মারা যাই, পরিবার না খাইয়া মরিবে! যদি হঠাৎ কোন রকমে হাত পা ভাঙ্গি, কি হইবে? ডাক্তারের ফি যোগাইতে হইবে, ছেলে-মেয়ে পরিবারের ভাবনা ভাবিতে হইবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। বর্ত্তমান জগতের সমাজ-ব্যবস্থা বলিতেছে, 'কুছ্ পরোয়া নেই, মানুষগুলিকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, যে প্রত্যেক লোক—কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কেরাণী, মজুর, চাষী প্রত্যেকে নির্ভাবনায় নিরুপদ্রবে নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিয়া কাজ করিয়া খাইতে পারে। তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভাবিবার দরকার নাই, কেবল কাজ করিয়া যাও, যদি মরিয়া যাও, তার জন্য, তোমার পরিবারের জন্য কেহ না কেহ দায়ী, ইত্যাদি।

তারপর ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগে জমি-জমাব নতুন আইন কায়েম হইয়াছে। সেকালের দস্তুর ছিল এই:—তুমি বড়লোক—তোমার যদি কিছু জমি থাকে, বেশী বা কম,—পাঁচ ছেলে থাকিলে তাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। কিংবা ইচ্ছামত যাকে তাকে দিয়া দেওয়া চলিত

আজ-কালকার লোক বলিতেছে—২৫।৩০।৪০ বৎসর ধরিয়া বলিতেছে—বোলশেহ্বিজ্‌মের জন্মের অনেকদিন আগে হইতে বলিতেছে—আইন পর্য্যন্ত করিয়াছে যে, যে লোকটার কম জমি আছে তাকে কিছু বেশী জমি দিতে হইবে ; যে লোকটার জমি নাই তাকে জমিদার রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু জমি আসিবে কোথা হইতে? যার জমি আছে তার কাছ হইতে জমি লইয়া যাদের জমি নাই অথবা কম জমি আছে তাদেরকে দাও। কে দিবে? রাষ্ট্র। আর এক রকম হইল ;—আমার জমি, আমি যাকে তাকে দিয়া যাইতে পারি, এটা মান্ধাতার আমল হইতে চাণক্যের সময় হইতে দুনিয়ার সর্ব্বত্র চলিয়া আসিতেছে। আজকালকার লোক বলিতেছে এ সব আইনে চলিবে না, যাকে তাকে দিয়া যাইবে, কিংবা ছেলেদের মধ্যে ভাগ ভাগ করিয়া টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া দিবে তা হইবে না। জমিগুলো বেচিতে হইলে তাতে পর্য্যন্ত সরকারের কথা মানিয়া লইতে হইবে। এইভাবে নতুন জমি-জমার আইন-কানুন করিয়া মানুষগুলোকে মজবুত করিয়া তোলা হইতেছে।

যারা ফ্যাক্‌টরীতে কাজ করে, অফিসে কেরাণীগিরি করে, তাদের জীবন এতদিন পর্য্যন্ত বড় জোর ট্রেড্‌ ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। তার মধ্যে থাকিয়া মালিকদের সঙ্গে দরদস্তুর কষাকষি, খুব বেশী হইলে ধর্ম্মঘট চালান। আজ পর্য্যন্ত একেই পৃথিবীর লোক চরম ধরণের শিল্প-স্বরাজ মনে করিত। মজুর শ্রমজীবী কুলী কেরাণী এদের পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভব নয়. কিন্তু গত দশ পনর বৎসরের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, এতে চলিতেছে না। আরো এক নতুন দুনিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ দুনিয়ার মজুর আর কেরাণী সকলে মালিকের সঙ্গে এক চেয়ারে বসিতেছে। কারখানা, আফিস, যা কিছু কর্ম্মকেন্দ্র আছে, সব জিনিষ শাসন করিতে তারা সমান অধিকারী। কেবল তা নয়, কবে কোথায়

কত টাকা খরচ হইয়াছে ও হইবে তার হিসাব-নিকাশ করিতেও অধিকারী এই মজুর কেরাণী ও শ্রমজীবী। এ হইতেছে আর্থিক উন্নতির আর এক বনিয়াদ।

প্রত্যেক মানুষকে হাতের জোরে আর মাথার জোরে কাজ করিতে হয়। পৃথিবীতে এটা হইতেছে শক্তিমানের লক্ষণ। এই দুই জিনিষের জোরে শক্তিমানেরা দুনিয়ার পূজা পায়। এখনকার লক্ষ্য হইতেছে জগতের প্রত্যেক মানুষকে শ্রেষ্ঠ করিয়া তোলা। একথা ২০।২৫ ৫০।৬০ বৎসর আগে এমন সজোরে, এমন সজাগ ভাবে দুনিয়ার নরনারী ভাবে নাই। ভাবিতেছে এখন। প্রত্যেক লোককে মাথার জোরে এবং হাতের জোরে স্বাধীন করিতে হইবে। তাহা করিবার উপায় কি? যখন যে প্রদেশে, যে জেলায়, যে ধরণেরই স্কুল করা দরকার, তখন সেই জেলায় সেই প্রদেশে সেই ধরণেরই স্কুল কায়েম কর। এতদিন পর্য্যন্ত ১৪ বৎসর বয়সের পুরুষ এবং স্ত্রী প্রত্যেক দেশে বাধ্যতা-মূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষা পাইতে অধিকারী ছিল। এখন হইয়াছে, কেবল মাত্র ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত নয়, কম্ সে কম্ ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রী কাজ করিবার সময়েও প্রত্যেকে বিনা পয়সায় লেখা-পড়া শিখিতে বাধ্য।

আজকার আলোচ্য "আর্থিক জগতে আধুনিক নারী।" সেদিনকার আলোচনায় প্রধানতঃ বলিয়াছি ফ্রান্সের কথা। আর আজকে প্রধানতঃ বলিতে চাই জার্ম্মাণির কথা। জার্ম্মাণির মেয়েরা আর্থিক জগতে কত রকমে, কত প্রণালীতে কৃতিত্ব দেখাইতেছে সে কথা আপনাদের কাছে বলিব।

অদ্বৈতবাদের বুজরুকি

প্রথমেই একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। যাদের মাথা আছে তারা সাধারণতঃ যখন যে বিষয় লইয়া চিন্তা করে, তখন সেই বিষয় লইয়া

মসগুল থাকে, আর বলে, "এই যে তথ্য, এই যে সত্য, যা আমি আলোচনা করিতেছি এটা দুনিয়ার একমাত্র তথ্য ও সত্য। অর্থাৎ অন্যে যা কিছু বলিতেছে সে-সব কাজের কথা নয়। আমি যা বলিতেছি তাই শুনিয়া যাও।" যেমন কোন এক মহাপুরুষ কোন দিন বলিয়াছিলেন—"আমিই একমাত্র পথ। দুনিয়ার প্রাণ যদি কিছু থাকে তবে সে আমি। আর সত্য নামক যদি কোন বস্তু থাকে তাও হইতেছি আমি।" আপনারা অনেকেই খৃষ্টীয় সাহিত্য জানেন। এই হইতেছে স্বয়ং খৃষ্টের বাণী। তা অন্যান্য মহাপুরুষদের সঙ্গে মিলিয়া যায়। কেন না আর একজন বলিয়াছেন, "দুনিয়ার আল্লা বা ঈশ্বর এক, তাঁর প্রতিনিধি হইতেছি আমি।" এই গেল মহম্মদের বাণী। ঠিক খৃষ্টিয়ান ও মুসলমানের মত আমরাও আমাদের শাস্ত্র আওড়াইয়া থাকি। আমরাও জানি 'সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ'—"দুনিয়ার যা-কিছু আছে সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া কুর্নিশ কর আমার পায়ে। আমি দুনিয়ার সব আমি যা কিছু করিতেছি তা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। মানুষকে যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে আমার প্রণালীতে রক্ষা হইবে" ইত্যাদি হইতেছে গীতার বচন।

এই ধরণের অদ্বৈতবাদ একমাত্র ধর্ম্মের মুল্লুকেই দেখা যায় এমন নয়। অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রেও অনেক সময়ে এইরূপ অদ্বৈত নীতি প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রণালীতে যদি সংসার চালাইতে হয়, তাহা হইলে একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিতে হইবে। যেটা শুনিলে সকলের লজ্জিত হইবার কথা। যেমন ধরুন আর্থিক জগতে নারীর কৃতিত্ব। এই বিষয়টা আলোচনা করিতে গিয়া হয়ত কেহ চরম ভাবে বলিবেন যে, পৃথিবীতে যা-কিছু হইয়াছে একমাত্র মেয়েদের দৌলতে ঘটিয়াছে। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে এর ভিতর সত্য পাই

কতটা? ধর্ম্মের অদ্বৈত কতটা সত্য? আপনারা মনে করিবেন গীতা-বাইবেল-কোরাণের অদ্বৈত চরম সত্য। কিন্তু আমি পাষণ্ড, আমি বিবেচনা করি যে, এর ভিতর বেশী সত্য নাই। থাকিলেও সেটা আংশিক সত্য এবং অ-সত্যের মধ্যে পরিগণিত করা উচিত। তেমনি যদি কোন লোক বলে—মেয়েদের উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে, তাহা হইলে আমি বলিব—এর ভিতর সত্য বেশী নাই। যেটুকু সত্য আছে তাকে অসত্যে পরিণত করিয়া প্রচার করা হইয়াছে। আর একটা দৃষ্টান্ত অন্যদিক্ হইতে দিতেছি। আজকাল কলিকাতায় দুধ পাওয়া যায় না কেন? গরু নাই। কেন গরু নাই? গোচারণের মাঠ নাই। তবে কি করা উচিত? এই লইয়া যদি কোন একটা লোক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে চায়, সে বলিবে, গো সেবা, গোচারণের মাঠ, গো-পূজা ইত্যাদি যা-কিছু এ সব যতদিন পর্যান্ত ভারতবর্ষে না দেখা দিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত গরুর উন্নতি হইবে না। আর যত দিন পর্য্যন্ত গরুর উন্নতি না হইবে ততদিন ভারতের আর দুনিয়ার উন্নতি অসম্ভব। এটা প্রমাণ করা কঠিন বিবেচনা করি না, কেন না গরু যদি হৃষ্ট-পুষ্ট হয় দুধ বেশী দিবে, দুধের গুণ ভাল হইবে, পরিমাণ বাড়িবে এবং সেই দুধ যদি পাওয়া যায় বাঙ্গালীর শিশু, স্ত্রী, পুরুষ বাঁচিবে। খাইয়া যদি বাঁচে তবে তারা হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ হইবে, তা হইলে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিবে। তার পর বি-এ পাশ করিয়া উকিল হইবে, উকিল হইলে গোলদীঘিতে বক্তৃতা দিবে, কংগ্রেসে বক্তৃতা করিবে। এই ভাবের বক্তৃতা করিবার লোক যদি বাংলায় না থাকে, স্বরাজ আন্দোলন চালাইবে কে? অতএব বলা যাইতে পারে যে, এই গরু আর স্বরাজ এক সঙ্গে গাঁথা। ইত্যাদি

আপনারা হাসিতেছেন। আমি বলিতে চাহিতেছি, এই রকম হাস্যজনক যুক্তি মান্ধাতার আমলে পৃথিবীর অনেক জায়গায় চলিয়াছে

এবং আজও ভারতে প্রভূতরূপে চলিতেছে। সে কথা আপনারা শয়নে-স্বপনে, নিশি-জাগরণে বেশ ভাল করিয়া জানেন। আমি হইতেছি অদ্বৈতবাদের কট্টর যম। আমার বিবেচনায়—আর্থিক উন্নতি একমাত্র জমি-জমার উপর কি একমাত্র মেয়েজাতির উপর নির্ভর করিতেছে না। এক সঙ্গে হাজার শক্তি কার্য্য করিতেছে। হাজার প্রতিষ্ঠান, হাজার আন্দোলন, হাজার নরনারীর ব্যক্তিত্ব একসঙ্গে কোন দেশের বা প্রদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। হয় ত সকলে সকল কার্য্য করিতে পারে না। আপনি চান জমি-জমা লইয়া লাগিয়া থাকিতে, আর একজন চায় শ্রমজীবীদের লইয়া থাকিতে, আর একজন বলিতেছে টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল করিবে। আর একজন আর কিছু করিতে চায়। যার যেমন ইচ্ছা, যার যেমন শক্তি, যার যেমন মর্জ্জি সে সেই রকম কাজ করিতে অধিকারী। কিন্তু এ জিনিষটিকে ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া তুলিয়া যদি বলি—"দুনিয়া চলিতেছে শুধু ঐ চরখার জোরে" বা ঐ রকম কিছু, তা হইলে গোলমাল বাধে যুক্তি-শাস্ত্রের হাতে খড়ির বেলায়ই। আমি বলিতে চাই যে, আমাদের জননায়কই হউক, শিক্ষকই হউক, সমাজ-সংস্কারকই হউক, কবিই হউক, বক্তাই হউক, আর ছাত্রই হউক তাদের যতগুলি যুক্তি —তার প্রায় সকলের ভিতর ঠিক এইরকম একটা বিশ্বাস, এই রকম একটা ধারণা কাজ করিতেছে। অদ্বৈতবাদের পাল্লায় পড়িয়া আমাদের ছেলেরা বুড়োরা অনেকেই যুক্তি-সম্পদকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

পাশ্চাত্য নারীর অ-স্বাধীনতা

আজ আমি দেখাইতে চাই—জার্ম্মাণ জাতির মেয়েরা কত উপায়ে টাকা রোজগার করিয়া খাইতেছে, কত উপায়ে দেশকে ধন-সম্পদে উন্নত করিয়া তুলিতেছে। একটা কথা সব দেশেই আছে, আমাদের দেশেও

আছে, সেটা হইতেছে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন—সোজা কথায় "ফেমিনিজম।" এর ভিতর অনেক কথা আছে—রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি। সব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, একটি কথা শুধু বলিব। যাঁরা নারী-স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রচারক—পুরুষই হউন, স্ত্রীই হউন—তাঁরা প্রধানতঃ এ কথা বলেন—মেয়েরা আজকালকার দুনিয়ায় নিজ নিজ সম্পত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করে নাই। এমন কি, তাদের নিজ সম্পত্তি বলিয়া কিছু নাই। দ্বিতীয় কথা, তাঁরা বলেন, "নিজ ইচ্ছানুসারে, স্বাধীনভাবে যে কোন ব্যবসা, যে কোন শিল্প, যে কোন কারবারের সুযোগ আইনতঃ মেয়েদের নাই।" এই যে দু'টি কথা, এ হইতেছে আর্থিক জীবন বিষয়ক; অর্থাৎ নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের বড় ভিত্তি হইতেছে—আর্থিক স্বাধীনতার দাবী।

এই কথা হইতে একটা সোজা কথা স্পষ্ট হইতেছে। যেদেশে যেদেশে এই আন্দোলন উঠিয়াছে, সেই সকল দেশে নারীর স্বাধীনতা ছিল না। যদি থাকিত, তা হইলে আন্দোলন উঠিবে কেন? কোথায় উঠিয়াছে? বিলাতে, আমেরিকায়, জার্ম্মাণিতে, ফ্রান্সে, ইতালিতে। এশিয়ায় আমরা একালে স্বাধীনভাবে কোন আন্দোলন সৃষ্টি করি এতখানি মগজ আমাদের নাই—না ভারতবর্ষে, না চীনে, না পারস্যে, না জাপানে। এই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আজ পর্য্যন্ত এশিয়ায় এমন কোন মাথা গজায় নাই যা স্বাধীনভাবে আন্দোলনের মতন একটা আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে। পৃথিবীর যা-কিছু উন্নতিজনক শক্তি, সে সব বর্ত্তমান যুগে—এই নারী-স্বাধীনতার আন্দোলনটাই ধরুন,—ইয়োরোপে উঠিয়াছে, আমেরিকায় উঠিয়াছে। যাক, দেখা যাইতেছে যে, ইয়োরোপীয় সমাজে, আমেরিকান সমাজে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় সমাজে নারী-স্বাধীনতা নামে একটা বস্তু কোনো দিনই ছিল না। এ-কথা প্রথমেই স্বীকার করা দরকার।

এ কথাটা বেশ খুলিয়া বলা প্রয়োজন, কেননা আমরা অনেক সময় আমাদের ঠাকুরদাদাদেরকে গাল দিতে দিতে স্বজাতিটাকে অপদার্থ মনে করিতে করিতে এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি যে, পৃথিবীর যা কিছু জঞ্জাল, নোংরা, যা কিছু ঘৃণিত সব জিনিষ ভারতের একচেটে বিবেচনা করিতে শিখিয়াছি। যেমন বলিয়া থাকি যে, নারী-স্বাধীনতার অভাব হিন্দু, মুসলমান ও চীনাদের বিশেষত্ব। আসল কথা, এই দোষ বা পাপটা সুয়েজ খালের অপর পারেও চিরকাল যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মজুত ছিল। নারী-স্বাধীনতার অভাব কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, আর্থিক ক্ষেত্রেও, উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দুনিয়ার সর্ব্বত্রই একভাবে চলিয়াছে। এর যদি দৃষ্টান্ত চান আমি দেখাইব-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে আলাবামা প্রদেশে ছেলে-মেয়ের অভিভাবক জননী কোন দিনই নয়, অভিভাবক তার বাপ। এই গেল যুক্ত-রাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের কথা। উত্তর দিকে যান, নিউ ইংলণ্ড খুব উন্নত, সেখানকার ব্যাপার এই। মেয়ে যদি চাকুরী করিয়া টাকা রোজগার করিয়া আনে, তার কর্ত্তা সে নিজে নয় তার স্বামী। অর্থাৎ গৃহস্থ-পরিবারে টাকা রোজগার করিয়া আনিতেছে স্ত্রী, কর্ত্তামি করিতেছে স্বামী। এই বিধান ১৯২৬ সনেও চলিতেছে। এ ধরণের বিধান বা অবিধান যুক্ত-রাষ্ট্রের ৪৮ জেলা হইতেই রকম রকম জোগাড় করিতে পারি।

জার্ম্মাণির কথা ধরুন। এই সে দিন ১৯১৪ সনে যখন লড়াই বাধে তখন সবে মাত্র মেয়েদেরকে ইউনিভার্সিটিতে পাঠাইবার একটা আন্দোলন জবর ভাবে দেখা দেয়। এই কথায় আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? আশ্চর্য্য হইবার কথা এই যে, জার্ম্মাণির এমন দিন গিয়াছে যে দিনটা অতিমাত্রায় "প্রাগ্-ঐতিহাসিক" যুগের সামিল নয়— যে যুগটার কথা তারা বেশ ভাল করিয়া জানে। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের বেশী নয়; জার্ম্মাণিতে এমন যুগ

গিয়াছে যখন ভিয়েনা, মিউনিক. বার্লিনের একটা মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে যায়, জার্ম্মাণরা এটা কল্পনা করিতে পারিত না। এই সমাজ-ব্যবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। যেদিন জার্ম্মাণিতে আর অষ্ট্রীয়ায় মেয়েরা "এণ্ট্রান্স" কি "এল-এ" পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল, সে দিন সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যে যেখানে ছিল, রাস্তার লোক, দোকানদার, মুটে মজুর, গাড়োয়ান, রাস্তার দুধারে দাঁড়াইয়া গেল দেখিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মেয়ে পড়িতে যায় সেটা কি রকম জানোয়ার! এতে বুঝিতে হইবে জার্ম্মাণিতে অষ্ট্রীয়ায় নারী-স্বাধীনতা কত নতুন জিনিষ। এ জিনিষটার অভাব একমাত্র ভারতে নয়, অন্যান্য দেশে, এমন কি জার্ম্মাণ সমাজেও ছিল এবং এখনো অনেকটা আছে। তার কথা জার্ম্মাণির নরনারী আজও ভাল করিয়া জানে। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগে মেয়েরা পাস করিয়া ইউনিভার্সিটীতে "বি-এ" পড়িতে আসিয়াছে—এটা কি জিনিস দেখিবার জন্য একেবারে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল, খবরের কাগজে লেখালেখি চলিল, আশ্চর্য্য জিনিষ। আমাদের দেশে এখনও সেই অবস্থা চলিতেছে অস্বীকার করিবার কারণ নাই। বুঝিতে হইবে আমরা এ বিষয়ে জার্ম্মাণদের অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পিছনে আছি। এখন মনে করুন ১৯২৪ সনে জার্ম্মাণিতে ঠিক নয়, প্রুসিয়াতে আড়াই হাজার মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত। এখন সেখানে পাঁচ হাজার হইয়াছে। আমাদের তুলনায় এই সংখ্যা খুব বড়, কিন্তু আমেরিকার তুলনায় পাঁচ হাজার কিছুই নয়। বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীতে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন এত নতুন জিনিষ যে, এখন পর্য্যন্ত এটা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

পরিবার-নিষ্ঠায় ল্যাটিন নারী

ফ্রান্সের একজন মস্ত বড় সমাজ-তাত্ত্বিক জোসেফ বার্থেলেমি মেয়ে জাতিকে অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে বিপুল গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাতে

তিনি বলিয়াছেন—ল্যাটিন জাত ঘর-প্রেমিক, পরিবার-নিষ্ঠ। নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন ল্যাটিন সমাজে চলিবে না। তাঁর বই বাহির হইয়াছে ১৯২০ সনে। ল্যাটিন জাতে ফ্রান্স, স্পেন ও ইতালী এই তিন দেশ ধরা হইয়াছে। অন্যান্য দেশে খাটিলেও খাটিতে পারে। কিন্তু ল্যাটিন জাতির মেয়েরা গৃহস্থালী-ভক্ত তারা মেয়েদেরকে ঘরে রাখিতে অভ্যস্ত। ইতালিতে "নারী জীবন" বলিয়া একখানি বড় মাসিক কাগজ বাহির হয়। তার সম্পাদিকা একদিন আমাকে বলিতেছিলেন;—"ইতালী দেশে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন যা দেখি—তা আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। ইতালির মেয়েদের আমেরিকানদের মত জীব হওয়ার জো নাই, সভা-সমিতিতে যাওয়া, কংগ্রেস করা এ সবে আমরা অগ্রসর হইব না। যদিও দেখিতে পাই, বিশ্ব-নারী-সভার কর্ম্মকেন্দ্র রোমে রহিয়াছে তা সত্ত্বেও বলিতে হইবে, এটা আমেরিকা হইতে আমদানি। আমাদের সম্পাদক বা কর্ম্মকর্ত্তা রাখা দরকার, সেজন্য রাখিয়াছি।" ইত্যাদি

তবেই দেখিতে পাইতেছেন যে, কি মার্কিণ, কি টিউটনিক, কি জার্ম্মাণ (আসল টিউটনিক) কি ফরাসী ও ইতালিয়ান ল্যাটিন জাতি, এদের যে পথ আর ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধের যে পথ,—দুইই এক। একই পথে আমরা সবাই চলিয়াছি, হয়ত আমরা বেশী পিছনে আছি। কিন্তু সর্ব্বদাই আমাদের চোখের সম্মুখে রাখা দরকার দুনিয়ায় নারী-স্বাধীনতার ক্রমোন্নতির খবর। মেয়েরা স্বাধীন কতখানি হইয়াছে জার্ম্মাণিতে আর কত নতুন নতুন স্বাধীন উপায়ে নিজের দেশকে ধনধান্যে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে—তা ভারতের পুরুষ আর নারীমহলে সর্ব্বদা আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এই আলোচনাই আমাদেরকে কর্ম্মক্ষেত্রে অনেকটা আগাইয়া দিতে সাহায্য করিবে।

জার্ম্মাণ নারীর আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্র

প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা জার্ম্মাণ মেয়েদের পক্ষে আর অসম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ যে সব টেকনিক্যাল কলেজ আছে তাতেও মেয়েরা পড়িতেছে। পড়িয়া ডাক্তার উকিল হইতে পারে, রাইখষ্টাগের (পার্লামেন্টের) মেম্বর হইতে পারে। তারপর ব্যবসা করিয়া, খবরের কাগজ চালাইয়া, লেখিকা হইয়া অনেকে টাকা রোজগার করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো অন্যান্য দিকে জার্ম্মাণ মেয়েদের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চাষবাসেও লক্ষ লক্ষ মেয়ে খাটিয়া নিজের দেশকে উন্নত করিতেছে, সেকথা সম্প্রতি না বলিলেও চলিবে। সকল দেশের লোককে উঁচু-নীচু-মাঝারি এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা কি কি কাজ করে, আর কি কি উপায়ে পয়সা রোজগার করে, সেই কথাই বলিব। প্রধানতঃ চারটী বিষয়ে বলিতে চাই: (১) গৃহস্থালীর কথা (২) মেয়েলী শিল্পের কথা (৩) বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল কাজের কথা (৪) সমাজ-সেবার কথা। আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই চার রকম কর্ম্মক্ষেত্রে জার্ম্মাণির মেয়েরা নতুন নতুন উপায়ে ধনসম্পদ্ সৃষ্টি করিতেছে।

(১) গৃহস্থালী

প্রথমতঃ গৃহস্থালী। আমাদের একটা বিশ্বাস আছে, সাদা-চামড়া যে-সব মেয়ে তারা বড় বাবু। বাবু টাবু বলিলে কি বুঝা যায়, তা আপনারা বেশ বুঝেন, ব্যাখ্যার দরকার নাই। তারা কখনও কোন কাজ করে না, রেষ্টরাণ্টে বা হোটেলে খায়, নাচিয়া গাহিয়া বেড়ায়।

অর্থাৎ জীবনটা তাদের হইতেছে ছেলে-খেলা, সংসার বলিয়া কিছু নাই, কাজ-কর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই। গৃহস্থালী রান্নাবাড়ি নামে কোন জিনিষ ইয়োরামেরিকায় আছে কি না এই ধরণের সন্দেহ পর্য্যন্ত আমরা করিয়া থাকি। মোটের উপর পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এইরূপ। আমাদের ভারত হইতে যে সব দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, মহাত্মা শ্রেণীর কেষ্ট বিষ্টু নর-নারী অথবা ছাত্রছাত্রী ইয়োরামেরিকায় দু'চার মাস বা দু'চার বছর কাটাইয়া আসিয়াছেন, তাঁরাও পশ্চিম মুলুকের মেয়ে জাত সম্বন্ধে এই ধরণেরই তথ্য ভারতীয় সমাজে ছড়াইয়াছেন।

আমার অভিজ্ঞতা বস্তুনিষ্ঠ। দেশ-বিদেশের ছোট-বড়-মাঝারী বহুবিধ-পরিবারের হাঁড়ীর খবর আমার কিছু কিছু জানা আছে। তা ছাড়া মজুর, চাষী, বড়লোক, গরীব লোক, ছুতার, কেরাণী, ইস্কুলমাষ্টার ইত্যাদি নানারকম লোকজনের সঙ্গে এই সকল বিষয়ে লম্বা লম্বা তর্কপ্রশ্ন চালাইয়া জিনিষটা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি বলিতে চাহিতেছি এই যে, গৃহস্থালীর কাজে জার্ম্মাণির মেয়েরা সকাল ৫টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত—উঁচু, নীচু, মাঝারী শ্রেণীর মেয়েরা, যত খাটে তা যদি দেখেন তাহা হইলে আপনাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের ভারতীয় বা বাঙ্গালী পাঁচ পাঁচটা মেয়ে ওদের একটার সমান হইতে পারে কিনা সন্দেহের বিষয়। এত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী তারা খাটিতে অভ্যস্ত। মেজে ঝাড় দেওয়া, দেওয়াল ঝাড় দেওয়া, ছাদ ঝাড় দেওয়া তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। তারপর আসবাব পরিষ্কার করা আর এক রকম কাজ। কাপড় পরিষ্কার করা আর এক রকম কাজ। যে ধরণের "পরিষ্কার" করার কথা বলিতেছি, তা আমার বিবেচনায় ভারতে একদম অজ্ঞাত। তারপর রান্নাঘর—সে এক অদ্ভুত

কারখানা। খুব গরীবের ঘরেও গিয়াছি, কাউকে কিছু না বলিয়া খবর না দিয়া ঢুকিয়াছি। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব এমন হইয়াছে যে, বলিয়া কহিয়া যাওয়ার দরকার হয় নাই। এমন নয় যে, আমি যাইব বলিয়া ঘরদোর সব পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। যখন তখন গিয়া হাজির হইয়াছি। এমন কখনও দেখি নাই যে, কোন জার্ম্মাণ পরিবারে শিঙ্কিল-মিছিল নাই। রান্নাঘরে যখনই যান দেখিবেন এটা যেন উঁচু দরের একটি ল্যাবরেটরী। কোনো ঘরের কোথাও একটু ঝুল থাকিতে পারে, এটা কোন জার্ম্মাণ মেয়ের কল্পনায় অসম্ভব। আমরা যাকে গিন্নী বা গৃহিণী বলি—জার্ম্মাণিতে তাকে বলে—"হাউসফ্রাও।" সে জীব বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষার যুগে এমন অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে যে, চোখে না দেখিলে তাহা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

গরুর গাড়ীর বেশী যারা কিছু চোখে দেখে নাই তাদের পক্ষে অটোমোবিল এরোপ্লেন কল্পনা করা কঠিন। মামুলি গিন্নীগিরিতে অভ্যস্ত নরনারীর পক্ষে বিংশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ "হাউসফ্রাও"য়ের কৃতিত্ব কল্পনা করাও প্রায় ঠিক সেই দরের কঠিন চিজ।

এরা চব্বিশ ঘণ্টাই খাটিতেছে। মাথার খাটুনিও কম নয়। খবরের কাগজে—মাসিকে সাপ্তাহিকে—পড়িতেছে অমুক ঘণ্ট কি অমুক তরকারী রাঁধিবার কায়দা। খাবারটা একসঙ্গে সস্তা ও পুষ্টিকর। পড়িতেছে—ছেলেকে শিখাইবার জন্য এমন কৌশল হইয়াছে যে তাকে আর ইস্কুলে পাঠাইতে হইবে না, সে ঘরে বসিয়া নিজেই শিখিতে পারে। পড়িতেছে—কি একটা নতুন গানের স্বর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঘরে বসিয়া অল্প খরচে এরা নানাদিকে নিজ নিজ ক্ষমতা বাড়াইতেছে। এরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতেছে। এইবার ভাবিয়া দেখুন, যদি অন্য লোক দিয়া কুঠুরী পরিষ্কার, আসবাব ঝাড়া, সন্তান-সন্ততি পালন, রান্নাবাড়ি

সব কাজ করাইতে হইত তাহা হইলে কত টাকা লাগিত, অর্থাৎ গিন্নী-পনার জোরে মেয়েরা পয়সা বাঁচাইতেছে।

গিন্নীপনায় পয়সা রোজগার

কেহ কেহ গিন্নীগিরি করিয়া পয়সা রোজগার করিতেছে। আজকাল ইয়োরামেরিকায় গিন্নীপনাও একটা ব্যবসা। কলিকাতায় ২০০।২৫০ হোটেল মেস চলিতেছে। যারা গিন্নীপনায় ওস্তাদ, তাদের দ্বারা জার্ম্মাণিতে এই ধরণের হোটেল রেষ্টর‍্যাণ্ট বা ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। এই কাজে তারা পয়সা রোজগার করে। নিজের বাড়ীতে ঘরকন্না করিতে হইলে যা যা করিতে হইত, এখানে ঠিক তাই তাই করিতে হয়। এখানে লওয়া হয় "কর্ত্রীর" পদ। তার সহকারিণী অন্যান্য লোক থাকে। এই রকম প্রতিষ্ঠান জার্ম্মাণিতে অনেক। এই সব প্রতিষ্ঠানে কর্তৃত্ব করিয়া জার্ম্মাণির মেয়েরা পয়সা রোজগার করে।

এইবার আর এক প্রকার প্রতিষ্ঠানের কথা বলিব। ধরুন ডাক্তারি ব্যবসা। একজন অস্ত্র-চিকিৎসক এবং একজন মামুলী চিকিৎসক—দুইজনে মিলিয়া কলিকাতায় একটা বাড়ী ভাড়া নিল, পনর-বিশটি ঘর সাজাইয়া রাখিল। সে বাড়ীটা হইল আধখানা হাঁসপাতাল, আধখানা অতিথি রাখিবার হোটেল। সাধারণ নাম জার্ম্মাণ হিসাবে "সানা-টোরিয়ুম" বা স্বাস্থ্য-নিবাস। সেখানে মফঃস্বলের রোগী আসে। কলিকাতায় যারা সপরিবারে বাস করে তাদের মধ্যেও যারা রোগী, তারা ইচ্ছা করিলে "স্বাস্থ্য-নিবাসে" ছয় সপ্তাহ হউক, ছয় মাস হউক কাটাইতে পারে। আপনারা বলিবেন "নিজের মা বোন ফেলিয়া যাইবে ডাক্তারের বাড়ী? এ কি কখনও সম্ভব হিন্দু-সমাজে? হিন্দুরা পরিবার-ভক্ত, আধ্যাত্মিক।" বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ চিন্তার পশ্চাতে কোনো তথাকথিত

হিন্দুত্ব বা আধ্যাত্মিকতা নাই। আছে আমাদের মগজের আলস্য আর চরিত্রের ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা। ভিতরকার কথা এই,—আমাদের যখন অসুখ হয় তখন আমরা মনে করি, নিজের মা বোন থাকে ত খাটিবে, বিধবা মাসী পিসী থাকে তারা খাটিবে, এর চেয়ে আর কি ভাল হইতে পারে? বিধবাকে দিয়া খাটাইয়া নিতেছি, এক জনকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছি, তার সুবিধা-অসুবিধা, তার ব্যক্তিত্ব একবার চিন্তা করিতেছি কি? যাক্ সে কথা। যদি আমাদের দেশে এমন কতকগুলা কেন্দ্র থাকে যাতে শিক্ষিত ডাক্তারের অধীনে বাড়ী ঘর আস্তানা পাই, ডাক্তারের সাহায্য পাই, খাওয়া দাওয়ার আরাম থাকে, সপ্তাহে বা মাসে বা রোজ বাড়ীর লোক আসিয়া আমাদের দেখিয়া যায়, আমি বলি এ ব্যবস্থাটা কি নিন্দনীয় ব্যবস্থা? এ ধরণের ব্যবস্থা আমাদের নাই। যদি হয় আমাদের সুখ-সুবিধা অনেক বাড়িবে। আপনারা স্বীকার করেন কি না জানি না। জার্ম্মাণিতে এই প্রণালীর চরম উন্নতি হইয়াছে। বার্লিনে যান, মিউনিকে যান, প্রায় এমন কোন রাস্তা নাই যেখানে একটি না একটি স্বাস্থ্য-নিবাস—যা এক হিসাবে হোটেল, এক হিসাবে হাঁসপাতাল—চলিতেছে না। এর কর্ত্তা হয় কারা? গিন্নীপনায় শিক্ষিত যে সব নারী তারা এই সব স্থানে কর্তৃত্ব করে।

তৃতীয় রকমের দৃষ্টান্ত—তাও আমাদের দেশে নাই। জার্ম্মাণির মধ্যবিত্ত লোক ইচ্ছা করিলেই সাধারণ ইস্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে পাঠাইতে পারে, কিন্তু সব সময় ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাইয়া সুখী হয় না। তারা চায়, কোন এক ভাল শিক্ষয়িত্রী ছেলেদের দায়িত্ব লউক্ এবং সেখানে তার যত রকম শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার সে করুক। এই ধরণের ব্যবস্থা জার্ম্মাণিতে অনেক আছে। স্বাস্থ্যকর জায়গায় আছে, বহু বড় সহরে আছে, পল্লীতেও আছে। সেগুলিকে

আদর্শ বিদ্যালয় ইত্যাদি নাম দিতে পারি। এক হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীর আবাস আর এক হিসাবে ইস্কুল দুইই এক সঙ্গে চলিতেছে। এই ভাবে ১৫০।২০০ ছেলে মেয়ে লইয়া একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী থাকে। তার সঙ্গে আরও শিক্ষয়িত্রী সেখানে বাস করে। সেটাকে বলিতে পারি ছেলে মেয়েদের জন্য 'উপনিবেশ'। যারা এর দায়িত্ব লয়—প্রধান শিক্ষয়িত্রী বা সহযোগিনী—সকলেই গৃহিণী ধরণে শিক্ষিতা। তারা এই সকল প্রতিষ্ঠানে কর্ত্তৃত্ব করিয়া নিজেদের অন্নসংস্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

ঝি-রাঁধুনির নব-বিধান

তার পর গৃহিণীপনার ভিতর আর একটি মামুলী জিনিষ ঝি-গিরি করা আর রাঁধুনীর কাজ করা। এ সবও এক ধরণের ব্যবসা, বলাই বাহুল্য। এখন কথা হইতেছে—"এ জিনিষ ত আগেও হইত, এখন এমন কি হইয়াছে? রান্না-বাড়ি তাও ইস্কুলে শিখিতে হইবে? এ ত সকলেই বুঝে! এই ধারণা আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত আছে। রান্না-বাড়ি শিখিতে ইস্কুলের দরকার কি? এ শিক্ষা আমরা ঠান্‌দির কাছে পাইয়াছি, এখন কেন ইস্কুলে যাইতে হইবে?" জার্ম্মাণরাও ঠিক এই রকম কথা বলিত। কতদিন আগে বলিত তাও বলিতে পারি। মাপ-জোক ছাড়া আমার ভিতর আর কিছুই নাই। ১৮৫০-৬৫ সনে জার্ম্মাণিতে এই দিকে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। আগেকার জার্ম্মাণরা বলিত—"গৃহস্থ হইয়াই ত জন্মিয়াছি; এ বিষয়ে ইস্কুলে নূতন শিখিবার আবার কি আছে?"

মজার কথা হইতেছে, জিনিষটাকে যত সোজা মনে করি তত সোজা নয়। কয়েক বৎসর আগেও আমাদের দেশে কয়লার রান্নার চলন হয় নাই, কাঠের রেওয়াজই ছিল। তাতে স্ত্রী হউক, রাঁধুনী হউক তাদের

স্বাস্থ্য তত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইত কিনা সন্দেহ। কয়লা যখন আসিল প্রত্যেক রান্নাঘর হইল যেন এক একটি কয়লার খনি। সেখানে বোনকেই রাখি কি বিধবা মাসীকেই রাখি তার উপর একটা অত্যাচার হইতেছে। ঝি রাখি, চাকর রাখি, ঠাকুর রাখি তার উপর একটা অত্যাচার হইতেছেই হইতেছে। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল,—কয়লা বনাম কাঠ—বিপুল বিপ্লবের সূত্রপাত।

জার্ম্মাণিতে এই রকম ধরণের বিপ্লব ঘটিয়াছে ১৮৫০-৬৫ সনে। এক একটা নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হইল, তার জন্য কারখানা গড়িয়া উঠিল। ঝি চাকর আর পাওয়া যায় না, তারা পল্লী ছাড়িয়া কারখানায় ছুটিতেছে। চাকরের সঙ্গে কথা বলে কে, আগুন! জার্ম্মাণি তখন দেখিল—"তাইত এক একটা বিপ্লবে পল্লীগুলি ছারখার হইয়া যাইতেছে, চাকর বাকর জুটিতেছে না। এদিকে গৃহস্থালী, ঘরবাড়ী, বিছানা, সবই একটু একটু করিয়া বদলিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় আমরা কেমন করিয়া সংসার চালাই? গৃহস্থালীতেও আমাদের নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কার করিতে হইবে।" সেই সময় লোকেরা বুঝিল আর পুরানো পথে চলিলে হইবে না, নতুন কিছু করা দরকার।

এই সঙ্গে আর একটি দৃষ্টান্ত দিলে ভাল করিয়া বুঝিবেন। চাষ-বাসের কথা। আমরা সকলেই বাবু। কেহ চাষ-বিজ্ঞান পড়িয়া ডিগ্রী লইয়া গ্রামে গিয়া যদি চাষীদের শিখাইতে চায় তারা বলিবে "দাদা! আমাদের শিখাইবে তোমরা! আমাদের বাপদাদা এই ভাবে শিখিয়া আসিয়াছে, তোমরা আমাদের কি চাষ-আবাদ শিখাইতে পারিবে?" চাষীতে বাবুতে এই ধরণের ঝগড়া ফ্রান্সে ছিল, জার্ম্মাণিতে ছিল। তারপর খনার বচন দেশ-বিদেশের কোন্ চাষী না জানে? আমরা যেমন বলিয়া থাকি—"যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজা, পুণ্য দেশ"।

এই ধরণের বচন জার্ম্মাণিতে ছিল, ফ্রান্সেও ছিল। বস্তুতঃ এখনও আছে। "আকাশের অমুক কোণে যদি এই ধরণের মেঘ হয়, কুছ পরোয়া নাই, দাঁও মারিয়া লইব"—তাদের এই রকম ধারণা আছে তাদের খনা বলিয়া গিয়াছে—"ঐ রকম মেঘ যদি হয় তা হইলে আলু, গম, যব—হাতী, ঘোড়া একটা কিছু হইবেই হইবে।" কিন্তু হাওয়া একটু একটু বদলাইতেছে। জার্ম্মাণি ও ফ্রান্স বদলিয়া গিয়াছে। খনার বচনের উপর নির্ভর করিয়া আর ফরাসীরা জার্ম্মাণরা চাষ চালায় না। তারা চাষ-আবাদ শিখিবার জন্যই ইস্কুল কায়েম করে।

নারী-সমস্যা সম্বন্ধে, গৃহস্থালী-সমস্যা সম্বন্ধেও আজকালকার জার্ম্মাণরা ফরাসীরা ঠিক ঐরূপ মীমাংসাই করিয়াছে। মেয়েদের শিক্ষার কেন্দ্র গৃহ না ইস্কুল?—এই প্রশ্নের জবাবে শেষ পর্য্যন্ত ইস্কুল নামক প্রতিষ্ঠান গড়া দরকার হইয়াছে। সেই সমস্যা গুলি এতদিনে এশিয়ায় আসিতেছে। আমরাও সেকালের ফরাসী-জার্ম্মাণদের মতন এদিক ওদিক ভাবিতেছি। হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, চীনা, বৌদ্ধ—এদের মাথায় একটা নতুন কিম্ভূত-কিমাকার প্রশ্ন হাজির হয় নাই। সুয়েজ খালের ওপারে খ্রীষ্টিয়ান, সাদা চামড়া যাদের—তাদের কাছেও এই সমস্যা আসিয়াছিল—পরিবার বনাম বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাইব কি পাঠাইব না? গৃহস্থালী শিক্ষার জন্য পরিবার আসল বিদ্যাকেন্দ্র, না ইস্কুল নামক কর্ম্মকেন্দ্র কায়েম করা দরকার? আমাদের দেশী একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝিতে পারিবেন।

আগেকার লোকেরা তেঁতুল দিয়া ডেক্‌চি পরিষ্কার করিত, এখন তেঁতুল পাওয়া যায় না। অন্যান্য জিনিষের ন্যায় তেঁতুলের দাম এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, তেঁতুলের ব্যবসা চালান যায়। ডেক্‌চি পরিষ্কার করিতে অন্য জিনিষ আবিষ্কার করা দরকার। আবিষ্কার আরম্ভ হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে মামুলী ঝি তা দিয়া ডেক্‌চি পরিষ্কার করিতে পারিবে কিনা। অনেক ক্ষেত্রে দেখিবেন যে, কি করা দরকার তাকে শিখাইতে হইবে। সেজন্য ঝিগিরি আর রাঁধুনীর কাজ শিখাইতেই জার্ম্মাণরা ইস্কুল কায়েম করিয়াছে। একালে দাসদাসীগিরি করা সোজা কথা নয়। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৫ সনে জার্ম্মাণিতে যে পরিষদ গড়িয়া উঠিয়াছিল সেটার নাম —সর্ব্ব-জার্ম্মাণ-মহিলা-পরিষদ। জার্ম্মাণির মেয়েদেরকে বর্ত্তমান শিল্প-বিজ্ঞানের যুগ-মাফিক শিক্ষিত কর্ম্মদক্ষ করিয়া তোলা ছিল তার মতলব। মাপিয়া দেখিতে পারেন এই ধরণের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আছে কিনা। যদি না থাকে সোজাসুজি বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করা উচিত—এখন পর্য্যন্ত আমরা ১৮৬৫ সনের দুনিয়ায় পৌঁছিতে পারি নাই।

(২) মেয়েলী-শিল্পের তিন মহল

এইবার মহিলা-শিল্পের কথা। এ জিনিষ এক হিসাবে মামুলী আর এক হিসাবে পঞ্চাশ বৎসর আগে দুনিয়ার কোথাও ছিল না। প্রথম নম্বর —গৃহস্থ-ঘরে দেখিবেন বাপ হোটেলে কাজ করে, স্ত্রী ঘর-বাড়ী দেখে, মেয়ে চালাইতেছে ছোট একটি দোকান। সেখানে পোষাক টোষাক, মনিহারী জিনিষ, খেলনা ইত্যাদি রহিয়াছে। পোষাক তৈয়ারি করাও এই মেয়ের কাজ। এইখানে কিছু সামাজিক কথা বলা দরকার। যদিও জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ ধনবান, তা সত্ত্বেও সকল গৃহস্থই দোকান থেকে যে ৩০।৩৫৲ টাকা দিয়া তৈয়ারি পোষাক কিনিয়া থাকে তা নয়। যে পোষাক দোকানে কিনিতে ৩৫৲ টাকা লাগে, সে পোষাক ঘরে তৈয়ারি করিতে অথবা কাউকে দিয়া তৈয়ারি করাইয়া লইতে খুব অল্প খরচ পড়ে। ধরুন ৮৲ টাকা দিয়া কাপড় কিনিয়া আনিল। আর তৈয়ারি করাইতে লাগিল ৮৲ টাকা। কেউ কেউ বলিবেন,—"পোষাক তৈয়ারি করা এমন কঠিন

কি ?" কেহ একটা জামা, গেঞ্জি বা মোজা জোড়া দিতে বা সেলাই করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন কি ? পারিবেন না সেলাই করিতে। বিদ্যার দরকার। কাজ চালাইবার মতন করিয়া বোতাম লাগাইতে পারিবেন, তা স্বীকার করি। কিন্তু সেলাই করিতে "শেখা" দরকার। প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক মেয়ে যে পারিবে এটা কল্পনা করা উচিত নয়। কাজেই সমাজে এমন কতকগুলি লোকের দরকার আছে যারা সস্তায় গৃহস্থের পোষাক তৈয়ারি করিয়া দিতে পারে। এ হইতেছে এক ধরণের ব্যবসা।

দ্বিতীয় মেয়েলি ব্যবসা টুপী-তৈয়ারি করা আপনারা বলিতে পারেন —"টুপী আর পোষাক ত এক শ্রেণীতে পড়িয়া গেল।" তা নয়, টুপী ভয়ানক কঠিন জিনিষ। টুপীর উপর নির্ভর করে লোকটা কেমন দেখাইবে। আপনারা যারা ছবি আঁকেন, তাদের রং আর রূপ সম্বন্ধে যতখানি জ্ঞান থাকা দরকার, টুপী তৈয়ারি করিতে ঠিক ততখানি বিদ্যার, মাথা খাটাইবার দরকার হয়। টুপীর ভিতর চাই রূপ আর রং। কোন্ রঙের সঙ্গে কোন্ রং খাপ খাইবে আপনি আমি বলিয়া দিতে পারি না। যত সোজা মনে করি তত সোজা নয়। কোন্‌টা সরল, কোন্‌টা গোল, কোনটা ত্রিভুজ, কোন্‌টা মোচার গড়নে করিতে হইবে বুঝা বেশ কঠিন। এ সবে নুন-তেল খরচ করিতে হয়। যেমন চিত্রশিল্প বক্তৃতা করিয়া বুঝান যায় না, কোন্ গড়নটা কিরকম করা উচিত, সেটা মাথা থেকে বাহির হইবে, অর্থাৎ যে লোকটা ছবি আঁকিতে শিখিয়াছে, তার জন্য কষ্ট করিয়াছে, সেই এসব তৈয়ারী করিতে পারে, আর বুঝিতে পারে, এ ও তেমনি। টুপী-শিল্প ভয়ানক জটীল। চিত্র-শিল্প, স্থাপত্য-বিদ্যা বলিলে পরে যতখানি রূপ রংএর দখল থাকা প্রয়োজন, টুপী তৈয়ারি করিতেও ঠিক ততখানি দরকার।

নিউইয়র্ক, লণ্ডন, বার্লিনের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া দেখিয়াছি—যে সব দোকানে খুব সাজ রাখে। কোথ্‌থেকে আসিল খুঁজিয়া দেখি সেটা নিউইয়র্কের জিনিষ নয়, লণ্ডনের জিনিষ নয়, বার্লিনের জিনিষ নয়। টুপী-বিজ্ঞানে পারিসের মেয়েরা দুনিয়াকে হারাইয়াছে। যখনই এ লাইনে কোন ভাল জিনিষ দেখিতে পান তখনি বুঝিতে হইবে এটা জার্ম্মাণ, ইংরেজ, আমেরিকান করিয়া উঠিতে পারে নাই, পারিয়াছে ফ্রান্স। টুপীর "ডিজাইন" বা নক্‌সাটা ফরাসারা তৈয়ারি করিল বটে, কিন্তু তার সঙ্গে হাজার হাজার ছবি তৈয়ারি হইয়া গেল। সেই ছবি অনুসারে নিউইয়র্ক, লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, রোম সব জায়গায় দোকানে দোকানে খবরের কাগজের সাহায্যে টুপীর গড়ন প্রচারিত হইয়া গেল। সেই অনুসারে ইস্কুলে শিখান চলিতে থাকে। আর যখন মেয়েরা ব্যবসা খোলে, প্রতি সপ্তাহের কাগজে টুপীর নতুন নতুন নক্‌সা অনুসারে টুপী গড়িয়া থাকে। টুপীর হাঙ্গামা বাঙ্গালী সমাজে নাই। কাজেই টুপী-শিল্পের মাহাত্ম্য লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি না করিলেও চলিবে। তবে এর সঙ্গে আর্থিক জীবনের আর শিল্প-শিক্ষালয়ের যোগাযোগ কত নিবিড় তা বুঝিতে পারিলে আমাদের প্রয়োজনীয় মেয়েলি শিল্পগুলার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা দরকার খানিকটা বুঝিতে পারিব।

তৃতীয় রকম মহিলা-শিল্প হইতেছে কাপড়ের যত রকম কাজ। আপনারা মনে করিতে পারেন এটা ত ডাহা পোষাকের অন্তর্গত। তা নয়। জামা তৈয়ারি করা এক জিনিষ, বিছানার চাদর তৈয়ারি করা আর এক জিনিষ, বালিসের ওয়াড়, লেপের ওয়াড় অন্য জিনিষ, চেয়ার টেবিলের ঢাকনি ভিন্ন জিনিষ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের দেশে এক জিনিষ চলে, যেমন তুলার সূতার জিনিষ। ইয়োরোপেও তুলার সূতা লে বটে, তার সঙ্গে আরো অনেক জিনিষ চলে। লিনেন সূতা তুলার

সুতার মত দেখিতে। কিন্তু ভিন্ন জিনিষ। তারপর রেশম পশমের কাজ আছে। খাঁটি পোষাক তৈয়ারি করা অথবা টুপী তৈয়ারি বলিলে যা বুঝায় এসব কাজ তা নয়।

চাই পাশ ও চাপরাশ

ধরা যাক্ যেন আমি শিখিলাম টুপী তৈয়ারি করিতে। কিন্তু পোষাক তৈয়ার করিতে লাগিয়া গেলাম। জার্ম্মাণিতে তা হইবার জো নাই। ঝি হইতে হইলেও ইস্কুলে পাশ দরকার; ঝির জন্য ইস্কুল আছে, রাঁধুনী বামুনের ইস্কুল আছে, ঝাড়ুদারের পর্য্যন্ত ইস্কুল আছে। এই সব ইস্কুলে পাশ করা চাই। সরকারী সার্টিফিকেট বা চাপরাশ পাইলে পরে তবে কোন লোক ঝি, বামুন, ঝাড়ুদার ইত্যাদির কাজ করিতে অধিকারী হয়। আমি এক যন্ত্রের মিস্ত্রী, কিন্তু আর একটা যন্ত্র মেরামত করিতে লাগিলাম। সে সব হইবার জো নাই। মিস্ত্রী, ছুতোর, ধোপা, নাপিত যত রকম ব্যবসা আছে প্রত্যেক ব্যবসায়ের জন্য পাশ করা দরকার, সার্টিফিকেট দরকার, লাইসেন্স দরকার। বিনা লাইসেন্সে, বিনা সার্টিফিকেটে, বিনা পাশে কোন লোক ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত হইতে অধিকারী নয়। এই প্রথম কথা মনে রাখা দরকার।

তারপর জার্ম্মাণিতে সব মেয়ে কমসে কম এণ্ট্রান্স পাশ। ঝি এণ্ট্রান্স পাশ, রাঁধুনী বামুন এণ্ট্রান্স পাশ। তার নীচে কোন পুরুষ কি কোন স্ত্রী থাকিতেই পারে না। এই পাশের বনিয়াদের উপর ব্যবসায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই পাশ করিবার পর তারা নানা দিকে, নানা কাজে, নানা ইস্কুলে চলিয়া যায়। কোন জায়গায় ছয় মাস, কোন জায়গায় এক দুই আড়াই বৎসর নানা রকম পাশের ব্যবস্থা আছে। তা খতম হইবার পর আর এক ইস্কুলের পাশ এবং তার সার্টিফিকেট চাই।

তারপর মিউনিসিপালিটী বা পল্লীস্বরাজ। সেখানে পরীক্ষা দিয়া সরকারী সার্টিফিকেট চাই। সে সব হইলে ব্যবসা করিতে পারে। ব্যবসা সোজা জিনিস নয়।

ব্যবসায়ের মধ্যে ধাপ আছে। এক রকম লোক আছে তারা স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিতে পারে, কিন্তু কোন লোক খাটাইতে অধিকারী নয়। তাদের বলা হয় আধা-শিক্ষানবিশ। আর এক রকম ব্যবসা আছে যা লোকেরা নিজে করিতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লোককে মাইনে দিয়া খাটাইতে পারে। তাদের বলে ওস্তাদ।

(৩) রকমারি টেক্‌নিক্যাল সহকারিণী

প্রথমে গৃহস্থালীর কথা বলিয়াছি। তার পরে বলা হইল তিন-প্রকার মেয়েলি-শিল্পের কথা। এখন বলিব মেয়েরা বিজ্ঞান-সম্পর্কিত অথবা যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত যে সকল কারবারে পয়সা রোজগার করে, তার কথা।

এক নম্বর হইতেছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহযোগিতা। আমাদের দেশে এ জিনিষ এখনও গড়িয়া উঠে নাই। ব্যাক্‌টিরিঅলজির কাজ, ভ্যাক্‌সিন তৈয়ারির কাজ, এ সব করে মেয়েরা। তাদেরকে বলে ডাক্তারী লাইনে আসিষ্টেন্টিন (সহকারিণী)।

দ্বিতীয় নম্বর—যত যায়গায়, যত হাঁসপাতাল আছে, সানাটোরিয়ুম আছে, সে সব জায়গায় ডাক্তারের নীচে কাজ করে যারা, তারাও মেয়ে, "আসিষ্টেন্টিন্"। তারা মাপ জোক করে। ডাক্তারী বিদ্যার যত রকম বিভাগের কাজ আছে, ব্যবসা আছে, প্রত্যেক ব্যবসায়েই জার্ম্মাণিতে মেয়েরা সহকারিণী। মেয়েদের পক্ষে এ হইতেছে আয়ের একটা বড় পথ।

তৃতীয় নম্বর—টেকনিক্যাল কাজ। যত জায়গায় খনি আছে, তাতে যে সব ধাতু বাহির হয় তার ঝাড়া বাছা গণা মাপায় বাহাল থাকে

মেয়েরা। এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করা, ধাতু গালান, ঢালান ইত্যাদি সবই মেয়েদের কাজ।

তারপর আরো একটি টেক্‌নিক্যাল বা বৈজ্ঞানিক কাজ আছে। সেটা রাসায়ণিক। যে কোন সহরে বা পল্লীতে যাও না কেন, সব জায়গায়ই খাদ্যদ্রব্যের "স্বাস্থ্য-পরীক্ষার" ব্যবস্থা আছে। এও একটা বড় ব্যবসা। প্রত্যেক সহরে, প্রত্যেক পল্লীতে দুধ মাখন চিনি, "আলু পটল" সবই পরীক্ষা করা হয়। যা কিছু খাদ্যদ্রব্য থাকিতে পারে সব রাসায়ণিক উপায়ে পরীক্ষার পর তবে বাজারে চলিবে। এই পরীক্ষাকাজে যে সব লোক বাহাল হয় তারা মেয়ে।

এইবার আর একদিকে নজর দিতেছি। বড় বড় এঞ্জিনিয়ারদের আফিস দেখিয়াছি। কেহ কেহ মাথা খাটাইয়া চল্লিশ পঞ্চাশটি বড় বড় বৈদ্যুতিক কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছেন। কোথাও জলের প্রপাত চলিয়া যাইতেছে, এটাকে কেমন করিয়া কাজে লাগান যায় তা লইয়া তাঁরা অনবরত মাথা খাটাইতেছেন—ইত্যাদি। এই যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এঞ্জিনিয়ার, তাঁদের আফিসে গিয়া দেখিবেন সাহচর্য্য করিতেছে কারা? অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ নয়, জার্ম্মাণির মেয়ে। সে বসিয়া মাপিতেছে, জুকিতেছে, ছবি আঁকিতেছে, অঙ্ক কষিতেছে। এ মামুলি সহযোগিতা নয়। রীতিমত টেক্‌নিক্যাল সাহচর্য্য। তাতে বেশ কিছু মগজের ঘি লাগে।

(৪) সমাজসেবায় অন্নসংস্থান

এখন চতুর্থ দফা,—সমাজ-সেবার কথা। এই শব্দ ব্যবহার করিলে আমরা বুঝি যে, লোকটা বিনা পয়সায় "দেশোদ্ধার" করিতে আসিয়াছে। আপনি কোথাও একটা বক্তৃতা দিয়া আসিলেন। অথবা দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, বন্যা হইয়াছে, দলে দলে লোক পাঠান গেল, স্বেচ্ছাসেবক

পাঠান হইল। পাঠাইতেছেন ভাল কথা। এ ধরণের অবৈতনিক কাজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আছে, আমরাও করিতেছি, ভবিষ্যতেও করিব। কিন্তু সম্প্রতি আমি যে ধরণের সমাজ-সেবার কথা বলিতেছি সেটা ঠিক আমাদের সুপরিচিত "দেশের" কাজ নয়। কেননা সে সব অবৈতনিক নয়। ওকালতী করা যেমন ব্যবসা, ডাক্তারী করা যেমন ব্যবসা তেমনি সমাজের সেবা করাও একটা ব্যবসা। আর এই সব কাজে মেয়েরা ওস্তাদ। ওকালতীর মত, ডাক্তারীর মত, এঞ্জিনিয়ারির মত দেশের লোকের সাহায্য করাও একটা বিশেষজ্ঞের পেশা। আর এতে পয়সা রোজগারও হয়।

এই ধরণের সমাজ-সেবা তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথমতঃ স্বাস্থ্যবিষয়ক। আপনাদিগকে আগে বলিয়াছি, মেয়েরা গৃহস্থালী করে, "স্বাস্থ্য-নিবাসে" কর্তৃত্ব করে। সেখানে যে কর্ত্তৃত্ব, সেটা খাঁটি টেক্‌নিক্যাল বিদ্যা নয়, সেটা গৃহস্থালী হিসাবে কর্ত্তামি। কিন্তু এইবার স্বাস্থ্য-হিসাবে নতুন ধরণের কাজ। তবে এটা ডাক্তারী নয়, আবার আর এক দিকে মামুলি গিন্নীপনাও নয়। এটা হইতেছে ওদের কথায় ভগ্নী, ইংরেজীতে যাকে বলে নার্শ, জার্ম্মাণিতে বলে শ্বোয়েষ্টার,—তার কাজ। নার্সিং—সেবা করা, শুশ্রূষা করা ইত্যাদি জিনিষ জার্ম্মাণিতে অতি বিস্তৃত রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। এক এক রোগের জন্য এক এক শ্রেণীর নার্স আছে। যদি আমি পেটের অসুখের জন্য নার্সিং বিদ্যায় পাশ করিয়া আসি তাহা হইলে আমাকে যক্ষ্মা রোগীর সেবায় কাজ দিবে না; অথবা আমাকে অস্ত্রচিকিৎসায় সাহায্য করিতেও দিবে না। ভিন্ন ভিন্ন বেয়ারামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হাঁসপাতাল, ভিন্ন ভিন্ন স্বাস্থ্যনিবাস যেমন জার্ম্মাণির সহরে সহরে অলিতে গলিতে দেখা যায়, ঠিক তেম্নি "ভগ্নী" বা "শ্বোয়েষ্টার" ইত্যাদিও রোগ হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন। এক রোগের জন্য পাশ করা মেয়েকে অন্য রোগের জন্য সার্টিফিকেট দিবে না। সে যদি একটা নতুন

কাজে আসে তার জেল হইবে এ রকম ব্যবস্থা আছে। যে কোন লোক যেমন ছুতোর হইতে পারে না—তার করাত আছে বলিয়াই সে কাঠ কাটাকাটি সুরু করিয়া দিবে এরূপ সম্ভাবনা জার্ম্মাণিতে নাই—তেমনি আমি নার্স নামক কোনো ভগ্নী, অতএব যে কোন রোগীর কাছে আমি হাজির হইতে পারি, জার্ম্মাণীতে তার জো নাই। এই হইতেছে এক নম্বরের সমাজ-সেবা।

দ্বিতীয় নম্বর, শিশু-ঘটিত যা-কিছু শিশু-জীবনের স্বাস্থ্যরক্ষা, আর ৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্যশিক্ষা ইত্যাদির জন্য হাজার হাজার মেয়ে তৈয়ারি হইতেছে, তারা ৭৭টি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিশু-সঙ্গিনী হইয়া তৈয়ারি হয়। এই সকল শিশু-কেন্দ্রে নানা বিভাগ ও তাতে নানা রকম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তার জন্য মেয়েরা বিশেষ ভাবে স্বতন্ত্র উপায়ে তৈয়ারি হয়। তার জন্য পরীক্ষা আছে।

তৃতীয় ধরণের সমাজ-সেবা—অর্থ-বিষয়ক। সমাজ-জীবনে বীমাপ্রথা জার্ম্মাণির বিশেষত্ব। বীমার প্রতিষ্ঠান, বীমার আইন—এসব জিনিষ তারা চরম বুঝে। টেক্‌নিক্যাল বিষয়ক, গ্যাসবিষ বিষয়ক, ধনোৎপাদন বিষয়ক, যানবাহন বিষয়ক, ব্যাঙ্ক বিষয়ক যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তাতে গোটা দেশের ইতিহাস, জীবনযাত্রা প্রণালী, ব্যবসা-বাণিজ্য কোথায় কেমন চলিতেছে তার খবর রাখা নেহাৎ জরুরী। এই সকল গবেষণার কাজে মেয়েরা বাহাল হয়। তারা আর্থিক অনুসন্ধান আর বাজার-গবেষণাকে সমাজ-সেবা বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

সমাজসেবার মহিলা-বিদ্যালয়

রকম রকম সমাজ-সেবা করিয়া হাজার হাজার জার্ম্মাণ মেয়ে ভাত কাপড়ের সংস্থান করে। আর সমাজ-সেবার ব্যবস্থা শিখিবার জন্য ইস্কুল-

কলেজেও আছে বিস্তর।' এই ইস্কুল অন্যান্য দেশে—এমন কি বিলাতেও বেশী নাই, এমন কি ১৮৯৯ সনের পূর্ব্বে এ জিনিষ জার্ম্মাণিতেও ছিল না। ১৯১৪ সনে দশ বারটি ছিল, আজকে গোটা চল্লিশেক প্রতিষ্ঠান—যাকে বলে "সমাজ-সেবার মহিলা-বিদ্যালয়" জার্ম্মাণিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে ভর্ত্তি হইতে কমসে কম আমাদের বি-এ বি-এস্-সি পাশ হওয়া চাই। যে সব মেয়ে এই পাশ নয় তাদের এসব ইস্কুলে স্থান দেওয়া হয় না। দ্বিতীয় নম্বর—বি-এ, বি-এস-সি পাশ থাকিলেই এই ইস্কুলে ভর্ত্তি করা হইবে তা নয়। তাকে অন্ততঃ পক্ষে দু' তিন বৎসর নানা কর্ম্মকেন্দ্রে কাজ করা চাই। যদি সে নার্স হইতে চায় দু' তিন বৎসর হাঁসপাতালে কাজ করিতে হইবে। যদি সে শিল্পবিদ্যালয়ে সমাজ-সেবক হইতে চায়, ঐ রকম প্রতিষ্ঠানে দু' তিন বৎসর কাজ শিখিতে হইবে। যদি সে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, বীমার লাইনে, শ্রমিক লাইনে কি অন্যান্য যে সব পরোপকারক কর্ম্মকেন্দ্র আছে তার যে কোন বিভাগে সমাজ-সেবক হইতে চায়, তাহা হইলে তাকে সেইরূপ প্রতিষ্ঠানে হাতে-কলমে কাজ করিতে হইবে। এই সকল কাজে অভিজ্ঞতার পর ইস্কুলে ভর্ত্তি করা হইবে। তার পর দস্তুর মত লেখাপড়া ও পরীক্ষা। তবুও চলিবে না। বয়স কমসে কম ২৪।২৫ বৎসর হওয়া চাই। তার আগে কাহাকেও সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে না।

তাহা হইলে জার্ম্মাণি আজ এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কোন রকমে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিলেই চলিয়া যাইবে তার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক বিভাগে বিশেষজ্ঞ রহিয়াছে। এত দূর পর্য্যন্ত দেশটা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে যে, সমাজ-সেবা করিতে হইলে ২৪।২৫ বৎসর বয়সের আগে কেহ উপযুক্ত বিবেচিত হয় না। আপনি যদি কলিকাতায় একটা নার্সিং ইস্কুল খাড়া করিতে পারেন, তাকে লইয়া কত লাফালাফি, কত

বক্তৃতা চলিবে। তার ছবি তুলিব, কত রকম প্রপাগাণ্ডা চালাইব; সমস্ত পৃথিবীকে উৎকর্ণ করিয়া তুলিব। এইরূপই সকল ক্ষেত্রে আমরা সচরাচর করিয়া থাকি। করাটা অন্যায় নয়, কারণ আমাদের দেশে "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।" খতাইয়া যদি দেখেন, ১৯০৫—২৬ সন পর্য্যন্ত যুবক ভারতের আমরা বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে যা কিছু করিয়াছি তার প্রায় সবই "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।" অর্থাৎ আমাদের সব চেয়ে বড় পণ্ডিত, বড় রাষ্ট্রপতি, বড় ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠাতা, সব চেয়ে বড় স্বদেশসেবক —কি পুরুষ কি স্ত্রী প্রায় সকলেই এক প্রকার "এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" মাত্র। কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইল বোধ হয়। তবে খাঁটি সত্যটা বেশী দূরে নয়। কিন্তু জার্ম্মাণিতে "এরণ্ড" লইয়া আর চলে না। হয়ত ষাট সত্তর বৎসর আগে চলিলেও চলিত। কিন্তু আজ আর চলে না; ওদের প্রত্যেক কাজের লম্বা লম্বা মাপ-কাঠি আছে। সেই মাপে চলা চাই। আমাদের একজন মেয়ে স্বদেশ-সেবক, কংগ্রেসকর্ম্মী, নার্স, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিৎ ইত্যাদি থাকিলে আমরা মাতামাতি করি। কিন্তু জার্ম্মাণি বলিতেছে—"আগে বি-এ, বি-এস-সি পাশ কর্, তার পর কথা কহিব; এই পাশের পর তিন বৎসর হাতেকলমে কাজ কর্ গিয়া এখানে ওখানে সেখানে, তার পর আসিস্—দেখা যাইবে—কথা বলিব কি না। তার পর আড়াই তিন বৎসর লেখাপড়া কর্ অমুক ইস্কুলে। পাশটাশ করিয়া নে।" তখনও বলিতেছে, "উপযুক্ত হ'স্ নাই।" আরে মলো যা! কখন উপযুক্ত হইবে? যখন কমসে কম ২৫ বৎসর বয়স হইয়াছে তখন তাকে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইবে। সেই সার্টিফিকেট লইয়া তবে সে কিছু টাকা রোজগার করিতে পারিবে। এই মাপকাঠি সোজা জিনিষ কি? ১৯২৬ সনে আমরা এটা কল্পনা করিতে পারি কি? ১৯০৫ সনে একথা বলিবার লোক ভারতে ছিল কি না জানি না। ১৯২৬

সনে যুবক ভারত এই পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, দুনিয়াটা কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে তার ইঙ্গিত মাত্র পাইতেছে।

সূর্য্য উঠে পশ্চিমে

এখন কথা হইতেছে, আমরা কি এই অবস্থায় থাকিব? আমরা কি আমাদের নামজাদা জন-নায়কদের কথায় অন্ধ হইয়া থাকিব? আমাদের মহাপুরুষেরা, জ্ঞানবীরেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার তথাকথিত আহাম্মুকি সম্বন্ধে কত বুজরুকি শিখাইয়াছেন। আমরা কি তাঁদের কথা-মাফিক ইয়োরামেরিকাকে ভারতের চেয়ে অসুখী, ভারতের চেয়ে নীতিহীন, ভারতের চেয়ে পাপী বিবেচনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব? আমি বলিতে চাই, আজ ১৯২৬ সনে যুবক ভারতের কর্ত্তব্য হইতেছে খোলাখুলি বলা—"হে পণ্ডিতগণ, তোমরা আমাদেরকে ঠকাইয়া রাখিয়াছ। তোমরা যা কিছু বলিয়াছ তার অনেক-কিছুর পশ্চাতে যুক্তি নাই, বস্তু নাই। তোমরা যা কিছু বলিয়াছ আমরা বোকার মত, তোতা পাখীর মত মুখস্থ করিয়াছি।" এখন জিজ্ঞাস্য—১৯২৬ সন ১৯৩০ সনের জন্য প্রস্তুত হইতে রাজী আছে কি না? ১৯০৫ সন যখন জন্মিয়াছিল তখন আমরা বলিয়াছি,—"১৮৮৬ সন হইতে ভারতে যা কিছু ঘটিয়াছে সে সব কিছুই নয়। সব ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। সেই ভাঙার ভিতর হইতে নতুন দুনিয়া গড়িয়া তুলিব।" আজ বিশ একুশ বৎসর ধরিয়া যুবক ভারত অনেক-কিছু ভাঙিয়াছে, অনেক কিছু গড়িয়াছে। কিন্তু তবুও দেখিতেছি ১৯০৫—২৫ সনে বেশী কিছু সাধিত হয় নাই। তাই আজ আবার জোরের সহিত বলিতেছি—"১৯০৫—২৫ সন, তুই কিছুই করিস্ নাই, অথবা যা কিছু করিয়াছিস্ সবই মান্ধাতার আমলের জিনিষ। দুনিয়ার সব কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া নতুন করিয়া ১৯৩০ সনের জন্য দুনিয়াকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

তার জন্য প্রথম দরকার,—পৃথিবীটা কি বস্তু তা নতুন ভাবে, গোঁজামিল না রাখিয়া, অতি সোজা প্রণালীতে নিরেট রূপে বুঝিতে চেষ্টা করা। এই বিষয়ে ভারতের পথ-প্রদর্শক তুর্কী আর জাপান। ওরা করিয়াছে কি? খোলাখুলি বলিয়াছে, খোলাখুলি বুঝিয়াছে যে, তুর্কী সভ্যদেশ নয়, জাপান সভ্যদেশ নয়। তুর্কী-জাপানের সভ্যতা, তুর্কী-জাপানের শিক্ষা-দীক্ষা, তুর্কী-জাপানের আধ্যাত্মিকতা কোথা হইতে আসিয়াছে? বর্ত্তমান কালে সূর্য্য উঠে পূরবে নয়, পশ্চিমে,—তুর্কী তাই বুঝিয়াছে। তুর্কী জানে, কামাল পাশা জানে, "যদি মানুষ হইতে হয় মুসলমানের দুনিয়াকে যদি মজবুত করিয়া তুলিতে হয়, মুসলমানের আধ্যাত্মিক জীবন আনিতে হইবে সূর্য্যাস্তের দেশ থেকে।" সে কথা যুবক জাপানও সোজাসুজি সমঝিয়া রাখিয়াছে। সেই কথাই ১৯২৬ সনের বাঙালীকেও কোন রকম গোঁজামিল আর হ-য-ব-র-ল না রাখিয়া বার বার বলিতে হইবে। যুবক বাঙলা, বল প্রাণ খুলিয়া:—"ভাই তুর্কী, তুই ওস্তাদ, ভাই জাপান, তুইও ওস্তাদ—ঠিক সময়ে বুঝিয়াছিস্ বর্ত্তমান এশিয়ায় আধ্যাত্মিকতা কিছুই নাই। এশিয়া যদি মানুষ হইতে চায়, তবে তাহাকে ইয়োরামেরিকার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেই হইবে।" একথা আজ খোলাখুলি চোখের ঠুলি খুলিয়া যুবক ভারত বলুক হাটে মাঠে। ১৯২৬ সন বলুক—যেন ১৯৩০ সনের জন্য সে প্রস্তুত হইতে পারে।

যৌবনের দিগ্বিজয় *

আপনারা চব্বিশ ঘণ্টা কাজের কথা এত শুনিয়া থাকেন যে বাজে কথা কিছু শুনিলে মন্দ হয় না। শক্তি-স্বাস্থ্যের কথা, যৌবনের কথা, কর্ম্ম-দক্ষতার কথা, আরাম-আয়াসের কথা ইত্যাদি কিছু কিছু বাজে কথা আজ বলিব!

তথাকথিত নিন্দা ও প্রশংসা

প্রথমেই একটা রগড়ের কথা শুনাইতেছি। দিন দশ বারো ধরিয়া নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনিতেছি। কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"হ্যাঁরে তুই নাকি অমুক লোকের নিন্দা করিস? লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়া নাকি নেতাদের অপমান করিতেছিস্?" এই ধরণের কথা আমাকে কমসে কম পাঁচ সাত জনে বলিয়াছে। এ ভারি মজার কথা। নিন্দা বা অপমান করা হইল কখন? দেশে ফিরিয়া আসিবার পর সেই বোম্বাই হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে প্রায় দশ বারোটা ইণ্টারভিউ বা মোলাকাৎ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। সব রকম কাগজেই,—কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের বা দলের কাগজে নয়। বক্তৃতাও বোধ হয় আট-দশটা দিয়াছি যার শর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টের বিবরণ কমবেশী একটু আধটু কোন না কোন কাগজে বাহির হইয়াছে। ব্যস্। কখন অপমানটা করা হইল কোন্ ব্যক্তিকে, কোথায়?

* বঙ্গীয় যুবক সমিতির উদ্যোগে আলবার্ট হলের এক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার ১৩ মার্চ্চ, ১৯২৬) সারাংশ। বক্তৃতা অনুসারে তাহেরউদ্দিন আহম্মদ কর্ত্তৃক লিখিত।

নিন্দা করা, অপমান করা এ হাড়ে জানে না। এই পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া যা কিছু বলিয়াছি বা করিয়াছি তার একটা কথাও আমার নয়া নয়। বার বৎসর বিদেশে থাকিবার সময় প্রায় হাজার আটেক পৃষ্ঠার কাছাকাছি বাঙ্গলা, হিন্দি, ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, এই পাঁচ ভাষাতে যা কিছু লিখিয়াছি, আর এই কয়মাস ধরিয়া যা কিছু বলিয়া যাইতেছি সবের ধুয়াই এক। এর পূর্ব্বে সেই ১৯০৫-৭ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ও ইংরেজি মাসিক পত্রিকায় বা বইয়ের হাজার কয়েক পৃষ্ঠায় যা কিছু লিখিয়াছি, তার সঙ্গেও আজকালকার লেখার আর বক্তৃতার মূলতঃ অমিল নাই কোথায়ও। আপনাদের কাহারও কাহারও হয়ত তাহা অজানা নয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অপমানটা করা হইল কোন জায়গায়—কাকে? হাঁ, আমার দেশটা আজকাল ইয়োরামেরিকার চেয়ে খাটো একথা আমি প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করি,—লোকজনকে বলিয়াও থাকি। কিন্তু তাহাতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে বেইজ্জৎ করা হয় কি করিয়া?

বরং লোকেরা আমাকে ঠিক উল্টো দোষের জন্য গালাগালি করিয়া থাকে। আমেরিকায়, প্যারিসে, বার্লিনে থাকিতে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হোমরা চোমরা পণ্ডিতেরা তাঁদের পরিষদে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন,—মায় ফ্রান্সের সেই জগদ্বিখ্যাত আকাদেমীতে পর্য্যন্ত, সব পরিষদেই,—যুবক ভারতের জীবন-কথাই প্রচার করিয়াছি। অতীত দুনিয়া, বর্ত্তমান দুনিয়া, দুনিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যা কিছু ভাবিয়াছি, যা কিছু বলিয়াছি বা লিখিয়াছি সব কিছুতেই যুবক ভারত আমার আলোচ্য বস্তু ছিল। তার বৃত্তান্ত ওসব দেশের বড় বড় কাগজ-পত্রেও ছাপা হইয়াছে। একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, তখনকার দিনে সেই দূর বিদেশে আমার যাঁরা স্বদেশী ভায়া ও বন্ধু ব্যক্তি তাঁরা এই বলিয়া

আমাকে গাল দিতেন—"তোর মত আহম্মক আর কেউ নাই। ভারতের কথা—যার মূল্য ছটাকও হইবে না—তুই কিনা তাই আইনষ্টাইন, হাবার, ব্যর্গসঁ, ডুয়ী, গিলবার্ট মারে ইত্যাদির মতন বড় বড় মহারথীর সভায় লম্বা গলা করিয়া বলিয়া যাস! তোর এতটুকু লজ্জাও করে না?" কিন্তু তাহা সত্বেও আমার মাপকাঠিতে ভারত সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখযোগ্য পাই তাহা আমি উঁচু গলায় বলিতে ছাড়ি নাই। তবুও তাকে ঠিক "প্রশংসা" করা বলা যায় কিনা সন্দেহ। কেননা,—আমার ব্যবসা হইতেছে যথাসম্ভব খাঁটি তথ্যগুলার খতিয়ান করা, আমাদের দেশের তথ্যগুলাকে অন্যান্য দেশের তথ্যের দাঁড়ি পাল্লায় হাজির করা।

অতীতের কিস্মৎ

যাক্, এখন আজকের কথা বলা যাক। সকল কাজের ভিতরেই কিছু কিছু চিন্তা করিবার জিনিষ, ধারণা করিবার জিনিষ, মাথার জিনিষের প্রয়োজন আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি,—আপনার জীবনে, আমার জীবনে কিম্বা অন্য কোন মানুষের জীবনে এমন কোনো মুহূর্ত্ত আছে কি যে মুহূর্ত্তটা অতি মাত্রায় সুন্দর, অতি মাত্রায় মধুর? যে মুহূর্ত্তকে আমরা বলিতে পারি:—"রে মুহূর্ত্ত, তুই অতি মধুর, অতি সুন্দর, তোর মত মধুর আর কিছু নাই—তোর সমান সুন্দর আর কিছু হইতে পারে না। তুই একবার দাঁড়া, তুই যেখানে আছিস সেইখানেই দাঁড়া, তোকে ভাল করিয়া দেখিয়া লই, তোকে তলাইয়া মজাইয়া বুঝিয়া লই, তোর পশ্চিম পূর্ব্ব, উত্তর দক্ষিণ হইতে তোকে চাখিয়া লই।"

যদি আপনারা কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন "মানুষের জীবনে এমন কোনো মুহূর্ত্ত আছে কি? কারু জীবনে এ রকম মুহূর্ত্ত আসিয়াছে কি?" এর উত্তরে আমি বলিব:—এ আসেনা—আসিতেই পারে না,

কোনোদিন আসিবে না—মানুষের জীবনে এ আসা উচিত নয়। যদি কোনদিন আমার জীবনে আসে আর আমি যদি বলি,—"রে মুহূর্ত্ত, তুই আমার চির সহচর, তুই আমার জীবন-সাথী" তবে সেই মুহূর্ত্তই আমার মৃত্যুক্ষণ। যখন আমি বলিতেছি অমুক মুহূর্ত্তের মত সুন্দর মধুর আর কিছু হইতে পারে না, তখনই আমি নিজে নিজের বুকে ছুরি হানিয়া দিতেছি।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত এই হইতেছে মানব জীবনের গতি,—সভ্যতার স্রোত। আপনারা হয়ত এ সত্য গ্রহণ করিতে না পারেন—সেটা গ্রহণ করা না করা আপনাদের মর্জ্জি। আমার কাছে কিন্তু এটা প্রথম স্বীকার্য্য। আমি বলিতে অভ্যস্ত, "রে অতীত! তুই আমার থুথু। তুই আসিয়াছিলি, তোর সাহায্যে আমার জীবনে হয়ত একটা বড় কিছু ঘটিয়াছে, হয়ত সেটা অতি গৌরবময়। কিন্তু গৌরবের হইলেও সেটা থুথু মাত্র। তাহা লইয়া লাফালাফি করিবার কিছু নাই।" এই গৌরবময় মুহূর্ত্ত হয়ত কোনদিন আমার জীবনকে উদ্বেলিত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সেটাকে ধরিয়া রাখিতে হইলে চিকিৎসকদের কথায় বলিতে হয় "ওটা যে বিষ রে! থুথুটা ফেলিয়া দিয়া তুই তোর স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়াছিস্। থুথুর দাম নেহাৎ কম নয়। কিন্তু এখন এই বিষ আবার তুলিয়া লওয়া বিষ খাওয়ারই সমান। কোন গৌরবময় মুহূর্ত্তের সুখস্বপ্নে বিভোর থাকাও সেইরূপ।" আমার স্বতঃসিদ্ধটা আপনাদেরকে স্বীকার করিতে বলিতেছি না। আপনাদের যা বিশ্বাস তা আপনারা রাখিতে সম্পূর্ণ অধিকারী। আমার যা তা আমি রাখিতে সম্পূর্ণ অধিকারী।

এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিতেছি। ধরুন এক শুভ মুহূর্ত্তে হয়ত বা কপালের জোরে কোন নবাব ছাহেবের সঙ্গে আমার মোলাকাৎ হইয়াছিল। নবাব ছাহেব আমার সাথে হাসিয়া কথা কহিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার আতর দেওয়া পানের খিলি পর্য্যন্ত আমাকে খাওয়াইয়া-

ছিলেন। এই মুহূর্ত্তের স্মৃতি আমার মনে না হয় দু ঘণ্টা থাকুক্ বা তিন দিন থাকুক্। কিন্তু ঐ নেশায় আমার মেজাজ শরিফ কতক্ষণ বা কতদিন থাকিতে পারে বা থাকিলে শোভন হয়? যদি আমি সেই শুভ মুহূর্ত্তের স্মৃতির রেশ লইয়া তিন বৎসর কাটাইতে চেষ্টা করি, নবাব ছাহেবের সেই ক্ষণিক বন্ধুত্বকে যদি জীবনের এক বড় পুঁজি বিবেচনা করি, প্রধান মূলধন বলিয়া ভাবি, তাহা হইলে আপনারা আমার পাগলামি দেখিয়া হাসিবেন না কি? কতক্ষণ আপনারা আমার পাগলামি সহিতে রাজি আছেন? যতই মধুর হোকনা কেন মোলাকাৎ. পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে তাহা থুথু মাত্র, একদম কিম্মৎহীন।

অতীত সম্বন্ধে আগাগোড়া আমার এইরূপ ধারণা। এখন আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন "এই যদি অতীত হয় তাহা হইলে আমরা দাঁড়াই কোথায়?" এর উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, অতীত একটা প্রত্নতত্ত্ব মাত্র—আলমারীতে পুষিয়া রাখিবার জিনিষ—কবরে রাখিবার জিনিষ। জীবনটা হইতেছে বর্ত্তমান—বর্ত্তমানও নয়—ভবিষ্য দুনিয়াকে দখল করিবার প্রবৃত্তি বা প্রয়াস। এমন কোনো কোনো ক্ষণ হয়ত আসিতে পারে যখন এই অতীত সম্বন্ধীয় আলোচনার ভাবে বিভোর হইয়া থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু দিনের পর দিন প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনকে গড়িয়া তোলাই, জীবনের স্রোত বাড়াইয়া দেওয়াই কাজের মত কাজ।

জীবন-পূজার দেবতা,—যৌবন

যাঁদের সঙ্গে এই বিষয়ে আমার মিল নাই তাঁদেরকে আমি অসম্মান করিনা। কিন্তু আধ্যাত্মিক হিসাবে তাঁদের সঙ্গে আমার প্রথম হইতেই আড়ি। বুঝিতেই পারিতেছেন যে, আমার চিন্তায় একমাত্র ধর্ম্ম হইতেছে বর্ত্তমান-নিষ্ঠা, জীবন-পূজা। বস্তুতঃ আমার বিশ্বাস,—

"ধর্ম্ম নামক কোনো বস্তু ছিলনা কোনো দিন দুনিয়ায়,
সংসারে বেঁচে থাকবার কলকে লোকে ধর্ম্ম বলে দুর্ব্বলের ভাষায়।"

আমার জীবন-পূজার একমাত্র দেবতা যৌবন। আর আমার এই দেবতার জন্য যদি কোনো পয়গম্বর আবশ্যক হয়, তবে কাকে আমি পয়গম্বর বিবেচনা করি? আমার সে পয়গম্বর মহম্মদও নয়, যীশুও নয় বা শ্রীকৃষ্ণও নয়। সে হইতেছে দুনিয়ার যৌবন-শক্তি, যুবা মানুষ, যুবক দুনিয়া। তরুণ ব্যক্তি বা তরুণের দল এই আমার একমাত্র পয়গম্বর।

আমি আজকের কথা বলিতেছিনা। বারো বৎসর আগেও যুবাই আমার পয়গম্বর ছিল। এই বারো বৎসরের মধ্যে যে কোন দেশেই আমি গিয়াছি—ঈজিপ্ট. ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জাপান, চীন, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, ইতালি ইত্যাদি—সব দেশেই আমার পয়গম্বর ঐ যুবক। যুবক ইংরেজ আমার দোস্ত, যুবক জাপানী, যুবক ফরাসী, যুবক চীনা, যুবক জার্ম্মাণ এরাই আমার পয়গম্বর। এটা একটু সোজাভাবে বলা যাউক। দেশী বিদেশী হোমরা চোমরা অনেকের সঙ্গেই আমার দহরম মহরম চলিয়াছে এবং চলিয়া থাকে। কিন্তু আমি বলিতে চাই যে,—দুনিয়াটা এঁদের দ্বারা চলেনা। নামজাদাদেরকে আমি অশ্রদ্ধা করিনা। তাঁহাদের সঙ্গে আমার ভাব আছে কম নয়। কিন্তু তাঁহারা আমাকে কোথায়ও তাতাইয়া তুলিতে পারেন নাই। কিছু হেঁয়ালীর মতন লাগিতেছে বোধ হয়?

পয়গম্বর,—যুবা দুনিয়া

আরও খুলিয়া বলি। আমার চেয়ে যে বয়সে বড় সে আমাকে কোন দিন কোন বিষয়ে এক কাঁচ্চাও শিখাইতে পারে নাই, আর পারিবেও না। আপনারা জিজ্ঞাসা করিবেন—"তবে কি যাদের সাথে বয়স হিসাবে

তোমার সাম্য আছে, যারা তোমার এক ক্লাসের ইয়ার, তাহারাই কি তোমাকে শিখাইতে পারে ?" আমি বলিব—না। তাও নয়। এ অতিবড় অহঙ্কারী দাম্ভিকের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু দাম্ভিক আমি এক দম নই। যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—"বলি বাপুহে, তবে তুমি কাকে সম্মান কর শুনি ? কে তোমাকে শিখাইতে পারে, কাকে তুমি গুরু বলিয়া স্বীকার কর ?" এর উত্তরে আমি বলিব—যারা আমার চাইতে পাঁচ সাত বছরের ছোট, এমন কি তারাও আমাকে শিখাইতে পারেনা, তাদেরকে আমি বড় একটা সম্মান করি না। খুব ভাল করিয়া চাখিয়া দেখিয়াছি,—যে লোক আমার চেয়ে পাঁচ-সাত বছরের ছোট তারা আমাকে শিখাইতে পারেনা। কম্‌সে কম দশবছর পনর বছরের যারা ছোট, এক মাত্র তারাই আমার পয়গম্বর, তারাই আমার গুরু।

ইংরেজ সমাজে, ফরাসী দেশে, সকল দেশেই বড় বড় দার্শনিক, কবি, এঞ্জিনিয়ার, ঐতিহাসিক দেখিয়াছি। তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও আছে। তাঁহারা আমার মত দশ বিশটাকে আলমারি আলমারি বই শিখাইয়া দিতে পারেন। মহা মহা দিগ্‌গজ সব। কিন্তু তাঁহারা তাজা মানুষ জ্যান্ত মানুষ নন। দুনিয়াকে ভাঙিয়া চুরিয়া টুকরো টুকরো করিয়া নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে এমন ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। কিন্তু দেখিয়াছি ইংরেজ যুবাকে, ফরাসী যুবাকে, জার্ম্মান যুবাকে। তারা আমার চেয়ে পনর বা বিশ বছরের ছোট। পাণ্ডিত্যের বৈঠকে হয়ত তাহাদের কোনই ইজ্জৎ নাই, কিন্তু এরাই পারে বুড়া গুলাকে ঢিট্ করিতে। তাহাদেরকেই আমি দুনিয়ার পয়গম্বর বিবেচনা করি। এই গেল আমার যৌবন-বিজ্ঞানের সিঁড়ি, বিশ্বজয়ী যৌবনের বিজয়-যাত্রার ধাপ-নির্দ্দেশ।

সেই ১৯০৫ হইতে আজ ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত আমার একমাত্র অভিজ্ঞতা এই। এই বাঙ্গলা দেশে, এই ভারতে, আমাকে তিল তিল

করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছে কে? যাঁহারা আমার চেয়ে বেশী বই পড়িয়াছেন বা বেশী বিদ্যা শিখিয়াছেন তাঁহারা আমাকে শিখাইতে পারেন নাই। হাঁ, তাঁহাদের কাছে বই মুখস্থ করিয়াছি—একথা অস্বীকার করিনা। কিন্তু আমাকে শিখাইয়াছে কে? যাঁহাদের নাম আপনারা কেউ জানেন না। এই আমাদের বাঙ্গলা দেশকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে কে? যাহাদের নাম খবরের কাগজে বাহির হয় না। সে বি, এ, এম, এ, পাশ করাও নয়। সে অজ্ঞাতকুলশীল আঠার-বাইশ বছরের যুবা। হয়ত দূর পল্লীর এক অজানা অখ্যাত কেরাণী অথবা চাষী কিম্বা চাষী-ঘেঁষা ভদ্র-লোকের সন্তান। এরাই এই নবীন বাঙ্গলার জন্মদাতা। বাঙ্গলার যুবা নয়া বাঙ্গলাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। বুড়োরা একথা স্বীকার করিবেন কিনা জানিনা। ছেলেদের ভিতর যাহারা বুড়া হইয়া গিয়াছে তাহারা একথা বুঝিবে কিনা জানিনা। কিন্তু আমার নিকট এ হইতেছে সনাতন সত্য।

যৌবনের স্রোত

এই যৌবন-বিজ্ঞানের নজির পাই সেই মান্ধাতার কালেও। যৌবন-শীল যুবা একদিন কি বলিয়াছিল আমার কল্পনায় তাহা নিম্নরূপ :—

"অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমি, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুমি, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এরা সবে,
রবি শশী লতাপাতা পাথর দরিয়াও অগ্নিস্ফুলিঙ্গই ভবে।
আনো চকমকি, লাগাও ঘষা, এখনি জ্বলিবে আগুন।" ইত্যাদি।

এই আগুনের স্রোত ছুটাইয়াছিল যুবক দুনিয়া। আমাদের ভারতে সেই যৌবনের গান শুনিতে পাইতেছি মধুচ্ছন্দার আগুন-ঋকে। ভারতই কেবল এই আগুনের গান গাহিয়াছে এমন নয়। চীন একদিন এই গানই গাহিয়াছিল। সুইজিন চীনাদের মধুচ্ছন্দা। পার্শীদের আবেস্তাও

আগুনেরই গাথা। গ্রীকদের প্রমেথেয়স আমাদের মধুচ্ছন্দারই মাসতুত ভাই। মান্ধাতার আমলে এরা সবাই যৌবন-শক্তির অবতার, যুবক দুনিয়ার প্রতিনিধি।

কিন্তু অন্যান্য যুবারা দেখিল শুধু আগুনে চলেনা। ঘোড়া চরান, গরু চরান চাই, চাষবাস চাই। তারা এসব সুরু করিয়া দিল। এই রকম আর আর যুবা দেখিল, কেবল এ সবেও চলেনা। তারা ছুতোর মিস্ত্রির কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। পাল্কী তৈরী আরম্ভ হইল। গাড়ী তৈয়ারী হইল, ঢেঁকি তৈয়ারী হইল, ঝাঁটা তৈয়ারী হইল। দুনিয়া নানা প্রকার কিম্ভূত কিমাকার "নতুন-কিছু"তে ভরিয়া যাইতে লাগিল। পুরাতনে কোনো যুবাই সন্তুষ্ট নয়। সবাই চাহিয়াছিল যৌবনের স্রোত বাড়াইতে, জীবনকে অনির্দ্দিষ্টের পথে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে।

দেখিতে দেখিতে পল্লী গড়িয়া উঠিল। এমন সময় আর একজন যুবক দেখিল, শুধু পল্লীতে চলিবেনা। "ভাঙ্গ পল্লী, সহর গড়িয়া তোল।" পল্লীতে পল্লীতে জোড়া লাগান হইল, এমনি করিয়া সহরের সৃষ্টি হইতে লাগিল। আমাদের ভারতীয় যুবকরাও পল্লী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সহরের পত্তন করিতে ছুটিয়াছিল। সহরেও ভারতবাসীর আধ্যাত্মিকতা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। যে-সে রকম সহর নয়। তার চৌহদ্দি ছিল ২১।২১॥ মাইল। এ আমাদের পাটলিপুত্র। যখন রোম নগরীর সীমানা ছিল মাত্র দশ মাইল। যাক বুঝা যাইতেছে এই, পশ্চিমের যুবার আর পুবের যুবার আদর্শগত কোন তফাৎ ছিল না।

এই ভাবে যুবারা দুনিয়ার চাল-চলন কত বিভিন্ন উপায়ে বদলিয়া ফেলিতে লাগিল। রাজা-প্রজার সম্বন্ধ দেখা দিল। জমিদারে রাইয়তে সংশ্রব সৃষ্ট হইল। পল্লীতে পল্লীতে, শহরে শহরে, পল্লীতে শহরে রেশা-রেশি মূর্ত্তি পাইল। কারিগরদের গিল্ড বা শ্রেণী জাঁকিয়া উঠিল। ইত্যাদি

ইত্যাদি। এই খানেই যুবারা ক্ষান্ত হয় নাই—একেই চরম বলিয়া স্বীকার করে নাই। যুবক দুনিয়া কখনো বলে নাই, "রে মুহূর্ত্ত, তুই অতি সুন্দর, তুই দাঁড়া"। সর্ব্বদা বলিয়াছে "চাষবাস মধুর বটে, কারিগরদের শ্রেণী-স্বরাজ সুন্দর বটে। গোপুরম, গথিক গির্জ্জা, গুম্বজ ওম্দা বটে। যা কিছু গড়িয়া তুলিয়াছি সবই সুশ্রী বটে। কিন্তু এক মাত্র এই সবে সানাইবে না। জীবনের পথ আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।"

এই খানে দুনিয়ার বোমা ফুটিল—বাষ্পযন্ত্র আর বাষ্পপোত। এর ফলে দুই হাজার দশ হাজার বৎসরের সভ্যতা কোথায় চলিয়া গেল! পয়দা হল উনবিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান জগৎ। মানবের যৌবন-শক্তির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সেই পুরাণা রাজা-প্রজা উড়িয়া গেল। পুরাণা পরিবার-বন্ধন উড়িয়া গেল। পুরাণা ভাত-কাপড়ের বিধান উড়িয়া গেল। পুরাণা জমিজমার বন্দোবস্ত, পুরাণা পল্লী শহর, পুরাণা চাষ-প্রধান সভ্যতা লোপ পাইল।

দিগ্‌বিজয়ের মন্তর

জীবন ফুরাইবার নয়। কোন যুগে কোন কেন্দ্রে, কোন ব্যক্তির জীবনে, কোন সমাজে ফুরাইবার নয়। প্রত্যেক অতীত মুহূর্ত্তকে যুবা বলিয়াছে —"রে মুহূর্ত্ত, তোকে আমি কলা দেখাইতেছি।" মধুচ্ছন্দা, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য হইতে আরম্ভ করিয়া হাজার হাজার ভারতীয় অভারতীয় ঋষিরা, মানব সভ্যতার প্রবর্ত্তকেরা বলিয়া আসিয়াছে,—"রে অতীত, তোকে কলা দেখাইতেছি, তুই চরিয়া খা গিয়া। তোকে রাখিয়া দিব আলমারীর ভিতরে। তোকে রাখিব মিউজিয়ামে। ছেলেরা দেখিবে। তুই ঠাকুরদাদাদের হাড়-গোড়ের মত থাকিবি কবরে।" দিগ্বিজয়ী যৌবনের গানে এই হইতেছে এক মাত্র "মুদ্দা"।

প্রতি মুহূর্ত্তে যুবা মানুষ ধরাখানাকে সরা জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে। ধরিত্রীকে, ভূমিকে, সর্ব্বদাই সে বলিয়াছে :—

"অহমস্মি সহমান
উত্তরোনাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়্
আশামাশাং বিষাষহি" ॥—অথর্ব্ববেদ।

"আমি পুরুষ, ক্ষমতার মূর্ত্তি—পরাক্রমের মূর্ত্তি। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে লোকে জানে মোরে দুনিয়ায়। আমি উত্তম আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুনিয়াকে ভাঙিয়া চুরিয়া তার উপর তাম্বি চালানো আমার স্বধর্ম্ম। আমি বিশ্বজয়ী,— দিকে দিকে বিজয় সাধন করা কর্ম্ম আমার।" এই যৌবন-বিজ্ঞান সেই মধুচ্ছন্দার আমল হইতে হিণ্ডেনবুর্গ, মার্শাল ফোশের সময় পর্য্যন্ত মানব-জাতির স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিয়াছে। দিগ্বিজয়ই জীবনের, যৌবনের একমাত্র ধর্ম্ম। মানুষ জন্মিয়াছে, নূতনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য। সকল যুবার মুখেই একবোল,—

"পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে মোরে
জানে লোকে ধরাতে,
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে
বিজয়কেতন উড়াতে।"

যুবক বঙ্গের দিগ্বিজয়

এই বিষয়ে এখন একটা নেহাৎ ঘরোআ কথা বলা যাউক। অতীতকে থুথুর মত ফেলিয়া দেওয়া, অতীতকে কলা দেখানো, ভারতবাসীর পক্ষে অতিমাত্রায় কঠিন জিনিষ নয়। বেশীদূর যাইতে হইবে না, এই যুবক

ভারতের কৃতিত্বের ভিতরই গণ্ডা গণ্ডা নজির মিলে। কিন্তু নজিরগুলা দেখাইতে গেলেই আপনারা আমার বিরুদ্ধে হয়ত একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিবেন। কেননা খোলাখুলি দুএকজন লোকের নাম করিতে চাই এই সূত্রে।

আপনারা সাধারণতঃ অতীত এবং মহা অতীত বিশ্লেষণ করিয়া দর্শন নিংড়াইতে অভ্যস্ত। কিন্তু দর্শন আমার কাছে প্রতিদিনের মামুলী কাজের মধ্যেই ধরা দেয় আমি হাঁড়ী-কুঁড়ির ভিতর, আড্ডা-বৈঠক-গল্প-গুজবের ভিতর ডাল-ভাতের মত অতি ছোট জিনিষের ভিতরও দর্শন দেখিতে পাই। তাই বলিতেছি যে,—এই যুবক ভারত, যুবক বাঙ্গলা, বাঙ্গলার যৌবন শক্তি প্রত্যেক দিনই দিকে দিকে বিজয় সাধন করিয়াছে। যৌবনের দিগ্বিজয় বস্তুটা আমাদের আজকালকার বাঙ্গলায় নেহাৎ অপরিচিত মাল নয়। তবে এখানে আমার ভয় হইতেছে। হয়ত আমি আজ যা বলিয়া যাইতেছি, বাহিরে লোকমুখে তার উল্টো ব্যাখ্যা ছড়াইয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আমাদের দেশের বড় বড় লোকের ভিতরে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আর চিত্তরঞ্জন এই যে চারজন—এঁদের মহত্ব সম্বন্ধে কোনই গোলমাল হইবার নয়। এঁরা প্রত্যেকেই বীর পুরুষ। এঁরা যে বীর একথা দিনের আলোর মত সত্য, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যে কোনো দেশে যে কোনো যুগে যে কোনো সমাজে এই চার জন বীর, লোকজনের পূজা পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হইতেছে, এঁদেরকে বীর করিয়া তুলিয়াছে কে ?

আমরা এতই সংযম শিখিয়াছি যে নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মশক্তি প্রচার করিতে একেবারেই নারাজ। ভয় পাছে আমাদের আধ্যাত্মিকতার ব্যাঘাত ঘটে! কিন্তু আমার বিবেচনায় নিজ

নিজ কৃতিত্ব ও কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাটা আধ্যাত্মিকতার অন্তরায় নয়। আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তির উপর শ্রদ্ধা, নিজ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে আস্থা রাখা এই সব চিজকে দাম্ভিকতা, অহঙ্কার ইত্যাদি বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। আমার মতে ঐগুলা দোষ নয়, গুণ। "অহঙ্কার"-ই হইতেছে আধ্যাত্মিক উন্নতির বনিয়াদ। কাজেই যুবক ভারতকে আত্ম-চৈতন্যশীল, আত্মশক্তিপরায়ণ এবং আত্মকৃতিত্বে আস্থাবান দেখিতে আমি ইচ্ছা করি। আমার সঙ্গে আপনারা একমত হইবেন এরূপ আমি বিশ্বাস করি না! আমার মতে আপনাদেরকে টানিয়া আনা আমার মতলব নয়। তবে আমার বক্তব্য আওড়াইয়া যাইতে আমি অধিকারী।

বঙ্কিম-স্রষ্টা ১৯০৫ সন

বঙ্কিমচন্দ্র যুবক-বাঙ্গলা সৃষ্টি করেন নাই। যুবক বাঙ্গলাই বঙ্কিমকে গড়িয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গলায় যৌবন-শক্তি ১৯০৫ সনে কেমন করিয়া জাগিয়াছিল, কেন জাগিয়াছিল, এসব প্রত্নতত্ত্বের খোঁজ করিবার সম্প্রতি দরকার নাই। একদিন যুবক ভারত জাগিয়া উঠিয়া দেখিল একটা জিনিষের তার অভাব। একটা মন্ত্র তার দরকার। এই মন্ত্র হইতেছে "বন্দে মাতরম্।"

এটা ১৯০৫ সনে প্রথম ছাপা হয় নাই এটা ছাপা হয় আরও আগে সেই ১৮৮৫ কি ৮৬ সনে কিম্বা ঐ যুগের কোনো এক ক্ষণে। কিন্তু তখন বঙ্কিমকে কেউ বড় একটা পুছে নাই। যখন বঙ্কিমচন্দ্র মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছিলেন তারও অনেককাল পরে বঙ্কিমের তলব পড়িয়াছিল। কে ডাকিয়াছিল? বুড়োরা নয়। যুবক ভারত, যুবক বাঙ্গলা বলিয়া উঠিল, "ঐ একটা লোক আছে, মানুষের মত মানুষ, ওকে খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে।" বঙ্কিমের যাঁরা চরম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন তাঁরা কল্পনাও করিতে

পারেন নাই যে, যুবক ভারত, যুবক বাঙ্গলা একদিন বঙ্কিমকে অত উপরে আসন দিবে—অতখানি মাথায় করিয়া রাখিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার চিন্তাশক্তিকে খুব তাজা ও নিরেট করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর বাঁচিয়া থাকা-কালীন সাহিত্যসেবকগণ বঙ্কিমের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কতটুকু করিতেন, সেই সব আলোচনার দৌড় কতটা, এসব কথা পাঁজি দেখিয়া বলা দরকার। তাঁর মরিবার পরও তাঁর সম্বন্ধে অনেকে সমালোচনাও লিখিয়াছিলেন—একথা আমি অস্বীকার করি না। ১৯০৫ সনের আগে বঙ্কিমের পশার বাংলা দেশে ছিল না একথা কেউ বলিবে না। ইস্কুল কলেজের ছেলেরা, নভেল-পড়া মেয়েরা, তার বই বালিশের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া পড়িত।

কিন্তু সেই বঙ্কিম আর ১৯০৫ সনের বঙ্কিম এক জিনিষ নয়। 'বন্দেমাতরম্' আগুনের স্রোতকে যুবক ভারত কোথায় লইয়া ঠেকাইবে তা আজও কেহ জানেনা। সেই বঙ্কিমী যুগের হোমরা চোমরারা তো কেউ ঠাহর করিতেই পারেন নাই। বঙ্কিম তাঁর নিজের যুগে যুবা। প্রবীণরা এই নবীনকে বেশী বরদাস্ত করিতে পারেন নাই।

যুবক ভারত, বাঙ্গলার যৌবনশক্তি বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙ্গলার মানুষের মধ্যে দুনিয়ার কাছে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যুবক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। বঙ্কিম-দর্শন দিগ্বিজয়ী বঙ্গীয় যৌবনের সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তিস্তম্ভ।

বিবেকানন্দের বাঘা চোখ

বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁর বক্তৃতার ফলে মার্কিণ সমাজের কোন কোন মহলে ভারত সম্বন্ধে একটা সাড়া পড়িয়া

যায়। সে ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৫ সনের কথা। তার অনেকদিন পরে ১৯০২ সনে তিনি মারা যান। কিন্তু সে যুগের বাঙ্গালীরা বিবেকানন্দকে থোড়াই কেয়ার করিত বলিলে বেশী মিথ্যা বলা হয় কি? তখনকার দিনে বড় জোর তার নামে দুই একটা বোর্ডিং ঘর খোলা হইত। আর সেখানকার ছেলেদের যদি জিজ্ঞাসা করা যাইত—"ওহে তোমরা কেমন আছ?" তারা উত্তর করিত—"এখানে বিবেকানন্দ হয় কিনা জানিনা, কিন্তু উদরানন্দ ত মোটেই হয় না!" যাঁকে একদিন অবতার বলিয়া বাঙ্গালী সমাজ পূজা করিবে তাঁকে কতখানি ইজ্জত দিতে হয়, তা ১৯০২ সনের যুগের বাঙ্গালী জানিত না।

বিবেকানন্দের নামে সমিতি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান চলিতেছে আজ ভারতের সর্ব্বত্র ডজনে ডজনে। বিবেকানন্দ-সাহিত্য প্রায় প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতসন্তানই পাঠ করিয়া থাকেন। বিবেকানন্দের "দরিদ্র-নারায়ণ" বয়েৎ সেদিন মেয়ররূপে চিত্তরঞ্জন "মুন্সিপালাইজড" "অফিসিয়ালাইজড" করিয়া নগর-শাসনের অন্যতম লক্ষ্যের মধ্যে খাড়া করিয়া দিয়াছেন। আমরা এই শব্দটা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচারিত করিয়া ছাড়িয়াছি।

আবার প্রশ্ন করিতেছি,—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামডাক কবে হইতে বাঙ্গালী সমাজে একটা জীবন-শক্তিরূপে দাঁড়াইতে সুরু করিয়াছে? "আশ্রম"গুলা ফুলিয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে কবে হইতে? ঠিক ১৯০৫ সনেও নয়, আরও পরে। রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক বিবরণগুলো ঘাঁটিয়া অঙ্ক কষিয়া বলিয়া দেওয়া চলে। বোধ হয় ১৯১০ সনের এদিকে ওদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের জোয়ার ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই আন্দোলনকে বাড়াইয়াছে কে?

যুবক বাঙ্গলা একটা মানুষের মতন মানুষ খুঁজিতেছিল। একটা মানুষ খাড়া করিতে গেলে সে দর্শন জানে কিনা, ভাল সংস্কৃত তার দখলে

আছে কিনা, লোকটা পণ্ডিত কিনা এসব দেখিবার প্রয়োজন করে না। বিবেকানন্দ দর্শন জানে কিনা যুবকবাঙ্গলা এ খবর লইতে যায় নাই। দেখিয়াছিল,—তার ঐ বাঘা বাঘা চোখ দুটো। ব্যস্, আর কুছ পরোয়া নাই! তার ঐ সিংহের মতন পরাক্রম এই হইলেই চলিবে। এর বেশী কিছু দকার নাই। যে মানুষটা বলিবে,—

"পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে মোরে জানে লোকে ধরাতে,
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়কেতন উড়াতে",

সে সংস্কৃত ফার্শী জানে কিনা তা ভাবিবার প্রয়োজন করে না।

আমেরিকার খোলা আসরে দাঁড়াইয়া প্রথম যেদিন এক গোলামের বাচ্চা জোর গলায় সিংহবিক্রমে বলিয়াছিল "ভারত কাহারও চাইতে ছোট নয়, সেও একটা হাতী ঘোড়া কিছু করিতে চায়—দুনিয়ায় একটা নতুন কিছু করিয়া ছাড়িবে"—দুনিয়া বুঝিয়াছিল যে, জগতে যুগান্তর আসিতেছে। তার অনেক কাল পরে ১৯০৫ সনের যুবক বাঙ্গলা দুনিয়ার আর সব জাতির সঙ্গে সমান অধিকারের দাবী লইয়া দাঁড়াইবার মতন দুঃসাহস দেখাইয়াছিল। তাই বাঙ্গলার যৌবন-শক্তি এই "অহঙ্কারী" আত্মচৈতন্যশীল "দাম্ভিকতার" প্রতিমূর্ত্তি কর্ম্মবীর "বাপকা বেটা" কে নিজেরই অবতাররূপে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। বাঙ্গালী-যৌবনের দিগ্বিজয়ে বিবেকানন্দ এক বিপুল কীর্ত্তিস্তম্ভ।

যৌবন-নিষ্ঠায় আশুতোষ

বাঙ্গালীর আর এক "বাপের বেটা" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এখানে যত লোক উপস্থিত আছেন,—বাঙ্গলার অলিতে গলিতে যত উকিল দু-পয়সা রোজগার করিতেছেন,—বাঙ্গালী সমাজে বি, এ, ফেল, বি এ পাশ, —গল্প-লেখক, সাংবাদিক, কেরাণী, মাষ্টার যত যা আছেন, তাহাদের

অনেকেই আশুতোষের কাছে ঋণী। এই আশুতোষ বাঙ্গলার জন্য, বাঙ্গালীর জন্য, শিক্ষা, সাহিত্যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাহা করিয়া গিয়াছেন পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসে আর কোনো ব্যক্তি একলা তেমনটি করিতে পারেন নাই। এইরূপই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এঁকে গ্রীক পেরিক্লেষ বা ফরাসী নেপোলিয়নের মতই জবরদস্ত হুঁস্তে কর্ম্মবীর রূপে জগতের "পূজাস্থান" বিবেচনা করি। এখন আমার প্রশ্ন হইতেছে,— "আশুতোষ আমাদেরকে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, না, আমরা আশুতোষকে সৃষ্টি করিয়াছি?"

১৯০৫—১৯১০—১৯১৫ দশকের বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর লইয়া দেখুন। আজ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় "সন্তানে"—ভারতে, এমন কি ইয়োরামেরিকায়ও,—বাঙ্গালীকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে, কমসে কম বড় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় আজ বাঙ্গালী জাতের অতি বড় দুরাকাঙ্ক্ষা প্রচার করিয়াছে। এই দুরাকাঙ্ক্ষার আসল এবং সকলের চেয়ে সেরা উৎস হইতেছেন আশুতোষ। কিন্তু এই যে বাঙ্গালীর দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া জগতের সামনে বাহির হইয়া পড়িতে চেষ্টা—এ কবেকার কথা? অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের কীর্ত্তিযুগ কতদিনকার জিনিষ?

আমার বিবেচনায় "আশুতোষের যুগ" মোটের উপর ১৯১৪-১৫ হইতে ১৯২৪-২৫ পর্য্যন্ত। একটুকু খুলিয়া বলা দরকার। ১৯১৮ সনের কথা মনে পড়িতেছে। আমি তখন একদিন আমেরিকার নিউইয়র্কে পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে ইয়াঙ্কি, বিলাতী, ফরাসী, জার্ম্মাণ পত্রিকা ঘাঁটিতেছিলাম। হঠাৎ ঐ সব বিদেশী পণ্ডিত-পরিষদের মুখপত্রে বাঙ্গালীর লেখা আমার চোখে পড়িল। বাঙ্গালীর লেখা আমেরিকা-ইংলণ্ডের কাগজে বাহির হইয়াছে—একথা ভয়ানক আশ্চর্য্য বোধ হইল। তাও আবার একটা

ছুটা নয়। বছরের মধ্যে এই ধরণের গবেষণামুলক প্রবন্ধ প্রায় দশ বারটা। তখন দেখিতে আরম্ভ করিলাম, কোন্ তারিখের জিনিষ এসব। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, মোটের উপর ১৯১৬—১৭ সনের পেছনে এ জিনিষ ঠেলিয়া দেওয়া যায় না। ঐ সময় হইতে বাঙ্গলা দেশ জ্যান্ত ভাবে দুনিয়ার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করিতে চাহিয়াছে। এই যুগটাই আশুতোষের যুগ। ১৯.৫ কি ১৬ তে এর পত্তন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলার কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু এ কীর্ত্তির স্থাপয়িতা কে? আশুতোষ?—না। আমি বলিব, যুবক ভারত। যুবক বাঙ্গলা ১৯০৫ সনে জাগিয়াই বলিয়াছিল—"চাই আমরা স্বরাজ, চাই আমরা স্বদেশী, চাই আমরা বয়কট আর চাই জাতীয় শিক্ষা।" এই "জাতীয় শিক্ষার" আন্দোলনটা কি চিজ্? গোড়ার কথা হইতেছে,—বাঙ্গলার যৌবন শক্তি বুঝিয়াছিল যে, প্রাচীন দুনিয়ায় প্রাচীন ভারতের ঠাঁই আবিষ্কার করিতে হইবে। এই শক্তি ইংরেজ জার্ম্মাণ ইত্যাদি পণ্ডিতদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। সেই আন্দোলনের দ্বিতীয় সাধনা ছিল বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, রসায়ন, তড়িৎ, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি সবই বাঙ্গালীর নিজের কব্জায় আনিয়া কৃষি-শিল্পের উন্নতি করা। আর শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলাকে বাঙ্গালীর তাঁবে আনা—এই ছিল যুবক বাঙ্গলার তৃতীয় সংকল্প ও স্বপ্ন।

১৯০৫ হইতে ১০ সন পর্য্যন্ত অসমসাহসিক যুবক বাঙ্গলা তুমুলভাবে আন্দোলন চালাইয়াছিল। আশুতোষ তখন এ লাইনে কিছু করিয়াছিলেন কি? বিশেষ কিছু করেন নাই। তিনি তখন যুবক বাংলার অনেক পেছনে পড়িয়াছিলেন। বাঙালী-যৌবনের দিগ্বিজয় যে তাঁহাকে একদিন হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে, তাহা তখনও তিনি ঠাওরাইতে পারেন নাই।

কিন্তু ১৯০৫-১০ এই বছরগুলো আশুতোষের পক্ষে শিক্ষানবিশীর অবস্থা। বাঙ্গলার নাবালকদের কাণ্ডকারখানা তাঁহাকে নিবিড়ভাবে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। এই যে যৌবন-শক্তির প্রচেষ্টা এটা সম্ভব কি? তাই ছিল ভাবিবার কথা। ১৯০৫ সনে তিনি আমাদের বিরোধী ছিলেন। অনেকেই এ কথা জানে। কারণগুলা আলোচনা করিবার দরকার নাই। ভাবিতে ভাবিতে অনেক বছর কাটিয়া গেল। আসল কথা হইতেছে যুবক বাঙ্গলার কৃতিত্ব, দুরাকাঙ্ক্ষা, অসাধ্য সাধনের প্রয়াসই তাঁহার মনের উপর কাজ করিতেছিল। যুবক বাংলাই তাঁহাকে সাধনায় সিদ্ধি লাভের যন্ত্র আবিষ্কারের পথে চালাইয়াছে,—আশুতোষকে সেনাপতি করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ফলেই আজিকার বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়। যুবক ভারতের নিকট আশুতোষের পরাজয়টাই আশুতোষের বীরত্বের ভিত্তি।

যুবক যা চিন্তা করে, বুড়োরা তা ভাবিতে পারে না। নাবালক নায়কের পেছনে পেছনে থাকে বুড়োরা। ১৯০৫-৬ সনের "জাতীয় শিক্ষার" বাণী সেকালের বহু গণ্য-মান্য বাঙালীর নিকটই অতি চরম কিছু মনে হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৫ সনে যুবক বাঙ্গলা শিক্ষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্পের আসরে যা কিছু চাহিয়াছিল, তার প্রায় সবই আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মজুদ দেখিতে পাইতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেকটা নিম-"জাতীয়" প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই আশুতোষের মহত্ত্ব। অবশ্য আজ আবার অনেক দিকেই সংস্কার দরকার।

তবুও একটা "কিন্তু" আছে। যুবক বাংলার চরম কথা এখনো এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই, কেন না সরকারের শাসন এখনো এই পাঠশালায় চলিতেছে। আশুতোষ বিদ্যালয় হইতে গবর্মেণ্টের সম্বন্ধ একেবারে রহিত করিয়া দিলেন না কেন? এ বিষয়ে "অসহযোগের" যুগে,—১৯২২ সনে বোধ হয় চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দু'একবার তাঁহার বচসা হয়। সে সব কথা

আপনারা সকলেই জানেন। আমি তো বিদেশে বসিয়াই অল্পবিস্তর শুনিয়াছি। চিত্তরঞ্জন আশুতোষকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি যদি গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ রহিত কর তবে কালই তোমার হাতে দু'চার কোটী টাকা তুলিয়া দিব।" আশুতোষ একথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আমি বলিতে চাই, বিশ্বাস না করাই ঠিক হইয়াছিল,—কারণ, তখন অত টাকা উঠিত না। আর উঠিলেও একমাত্র দুইকোটি চার কোটির জোরেই গোটা বাঙ্গলাদেশের জন্য জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা পাঁচ সাত দশটা তাজমহল গড়ার বরাত্। যাক সে কথা। মোটের উপর বুঝা গেল যে, শেষ পর্য্যন্ত আশুতোষ যুবক বাংলার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়াই চলিয়া ছিলেন,—কেবল পারেন নাই ঐ সম্বন্ধটা টুটাইতে।

চিত্তরঞ্জনের গুরু,—যুবক বাঙ্গলা

এইবার চিত্তরঞ্জনের কথা। চিত্তরঞ্জন নামজাদা হইয়া পড়িয়াছেন কবে হইতে? ১৯০৫ সনে তাঁহাকে বড় বেশী জানা যায় নাই। ১৯১৫ সনেও তিনি বাহিরে। লোকেরা তাঁহাকে চিনিত না তা নয়। যুবাদের সঙ্গে তাঁর লেন-দেন ছিল না এ কথা বলিতেছি না। বলিতেছি এই যে, যুবক বাংলার সঙ্গে তিনি তখনও খোলামাঠে যোগ দিতে পারেন নাই। যে চিত্তরঞ্জন ১৯২৪-২৫ সনে গোটা বাঙ্গলার, গোটা ভারতের, গোটা দুনিয়ার—এক অদ্বিতীয় বীর সাব্যস্ত হইবে, কেল্লা ফতে করিবে আর সেই কেল্লার মধ্যেই বিজয়-গৌরবের অভিমান সহ জীবন উৎসর্গ করিবে সে চিত্তরঞ্জন তখনও বাহিরে ছিলেন। অঙ্ক কষিয়া বলিয়া দেওয়া চলে চিত্তরঞ্জন কবে আসরে নামিয়াছেন বা নামিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তখনও আবার আমি বিদেশে, ফ্রান্সে। একদিন কথা প্রসঙ্গে এক

গুজরাতী বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলাম, বাঙ্গলা হইতে তো কোন লোকের সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল,—"ক্যা, দাস বাবু কা নাম আপকা মালুম নাহি হ্যায় ?" জিজ্ঞাসা করিলাম—দাস বাবুটি আবার কে ? দাস তো বাঙ্গালায় কতই আছে। জবাব পাওয়া গেল,—দাস সাহেব, ব্যারিষ্টার থা, উস্কা বহুৎ প্রাক্‌টিস্ থা। অনেক আলোচনার পর বাহির হইল চিত্তরঞ্জনের নাম। চিত্তরঞ্জন জীবনের শেষ দিকে মাত্র দুই তিন বৎসর নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে দেশের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু আবার মজার কথা। তিনি যখন আসরে নামিয়াছিলেন তাঁর বন্ধুরা, প্রবীণ বিজ্ঞেরা তাঁর ছায়া মাড়াইয়াছিলেন কি ? মাড়ান নাই। তিনি যুবার পাল্লায় পড়িয়া আসরে নামিয়াছিলেন,—শেষ পর্য্যন্ত যুবারাই তাঁহাকে অবতার করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁর ডাইনে বাঁয়ে কেবল আঠার-বাইশ বছরের যুবা। নেতা হ'ল আঠার-বাইশ বছরের যৌবন-শক্তি। আর তারই পশ্চাতে থাকিয়া—অথবা তারই মুখপাত্র হইয়া চিত্তরঞ্জন "দেশ-বন্ধু" দাঁড়াইয়া গেলেন। দিগ্বিজয়ী বঙ্গীয়-যৌবনের এক শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ চিত্তরঞ্জন। যুবক ভারতের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আন্তরিক সাক্ষ্য চিত্তরঞ্জনের নিকট যত পাওয়া যাইতে পারিত, অত বোধ হয় আর কাহারও কাছে নয়।

সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইতেছি, যুবক ভারত প্রতিজ্ঞা করে যে,—অসাধ্য সাধন করিতে হইবে। তারা নিজে খাটিয়া, নিজের জীবনে পরখ করিয়া, নিজেরা ভুগিয়া দেশকে দেখায়,—কাজটা করিয়া তোলা নেহাৎ অসাধ্য নয়। তখন বড় লোকেরা আসিয়া তাদের সাথে যোগ দেয়। তখন আসিয়া তাঁরা বলেন,—"হাঁ, কাজটা করিতে হইবে।" এই হইতেছে যৌবন-বিজ্ঞানের ধারা।

বৃহত্তর ভারতে রবীন্দ্রনাথ

যাক্, এসব তো মরা বাঘের কথা বলিলাম। এখন একটা জ্যান্ত মানুষের কথা বলা যাউক। বলিতে যদিও ভয় হইতেছে, কেন না আপনাদের মেজাজ বুঝিয়া ওঠা কঠিন। রবি বাবুকে অনেক যুবক পছন্দ করেন না। তার কারণ অবশ্য আমি জানি না, বুঝিতেও পারি না। কিন্তু আমার বিবেচনায় রবি বাবু একজন সেরা যুবা। যুবক বাঙ্গলার দিগ্‌বিজয়ে প্রথম কীর্ত্তিস্তম্ভ বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ বিবেকানন্দ, তৃতীয় আশুতোষ, চতুর্থ চিত্তরঞ্জন। তেমনি আর এক কীর্ত্তিস্তম্ভ ঐ জ্যান্ত মানুষটা—রবীন্দ্রনাথ। এই সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না। মাত্র দু'একটা কথা বলিতে চাই। গত বৎসর এই রবীন্দ্রনাথ মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু কোথায়? ভারতে নয়—এশিয়ায় নয়,—সেই সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার পথে—আটলান্টিক মহাসমুদ্রের বুকের উপর। যদি ঐ রকম অবস্থায় ঘটনাচক্রে তাঁর মৃত্যু ঘটিত,—মরিলে ভাল হইত বা সুখের হইত তা বলিতেছি না,—তাহা হইলে বাঙ্গালী সমাজে যে একটা ৬৬ বছরের যুবা ছিল তা দুনিয়ার লোকে টের পাইত। কিন্তু তিনি সৌভাগ্যক্রমে মরিতে মরিতে যমের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই ৬৬ বছরের প্রবীণকে যুবা তাজা নবীন বলিতেছি কেন? এঁকে যৌবনধর্ম্মের বড় খুঁটা বিবেচনা করিতেছি কেন?

সেই সুদূর আর্জ্জেণ্টিনিয়া প্রদেশে তিনি যুবক ভারতের, যুবক বাঙ্গলার বাণী প্রচারিত করিতে ছুটিয়া যাইতেছিলেন। কোথায় চীন, কোথায় সুইডেন, সকলের সঙ্গেই বাঙ্গলার যৌবন-শক্তির যোগাযোগ কায়েম করিবার আন্দোলনে তিনি নিজকে সজাগভাবে মোতায়েন রাখিয়াছেন।

এই কারবারে রবীন্দ্রনাথের বাহাদুরী কোথায়? তিনি যুবক ভারতের ডাকে সাড়া দিতে পারিয়াছেন বলিয়া। আর কোনো প্রবীণ ভারত-সন্তান তো তা এখনো পারেন নাই। এইটাই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।

বিদেে ভারতের প্রতিনিধি ভারি দরকারী, এই কথা যুবক ভারত লম্বা গলা করিয়া দেশের লোককে জানাইতেছে আজ দশ পনর বছর ধরিয়া। কৈ? লোকের কানে তো একথা গিয়া পশিতেছে না। যুবক ভারতকে দুনিয়া নেমন্তন্ন পাঠাইতেছে, আহ্বান করিতেছে, "আয় তোরা আমাদের দেশে, তোদের প্রতিনিধি পাঠা, আমাদের দেশে ভারতীয় পরিষদ গড়িয়া তোল্।" আমেরিকায় ভারতীয় প্রতিনিধি, ফ্রান্সে ভারতীয় প্রতিনিধি, ইংলণ্ডে ভারতীয় প্রতিনিধি পাঠান অতি আবশ্যক। একথা নবীনেরা বলিতেছে, প্রবীণেরা তা বুঝিতে পারিতেছে না। আমেরিকা, জার্ম্মাণি, জাপান, ফ্রান্সের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া যুবক ভারত দেখাইতে চায় যে, ভারতসন্তান জাগিয়াছে। ভারতের বাহিরে যে সব উড়নচণ্ডী যুবক পড়িয়া রহিয়াছে, সেই সবকে দেশের লোক বোধ হয় "ভ্যাগাবণ্ড" বলে। কিন্তু এরা অনেকেই কাজের লোক। তারা "বৃহত্তর ভারত" গড়িয়া তুলিয়াছে। তারা এ বিষয়ে আন্দোলন চালাইতেছে।

ওসব দেশে প্রতিনিধি রাখিয়া আমরা একমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনই চালাইব একথা বলিতেছি না। ইংরেজের প্রতিনিধি ফ্রান্সে বা ফ্রান্সের প্রতিনিধি আমেরিকায় আছে। তারা কি রাজনৈতিক আন্দোলন চালায়? ইংরেজ প্রতিনিধি ফ্রান্সে বসিয়া বা ফ্রান্সের প্রতিনিধি আমেরিকায় বসিয়া কোনো দেশের সপক্ষে বা বিপক্ষে খবরের কাগজ চালায় না। অথচ তারা প্রত্যেক্যেই ধীরে সুস্থে দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা নিজ নিজ দেশের স্বার্থ পুষ্ট করিয়াই চলিয়াছে।

দুনিয়ার সর্ব্বত্র ইংরেজের প্রতিনিধি রহিয়াছে। তারা সে সকল দেশে যা কিছু করে, আমাদের প্রতিনিধিরাও ঠিক তাহাই করিবে। এই রকম ভারতীয় প্রতিনিধি মার্সেইয়েতে, নিউইয়র্কে, ইয়োকোহামায়, হাম্বুর্গে, লণ্ডনে রোমে, পাঠাইতে হইবে· দুনিয়ার প্রত্যেক বিদ্যার কেন্দ্রে এমনিতর ভারতীয় প্রতিনিধি থাকা চাইই চাই। এই আন্দোলনে আর কেউ যোগ দিতে পারেন নাই। প্রবীণদের মধ্যে যদি কেউ যুবক ভারতের এই বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সমঝিয়া থাকেন,—বিদেশে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভারতীয় প্রতিনিধি রাখিবার সার্থকতা, বিদেশীদের সাথে কর্ম্ম ও চিন্তার বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন তবে সে এই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে এইজন্য যুবক ভারতের, যুবক দুনিয়ারই প্রতিনিধি বিবেচনা করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন প্রবীণকে সে ইজ্জৎ দিতে বড় শীঘ্র রাজি হইব কি না সন্দেহ।

রক্ত করবীতে যুবার ইজ্জৎ

রবিবাবু সম্বন্ধে আর একটা মাত্র কথা বলিতে চাই। বেশী সময় লইব না। তাঁর "রক্ত-করবীর" কথা বলিতেছি। এইখানেও কবির উপর আমাদের যৌবনশক্তিরই জয় জয়কার দেখিতে পাইতেছি। যে সে হাড়ে রক্তের লাল বাহির হয় না। সে কেবল যৌবনের তাজা হাড়েই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যুবা, যুবার সেবক ও ভক্ত। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কীর্ত্তির চেয়ে তাঁহার যৌবন-প্রীতি এবং যৌবন-নিষ্ঠা ছোট কথা নয়।

যুবা দুনিয়ার বাণী রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। জগতের যৌবনশক্তি ফরাসী কবিকে, জার্ম্মাণ কবিকে, ইতালিয়ান কবিকে, ইংরেজ কবিকে, রুশ কবিকে, মার্কিণ কবিকে, মানবজাতির পুনর্গঠন সম্বন্ধে নানা কথা শিখাইতেছে। সেই সকল কথারই কিছু কিছু রবিবাবুর

ক্সানেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর কোনো বাঙ্গালী বা ভারতীয় প্রবীণের সাহিত্যরচনায় তাহা মূর্ত্তি পাইতেছে কিনা সম্প্রতি আলোচনা করিব না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মহত্বই এই যে, তিনি যৌবন-শক্তির অনুসরণে অভ্যস্ত ও সুপটু। "রক্তকরবী" সৃষ্টি করিয়া তিনি দুনিয়ায় যুবক বাঙ্গলার ইজ্জৎ রক্ষা করিয়াছেন। যৌবন-শক্তির দিগ্‌বিজয় বাঙ্গলার যে সব উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তার ভিতর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব অন্যতম।

নির্লজ্জ বেহায়ার মতন আমি অনেক বাজে বকিয়া যাইতেছি। এসব কথা আপনাদের কানে হয় ত বিতিগিচ্ছিরি লাগিতেছে। কিন্তু আমার নিকট এসব কথা দু দুগুণে চারের মত প্রথম স্বতঃ-সিদ্ধ।

চাই তরুণের আত্মচৈতন্য

বাঙ্গলার যৌবনশক্তি বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মত মরা লোকগুলাকে জ্যান্ত করিয়া তুলিয়াছে। আর আশুতোষ-চিত্তরঞ্জনের মতন জ্যান্ত লোকেরা বাঙ্গলার যৌবনশক্তির প্রভাবেই যুবা হইয়া কাজ করিয়াছেন। এঁরা সকলেই আজ এজগতে নাই। কিন্তু চোখের সাম্‌নে আমাদের যে অদ্বিতীয় বঙ্গসন্তান হাটে বাজারে নাচিয়া গাহিয়া কবিতা রচনা করিয়া বেড়াইতেছেন, তিনিও যুবক বাঙ্গলারই এবং খানিকটা যুবক দুনিয়ারও সৃষ্টি। এই কয়জন বাঙ্গালী বীরদের সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইল আমার মতে কোনো মহাপুরুষের পক্ষে এর চেয়ে বেশী গৌরবের কথা আর কিছুই হইতে পারে না। যে সকল লোককে যুবারা জ্যান্ত করিয়া রাখে অথবা যাহারা যুবাদের নিকট পরাজিত হইবার মতন শক্তি ও সাহস রাখে তাহারাই দুনিয়ার আসল বীরপুরুষ।

আজ ১৯২৬ সন। যুবক বাঙ্গলা ১৯০৫ গড়িয়াছিল, ১৯১৫ গড়িয়াছিল,—এইভাবে পর পর প্রত্যেক মুহূর্ত্তই গড়িয়া আসিয়াছে। আজকেও তাকে আবার নূতন একটা কিছু গড়িয়া তুলিতেই হইবে। প্রবীণেরা কোনোদিন নবীনকে গড়ে নাই। চিরকালই প্রবীণেরা নবীনদের পেছনে পেছনে ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়াছে। আজও তাহাই হইবে।

এই আত্মচৈতন্য, এই অহঙ্কার, এই ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠাই আজ যুবক ভারতের আবশ্যক। ১৯২৬ সনের যুবা সদর্পে বলুক,—"রে অতীত তুই আমার থুথু. তুই চরিয়া খা! রে ১৯০৫ হইতে' ২৫, তোকে কলা দেখাইতেছি। তোকে মিউজিয়মে রাখিয়া দিব, তুই সেখানে আলমারীর কাচের মধ্যে সযত্নে তোলা থাকিবি. রে ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকে ভাঙিয়া টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া নূতন জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিব কিনা জানি না, তবে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য অসাধ্য-সাধন।"

প্রথমেই বলিয়া রাখি,—১৯২৬ সনটা—১৯০৫ বা ১৯১৫এর মত অত সরল-সহজ নয়। এটা অতি জটিলতাপূর্ণ। অনেক ভজকট আসিয়া জুটিয়াছে আমাদের জীবনে। আজ যুবার পক্ষে একটা কিছু করিতে হইলে অনেক কাঠখড়, অনেক তেলনুন দরকার। এযুগে অসাধ্যসাধনের কল্পনা করা যারপরনাই কঠিন। এই জটিলতার দুএকটা কথা এখনি আপনাদিগকে শুনাইতে চাই। কিন্তু শুনিলেই আপনারা বোধ হয় আমাকে একেবারে মারিয়াই ফেলিবেন।

তথাকথিত ভারতীয় ঐক্য

প্রথম কথাটা হইতেছে এই যে,—ভারতবর্ষ এক দেশ নয়। ভারতীয় ঐক্য একটা মিথ্যা কথা। ১৯০৫ সনের আগে এবং পরে আজ পর্য্যন্ত

আমরা এই মিথ্যাটা মুখস্থ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু একটা নয়া সত্যের সঙ্গে ১৯২৬ সনের যুবক ভারতকে পরিচিত হইতে হইবে, এতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। বাঙ্গালীর সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুরের একপ্রকার কোন মিল নাই। মারাঠীরা তেলেগু বোঝে না, বুঝিতে পারে না। পাঞ্জাবীরা মান্দ্রাজীকে বোঝে না, বুঝিতে পারে না। তাই বলিব এই ঐক্য—এই ভারতীয় ঐক্যের কথা একটা বোল মাত্র। আসল বস্তুনিষ্ঠার দিক দিয়া এ সমস্যার দিকে অগ্রসর হইলে বলিতে বাধ্য হইব যে,—ইয়োরোপ যদি এক দেশ হয়, পর্ত্তুগাল যদি রুশিয়াকে ভাই ভাই রূপে আলিঙ্গন করিতে পারে, তবেই ভারতবর্ষের পক্ষেও একদেশরূপে বিবৃত হইবার দাবী চলিতে পারে।

এতদিন দেশের জননায়কেরা দেশের লোককে যা শিখাইয়াছে তার গোড়ায় গলদ। ভারতবর্ষ এক দেশ নয়, ভারতীয় ঐক্য মিথ্যা কথা। এই তথ্যটা ১৯২৬ সনে আজ যুবক ভারতকে বেমালুম হজম করিয়া লইতে হইবে। এই নিরেট তথ্যের সঙ্গে খাপ খায় এমন একটা নয়া যৌবন-বিজ্ঞান আজ নবীন ভারতকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তথাকথিত প্রাদেশিক ঐক্য

১৯২৬ সনের দ্বিতীয় বাণীও এই সুরেই গাঁথা। গোটা ভারতে ঐক্য থাকা তো দূরের কথা, এর এক একটা প্রদেশের মধ্যেও ঐক্য নাই। প্রাদেশিক ঐক্য বলিয়া কোন জিনিষ কোনো প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৯০৫ সনে এই ঐক্যটা প্রথম স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। মজুর-মনিব, জমিদার-রায়ত, বড়লোক-গরীব লোক, সবাই একসঙ্গে নাচানাচি করিবার ভাণ করিয়াছিল। কিন্তু আজ সকলেই

জানে যে এ দুয়ের মিলন কোনদিনই ঘটে নাই, ঘটিতে পারিবে কিনা বলা মুস্কিল। সেদিন আমরা গাহিয়াছিলাম :—

"ও আমার দেশের মাটি তোমার পরেই ঠেকাই মাথা,
তোমাতেই বিশ্বময়ীর বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

কি "রাজা", কি "প্রজা", কি জমিদার, কি কিষাণ, কি মালিক, কি মজুর সকলে এক সাথে মিলিয়া বাংলার বারোয়ারী-তলায় দাঁড়াইয়া মাথা নত করিয়া ১৯০৫ সনে এই গান গাহিয়াছিল।

আজ ১৯২৬ সন। যুবক ভারতের চোখ খুলিয়া গিয়াছে। একমাত্র "ভক্তিযোগে" আজকাল চলে না। বেশ মালুম হইয়াছে যে, জমিদারে কিষাণে কোনরূপ দোস্তি দেখা যাইতেছে না। যদি দেখা যায় তবে সে একটা অতিবড় আশ্চর্য্য রকমের জিনিষ হইবে সন্দেহ নাই। তেমনি মজুর ও মালিকের মধ্যে কোন রফার সম্ভাবনাও দেখিতে পাইতেছি না। গান আজও গাই বটে, কিন্তু গানের "যুগ" আর নাই। কেঠো সত্যগুলা আমাদের দুয়ারে ঘা মারিতেছে।

এ ১৯০৫ সন নয়, এ রীতিমত ১৯২৬ সন। মজুরদিগকে মনিবের খাস তালুকের প্রজা ভাবিবার, তাদের ভবিষ্যৎ মাফিক তৈরী করিবার, খাসের অনুচর ভাবিবার দিন আর নাই। সে সব দিন চলিয়া গিয়াছে। যুবক ভারতকে, যুবক বাঙ্গলাকে এই পরিবর্ত্তিত রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া তার নয়া যৌবন-দর্শন গড়িয়া তুলিতে হইবে। আজ সজ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন জাতের, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের ইজ্জৎ ঘোষণা করিবার দিন আসিয়াছে। যে লোক তিন হাজার টাকার চাকরী করে সে কি আর ঐ ত্রিশ টাকার কেরাণীকে ভাই বলিয়া ভাবিতে পারিবে? তার সাথে হাত মিলাইতে সমর্থ হইবে? "ভক্তিযোগ" আর গানের যুগে আমরা ভাবিতাম এ সব সম্ভব। আজ জানি, সম্ভব নয়।

একতার পথ অনৈক্যে

এইবার তৃতীয় জটিলতার কথা বলিতেছি। সেটা এই যে,—একতা জিনিষটা অতি-কিছু নয়। কথায় কথায় ঐক্য, একতা লইয়া লাফালাফি করা বেকুবি। ঐক্য একটা হাতী-ঘোড়া নয়। অনৈক্য দ্বারাও যথার্থ শক্তির সৃষ্টি হইতে পারে। আর সেই শক্তিই দরকার হইলে অনৈক্যের ভিতর ঐক্য আনিয়া দিতে পারে। যার সাথে যার মেলে না, কোন দিন মিলিবার সম্ভাবনা আছে কিনা সন্দেহ—শুধু একটা কথার খাতিরে তাদের ঐক্য ফলানো বিড়ম্বনা মাত্র। বারোয়ারীতলায় দাঁড়াইয়া হরিবোল বলিলে তাতে পোষাকী ঐক্য হইতে পারে। হরির লুটটা কুড়াইয়া খাইবার সময় পর্য্যন্ত সেই ঐক্য বজায় থাকে, কিন্তু আসল ঐক্য তাতে গজায় না। কিষাণ-জমিদার, মালিক-মজুর, পয়সাওয়ালা লোক আর গরীব নরনারী, এদের কাহারো স্বার্থ কাহারো সাথে কোনো দিন মিল খাইবে কিনা কে জানে? কাজেই অমিলের উপরই দর্শন গড়িয়া তুলিতে যাহারা সাহসী তাহারাই জীবনের দৌড় বাড়াইতে সমর্থ। কথায় কথায় এদের মধ্যে জোর জবরদস্তি করিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা ঘোরতর আহম্মুকী। আজ এই ১৯২৬ সনে সে ভাবপ্রবণতার দিন চলিয়া গিয়াছে। দুনিয়া বস্তুনিষ্ঠার দিক দিয়া প্রত্যেক লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হইতেছে। আর যুবক ভারতকেও অনৈক্যই হজম করিয়া লইতে হইবে। এই অনৈক্যের ভিতরেই আসল শক্তির ঠাঁইগুলোকে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে।

রাষ্ট্রনীতিই একমাত্র পদার্থ নয়

চতুর্থ কথা,—রাষ্ট্রনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম বিবেচনা করা যাইতে পারে না। আমি একথা বলিতে

যাইতেছি না যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে আপনারা থাকিবেন না। বরং বলিব যে,—রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আরও গভীর এবং নিবিড় ভাবে চলুক। পাঁচকোটী হিন্দু মুসলমানের বাংলার কথা দু'চার দশজন রাষ্ট্রিকের মাথায় থাকিলে চলিবে না। এই বাংলার বুকে অনেক রকম সম্প্রদায় আছে। বাংলার সাথে অনেক বিভিন্ন জাতির নানা লোকের সম্বন্ধ বিজড়িত আছে। এইসব গুলোকে এক সূতোর মধ্য দিয়া পাশ করাইতে গেলে গুলাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে তুমুল ভাবে দলাদলি চাই। নামজাদা কর্ম্মবীর নেতা বহুসংখ্যক নামা চাই। আব প্রত্যেক দলের পেছনেই স্বার্থত্যাগ, কর্ম্মশক্তি, উৎসাহ, আবেগ, যৌবনশক্তি সবই আবশ্যক। এই যে আজ ১৯২৬ সনে বিভিন্ন দল মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে এটা খুবই আশার কথা। ১৯০৫ সনে দল একপ্রকার ছিলই না। তখন মাত্র দুইটা দলের উৎপত্তি হ'ব হ'ব হইতেছিল। আজ তার জায়গায় পাঁচ সাতটা খাড়া হইয়াছে। এ সবই ভাল কথা।

কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে,—বাংলার যৌবন-শক্তিকে একমাত্র রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে ডুবিয়া যাইতে দেওয়া কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। আরও হাজার আন্দোলন আছে। যুবক ভারতকে নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। চাই বৈচিত্র্য, চাই কর্ম্মদক্ষতার বিভিন্ন প্রয়াস-কেন্দ্র।

আর্থিক আন্দোলন

১৯২৬ সনের কাজের জন্য ১৯০৫ বা ১৫এর চাইতে গুণতিতে বেশী কর্ম্মবীর যৌবনবীর দরকার। মাত্র একটা আন্দোলনের কথা বলিব। পাঁচলাখ নতুন "মজুর" গড়িয়া তুলিতে হইবে। পঞ্চাশহাজার মধ্যবিত্তের জন্য নতুন নতুন অন্ন সংস্থানের পথ করিয়া দিতে হইবে। তার জন্য মাথা

ঘামানো চাই। দেশব্যাপী দারিদ্র্যের দাওয়াই কি? নতুন আয়ের পথ সৃষ্টি করিতে হইলে কেবল স্বার্থত্যাগ, আধ্যাত্মিকতার বক্তৃতায় চলিবে না। স্বার্থত্যাগের বক্তৃতা করা অতি সোজা। তাহা সকলেই পারে। স্বার্থত্যাগ করাও নেহাৎ কঠিন কিছু নয়। কিন্তু আয়ের পথ সৃষ্টি করিতে পারে কে? যার টঁ্যাকে পুঁজি আছে, যার কোমরে টাকার জোর আছে, কেবল সেই পারে। খুব বড় বড় দার্শনিকের বুখনি আমাদের প্রায় সকলের মুখেই আছে। আমরা বাক্যবীর তো বটেই। কিন্তু আয়ের নতুন নতুন পথ সৃষ্টি করিতে আমরা অপারগ। কঃ পন্থাঃ? এর জন্য পুঁজির দরকার যে। সেই বস্তু আমাদের কই?

পুঁজিওয়ালা লোক ভারতের বাহিরে। যদি পুঁজিওয়ালা লোক কোথাও থাকে তবে সে ঐ ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে। এ দের গাঁটরীতে কিছু টাকা আছে। আজ এদেরকে বল;—"ভারত-ভূমিতে লোহার খনি আছে, কয়লার খাদ আছে, বনজঙ্গল আছে, আর আছে লোকজন। তোরা তোদের দেশ থেকে কোটী কোটী টাকা আনিয়া আমাদের মাটীতে গাড়িয়া যা। বড় বড় কল কারখানা গড়িয়া তোল্। বড় বড় ব্যাঙ্ক সৌধ প্রতিষ্ঠা কর্। আমরাও খুদ কুড়াইয়া বিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা তুলিয়া তোদের সঙ্গে সঙ্গেই কাজ করিয়া যাইব।" তাহা হইলেই হাজার হাজার মজুরের আর চাষীর অবস্থা বদলাইতে আরম্ভ করিবে। আর এদের আর্থিক উন্নতি সুরু হইলেই মধ্যবিত্তও খাইয়া বাঁচিবে। অধিকন্তু; দেশের ভিতর যেখানে যেখানে টাকা আছে তারও কিছু-কিছু আসিয়া স্বদেশী ব্যাঙ্ক আর বীমা প্রতিষ্ঠানে জমা হউক। তাতেও আমাদের উদ্দেশ্য খানিকটা পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু তার পরিমাণ এত কম যে, বিদেশী পুঁজি ছাড়া বর্ত্তমানে কিছুকাল পর্য্যন্ত আমাদের আর উপায় নাই।

বিদেশী পুঁজি ও নবীন ভারতীয় সভ্যতা

বর্ত্তমান ভারত গড়িয়া তুলিয়াছে কে? নবীন বাংলাকে গড়িয়া তুলিয়াছে কে? কলিকাতাকে গড়িয়া তুলিয়াছে কে? চোখের ঠুলি খুলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে,—আমাদের দৌলতে এসব ঘটে নাই, এসব ইংলণ্ডের টাকায় গড়িয়া উঠিয়াছে। আপনারা একথা শুনিয়া আমাকে জবাই করিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু আমি তবুও বলিব যে, ইংরেজের মূলধন এদেশে না খাটাইলে অথবা ঐ মূলধনের আশ্রয়ে ভারতীয় মূলধন পরিচালিত না হইলে ঐ হাওড়া ষ্টেশন দিয়া, বেলেঘাটা দিয়া, শিয়ালদহের পথে লাখ লাখ ডেলী প্যাসেঞ্জার রোজ যাতায়াত করিত না। বাঙ্গালীর ক্ষমতা নাই, ভারতবাসীর ক্ষমতা নাই এত বড় বড় কারবার চালাইতে। কোনো কোনো স্থানে টাকা থাকিলেও আমাদের সাহস, যোগ্যতা এবং কর্ম্মশক্তি নাই। প্রায় সকল ভারত-সন্তানেরই অবস্থা একরূপ।

আর একটা প্রশ্ন করিতেছি,—কলিকাতার বুকে বড় বড় কারখানা চলিতেছে, আর তাহাতে হাজার হাজার লোক প্রতিপালিত হইতেছে। বাংলার কত শত মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্নসংস্থান হইতেছে। এইসব কল-কারখানার কারবার, যেখানে হাজার হাজার বাঙ্গালীর রোজগারের পথ হইয়াছে, সে সব কার টাকায় চলিয়াছে? ঐ ইংরেজের পুঁজিতে। ঐ সব বিদেশীর কল-কারখানায় বাঙ্গালী কাজ করিয়া তার দরিদ্র সংসারকে প্রতিপালন করিতেছে। বর্ত্তমান বাঙালী জাতির ভাত-কাপড়, শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন, এই সমুদয়ের পশ্চাতে দেখিতেছি এই বিদেশী পুঁজি অথবা বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় মূলধন।

আপনারা সজ্ঞানে বিচার করিয়া দেখুন আজ এই পঞ্চাশ বছর ধরিয়া বাংলার মধ্যবিত্ত হাজার হাজার পরিবারে অন্ন যোগাইতেছে কে? বাংলার "ভদ্রলোক"-সমাজ এতদিন ধরিয়া বিদেশীর মূলধন হজম করিয়া মানুষ হইয়া আসিতেছে না কি?

আমার মতে আরও বেশ কিছু কাল বিদেশীর পুঁজি আমাদেরকে হজম করিতে হইবে, তাহাতে আমাদের মাথা যতখানিই হেঁট হইয়া পড়ুক না কেন। বিদেশীর মূলধন এদেশে থাকিলে আমাদের দেশের ধনী বড় বড় লোকদের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটিবে, একথা জানি। কিন্তু আজ এর চাইতেও বড় কথা ভাবিতে হইবে। এই মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায় ছাড়া বাংলার লক্ষ লক্ষ নিরন্ন কুটীরবাসীর,—আমার আপনার মত আধ-পেট-খাওয়া অসংখ্য মধ্যবিত্তের—আর মজুর-চাষীর কথা ভাবিতে হইবে। এর প্রধান উপায় বিদেশী মূলধন। এই বিদেশীর গাঁটরীর টাকাই বাংলা-ভূমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিবে। ১৯২৬ সনের যুবক বাংলাকে বিদেশীর নিকট মাথা নোয়াইয়া নির্ম্মম কঠিন কঠোরভাবে বাস্তব সত্যটা বরদাস্ত করিতে হইবে। পারিবে কি? বুকের পাটা চাই।

স্বরাজ-সাধনার নয়া সমস্যা

আজ দেশের আর্থিক উন্নতি করিতে হইলে, দরিদ্র দেশের হাওয়া বদলাইতে হইলে ঐ বিদেশীর অর্থের পানে চাহিতে হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের জন্য বিদেশ হইতে পুঁজি আনিতে হইবে। বিদেশী পুঁজিই আজকালকার অবস্থায় যুবক ভারতের মস্ত বড় উদ্ধারকর্ত্তা। নেহাৎ ঠোঁট-কাটার মতন এ কথাটা বলিয়া যাইতেছি। ব্রিটীশ পুঁজির সঙ্গে আরও কিছুকাল যুবক ভারতের কুর্ণিশ করিয়া চলিতে হইবে,—তাহাতে

ভারতের জাতীয় সম্মানে আঘাত পাইলেও ক্ষতি নাই। শীঘ্র শীঘ্র স্বদেশী মূলধন যথোচিত পরিমাণে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা আমাদের দেখা যাইতেছে না যে!

এখন প্রশ্ন হইতেছে, বিদেশী মূলধন এদেশে রাখিতে গেলে স্বরাজ আন্দোলনটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? স্বরাজ আন্দোলন তাহা হইলে চলিবে কি? আমার তো বিশ্বাস এ দুইটা কিছু কিছু পরস্পর-বিরোধী জিনিষ, আবার কিছু কিছু পরস্পর-সহায়কও বটে। এ বিষয়ে সম্প্রতি আর কিছু বলিব না। কিন্তু ভারতের আর্থিক বনিয়াদের গাঁথনি শক্ত করিতে চাহিলে তাহার ভিতর যতখানি বিরোধ আছে সেটাকে এড়াইতে গেলে চলিবে না। কথাটা খুব গভীরভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার। দুনিয়া বড় সোজা চিজ নয়। এই সমস্ত বিরোধ, এই সব কাঠিন্য বা দুর্গতির কথা নিরেট সত্যের তরফ হইতে আলোচনা করিতে হইবে। গভীরতম নৈরাশ্যকে হজম করিয়া তাহার উপর আশার বাণী প্রতিষ্ঠিত করা চাই। গোঁজামিল রাখিলেই ঠকিতে হইবে।

চাই লাখ লাখ নতুন সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের অন্ন। মজুরদের পেটে ভাত জুটিলেই চাষীদের আর্থিক উন্নতি ঘটিতে থাকিবে। আর কেরাণী-কর্ম্মচারীদের অন্নসংস্থান ও মজুরদের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গেই জড়িত। মজুরদের পেছন পেছন স্বরাজও ছুটিতে থাকিবে। যুবক ভারত, ভাবো মজুর-সৃষ্টি ও মজুর-পুষ্টির কথা। মধ্যবিত্তের পথ আপনাআপনিই পরিষ্কার হইয়া আসিবে। আজ মজুরদের একমাত্র অথবা সর্ব্বপ্রধান অন্নদাতা বিদেশী মূলধন।* এই বিদেশী মূলধনের ঠেলায়ই ভারতে স্বরাজ আসিয়া হাজির হইবে।

* স্বদেশী পুঁজির বিকাশ সম্বন্ধে "ব্যাঙ্ক-গঠন ও দেশোন্নতি" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অন্ধের মতন নয়,—সজ্ঞানে খোলা চোখে এই সকল নিরানন্দময় বিষাদপূর্ণ কেঠো সত্যগুলা নিজ রক্তের সঙ্গে মিলাইয়া তবে যুবক ভারতকে নবীন দুনিয়া গড়িবার সাহস দেখাইতে হইবে। ভারতীয় যৌবনের দিগ্বিজয়-ধারা ১৯২৬ সনের এই বিপুল সংশয়-পর্ব্বতকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে কি? আগেকার দিনের মতন আজও আবার যুবক ভারত বলিতে সাহস রাখে কি যে,—

"পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে মোরে লোকে জানে ধরাতে,
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,—
জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়কেতন উড়াতে?"

—তারই উপর নির্ভর করিতেছে ভারতের আগামী তিন বৎসর।

ত্যাঁদড়ের দর্শন *

যাঁরা আমাকে জানেন তাঁরা এইটুকু জানেন যে, আমি শুদ্ধ ভাষার ধার ধারিনা। এতদিন ছিল "গুরু-চাণ্ডালী," সেইটে চরমে উঠিয়াছে। এখন চেষ্টায় আছি ভাষাটাকে ষোল আনা চাণ্ডালীতে পরিণত করিতে পারি কি না তা দেখিতে। কাজেই যাঁরা সংস্কৃতালী শব্দ শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁদের কিছুকাল কানে হাত দিয়া থাকা ভাল।

হিন্দু হষ্টেলের আড্ডা

হিন্দু হষ্টেলের আড্ডা গুলি আপনাদের কাছে কি রকম লাগে জানি না, কিন্তু আমার কাছে খুব ভালই লাগিত। কেবল যে ভাল লাগিত তা নয়, এ গুলিকে আমি যুবক বাংলার জীবনকেন্দ্র সমঝিতে অভ্যস্ত। এই হিন্দু হষ্টেলে আমরা অনেক সময় গুণ্ডামী করিয়াছি। এখানকার "আলগা ঝোল" খাইয়া মানুষ হইয়াছে বাংলা দেশের অনেক লোক। এখানকার ঠাকুর-চাকরের সঙ্গে ঝগড়া করে নাই এমন কেহ এখানে আসিয়াছে কিনা জানিনা। তারপর, আমাকে আপনারা মাপ করিবেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে ঝগড়া করে নাই এমন কোন বাঙ্গালী ছাত্র হিন্দু হষ্টেলে বোধ হয় কোন দিনই ছিল না। এই ধরণের যতকিছু আপনারা আজকাল করিতেছেন,—নায় কুঁজো ছুঁড়িয়া লড়াই পর্য্যন্ত,—২০।২২ বৎসর আগে আমরা ঠিক তাই করিয়াছি।

* কলিকাতা ইডেন হিন্দু হষ্টেলের বার্ষিক মিলনোপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ (সেপ্টেম্বর ১৯২৬)। ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর লওয়া শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত।

হিন্দু হষ্টেলের এসব গুণ ত আছেই, চিরকালই থাকিবে। আমার কাছে হিন্দু হষ্টেল আরও অন্যান্য কারণে অতি প্রিয়। এই আড্ডাতেই, এখানকার আবহাওয়াতেই আমরা ১৯০৫ সন কাটাইয়াছি। এখানকার আড্ডায় কান পাতিয়াই আমরা জাপানের কামান দাগা শুনিয়াছি। কেমন করিয়া জাপানের কামান এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইতেছে, সে সব আমরা এখানেই গুল্‌তান করিতে করিতে দেখিয়াছি। এশিয়ার কামান কেমন করিয়া ইয়োরোপ ডিঙ্গাইয়া আমেরিকার পোর্ট্‌স্‌মাউথ শহরে গিয়া এশিয়াবাসীর দিগ্বিজয় সম্বন্ধে ডিক্রীজারি করিয়া ছাড়িয়াছে, তাও আমরা হিন্দু হষ্টেলের আড্ডাতে আড্ডাতেই শুনিয়াছি।

ঐ আড্ডাতেই আবার বাংলার ৭ই আগষ্ট আর ১৬ই অক্টোবর জন্মিয়াছে। ভারতের সেই চিরস্মরণীয় ১৯০৫কে আমরা এই হিন্দু হষ্টেলেই পায়দা করিয়াছি। তারই ফলে যুবক বাংলা, যুবক ভারত ইত্যাদি বস্তু। আর তারই ফলে আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন ইত্যাদির বীরত্ব কৃতিত্ব, মহত্ব। কাজেই হিন্দু হষ্টেলের আড্ডা কেবল আমারই জীবনের একটা বড় জিনিষ এরূপ নয়; এটা যুবক বাংলার জীবনস্মৃতিতে, তার জীবনের গতি-ভঙ্গীতে একটা বড়-কিছু করিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতেও হিন্দু হষ্টেল বাংলায় আর ভারতে বড় বড় অনেক-কিছু করিবে।

ছোঁড়ারা বুড়োদেরকে মানছে না

কিছুদিন হইল আমার সঙ্গে একজন নামজাদা জননায়কের কথা হইতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন—"ওরে বিনয়, আর কি সেদিন আছে? দেশের অবস্থা কেমন বুঝিতেছিস্‌?" আমি বলিলাম—"অবস্থা ত বেশ ভালই মনে হইতেছে।" তিনি বলিলেন—"তুই এতদিন

বিদেশে লম্ফঝম্ফ করিয়া আসিয়া মনে করিতেছিস্ দেশ খুব বড় হইয়াছে। আসল ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছিস্ না। আজকালকার ছোঁড়াগুলা বেয়াড়া, আমাদেরকে আর মানিতেছে না।" যেই তিনি একথা বলিলেন তখনি আমি বলিলাম—"যাক, বাঁচা গিয়াছে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, দেশটা আবার উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বুড়োদের বিরুদ্ধে ছোঁড়ারা বিদ্রোহী হইতেছে।"

ছোঁড়াদেব উপর বুড়োদের অত্যাচার এ কয় বছর ধরিয়া ভারতের এক প্রধান তথ্য। কেবল শিক্ষা-কেন্দ্রের আবহাওয়ায় নয়, গোটা যুবক ভারতের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই এ একটা প্রধান বিষ। প্রবীণেরা চেষ্টা করিতেছে ছোঁড়াগুলোকে কোন না কোন উপায়ে জব্দ করিতে হইবে। নবীন আর প্রবীণে লড়াই চলিয়াছে। প্রবীণেরা চেষ্টা করিতেছে নবীন যাতে মাথা না তুলিতে পারে, আর নবীনদের মধ্যেও গুটিকয়েক "ভাল ছেলে" আছে, তারা ৫০।৬০।৬৫ বৎসরের বুড়োরা যা-কিছু বলিবে, তার মধ্যে হয় একটা দর্শন, না হয় বেদান্ত, না হয় গীতা, কিছু না কিছু খুঁজিয়া বাহির করিবেই করিবে। সুতরাং যখনই ঐ নামজাদা জননায়ক মহাশয় বলিলেন—"ছোঁড়ারা বড় ত্যাঁদড় হইয়াছে," তক্ষুণি আমি বুঝিলাম -এবার তাহা হইলে আধ্যাত্মিক দাওয়াই কিছু বাহির হইয়াছে। তিনি দুঃখের সহিত বলিলেন—"দ্যাখ্ তোদেরকে আমরা যা-কিছু বলিতাম তোরা তাই করতিস্। আজকালকার দিনের একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়া দ্যাখ্, কোন একটা কাজের কথা বল্, কেহ গায় তুলিবে না।" শুনিবামাত্রই তাঁকে সোজাসুজি ভাবে জবাব দিলাম, "এই যে ছোঁড়ারা আপনাদেরকে মানিতে চায় না, বুঝিয়া রাখুন এইটিই আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনের নবীন সুপ্রভাত, ছোঁড়ারা যদি আপনাদিগকে না মানে, আর আপনারা যদি বুঝেন যে, এই ছোঁড়াদের পিছনে চলিয়া আপনারাও

মানুষ হইবেন, তাহা হইলে বুঝিব, আপনারা এই বুড়ো বয়সে আবার যৌবনের জীবনটা চাখিয়া যাইতে পারিবেন।"

এই সব কথা আমার ভাল লাগে এই জন্য,—মাপ করিবেন "আমি" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, আমার নিজের কথা একটু বলিতেছি, বেয়াড়া ত্যাঁদড় বলিলে যা বুঝায়, ঘটনাচক্রে আমিও তাই। অনেকে আমার সম্বন্ধে মনে করিয়াছেন—"বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া লোকটা বখিয়া গিয়াছে ; আগে ত ছিল ভালই, আজকাল তাকে বুঝাই যাইতেছে না। ঠিক উল্টো পথে যাইতেছে।" নিজের কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি এইটুকু শুধু বলিতে চাই,—আত্মকাহিনী বলা উদ্দেশ্য নয়—১৭।১৮ বৎসর বয়স হইতে যা-কিছু করিয়াছি অথবা প্রায় বার বৎসর বিদেশে থাকিবার সময় যা-কিছু করিয়াছি,—সবই ছাপার হরপে লেখা আছে,—তার কিছুই অন্য লোকে যা বলিয়াছে তার সঙ্গে এক প্রকার মেলে না। ১৯১৪ সনের আগেকার যুগেও সকল বিষয়েই বেয়াড়ামি ও ত্যাঁদড়ামি আমার ছিল।

আর এই বিদেশ-প্রবাসের বার বছরও লোকজনের সঙ্গে অমিলেরই প্রকাণ্ড যুগ। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড, চীন, জাপান যেখানে যেখানে আমার ডাক পড়িয়াছে,—কি প্যারিসের 'আকাদেমী', কি বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়,—সর্ব্বত্রই লোকগুলো দেখিয়াছে—"এই লোকটা যা কিছু বলিতেছে, কোন ফরাসী, জার্ম্মাণ, বা আমেরিকান কখনও তা বলে নাই। কেবল তা নয়, ভারতবর্ষের যত লোক বিদেশে গিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ লইয়া ৩০।৪০।৫০ বৎসর ধরিয়া যা-কিছু বলিয়াছে, এমন কি ভারতবাসী সম্বন্ধে যে মতামত তারা প্রচার করিয়াছে, তার সঙ্গেও এই লোকটার মিলে না।" আমার সঙ্গে কোন লোকের বনিবনাও হয় না। মজার কথা। সেই জন্যই ফরাসী, জার্ম্মাণ আমেরিকান,—এরা আসিয়া ডাকিয়া বলিয়াছে—"তুই যা-কিছু বলিতেছিস্, বলিয়া যা।

তোকে আমাদের দুয়ারগুলো খুলিয়া দিতেছি। আসরে বসিয়া যা পারিস্ বকিয়া যা। আর পারিস্ ত ছাপার হরপেও দাগ রাখিয়া যা কিছু কিছু। আর কেহ তেমন বলিতেছে না।" আমিও তাদেরকে বলিয়াছি—"ব্যস্, সম্প্রতি আর কিছু আমি চাই না। কেবল তোমাদের আসরে গাহিয়া যাইবার স্বাধীনতাটুকু পাইলেই বর্ত্তিয়া যাই।"

লোকটা বখিয়া গিয়াছে

আমার বক্তব্য হইতেছে ত্যাঁদড়ামি। যেদিন হইতে স্বদেশে পদার্পণ করিয়াছি, বোম্বে নামিবার পর হইতে যা-কিছু বলিয়াছি, ঘটনাচক্রে দেখিতেছি আমাদের লোকের সঙ্গে মিলিতেছে না। ভারতের স্বদেশ-সেবকেরা বলিতেছে—"বিদেশী মূলধন আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে।" আমি জোর্‌সে তার উল্টো বলিতেছি। আমি বলিতেছি, "বিদেশী পুঁজিই সম্প্রতি আরও কিছুকাল ভারতের উন্নতির একমাত্র না হোক মস্ত বড় উপায়"। দেশের যাবা মহা পণ্ডিত—লালা লাজপৎ রায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি সকলেই কৃষি কমিশনের বিরুদ্ধে বলিতেছেন। সেদিন আমাকে যখন একজন কাগজওয়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি তার উল্টো বলিলাম। বলিয়া দিলাম—"কৃষি-কমিশনে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই।" কারেন্সি কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, বোম্বাইয়ের পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস এ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, আসমুদ্র-হিমাচল তাকেই ভারত-আত্মার বাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁর বিরুদ্ধে মত দিয়াছি। ত্যাঁদড়ের পাল্লায় পড়িয়া, আশা করি, আপনারা সে মত গ্রহণ করিবেন না!

বিশ-পঁচিশ বৎসরের ত্যাঁদড়ামি; একদিনের নয়। কাজেই আজকের সভাপতির অভিভাষণে শুদ্ধ ভাষা বলিতে একেবারেই অক্ষম, আর তা

ছাড়া ত্যাঁদড়ামি ভিন্ন অন্য কিছু বকিয়া যাওয়াও কঠিন। আমি জানি না আপনাদের ধৈর্য্য থাকিবে কিনা। গান-বাজনা আছে, হাসি-কৌতুক আছে, থিয়েটার আছে। এই আবহাওয়ায় ত্যাঁদড়ের গলাবাজি শুনিতে কেউ রাজি হইবেন কি? আমি অবশ্য জোর জবরদস্তি করিয়া আপনাদেরকে বিরক্ত করিতে চাই না। এখানে না হয়, আজ না হয়, আর কোথাও বা কোনদিন ত্যাঁদড়ামি জাহির করিবার সুযোগ পাইবই পাইব।

গড্ডলিকার দর্শন

প্রশ্ন হইতেছে,—ত্যাঁদড়, বেয়াড়া বস্তুটা কি? বেয়াড়া অবশ্য একটা জানোয়ার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্যাঁদড় একটা লোকও বটে। বেয়াড়ারা যে বেদান্ত প্রচার করে, সে বেদান্তটা আসে কোত্থেকে? অতি সোজা ভাষায় বলা যাইতে পারে, বেয়াড়াকে তার উল্টোর সঙ্গে তুলনা করিলে বস্তুটা সহজেই পাকড়াও করা যাইবে।

বেয়াড়া বলিতেছে—"এই যে দুনিয়া দেখিতেছ, এটা বড় সুখের বটে, কিন্তু এর চেয়ে আরও সুখের একটা দুনিয়া হইতে পারে কিনা দেখা দরকার"। বেয়াড়ার উল্টো যে, সে এ সব লাইনে চিন্তা করে না। সে সকাল বেলা উঠিয়া চা খাইয়া ঘণ্টাখানেক খবরের কাগজ পড়ে, ১০টা বাজিলে ঝিকে ডাকিয়া বলে "ঝি তেল লইয়া আয়, নাইবার বেলা হইল।" ১০॥০টা ১১টায় তিনি আফিসে বাহির হইলেন। ৫টায় ফিরিয়া আসিয়া কিছু জলযোগ করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে হেঁদো কি গোলদিঘীতে গিয়া হয় 'ফরওয়ার্ড' না হয় 'অমৃতবাজার' কি 'সার্ভেণ্ট' লইয়া গল্পগুজব। ৮॥০টায় আবার কোটরে প্রবেশ, ইত্যাদি। এ জীবন মন্দ নয়, এতে নিন্দা করিবার কিছুই নাই, বেশ মোলায়েম বটে।

এই হইতেছে একপ্রকার চিন্তা-প্রণালী, একপ্রকার দর্শন, একপ্রকার সাধনা। এরকম চিন্তা-প্রণালীর লোক সর্ব্বত্রই দেখা যায়। মাথা ঘামাইবার দরকার হয় না। এতে হিসাব লাগে না। যা আছে, যা চলিতেছে সেইটেই "রীতি", সেইটেই "নীতি"। তার বিবেচনায় দুনিয়া এই ভাবে তিন হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে, আরো তিন হাজার বৎসর এই ভাবে চলিবে। এই পথের যাত্রী হইতেছেন গড্ডলিকা-প্রবাহের বৈজ্ঞানিক বা সনাতনপন্থী দার্শনিক।

ত্যাঁদড়ের জগৎ-কথা

বেয়াড়া, যে সে বলিবে—"এই সংসারটা সুখের বটে, কিন্তু এ ছাড়াও আর একটা সংসার কায়েম হইতে পারে। যে দুনিয়াতে আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তাহা ছাড়া যে আর একটা দুনিয়া থাকিতে পারে না, তা আমি বলি কি করিয়া? আমার রক্তমাংস বলিতেছে যে, আমার হাড়-গোড় বদলিয়া যাইবার জন্যই তার জন্ম।" ত্যাঁদড় প্রথমেই সন্দেহ তুলিবে, বলিবে,—"এই পৃথিবীটা ডান দিকে চলিতেছে, এটাকে বাঁ দিকে বোধ হয় চালাইলেও চালাইতে পারি।" ত্যাঁদড় বলিবে "পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতের দক্ষিণে একটা সাগর, উত্তরে একটা পাহাড় আছে; কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকে ভারত মহাসাগর না হইয়া আর এক জায়গায় থাকিলে মহাভারতখানা পচিয়া যাইত কি? ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ পৃথিবীটাকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া নতুন করিয়া একটু উঁচুতে তুলিয়া ধরা যাইতে পারে কিনা দেখা দরকার।" ত্যাঁদড়ের হাতে সে ক্ষমতা আছে কিনা সে কথা সে আলোচনা করে না। সে বলে মাত্র এই যে, পৃথিবীটার দক্ষিণ দিকে অত বড় মহাসমুদ্র না থাকিয়া অন্য কোথাও যদি থাকিত, তাহা হইলেও পৃথিবীটা চলিলেও চলিতে পারিত। ত্যাঁদড় বলিতেছে—

হুড়মুড়িয়ে আটলান্টিক, তুই ছুটে' যাস্ কোথায় ?
আয় তোরে বাঁধ্‌ব নিয়ে এশিয়ার পায়।
ভারতসাগর বুড়িয়ে গেছে জলে নাই তার মুণ,
মুণ না পেয়ে পারশী হিন্দু চীনার হাড়ে ঘুণ,
ভারতসাগর ছেঁচে কর্‌ব আটলান্টিকের খাল,
সবার আগে চাঙ্গা হয়ে উঠবে দেশ বাঙ্গাল।

বাঙ্গালীর শারীরিক অসম্পূর্ণতা

ত্যাঁদড় বলিতেছে—"বাঙ্গালী সোজা হইয় হাঁটিতে পারে না। সোজা বসিতে পারে না। কুঁজো হইয়া হাঁটে। পাঁচ শ' ফরাসী, হাজার জার্ম্মাণ, দু'হাজার ইংরেজ যখন ইস্কুলে যায়, রেস্ দেখে, থিয়েটার শোনে, ঘাড় সোজা করিয়া হাঁটে, বসে, চলাফেরা করে। কিন্তু যখনই বাঙ্গালীর পাল দেখি, তখনই দেখি তারা চলিতেছে বেঁকে। কেন সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না ?" এখানে ত্যাঁদড় বলিবে—"চিরকাল বাঙ্গালীকে বেঁকেই চলিতে হইবে, তা বোধ হয় নাও হইতে পারে"। বাঙ্গালী যেখানে-সেখানে হাই তোলে, যখন-তখন আঙ্গুল মটকায়, নাক খোঁচায়, কানের ময়লা বাহির করিয়া শোঁকে, আর চেয়ারে বসিয়া বা আসনে বসিয়া হামেশা পা দোলাইতে থাকে। তার না আছে কোন রকম শারীরিক স্থিরতা, না আছে দেহের দৃঢ়তা। ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, আমেরিকানদের মধ্যে দেখিবেন, ঐ রকম মুদ্রাদোষ নাই। বাঙ্গালীর সমাজে,—তা ছোট বড় সকল মহলেই,—অনেক আছে। এখানে ত্যাঁদড় বলিবে—"ভবিষ্যতের বাংলা সম্বন্ধে একথা না খাটিতেও পারে।"

চরিত্রহীনতায় বাঙ্গালী

একজন বাঙ্গালী আর একজন বাঙ্গালীকে যত হিংসা করে, একজন বাঙ্গালীর উন্নতিতে আর একজন বাঙ্গালী যত দুঃখিত হয়, কোন জার্ম্মাণ বা ফরাসী তার স্বদেশবাসীর উন্নতিতে তত দুঃখিত হয় কি না সন্দেহ। আপনাদের যিনি যে মহলে আছেন, তিনি প্রতিদিন বোধ হয় সেই মহলের বাঙ্গালীর চরিত্রকথা সম্বন্ধে এই মতই প্রচার করিতে বাধ্য হইবেন। এমন কি, বিদেশেও যে-সকল বাঙ্গালী ও অন্যান্য ভারতবাসী দেখিয়াছি, তাহাদের চরিত্র-সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। বন্ধুতে বন্ধুতেও বাঙ্গালী সমাজে আন্তরিকতা নাই। সর্ব্বত্রই জিলিপির প্যাঁচ, কুটিল স্বভাব। আমেরিকায়, জাপানে, ফ্রান্সে, ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যে দেখিবেন, কোনো বাঙ্গালীর উন্নতিতে যদি কেহ দুঃখিত হইতে হয়, তবে একমাত্র বাঙ্গালীই হইবে। এখানে গড্ডলিকা বলিতেছে—"আমি বাঙ্গালী হইয়া জন্মিয়াছি, তাই থাকিব, যেমন চলিতেছি তেমন চলিব, যেমন করিতেছি তেমন করিব।" ত্যাঁদড় বলিতেছে—"না, বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন, তারা হয়ত অন্য কোন প্রণালীতে তাদের জীবন গড়িয়া তুলিলেও তুলিতে পারে। অর্থাৎ বাংলার মাটী, বাংলার জল, আর বাংলার বায়ুতে চিরকাল একমাত্র কুটিল, বক্রগতি, বক্রচরিত্র মানুষই পায়দা হইবে একথা ঠিক না হইতেও পারে।" বাঙ্গালার চরিত্রে নীচতা, হিংসাপ্রিয়তা এবং পরশ্রীকাতরতা গজাইয়া উঠিবেই উঠিবে, একথা ত্যাঁদড় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। অন্ততঃপক্ষে সেরূপ স্বীকার করাটা ত্যাঁদড়ের দর্শন নয়।

দুনিয়ার পথে ভারত

সহজ কথায় দু'চারটি বুখনি যদি চালাইতে দেন, তাহলে বলিব বৌদ্ধ ঋষিরা যেমন "সত্য চতুষ্টয়ের" কথা বলিয়া গিয়াছেন, আমিও তেমনি

ত্যাঁদড়ামি-বেদান্তের পাঁচটা সত্য সম্প্রতি প্রচার করিতে পারি। প্রথম-সূত্র নিম্নরূপ। গড্ডলিকাওয়ালারা বলেন "ভারতবর্ষ ক্রমে জাহান্নমে যাইতেছে।' ত্যাঁদড় বলিতেছে—"একথা ঠিক নয়, ভারত দুনিয়ার পথেই চলিয়াছে।" আমি ত বাঙ্গালীর বাচ্চা, বিদেশে গিয়া যখন ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন, জাপান, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি দেখিলাম, তখন ত একথা আমার মনে হয় নাই যে, ভারতবর্ষ জাহান্নমে গিয়াছে বা যাইতেছে। মনে হইয়াছে ঠিক উল্টো। দেখিয়াছি যে, ইয়োরোপ ও আমেরিকা ঠিক যে পথে চলিয়াছে, যে আদর্শে চলিয়াছে, গত একশত বৎসর ধরিয়া ভারতও সেই পথে চলিয়াছে। পশ্চিমের এসব দেশ আগে কৃষি-প্রধান ছিল, এখন আস্তে আস্তে শিল্প-প্রধান, কারখানা-প্রধান, যন্ত্র-প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমাদের দেশেও ঠিক তাই হইয়াছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই আগে পল্লীস্বরাজ ছিল। সেগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এখন সেখানে নতুন কিছু দাঁড়াইয়াছে। এই ভারতেও আজ পল্লীসমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নতুন রকম জিনিষ গড়িয়া উঠিয়াছে। তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনে বিলাত বলিয়া কোন দেশ চিরকাল ছিল না, একটার জায়গায় পঞ্চাশটা বিলাত ছিল। ফরাসী দেশে আড়াইশ রকমের বিভিন্ন আইনকানুন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ছিল। একটু একটু করিয়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে এসব দেশ এখন "জাতিতে" পরিণত হইয়াছে। আমাদের এখানেও রাঢ় বরেন্দ্র বঙ্গ সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এখন একটা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। সেই দানাটা পরাধীনতা সত্ত্বেও ঠিক ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজের দানারই মতন ঐক্য-গ্রথিত।

পরাধীনতা বনাম স্বাধীনতা

আমি বলিতে চাই, খাঁটি রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা থাকা সত্ত্বেও,—আশ্চর্য্যের কথা,—ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ যে পথে যে আদর্শে এবং যে

সভ্যতার দিকে ছুটিয়াছে, এই ভারত এবং বাংলাদেশও সেই পথ, সেই আদর্শ এবং সেই সভ্যতার দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। এ বিষয়ে ত্যাঁদড়ের যে মত তা সাধারণ মতের ঠিক উল্টো। কেননা, পরাধীনজাতি, সে কিনা আজ সভ্যতার পথে চলিয়াছে? সভ্য, উন্নত ও স্বাধীন দেশের লোকেরা যে প্রণালীতে কাজ চালাইতেছে, এই পরাধীন দেশের লোকেরাও সেই প্রণালীতে কাজ চালাইতেছে, এটা কল্পনা করা পর্য্যন্ত গড্ডলিকাওয়ালাদের পক্ষে কঠিন। আমি বলিতে চাই যে—তুনিয়ার পথ এক, সবাই তুনিয়ার পথে চলিয়াছে। তাই বলিয়া ইংরেজের কাছাকাছি বাঙ্গালী আসিয়াছে, কি ফরাসীর কাছাকাছি মারাঠা আসিয়াছে অথবা জার্ম্মাণের কাছাকাছি পাঞ্জাবী আসিয়াছে তা বলিতেছি না। ভারত যদি আজ স্বাধীন থাকিত তাহা হইলেও সভ্যতা, আদর্শ ও জীবনের যেরূপ গতি আজ দেখিতেছি তাই থাকিত, নতুন কিছু হইত না। ভারত চরম স্বাধীনতা লাভ করিলেও এমন কিছু করিতে পারিবে না, যা ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইংরেজ ইত্যাদি জাতির মধ্যে সৃষ্ট হয় নাই বা হইবে না। ইয়োরোপেও স্বাধীন এবং পরাধীন অথবা নিম-স্বাধীন দেশ আছে। এশিয়ায়ও স্বাধীন এবং পরাধীন দেশ আছে। জিজ্ঞাসা করি, জাপান স্বাধীন থাকিয়াও এমন কিছু অঘটন ঘটাইতে পারিয়াছে কি যা ইয়োরোপ বা আমেরিকা পারে নাই? স্বাধীন জাপানী এবং পরাধীন বাঙ্গালী এ তুইয়ের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোনো তফাৎ যদি আমাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে বলিব—আমি এ পর্য্যন্ত যা-কিছু বলিয়াছি সবই আহাম্মুকী। জাপানীরা এমন কিছু হাতীঘোড়া করে নাই,—কোনো মার্কামারা পশ্চিমাদের অজানা নতুন পথে চলিতেছে না। জাপানী ও বাঙ্গালীতে তফাৎ এইটুকু যে, ওদের মানোয়ারী জাহাজ আছে, আমাদের নাই, ওদের কব্জাতে উড়ো জাহাজ চলে, আমাদের উড়ো জাহাজ নাই, ওদের ট্যাঙ্ক-

পল্টন আছে, আমাদের নাই। তা ছাড়া জীবনের আদর্শ, সভ্যতা, ভব্যতা, সমাজ, পল্লীর সঙ্গে সহরের সম্বন্ধ, ফ্যাক্টরীর সঙ্গে চাষের সম্বন্ধ—এসব বিষয়ে যাঁহা বাঙ্গালী, তাঁহা জাপানী, যাঁহা জাপানী তাঁহা জার্ম্মাণ, যাঁহা জার্ম্মাণ তাঁহা ইংরেজ। আমি বলিতেছি—ভারত পরাধীন, তবু সে দুনিয়ার পথেই চলিয়াছে, ভারত বর্ত্তমান জগতেরই অন্যতম অঙ্গ; আজকাল যে পথে চলিয়াছি স্বাধীন থাকিলেও আমরা সেই পথেই চলিতে থাকিব।

আর্থিক অবস্থায় অবনতির কোন চিহ্ন নাই

এইবার দ্বিতীয় সূত্র। গড্ডলিকাওয়ালা বলিতেছে—"আর্থিক হিসাবে ভারতের দারিদ্র্য দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।" এখানে ত্যাঁদড়ামির দর্শন বলিতেছে—"তা ঠিক না হইতেও পারে! ভারতভূমি ক্রমে ক্রমে দরিদ্রতর হইতেছে, কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা—একথা প্রমাণ করা বড় সোজা কথা নয়।" সামান্য সামান্য দু'একটা বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ দিয়া যাইতেছি। আমি যখন প্যারিসে যাই, দেখি কি? তোফা বাড়ী, তোফা ঘর, সুশ্রী ট্রাম, সুন্দর হোটেল। ফিটফাট লোকজন চলাফেরা করিতেছে, পোষাক-পরিচ্ছদ সব চোস্ত দুরস্ত, সুঠাম টেবিলের উপর নরনারী খাইতেছে ইত্যাদি। আমরা যখন ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য মাপি তখন দেখি ওদের বাড়ীঘর কি রকম, জমি জোতের পরিমাণ কি, কয়জন খায়, কি খায় ইত্যাদি। আমাদের দেশেও ধনৈশ্বর্য্য জরীপ করিবার ঠিক সেইরূপ প্রণালীই কায়েম করা যাউক। তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ভিতর ভারতের এবং বাংলাদেশের অবস্থা যে খারাপ হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিবার মতন কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাই না। যে মাপে, যে প্রমাণে আমরা বলিয়া থাকি, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, জাপান আর্থিক হিসাবে পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে যা ছিল তার চেয়ে উন্নতির

পথে এগিয়ে যাইতেছে, ঠিক সেই প্রণালী ও সেই মাপকাঠিতে বাংলাদেশও উন্নতির দিকেই যাইতেছে, দারিদ্র্যের দিকে যাইতেছে না; মোগলাই-মারাঠা আমলে অথবা মৌর্য্য-গুপ্ত আমলে ভারতে সোনার যুগ ছিল না। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণরাও মধ্যযুগে বা প্রাচীনকালে আজকালকার চেয়ে বেশী সুখে ছিল না।

কলের জল ও বালাম চাউল

চোখের সামনে দেখুন, কলিকাতায় যারা আছে তাদের জীবনের প্রধান জিনিষ হইতেছে কলের জল আর বালাম চাউল। এই দুটি জিনিষ যার পেটে পড়ে তার "ভিটে মাটি উচ্ছন্ন যায়", মতিগতি বিগড়িয়া যায়। রূপকের সাহায্যে বুঝিতে হইবে যে—"আধুনিকতা", —সভ্যতা-ভব্যতা, স্বাস্থ্যোন্নতি, কর্ম্মদক্ষতা ইত্যাদি যে জনকেন্দ্রে বাড়িয়া যায় তারই নাম কলিকাতা। কথা হইতেছে, এই দুটা জিনিষ আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চলনসই চাক্ষুষ বাস্তবগোছের মাপকাঠি। জেলায় জেলায় আপনারা মাপিয়া দেখুন—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ এই দুটী জিনিষ অথবা এই দুটী জিনিষের মাসতুত ভাই-জাতীয় অন্যান্য বস্তু বিগত ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর কত বাড়িয়াছে। ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গোটা বাংলাদেশে একটীও মিউনিসিপ্যালিটি ছিল না। না থাকার অথবা খারাপ থাকার মানে কি তা আমি ১৯১০-১২ সনে ঢাকায় চলাফেরা করিয়া বুঝিয়াছি। সেই মিউনিসি-প্যালিটির সংখ্যা আজ যদি ১২৫ হইয়া থাকে অথবা ৫০টীর জায়গায় আজ যদি ১০০টী হইয়া থাকে, তাহলে কি বলিব যে, আর্থিক হিসাবে বাঙ্গালী সমাজ অবনতির পথে যাইতেছে?

কেবল মিউনিসিপ্যালিটী নয়, যে-কোন লোকের পরিবারের খবর লইয়া দেখা যাইতে পারে ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর আগে তারা কি খাইত,

কোন্ কোন্ জিনিষ কিনিত? এক শহর থেকে আর এক শহরে কিংবা এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় তারা বছরে কতবার যাওয়া-আসা করিত? আর যাইতে হইলে তখন গরুর গাড়ীতে না নৌকায় যাওয়া হইত? তার সঙ্গে তুলনায় সেই পরিবার আজকাল কি খায়, কি পরে? এক শহর থেকে আর এক শহরে, এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় কতবার যাওয়া আসা করে? লোকেরা আড্ডা মারিতে দেশ দেশান্তরে যায় না, কাজ নিয়েই যায়। বাংলাদেশের অনেক পল্লী শহরেই ফী বৎসর নতুন নতুন নিরেট বাড়ীঘর দু-চার খানা করিয়া মাথা তুলিতেছে। কাপড়-চোপড়ের আকার-প্রকার সমাজসুদ্ধ বাড়িয়া চলিয়াছে। এ সব জিনিস জীবন-যাত্রার হিসাবে তুচ্ছ করা চলে না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মত এদেশ সম্বন্ধেও হিসাব করিয়া যদি দেখি, আগে আমরা যতখানি চিঠি লেখালেখি করিতাম, যত লোক রেলে নৌকায় গরুর গাড়ীতে চড়িতাম, থিয়েটারে যাইতাম, এখন তার চেয়ে বেশী লোক চিঠি লেখে, ট্রামে চড়ে, রেলে চলে, থিয়েটারে যায়, তাহলে কি বলিব আমাদের আর্থিক অবস্থা অবনত হইয়াছে? আগে যেখানে মাত্র পাঁচ জন লোক জামা পরিত, এখন সেখানে যদি পঁচিশ জন লোক জামা পরিতেছে, তাহলে কি বলিব আমাদের অবস্থা অবনত হইয়াছে? আগে যেখানে দু' জন চপ কাট্‌লেট্ খাইত—এখন সেখানে দু'শ লোক যদি চপ কাট্‌লেট্ খায়—অর্থব্যয়ের অপব্যয়ের কথা বলিতেছি না, বস্তুনিষ্ঠার দিক্ থেকে, টাকা খরচ করিবার ক্ষমতার দিক্ থেকে বলিতেছি—তাহলে কি বলিব আর্থিক হিসাবে দেশ অবনত হইয়াছে? আগে তিনজন লোকের পয়সা ছিল, অতএব তারা ব্যয় করিত, এখন তিনশ লোকের পয়সা আছে তাই তারা খাইতে পারিতেছে, বাবুগিরিও করিতেছে। এটা কি দারিদ্র্যের লক্ষণ, ক্রমিক অধোগতির সাক্ষী?

অর্থনৈতিক মতামতের ওলট-পালট অসম্ভব নয়

আর্থিক হিসাবে আমরা অবনত হইতেছি—এই মতটা আমাদের দেশে গড্ডলিকার মত চলিয়া আসিতেছে। আর এই ধরণের মতকে আমরা ভারত-আত্মার বাণীস্বরূপ ধরিয়া লইয়াছি। কিন্তু এসব মত টেঁকসই কি না তা ভাবিয়া দেখাও আমরা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি না। ত্যাঁদড় বলিতেছে "এই সব মতামত ঝাড়িয়া বাছিয়া দেখিবার যুগ আসিয়াছে।" স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল স্রোত যখন ১৯০৫ সনে বাংলাদেশের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল, তখনকার দিনে রমেশচন্দ্র দত্তকে অর্থনৈতিক চিন্তা-হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পীর বলিয়া আমরা বিবেচনা করিতাম। বাস্তবিক পক্ষে আমার বিবেচনায় রমেশচন্দ্রের মত কৃতী পুরুষ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় খুব কমই ছিলেন। যাক্, এখানে সে কথা পাড়িতেছি না। বৃটিশ ভারতের আর্থিক ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি স্বদেশী যুগের সমসমকালে দু'খানা বই লিখিয়া গিয়াছেন। সেই বই দু'টাই ছিল আমাদের গীতা-কোরাণ-বাইবেল স্বরূপ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ১৯২৫-২৬ সনের ছোকরারা, ১৯২৫-২৬ সনের রিসার্চ্চ-ওয়ালারা, অধ্যাপকেরা কি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র যে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন, আজকালকার দিনে তা যুবক-ভারতের বা যুবক বাংলার বেদান্ত-স্বরূপ দাঁড়াইতে পারে? কিন্তু আমি জানি ১৯০৫-৬ সনে রমেশচন্দ্রের ঐ বহিকে আমরা আর্থিক বেদান্তই বিবেচনা করিতাম। এখন লোকেরা ক্রমশঃ বুঝিতেছে যে, রমেশচন্দ্রের সেই মত, যাকে আমরা ভারত-আত্মার বাণী-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি, তা ভারত-আত্মার বাণী না হইতেও পারে। বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে, সে সম্বন্ধে

দু'চার জন নামজাদা লোক যা-কিছু লিখিয়াছে বা লিখিতেছে, সেগুলিকে ভারত-আত্মার বাণী বা যুবক ভারতের বেদান্ত বা জাতীয় চৈতন্যের প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনা করা ত্যাঁদড়ের ত্যাঁদড়ামির পক্ষে অসম্ভব। রমেশচন্দ্র যেমন কিছু কিছু বাতিল বিবেচিত হইতেছেন, তেমনি আজকালকার বাজারে আর্থিক মতামত সম্বন্ধে যা-কিছু "ভারতীয়", "জাতীয়", "স্বদেশী" বলিয়া চলিতেছে, তার অনেকগুলিই বাতিল বিবেচিত হইতে চলিয়াছে এবং চলিবে। এই গেল ত্যাঁদড়ের ধনবিজ্ঞান। যাকে তাকে যখন তখন ত্যাঁদড়েরা ভারত-আত্মার বাণী, ভারতীয় স্বাদেশিকতার প্রতিমূর্ত্তি স্বীকার করিতে নারাজ। স্বদেশনিষ্ঠ বা "জাতীয়" বা "ভারতীয়" বলিয়া যে-সকল মত বাজারে দাঁড়াইতেছে সেগুলা প্রকৃতপক্ষে স্বদেশনিষ্ঠ না হইতেও পারে,—অর্থনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধে ত্যাঁদড়ামির সংশয়বাদ এইরূপ।

মধ্যবিত্তের সৃষ্টি ও

এখন ত্যাঁদড়ামির তৃতীয় সূত্র প্রচার করা যাউক। মধ্যবিত্ত সমাজ সম্বন্ধে গড্ডলিকাওয়ালারা বলেন—"দেখিতে পাইতেছ না তাদের কি দুরবস্থা হইয়াছে? দেশ অবনতির দিকে যাইতেছে, তার পরিচয় আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।" ত্যাঁদড় বলিতেছে, "তা আমি স্বীকার করিতে পারি না। মধ্যবিত্তের দুরবস্থা হইয়াছে, এ কথাটা প্রমাণ করা কঠিন। হয়ত হয় নাই।" ত্যাঁদড় বলিবে—"তুই যখন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত করিস্ তখন কয়টা লোকের নাক গুণিয়া বলিস্? গণনার মধ্যে খুব জোর বামুন কায়েত বৈদ্য ইত্যাদি থাকে। ব্যস্, তারা গোটা বাংলায় কত লাখ?" তার চেয়ে যারা একটু উদার-প্রকৃতির লোক তাঁরা বলিবেন —"মধ্যবিত্ত বলিতে তাদেরকেও ধরা উচিত, যারা ইস্কুল-কলেজে পাশ

করিয়াছে কি ফেল হইয়াছে, সাদা জামা, ধোওয়া কাপড়, ধোওয়া চাদর যারা পরে—এসব গুলিকে মধ্যবিত্ত বলা যাইতে পারে।"

সমাজের উৎকর্ষ-বৃদ্ধি

এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গীয় মধ্যবিত্তের অবস্থা খারাপ একথা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারে কয়জন বাঙ্গালী? আমাদের ঠাকুরদাদাদের আমলে একজন লোক এণ্ট্রান্স পাশ করিলে দারোগা হইত, অথবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কি মুন্সিফ হইত। আজকাল এম-এ, পি আর-এস, পি, এইচ ডি, ডি-এস্-সি উপাধি পাইলেও অনেক সময় একটা চাকুরী জোটে না। গড্ডলিকাওয়ালারা বলিতেছে "এর চাইতে বেশী প্রমাণ আর কি চাও, বাবা?" আমি বলিতেছি—"এতে মধ্যবিত্তের দুরবস্থা কোন মতেই প্রমাণিত হয় না, প্রমাণিত হয় ঠিক উল্টো; দেশটা ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে, মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া দেশের পক্ষে মঙ্গলকর। সামান্য পাশের পর কেউ আজকাল হাকিম হইতে পারে না। কিন্তু যে যুগে এল-এ ফেল হইলেই একটা কেষ্ট-বিষ্টু হওয়া যাইত তার চেয়ে আজকের যুগ হাজারগুণে উন্নত। তখন ঐ রকম দারোগা বা হাকিম হইত গোটা বাঙ্গালা দেশে দশ-বার জন। আর এখন হাজার হাজার লোক প্রত্যেকেই দারোগা বা হাকিম হয় না বটে, কিন্তু অন্যান্য কিছু হয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ-পঁচাত্তর বৎসর আগে গোটা বাংলা দেশে যারা ইংরেজী পড়িত, খবরের কাগজ পড়িত, একখানি বই কিনিয়া তিন পুরুষকে উইল করিয়া দিয়া যাইত তাদেরকে "জ্ঞানী" বলা হইত। তাদের সংখ্যা ছিল বোধ হয় দেড়, দুই বা সাড়ে তিন হাজার। সে যুগটা লইয়া লাফালাফি করিবার কি আছে? কর্ম্মবীর আশুতোষের কল্যাণে আজ সেখানে দশ-বার হাজার লোক এম-এ, বি এ পাশ কি ফেল হইতেছে। এরা খবরের কাগজ

চালাইতেছে, গল্প লিখিতেছে, ছবি আঁকিতেছে, গান করিতেছে, নতুন নতুন ব্যবসাতে যাইতেছে, নানাদিকে বাঙ্গালীর জীবনটাকে বৈচিত্র্যময়, ঐশ্বর্য্যময় করিয়া তুলিতেছে। সকলেই নোট মুখস্থ করিয়া বি-এ পাশ করিতেছে তা নয়। বি-এ পাশ হউক কি ফেল হউক, লেখাপড়ার ফ্যাক্টরীতে তারা যাইতেছে। আগে যেখানে চার-পাঁচ শত ছেলে যাইত, এখন সেখানে যায় বিশ-পঁচিশ হাজার বা তার কাছাকাছি।

সমগ্র মধ্যবিত্তের আয়

আগেকার দিনে কোন পল্লীতে একজন লোক মাত্র এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া দারোগাগিরি কি ডেপুটীগিরি পাইত, কিন্তু তার পোষ্যবর্গ ছিল বিশ-পঁচিশ জন নিষ্কর্ম্মা লোক। সে যুগটা এমন কোন গৌরবের যুগ নয়। আজকে এণ্ট্রান্স কি বি-এ পাশ করিয়া অথবা ফেল করিরা সেই একজনের জায়গায় ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক মাসিক ২৫।৫০।৭৫৲ টাকা রোজগার করিতেছে। ধরুন যেন আগেকার দিনে হাজার লোক প্রত্যেক মাসে ১৫০।২৫০৲ টাকা রোজগার করিত। আজ অন্ততঃ তিন লাখ লোক প্রত্যেকেই মাসে ২৫।৫০।৭৫৲ টাকা করিয়া রোজগার করিতেছে। কড়ায় ক্রান্তিতে হিসাব করিয়া কথা বলিতেছি না—ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ জাহির করা এক্ষেত্রে এমন সহজও নয়,—আলোচনা-প্রণালীটা মাত্র দেখাইতেছি। দেখাইতেছি যে—সমগ্র মধ্যবিত্ত-সমাজে ধনসম্পদ্ বাড়িয়াছে। অতএব যদি কেহ বলেন, গোটা মধ্যবিত্তের অবস্থা খারাপ হইতেছে, তাঁদের পক্ষে সে কথা হজম করা অসম্ভব। মধ্যবিত্তের দুরবস্থা কোথাও কোথাও থাকিতে পারে। কিন্তু সে কালের তুলনায় এ কালের মধ্যবিত্ত বেশী দুরবস্থায় আছে তা স্বীকার করা সহজ নয়।

শ্রেণী-বিপ্লব

তারপর আজ যাকে মধ্যবিত্ত বলিতেছি, ত্রিশ-চল্লিশ-ষাট-পঁচাত্তর বৎসর আগে সে মধ্যবিত্ত ছিল না। আজকে যাকে ভদ্র বলিতেছি, ত্রিশ-চল্লিশ-ষাট-পঁচাত্তর বৎসর আগে সে বোধ হয় ভদ্র গণ্ডীর বহির্ভূত অর্থাৎ "অ-ভদ্র" ছিল। কতজন সে খবর রাখেন? ব্রাহ্মণই হউক, কায়স্থই হউক, বৈদ্যই হউক, কি অন্যান্য জাতের লোকই হউক, তারা ১৮১৫—৫৭ সনে আজ-কালকার মাপকাঠি অনুসারে "ভদ্র" বা মধ্যবিত্ত বিবেচিত হইত কিনা সন্দেহ এ বিষয়ে মাথা খেলানো আবশ্যক। সেদিকে গড্ডলিকাওয়ালারা ভ্রূক্ষেপই করেন না। কাজেই আগেকার চেয়ে মধ্যবিত্তের অবস্থা খারাপ হইয়াছে, একথা স্বীকার করিয়া চলা সুকঠিন। অধিকন্তু এখনকার মাপকাঠিতে বাংলার আর দুনিয়ার ভদ্রলোকের গণ্ডী অনেক বেশীদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বুঝিতে হইবে এই পঞ্চাশ-পঁচাত্তর বৎসরের ভিতর একটা সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ছোট জাত বড় জাত হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এটা কি ভারতের দুরবস্থার লক্ষণ? ছোট জাত ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে। যে লোক পাঠশালার পুঁথি পড়িতে পারিত না, তার বংশধর মাইনর, এণ্ট্রান্স, এল-এ, বি-এ পাশ করিয়া হাইকোর্টের উকীল হাকিম পর্য্যন্ত হইতেছে। এগুলি কি ভারতের দুরবস্থার লক্ষণ, মধ্য-বিত্তের দুরবস্থার লক্ষণ? অধিকন্তু, ধরা যাক যেন আজকাল কোন কোন জেলায় কোন কোন মধ্যবিত্ত পরিবারে আর্থিক দুরবস্থা দেখা যাইতেছে। কিন্তু তা বলিয়া বাংলাদেশের গোটা মধ্যবিত্ত সমাজই কষ্টে আছে, একথা অন্যান্য পরিবারের লোকজন কোন মতেই স্বীকার করিবে না। তা ছাড়া গোটা মধ্যবিত্ত সমাজই যদি রসাতলে যায়, তাহলেও সমগ্র বাংলাদেশ মাটি হইতে চলিল, একথাও বলা চলিবে না। কেন না,

৪॥০ কোটি বাঙ্গালীর সমাজে দুই আড়াই বা তিন লাখ মধ্যবিত্তের দারিদ্র্য বা অবনতি এমন বিশেষ কিছু নয়। মধ্যবিত্তের সর্ব্বনাশ ঘটিলেও অন্যান্য শ্রেণীর "পৌষমাস" চালানো অসম্ভব নয়। ত্যাঁদড়ের ধনবিজ্ঞান এইরূপই বিচার করিতে অভ্যস্ত।

নবীন বাংলার মেরুদণ্ড—কারখানার মজুর

তারপর চতুর্থ সূত্র। গড্ডলিকাওয়ালারা মধ্যবিত্ত ছাড়িয়া যখন দেশটার কথা ভাবেন, তখন বড জোর মাঝে মাঝে চাষীদের কথা বলেন। "কৃষির উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না, চাষীরা হইতেছে ভারতের, বাংলার মেরুদণ্ড। চাষ জিনিষ আধ্যাত্মিক। এ বস্তু আর কোথাও ছিল না বা নাই। চাষী হইতেছেন ভারতের আদর্শমাফিক লোক।" এইরূপই তাঁদের দর্শন। এখানে ত্যাঁদড় বলিবে—"ভবিষ্যৎ ভারতের মেরুদণ্ড,নয়া বাংলার মেরুদণ্ড মধ্যবিত্তও নয়, চাষীও নয় সে হইতেছে কারখানার মজুর।" বাংলাদেশে জমির পরিমাণ এত কম, আর চাষীর সংখ্যা এত বেশী যে, কেহ আর চাষের উপর নির্ভর করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ নয়। এই অবস্থায় বাংলাদেশকে গড়িয়া তুলিবে চাষী, একথা যদি বলা হয়, তাহলে বুঝিতে হইবে যে, বক্তা একেবারে চরম নৈরাশ্যের দর্শনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য যদি কোন চিন্তা করা সম্ভব হয় তাহলে ত্যাঁদড় বলিবে— "মধ্যবিত্তের দিকেও তাকাইও না, চাষীর দিকেও তাকাইও না। যে জিনিষটা একসঙ্গে দুটোকেই রক্ষা করিবে, সে হইতেছে কারখানা, ফ্যাক্টরী বা কল-নিয়ন্ত্রিত, যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক বিধান। যেই এক একটা পল্লীর বুকে ফ্যাক্টরী কায়েম হইবে, তখনি চাষীরা নিজ নিজ বাস্তুভিটা ছাড়িয়া কারখানায় আসিয়া দেখা দিবে, আর ৩০।৪০।৫০ টাকা

পর্য্যন্ত মাহিনা পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মধ্যবিত্ত লোক যারা বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না বলিয়া নৈরাশ্যময় হইয়া পড়িতেছে, তারা ফ্যাক্টরীতে গিয়া এঞ্জিনিয়ার, কেরাণী, অ্যাকাউণ্টেণ্ট, যা হয় একটা কিছু হইবে। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত যে কাজ মাথা আর কলম দিয়া চালাইতে সমর্থ সেটা সে ফ্যাক্টরীতে চালাইবে। ফ্যাক্টরী এক সঙ্গে চাষীকে এবং মধ্যবিত্তকে রক্ষা করিবে।" অবশ্য এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, বিগত ১৫।২০ বৎসরের ভিতর মজুরেরা আর্থিক হিসাবে বেশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। চাষীদের অবস্থাও আগেকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। কিন্তু মধ্যবিত্তেরা চাষী ও মজুরদের আর্থিক সচ্ছলতাকে দেশের সচ্ছলতা বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত নয় বলিয়া হিসাবে গণ্ডগোল হয়।

আর একটা কথা জানিয়া রাখা দরকার। মজুরের দল পুরু না হইলে ভারতবর্ষ আধুনিক সভ্যতার কোঠায় উঁচাইয়া যাইতে পারিবে না। যন্ত্র-নিষ্ঠ, সময়-নিষ্ঠ, শাসন-নিষ্ঠ মজুরেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই ভারতীয় সমাজে সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, ডেমোক্রেসি ইত্যাদি চিজের আধ্যাত্মিকতা ছড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। মজুর-দর্শন, মজুর-গীতা, মজুর-বেদান্ত যতদিন ভারতে অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক স্বরাজ অসম্ভব।

ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন দেশে যতটুকু ডেমোক্রেসি বা স্বরাজ আজকাল দেখা যায়, তার প্রায় ষোল আনা না হোক অনেকটাই মজুর-সঙ্ঘের আর মজুর-আন্দোলনের দান। বিলাতের কথা ধরুন। সেখানে ১৮৩২ সনের "রাষ্ট্রসংস্কারে" আসল ডেমোক্রেসি পায়দা হয় নাই। এমন কি ১৮৬৬ সনের ধাক্কায়ও এই চিজ বেশী আসে নাই। ডেমোক্রেসি বা সাম্যনীতির অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ১৮৮৬ সনের আর তার পরবর্ত্তী আইন-

কানুনের সন্তান। এই চল্লিশ বৎসরের আইনকানুনের গোড়ায় মজুর-জীবনের শক্তি ছিল প্রচুর। ১৯২৪-২৫ সনে মজুর-শক্তিই বিলাতী সমাজের একপ্রকার আত্মাশক্তি।

যুবক ভারত আজ ১৮৮৬ সনের বিলাতী আধ্যাত্মিকতা আর তার পরবর্ত্তী ও সমসাময়িক পাশ্চাত্য ডেমোক্রেসি বা স্বরাজ সমঝিতে অসমর্থ। আমরা এখনো বোধ হয় ১৮৩২-৭৫ সনের পাশ্চাত্য জীবন পাশ করিতে পারি নাই। ভারতের মজুর-সমাজ যতদিন পর্য্যন্ত না গুন্‌তিতে বাড়িয়া যায় আর কর্ম্মগুণে মজবুত হয় ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে আসল স্বরাজ আর ডেমোক্রেসি চাখা অসাধ্য সাধন। স্বদেশ-সেবকেরা, স্বরাজ-সাধকেরা মজুর-আন্দোলনটা পাকাইয়া তুলুন।

মজুর-সংখ্যায় ভারত ও দুনিয়া

গোটা ভারতে আজ মাত্র হাজার ছয়েক কারখানা আছে, তাতে অতিমাত্রায় ধরিলেও ১৫ লক্ষ মজুর খাটিতেছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন আমরা কোথায় আছি। আগে একবার বলিয়াছি, ইয়োরোপ ও আমেরিকা যে পথে চলিয়াছে, উন্নতি-হিসাবে, আদর্শ-হিসাবে, সভ্যতা-হিসাবে, গতি-হিসাবে, জীবনের ভবিষ্যৎ-হিসাবে, ভারতবর্ষও ঠিক সেই পথে চলিয়াছে। পরাধীন ভারতে এবং স্বাধীন বিলাতে এক্ষেত্রে কোন প্রভেদ নাই। এখন প্রশ্ন এই, আমরা রহিয়াছি কোথায়? আমার কাছে তার মাপও বাস্তব। ইংরেজ-সমাজে ৪॥০ কোটি লোকের ভিতর যেখানে সত্তর-পঁচাত্তর লাখ কি এক কোটি মজুর, বাংলাদেশে ৪॥০-৫ কোটি লোকের ভিতর সেখানে মাত্র চার লাখ মজুর। এখন তুলনা যদি করেন, দেখা যাইবে যে চার লাখের সঙ্গে সত্তর লাখ বা এক কোটি মজুরের যে সম্বন্ধ, গোটা বাঙালী সমাজের সঙ্গে বিলাতী সমাজের ঠিক সেই সম্বন্ধ।

এ কথাটীকে আর একদিক্ থেকে আরো সোজা করিয়া বলা যাইতে পারে। ইংরেজ-সমাজে কি ফরাসী-মহলে কি জার্ম্মাণিতে ষোল আনা মানুষ কতগুলি আছে? সাড়ে চার বা পাঁচ কোটি মানুষের মধ্যে বাজে মাল সব ঝাড়িয়া ফেলিলে দেড়-দুই কোটি মাত্র ষোল আনা মানুষ মিলে। তার মানে তাদের শরীর সুস্থ সবল, তাদের মাথা ভাল, সজাগ, তেজবীর্য্য আছে। নিজেদের মাথা খেলাইয়া চিন্তা করিয়া তারা কাজ করে এবং নিজেরাই তার ফলভোগ করে। যত রকম দারিদ্র্য ব্যাধি আসিতে পারে সব বর্জ্জন করিলে, রক্তমাংসের মানুষ যে আকারে পৃথিবীতে দেখা দিতে পারে, তা যদি কল্পনা করিতে পারি, তাহলে বলিব শতকরা ১০০ অংশ মানুষ অর্থাৎ ষোল আনা মানুষ পৃথিবীতে খুব কম। কিন্তু অনুপাতের তরফ থেকে মনে হইয়াছে যে, বিলাতে সাড়ে চার কোটির মধ্যে যদি দেড় কোটি আড়াই কোটি থাকে, বাংলাদেশে সাড়ে চার কোটির মধ্যে দেড়, দুই, পাঁচ, দশ হাজার আছে কি না সন্দেহ। অতএব লক্ষ্য হিসাবে আর আদর্শ হিসাবে আধুনিক ইংরেজ আর আধুনিক বাঙ্গালী যদিও এক, কিন্তু কর্ম্মদক্ষতা হিসাবে, জীবনের কিম্মৎ হিসাবে, দশ বিশ হাজারে আর দেড় কোটিতে যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালীতে আর ইংরেজেও সেই সম্বন্ধ। একদম অঙ্ক কষিয়া নিক্তির ওজনে কথা বলিতেছি না, ঠারে ঠোরে এক জাতের সঙ্গে আর এক জাতের সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এই যদি বুঝি, তাহলে বুঝিতে পারিব, মুষ্টিমেয় ইংরেজ আসিয়া ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উপর আধিপত্য করিতেছে কেন।

বাংলার আসল লোক-সংখ্যা

আমরা পাটীগণিতে পড়ি যে, তিনের পিঠে কতকগুলো শূন্য দিলে বিপুল রাশি হয়। কিন্তু ষ্ট্যাটিস্‌টিকস যারা ঘাঁটে তারা বলিয়া দিবে,

তিনের পিঠে কতকগুলো শূন্য থাকিলেই একটা বিপুল রাশি দাঁড়ায় না। শূন্যগুলার মূল্য অনেক সময় এক দামড়িও না হইতে পারে। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে এক একটা মানুষ দশ-বার হাজার লোকের সমান— হাতের জোরে আর মাথার জোরে। হইতে পারে বাংলায় পাঁচ কোটি লোকের বাস। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করেন, "পাঁচ কোটি লোকের কিম্মৎ কতখানি ?" আমি বলিব "আমাদের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি নয়, বোধ হয় পঞ্চাশ হাজার মাত্র।" আর যদি জিজ্ঞাসা করেন—"ইংরেজের সংখ্যা কত ?" তখন বল্‌ব—"ওরাও সাড়ে চার বা পাঁচ কোটি নয়, হয়ত দুই বা আড়াই কোটি।" ওদের আড়াই কোটির সঙ্গে যখন টক্কর দিতে চাই, তখন যদি মনে রাখি আমরা সংখ্যায় মাত্র পঞ্চাশ হাজার, তাহা হইলেই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করা হয় এবং আমরা বুঝিতে পারি ভারত কোথায়— এশিয়া কোথায়। ইয়োরোপের সঙ্গে এশিয়াকে টক্কর দিতে হইলে, যুবক এশিয়াকে, যুবক ভারতকে, যুবক বাংলাকে কত হাত পানির নীচ থেকে কাজ সুরু করিতে হইবে তা একবার মনে মনে কল্পনা করুন, আর যথার্থ আদমসুমারির, দেশের খাঁটি লোক-সংখ্যার কথা ভাবুন।

বৃহত্তর ভারত

এবার বলতে চাই পঞ্চম সূত্র। গড্ডলিকাওয়ালারা বলিয়া থাকেন, "ভারতের উন্নতির একমাত্র উপায় 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।' জন্মিয়াছি এদেশে, মরিতেও হইবে এদেশে।" এই হইতেছে গড্ডলিকার দর্শন। ত্যাঁদড় বলিতেছে—"ভাই, চোখ খুলিয়া একবার দেখ এবং বল—রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করিয়া, মধুসূদন আর বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করিয়া আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র পর্য্যন্ত যাঁর নামই কর না কেন, এই লোকগুলি কি "বৃন্দাবনং

পরিত্যজ্য পাদমেকং” কদাপি ন জগাম ? এঁরা তবু অনেকে বিদেশ-ফেরতা লোক বটেন। যাঁরা বিদেশে যান নাই, তাঁদের অবস্থাটাও কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন ?

ইডেন হিন্দু হষ্টেলের আবহাওয়ার ভিতর কেহ বিদেশে যায় নাই একথা ঠিক। কিন্তু এর আবহাওয়া আগাগোড়া বিদেশের প্রতিমূর্ত্তি নয় কি ? এই যে প্রেসিডেন্সি কলেজ, এই যে বিশ্ববিদ্যালয়, এই যে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্, চলিয়া যান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, বিশ্বভারতীতে, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটে, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের আওতায়,—যেখানে যেখানে বাংলা সাহিত্যের চরম নিদর্শন, সুকুমার শিল্পের পরাকাষ্ঠা—শিল্প হিসাবে, সাহিত্য হিসাবে, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হিসাবে আমরা যা-কিছু করিতেছি,—তার শতকরা ৯৯।৯৯।৷৹ অংশ বিদেশী মাল নয় কি ? অর্থাৎ একশ’ বৎসর ধরিয়া আমরা জীবনে, কর্ম্মে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, আধ্যাত্মিকতায়, রাজনৈতিক চিন্তায়, সংবাদ-পত্রের পরিচালনে একটা মাত্র সূত্র প্রচার করিয়া আসিতেছি। যদিও গড্ডলিকা-ওয়ালারা তা খুলিয়া বলে না, সে কথা হইতেছে—“হতে চাও স্বদেশী, ত আগে হও বিদেশী।” বর্ত্তমান ভারতের প্রত্যেক কর্ম্মবীর এবং চিন্তাবীরই এক একজন পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্ত্তি। ভারতটা “বৃহত্তর” হইয়াছে তাঁদেরই কৃতিত্বে।

বর্ত্তমান ভারতে পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিকতা

তা যদি আজ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে তাহলে ত্যাঁদড় বলিবে “গড্ডলিকা-ওয়ালা, বাহির হও এখান থেকে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভারতের পল্লীতে-পল্লীতে, শহরে-শহরে, পরিবারে-পরিবারে, দোকানে-দোকানে, মুচী-মেথর-মুদ্দাফরাসের সমাজে, চাষীর বাড়ীতে, মজুরের কর্ম্মকেন্দ্রে

কায়েম করা হইতেছে আমাদের একমাত্র সাধনা। একশ' বৎসর ধরিয়া অজ্ঞানে-সজ্ঞানে যা কিছু করিয়াছি, আজ সজ্ঞানে তাই করিব। প্রাণ ভরিয়া যুবক ভারতকে আজ খোলা মাঠে দাঁড়াইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে পাশ্চাত্য খোরাক খাইয়াই আমরা মানুষ হইয়াছি।" এই দেখুন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এখানে বসিয়া আছেন। ইনি কখনও সমুদ্র পাড়ি দেন নাই, গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু ইনিও একজন মস্ত 'গো-খাদক'। চসার, শেক্‌সপীয়ার মুখে না দিয়া ইনি কোন দিন জলস্পর্শ করেন না। এই রকম অখাদ্য-খেকো মানুষ বাংলায় আজ কত? হাজার হাজার, লাখ লাখ, যারা বি-এ, এম-এ পড়িতেছে, যত লোক খবরের কাগজ চালাইতেছে, যত লোক স্বরাজ আন্দোলনের পাণ্ডা, সবাই পশ্চিমা সভ্যতার রস শুষিয়া নিজ নিজ আত্মাকে পুষ্ট করিয়াছে। "অখাদ্য না খাইয়া, হুইটম্যান-আইনষ্টাইন-প্যাস্তুয়র না পড়িয়া মানুষ হইয়াছে, এমন লোক বর্ত্তমান ভারতে কয় জন আছেন বাপ কা বেটা? যুবকভারতের সভ্যতার, যুবক বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের শতকরা ৯৯ অংশ বিদেশী। অতএব আজ যদি আমাদের কিছু কাজ করিতে হয় খোলাখুলি সজ্ঞানে বলিতে হইবে—পাঁচ কোটি নরনারীর প্রত্যেককে ঐ রকম অখাদ্য-খেকো বানাইয়া পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক দস্তুল-ওয়ালার জাতিতে পরিণত করা আবশ্যক।

জাপানী কায়দা

কথাটা আরো সোজা করিয়া বলা দরকার। আমাদের ছেলেরা ইস্কুল কলেজে এণ্ট্রাস, এল-এ, বি-এ, এম-এ, ডি এস-সি পাশ করিতেছে করুক। আশুতোষ পাঁচ হাজারের জায়গায় পঁচিশ হাজারের পাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর কাজে হাজার পঁচিশেক মানায়

না। ঐ লাইনেই আরও অনেক ফন্দি-ফিকির বাহির করিতে হইবে। আশু-তোষের পথেই এই কাজ আরও বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। চাই আট-দশটা আশুতোষ। প্রশ্ন হইতেছে—কবে একটা জন ষ্টুয়ার্ট মিল বা আইন-ষ্টাইনের কথা বিদেশীরা আসিয়া আমাদের ইস্কুলে শুনাইবে, আর আমরা সেটা মুখস্থ করিয়া মানুষ হইব, সে ভাবে চলিলে আর কুলাইবে না। জাপান তা করে না, তুর্কী তা করে না। ওরা বসিয়া থাকে না এই আশায় যে, কবে ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, মার্কিণ আসিয়া জাপানকে বলিবে—"ওরে এই একটা নতুন আবিষ্কার হইল, তোদের দেশেও এটা কাজে লাগিবে।" ওরা নিজেরা সকল দেশে গিয়া নিজের মাথা চালনা করিয়া মাল লইয়া আসে। জাপানীরা বসিয়া রহিয়াছে দুনিয়ার সর্ব্বত্র। দূরবীণ লাগাইয়া দেখিতেছে কোথায় কোন্ তারা উঠিল। ধরা যাক্ যেন, ফটোগ্রাফের ব্যবসা জার্ম্মাণ চালাইতেছে। অথবা ইংরেজ ফরাসী আমেরিকান এক একটা ঘাঁটি আগলাইয়া বসিয়া আছে। জাপান তাই দেখিতেছে, দেখিয়া বলিতেছে—"তাইত আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না।" দেশে যত রকম কলকারখানার ব্যবসা-বাণিজ্য আছে তাতে যোগ দিয়া কেহ রবারের ব্যবসা, কেহ কাচের ব্যবসা ধরিয়াছে। কেহ মন্ত্রী, কেহ মজুর-আন্দোলনের কর্ত্তা, কেহ মাষ্টার। এইরূপ ধরণের কাজে পাঁচ-সাত বৎসরের অভিজ্ঞতা যেই হয়, তখন তারা বাহির হইয়া পড়ে আমেরিকায় —জমিজমা সম্বন্ধে, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সেখানে কি হইতেছে দেখিতে। আমেরিকা খতম করিয়া যায় বেলজিয়ামে। সেখানেও শেষ নয়; যায় জার্ম্মাণিতে। এই রকম করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আড়াই-তিন-পাঁচ বৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া আবার কাজে লাগিয়া যায়। অথবা পুরানো কাজই বাড়াইয়া তোলে। দুই তিন বৎসর কাজ করিতে করিতে দেখে যে, জীবনটা তেতো হইয়া গিয়াছে, পুরানো হইয়া গিয়াছে, চাঙ্গা হইয়া আসা দরকার,

তখন চলিল আবার বিদেশে। অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তারা জীবনটাকে হরদম তাজা করিয়া তুলিতেছে। এই হইতেছে জ্যান্ত জাতের জীবন-সাধনা।

বাঙ্গালী তা করিতেছে না। আমরা রহিয়াছি বসিয়া কবে ম্যাকমিলান কোম্পানী বই ছাপাইবে, আর ছাপা হইলে কবে তার আড়কাঠি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুয়ারে আসিয়া বলিবে—"দেখুন মশায় ছাপা হইয়াছে, টেক্সট্ বুক করুন।" তখন আমরা বলি—"আচ্ছা রেখে যান, দেখিব কি করিতে পারি"। যুবক বাংলা কেন পরের উপর নির্ভর করিতেছে? জাপান তা করে না। ইংরেজ কোন্ কোন্ বই নতুন বাহির করিতেছে, ফরাসী রাসায়নিক কোন্ কায়দা নতুন আবিষ্কার করিল, জার্ম্মাণি কোন্ কোন্ গানের কোন্ কোন্ সুর নতুন সৃষ্টি করিল তা জানিবার জন্য জাপানের লোক মোতায়েন রহিয়াছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর প্রত্যেক জাহাজে জাপানীরা বিদেশে যাইতেছে—বিদেশী সাহিত্য, শিল্প, কলকব্জা দেখিতে, শিখিতে, জানিতে ও আমদানি করিতে।

গাড়ো আড্ডা বিদেশে

গড্ডলিকা বলিতেছে—"আমরা জন্মিয়াছি এদেশে, দু'এক জন নামজাদা স্বদেশী লোকের কল্যাণে যা-কিছু পাইয়াছি তাতেই বেশ চলিয়া যাইতেছে, বিদেশে যাইবার দরকার নাই। বিদেশ থেকে নতুন কিছু আমদানি করিবার জন্য মেহনৎ করা অনাবশ্যক। বিদেশীরা আমাদের চেয়ে বড় বেশী উপরের শ্রেণীর লোক নয়।" ত্যাঁদড় বলিতেছে, "আমরা একসঙ্গে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ বাপকা বেটা লোক চাই।"

একটা আশুতোষ, একটা চিত্তরঞ্জন মরিয়া গেল, আর অমনি আমরা অনাথ ছেলেমেয়ের মত কান্নাকাটি সুরু করিলাম, এ অবস্থা কোন মতেই মানুষের অবস্থা নয়। স্বদেশে হাজার হাজার লোক একসঙ্গে, এমন কি পয়লা নম্বরের গণ্ডা গণ্ডা লোক একসঙ্গে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ নাই; বিদেশে অভিযান না পাঠাইলে তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল হইবে না, বিদেশের ফোয়ারা থেকে বিদেশী দস্তলের আমদানি হওয়া চাই হরদম, তাহা না হইলে দেশের লোকগুলো মজবুত হইবে না। "আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন বৎসরে দু'একটা করিয়া মারা যাক, ট্যাঁকে আমাদের আরো রহিয়াছে"—এই চিন্তা আর এই অবস্থা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ জাতি মানুষের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না। কবে কালে-ভদ্রে একজন লোক ভাবুকতাপূর্ণ হৃদয় লইয়া একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবে, আর আমরা তীর্থের কাকের মত তার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিব—এ অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

পয়সা না থাকে, বিদেশে যাইতে না পার, ঝাঁপাইয়া পড় সমুদ্রে। সাঁতার কাটিয়া জাপানে আমেরিকায় গিয়া হাজির হও, এখানে ওখানে যাইয়া ৫।৭ বৎসর ভবঘুর্‌য়েগিরি কর। বি-এ, এম-এ পাশ করিয়াই বিদেশে গেলে চলিবে না। বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া কি ফেল করিয়া—ফেল হইলেও কুছপরোয়া নাই—ব্যবসাদারী, এঞ্জিনিয়ারী, ওকালতীর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন কর, সেই অভিজ্ঞতা লইয়া যত বেশী লোক বিদেশে যাইতে পারে ততই ভারতের পক্ষে মঙ্গল। তাকেই বলি "বৃহত্তর ভারত." গাড়ো আড্ডা বিদেশে। বৃহত্তর ভারত গড়িয়া তোল অর্থাৎ ভারতের বাহিরে হাজার হাজার ভারতবাসীর কর্ম্মক্ষেত্র, বহুসংখ্যক ভারতীয় নরনারীর জীবনকেন্দ্র গড়িয়া তোলাই আমাদের স্বদেশী এবং স্বরাজ সাধনার অন্যতম বনিয়াদ।

বৃহত্তর ভারত কাহাকে বলে ?*

প্রাচীন ভারতের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য

কলিকাতায় "বৃহত্তর ভারত"-পরিষৎ নামক এক পণ্ডিতসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। মধ্য এশিয়ায়, চীনে, জাপানে, ইন্দো-চীনে, আনামে, শ্যামে এবং জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপসমূহে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য আলোচনা চালানো এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আফগানিস্থান, পারশ্য এবং প্রাচ্য এশিয়ার অন্যান্য জনপদেও বৃহত্তর ভারতের চিহ্ন ঢুঁড়িয়া বাহির করিবার দিকে এবং সেই সম্বন্ধে গবেষণা চালাইবার দিকে এই পরিষদের লক্ষ্য থাকিবে।

প্রাচীন ভারতের নরনারী সেকালের দুনিয়ায় যে সকল আন্তর্জ্জাতিক লেন-দেন চালাইয়াছে তাহার কিছুই বৃহত্তর ভারত-পরিষদের আলোচনায় গবেষণায় বাদ পড়িবে না। বহির্ব্বাণিজ্য ছিল একালের মতন সেকালেও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অন্যতম আর্থিক কর্ম্ম এই কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্গে যাতায়াতের কথা, যানবাহনের কথা, কৃষিশিল্পের কথা, মাল আমদানি রপ্তানির কথা, পথঘাটের কথা, বলদ গাধা নৌকা গাড়ী জাহাজের কথা সবই অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ। প্রাচীন ভারতীয় আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সকল তথ্যই এই পরিষদে আলোচিত হইতে পারিবে। কাজেই ধনবিজ্ঞান-সেবীদের পক্ষে এই পরিষদের কার্য্যাবলী অনেক তরফ হইতেই কাজে লাগিবার কথা।

* "বৃহত্তর ভারৎ-পরিষৎ" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড বৃত্তান্ত (১০ অক্টোবর ১৯২৬)। শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন শ্রীইন্দ্রকুমার চৌধুরী।

উপনিবেশের প্রবাসী-ভারত

প্রত্নতত্ত্ব অর্থাৎ সেকেলে ভারত-সন্তানের জীবন দুনিয়ার দিকে দিকে কতখানি দিগ্বিজয় করিয়াছিল, তাহার চৌহদ্দি জরিপ করাই এই পরিষদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। বর্ত্তমান ভারতের নরনারী অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজীল্যাণ্ড, ফিজিদ্বীপে, ক্যানাডায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, পূর্ব্ব আফ্রিকায়, ট্রিনিডাড ইত্যাদি মধ্য আমেরিকার দ্বীপসমূহে এবং মরিশাস ইত্যাদি আফ্রিকার উপকূলস্থ দ্বীপে, "উপনিবেশে" "উপনিবেশে"—কেহ কেহ বা দুই তিন পুরুষ ধরিয়া কেহ কেহ বা কয়েক দশক ধরিয়া বসবাস করিতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উপনিবেশে এবং ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জনপদে বর্ত্তমান কালে এই উপায়ে একটা বৃহত্তর ভরত গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রবাসী-ভারতের জীবনযাত্রা, আর্থিক লেন-দেন, শিক্ষাদীক্ষা এবং সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-অবনতির অবস্থা বুঝিবার জন্যও এই পরিষদে চেষ্টা চলিবে। "উপনিবেশ-সমস্যা" যুবক ভারতে উপস্থিত হইয়াছে। তাহা বুঝিবার প্রয়াসও এই পরিষদে কিছু কিছু অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

বৃহত্তর ভারতের একাল-সেকাল

আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া, চীন, জাপান, শ্যাম, আনাম ইত্যাদি দেশের প্রাচীন বৃহত্তর ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাও এই সকল নবীন বৃহত্তর ভারতের জীবন-কথার সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত হইবে। ইহাতে ভারতবর্ষের সঙ্গে এই সকল 'প্রবাসী' ভারত-সন্তানের আত্মিক যোগাযোগ কায়েম হইতে থাকিবে।

এতগুলা কাজ কোনো এক পরিষদের উদ্যোগে সুসিদ্ধ হইতে পারিবে কি না জানি না। কিন্তু বৃহত্তর ভারতের একাল-সেকালকে

উপেক্ষা করিয়া চলিতে যুবক ভারত আর রাজি নয়। এই পরিষদের প্রতিষ্ঠায় আমরা এইরূপই বুঝিতেছি।

বৃহত্তর ভারত বস্তুটা এক একজন এক এক প্রণালীতে বুঝিয়া থাকেন। ধরুন ভীম নাগের সন্দেশ বস্তুটা কি? কেহ বলিবে গোলাকার, কেহ বলিবে চক্রাকার, কেহ বলিবে সাদা, কেহ বলিবে মিঠা, কেহ বলিবে কড়াপাক ইত্যাদি। কিন্তু আমি যখন ভীমনাগের সন্দেশ দেখি, তখন দেখি গোচারণের মাঠ। আমার নজরে পড়ে,—পাঁচ হাজার গরু মরিতেছে, এই সেদিন দেখিলাম চাটগাঁয়ে গোমরক হইয়াছে। হয়ত চোখে পড়ে চাযের জমি, সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে জমিজমার আইন-কানুন, আবার ভাবিতেছি রয়্যাল কৃষি কমিশন ইত্যাদি।

এশিয়ার প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা

সেইরূপ বৃহত্তর ভারত বলিলে কেহ বুঝিতেছে মেসপটেমিয়া, ইজিপ্ট, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশ, কেহ বলিতেছে মিশর ও গ্রীসের মাঝামাঝি ক্রীট দ্বীপ, কেহ বলিতেছে মধ্য এশিয়া, কেহ বলিতেছে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ, অথবা শ্যাম, জাপান, কোরিয়া এই সব জায়গায় গিয়া কিছু ঘোঁটমঙ্গল করা। এই রকম ঘোঁটমঙ্গল করিতে আমি অনভ্যস্ত নহি, চীনের প্রাচীর, মিশরের পিরামিড্ সবই আমার 'টপকান' আছে। তেমনি,—

"পাইন-ঢাকা পাহাড়ের পায়ে—
দেউল ভাসছে সাগরে যেথায়
এসেছি নিপ্পণ শিকফের মাঝে
দেউল-দ্বীপ সেই মিয়াজিমায়।"

আপনারা জানেন, জাপানের নারা-হরিউজি জনপদ যখন আমাদের নালন্দার মাপে একটা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিয়াছিল তখন

হরিণ সেথায় মানব-সখা
লাক্ষামোড়া তোরীতলে,
ধানের ক্ষেতে সবুজ সে দেশ
গম্ভীর ধ্বনি সাগর-জলে।"

সে সব ধ্বনিও শুনা কিছু কিছু আছে। এখানে বক্তব্য টো টো করিয়া মিশর জাপান কি কোথাও গিয়া প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করা প্রয়োজন। যেমন সন্দেশ বুঝিতে গেলে গরু, গো-মড়ক, ভেটারিণারি ডাক্তার, গোচারণের মাঠ, জমিজমার আইনকানুন, এগুলি চোখের সামনে রাখা উচিত, তেমনি বৃহত্তর ভারত জিনিষটা বুঝিতে গেলে— সোজাসুজি খোলাখুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝা দরকার—যে প্রথম জরুরিই হইতেছে এশিয়ার নানা দেশে ঘুরাফিরা করা।

দুনিয়ার বাটখারায় ভারতসন্তানকে মাপো

আপনারা জানেন—আমরা যে ফলটাকে "সেও" বলি, তারই আর এক নাম আপেল ফলটা দুনিয়ায় নানা নামে পরিচিত। আমেরিকার কালিফর্ণিয়া প্রদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন হাজির হই তখন দেখি স্যানফ্র্যান্‌সিস্‌কোর চিত্র-প্রদর্শনীতে এক জায়গায় পর্ব্বতপ্রমাণ 'আপেল' সাজান আছে। তার সামনে কল রহিয়াছে, আপেলগুলি ছিটকাইয়া গিয়া একটা জালের ভিতর পড়িতেছে। জালটা পর পর দুই তিন ভাগে বিভক্ত। কোনোটা প্রথম ভাগে গিয়া পড়িতেছে, কোনোটা পরের ভাগে গড়াইয়া পড়িতেছে, ব্যাপার কি? দেখা গেল, যেটা ছোট

সেটা দূরে, যেটা মাঝারি সেটা মাঝখানে আর যেটা বড় সেটা সামনে গিয়া পড়িতেছে। কালিফর্ণিয়ার উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম যেখান থেকেই আপেলগুলি আসুক না কেন, ঐ কলের ভিতর দিয়া ১।২।৩নং ইত্যাদি ভাবে 'গ্রেডেড্' বা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে। আমি বলিতে চাই গোটা দুনিয়ায়ও এই রকম একটা কল আছে। রামা হউক, শ্যামা হউক, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, ভারতবাসী হউক, চীনা হউক, ইংরেজ হউক, জার্ম্মাণ হউক—সকলকে সেই কলের ভিতর দিয়া চলিতে হইতেছে। কাহাকেও বলিতেছি নম্বর ১, কাহাকেও বলিতেছি নম্বর ২, কাহাকেও বলিতেছি নম্বর ৩। অর্থাৎ দুনিয়ায় কখনও কোথাও কেহ বলিতেছে না এটা বাঙালীর মাপের, ওটা জার্ম্মাণির মাপের, সেটা ইংরেজের মাপের বস্তু বা ব্যক্তি। দুনিয়া এক মাপে চলিতেছে; সেই মাপে কেহ শতকরা ৬৫, কেহ ৭৫, কেহ ৮৫ নম্বর পাইতেছে। দুনিয়ার মাপকাঠিতে যখন একদিকে আরিষ্টটল ও অপর দিকে কৌটিল্যকে চড়ান গেল, তখন সেই মাপকাঠিতে আরিষ্টটলকে নম্বর দেওয়া গেল ধরুন ৮৫, কৌটিল্যকে ৬০। আসিল পানিনি তাকে দেওয়া গেল ৯৫, তারপর আসিল আর্য্যভট্ট সে পাইল ৭৫, আসিল নিউটন সে পাইল ৯৫। তারপর বাটখারার একদিকে আমাদের ঔরঙ্গজেব আর একদিকে ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুইকে বসান গেল প্রায় সমান সমান হইল। ধরুন দুজনেই পাইল ৬৫। আসিল শিবাজী আর ফ্রেডরিক দি গ্রেট; দুনিয়ার মাপকাঠি দুজনকেই দিল ৮৫।

নম্বরের সংখ্যাগুলি আপনারা যার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ বসাইতে পারেন। পরীক্ষকের মর্জ্জির উপর এসব চিজ অনেক সময় নির্ভর করে। আমি শতকরা হারটার উপর এখন জোর দিতেছি না। দেখাইতেছি প্রণালীটা মাত্র। এইভাবে দুনিয়া চলিতেছে। প্রাচীন ভারতই হউক, কি বর্ত্তমান ভারতই হউক, চিরকাল দুনিয়ার মাপকাঠিতে তার মাপাজোকা

হইতেছে। বর্ত্তমান জগতের মাপে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া যদি বর্ত্তমান ভারত দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে বুঝিব বৃহত্তর ভারত কায়েম হইয়াছে।

এখন একমাত্র প্রশ্ন, বিশ্বের মাপকাঠিতে কেমন করিয়া ভারতবাসীকে আনিয়া ফেলিতে পারা যায়। অর্থাৎ ইংরেজ, জার্ম্মাণ, জাপানীর সঙ্গে এক মাপকাঠিতে ভারতকে আনিয়া ফেলিবার সুযোগ আমরা সৃষ্টি করিতে পারি,কি পারি না—তাহাতেই বুঝা যাইবে আমাদের মাথার দৌড় কতখানি, মগজে ঘি কতখানি। জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইতালিয়ান, মার্কিণ, জাপানী ও ইংরেজের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে এমন কতকগুলি লোক যদি এদেশে দাঁড়াইয়া যায় তবে বাস্তবিকপক্ষে বাংলাকে এবং বাংলার বাহিরের বিশাল ভারতকে বৃহত্তর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে। তাহা করিবার জন্য দুটা খুঁটা উল্লেখ করিব।

চাই বিদেশে ভারতীয় মোসাফির

প্রথমতঃ—ভারতবর্ষের বাহিরে জাপান, জার্ম্মণি, বিলাত, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভারতবাসীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা দরকার। সকলেই অবশ্য প্রত্নতত্ত্বের সওদা লইয়া যাইবে না, জীবনতত্ত্বের তেজারতি করে এমন অনেক লোক বাংলা দেশে ও বাংলার বাহিরে আছে, তাহারা মাল ও মজুর আমদানী রপ্তানি করিবে। এখানে বলিয়া রাখিতে চাই যে, হাজার হাজার মজুর ভারতবর্ষের বাহিরে না গেলে ভারতমাতা শীঘ্রই মহাবিপদে পড়িবেন —একথা সকলের জানা উচিত। সমস্ত পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, আমাদের দেশেরও বাড়িতেছে, কাজেই দক্ষিণ আফ্রিকা হউক, আমেরিকা হউক, কানাডা হউক, ফিজি হউক, মাদাগাস্কার হউক, মরিশস হউক,

সর্ব্বত্র আমাদের দেশের লোক যাইবেই যাইবে—যদিও আইন রহিয়াছে তাহার বিরোধী। সংসারটা যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে আমাদিগকে ফেলিয়া ওদের ধনসম্ভার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

আমরা যতই স্বদেশী আন্দোলন চালাই না কেন, বিলাতকে কখনই মারিয়া ফেলিতে পারিব না, খুব জোর ওদের ধুতি ছাড়িয়া দিব. খদ্দর চালাইব, আমেদাবাদ কি বোম্বাইয়ের মিলের কাপড় পরিব, বাংলা দেশেই বাঙ্গালীর কাপড়ের কল গড়িয়া তুলিব, কিন্তু যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক মাল ইত্যাদি চিজ ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণি থেকে আনিতে হইবেই হইবে। দেখিতে পাইতেছি, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী আর চলিতেছে না, মফঃস্বলের জেলায় জেলায় ৪০।৫০।৫৫ খানা করিয়া মোটরলরী চলিতেছে। তার মানে এই যে—যতই আমরা স্বদেশী হই না কেন, বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনিতেই হইবে। তেমনি আমেরিকা, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, ফিজি, মাদাগাস্কার, যতই আমাদের শত্রু হউক না কেন, ভারত-সন্তান হিন্দু মুসলমান ওদের দেশে যাইবেই যাইবে। এই সকল বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার ভারতসন্তান যদি যাইতে পারে তাহা হইলে বুঝিব বাস্তবিক আমরা বৃহত্তর ভারত কায়েম করিয়াছি। কেহ যাইবে ফটোগ্রাফার ভাবে ছবি তুলিয়া আনিতে, কেহ যাইবে মাল বাছাই করিয়া লইয়া আসিতে ইত্যাদি। কেহ যাইবে কলকব্জা, ঔষধপত্র দাওয়াই আনিতে। ভারতের ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য অনেক ডাক্তারকে বিদেশে অভিযান চালাইতে হইবে, কেহ কবি, কেহ লেখক, কেহ সংবাদপত্রের সম্পাদক, কেহ ইস্কুলমাষ্টার, কেহ ধর্ম্ম প্রচারক, কেহ বা চাষী, কেহ বা মজুর, এই ধরণের লোক বিদেশে মোসাফিরি করিবে। একমাত্র স্কুল মাষ্টার বৃহত্তর ভারতের অধিবাসী নয়, একমাত্র প্রত্নতত্ত্ববাগীশ পণ্ডিত বৃহত্তর ভারতের প্রজা নয়। যারা হাল চালায়,

যারা মুচী, মেথর, গাড়োয়ান, দারোয়ান যত রাজ্যের যত রকম লোক থাকিতে পারে সকলকে ১৯২৬ সালের পর থেকে ভারতের বাহিরে দুনিয়ার সকল দেশে পাঠানই বৃহত্তর ভারতের অন্যতম প্রধান খুঁটা।

চাই ভারতে বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা

দ্বিতীয়তঃ—আগেই বলিয়াছি, যেখানে আপনারা দেখেন সন্দেশ, সেখানে আমি দেখি গরু, গোচারণের মাঠ। এই যে বক্তারা বলিয়াছেন —শ্যাম ব্রহ্মদেশ, কুচা খোটান, সুমাত্রা জাভা, চীন জাপান ইত্যাদি দেশের সঙ্গে মিতালি পাতান হইবে, তার মানে সোজাসুজি এই, ঘরে বসিয়া বাংলা দেশে থাকিয়া আমাদিগকে চীনা ভাষা, জাপানী ভাষা, শ্যাম দেশের ভাষা, তিব্বতী ভাষা ইত্যাদি নানা এশিয়ান ভাষা শিখিতে হইবে। তারপর জার্ম্মান ভাষা, ইতালীয় ভাষা, ফরাসী ভাষা, ওলন্দাজ ভাষা, এসবগুলিকে আমাদের কব্জার ভিতর আনিয়া হাজির করিতে হইবে। এই সব ইয়োরোপীয়ান ভাষায় এশিয়ার নানা দেশের একাল-সেকাল সম্বন্ধে ভাল খবর পাওয়া যায়। সব বাঙ্গালীকেই যে বসিয়া বসিয়া ভাষা মুখস্থ করিতে হইবে তা নয়। জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের হাজার হাজার সন্তান বিদেশী ভাষায় পণ্ডিত হয় না। সম্প্রতি গোটা ভারতের কথা বলিতেছি না, এই বাংলা দেশে আজ থেকে তিন বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ১০০ জন লোক চাই,—এই সকল লোক বাংলা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ছড়াইয়া থাকা চাই,—যারা কেহ জার্ম্মাণ ভাষায়, কেহ ওলন্দাজ ভাষায়, কেহ রুশ ভাষায়, কেহ ইতালিয়ান ভাষায়, কেহ ফরাসী ভাষায়, কেহ জাপানী ভাষায় দক্ষতাওয়ালা লোক হইয়া বসিবে। তার ফল দাঁড়াইবে এই,—প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাসে ঐ সকল ভাষায় মাসিক ত্রৈমাসিক প্রভৃতি কাগজে যে সকল খবরাখবর বাহির হয় তাহা দিয়া তাহারা জননী বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবে। তাহাতে

একদিকে ভারতবর্ষের চৌহদ্দি বাড়িয়া যাইবে, অন্যদিকে আত্মিক হিসাবে, আধ্যাত্মিক হিসাবে, উৎকর্ষের হিসাবে, ভারত মাতাকে গভীরতর করিয়া তোলা হইবে।

বিগত একশ বছরের শিক্ষার ফলে আমরা কেহ শেকস্‌পীয়ারের এক ছটাক, আইনষ্টাইনের আধ তোলা, প্যাস্তুরবেয় দেড় কাঁচ্চা রস লইয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছি, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানে হাজার হাজার লোক ভারতের বাহিরে পাঠান যাইবে কিনা জানি না। ছাত্র হিসাবে দু'চার পাঁচশ' জন গেলেও যাইতে পারে। তাতে আমি যে ধরণের বৃহত্তর ভারতের কথা বলিতেছি, সেই গভীরতর বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিবে না! ইংরেজী সাহিত্য, ইংরেজী বিজ্ঞান ও ইংরেজের উৎকর্ষের সাহায্যে এই বাংলা দেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে বৃহত্তর ভারত আমরা কায়েম করিতে বসিয়াছি তাহাতে কি আমরা একমাত্র ইংরেজের রসের রসিক হইব। ফরাসী, জার্ম্মাণ, রুশ, ইতালিয়ান, ওলন্দাজ ভাষায় যে সম্পদ রহিয়াছে সেই সম্পদ বাংলার সমাজে, যুক্ত প্রদেশে, মাদ্রাজে, পাঞ্জাবে, গুজরাটে বিতরণ করিবার দায়িত্ব আমরা লইব কি না ইহাই প্রশ্ন।

ব্যবসার জন্য বিদেশী ভাষা দরকার

একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। জাপানী ভাষা দখল না করিলে আমাদের যাহাদের তেজারতি কারবার রহিয়াছে তারা আর বেশী দিন জাপানের সঙ্গে পাঞ্জা কষিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। জাপান ভারতবর্ষকে যেমন করিয়া চুমরিয়া লইতেছে—বাঙালী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, গুজরাটী তেমন করিয়া জাপানকে চুমরিয়া লইতে পারিতেছে না। তার কারণ ১৯০৫ থেকে ১৯১০, ১৯১০ থেকে ১৯১৫ এবং এই শেষ ১০।১১ বৎসর

প্রতি বৎসর জাপান দলে দলে লোক ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছে তাহারা কলিকাতায় বসিয়া থাকে না, তাহারা লাহোর, অমৃতসর, পুনা সর্ব্বত্র মুল্লুকে মুল্লুকে মফঃস্বলের পাড়াগাঁয়ে টিকৃটিক্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভারতবর্ষের রস লইয়া গিয়া জাপানকে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। আজকাল জাপানীরা ইংরেজদের পরে সব চেয়ে আমাদের বড় খরিদ্দার। কোন কোন বিষয়ে ইচ্ছা করিলে জাপান আমাদিগকে কুপোকষা করিয়া মারিতে পারে। যদি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে আমাদের লড়িতে হয় তাহা হইলে জাপানী ভাষায় দখলওয়ালা লোক হইতে হইবে। সেইরূপ জার্ম্মাণির ভাষা দখল না করিলে, আমাদের যারা ব্যবসা চালাইতেছে, যন্ত্রপাতি আমদানি করিতেছে, পাট তূলা প্রভৃতি মাল রপ্তানি করিতেছে তারা বৃহত্তর ভারতের কর্ম্মক্ষম প্রজা হইতে পারিবে না। ইতালী ও ভারতে বাজারে কুলিরা উঠিতেছে।

চাই বিশ্বশক্তির ভারতীয় জহুরী

বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে হাজার হাজার লোক ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে পাঠাইতে হইবে আর জেলায় জেলায় বড় বড় শহরে বিভিন্ন দেশের ভাষা প্রচার করিবার ব্যবস্থা করতে হইবে। এ সব করিয়া তুলিতে পারিলে তবে আমাদের ভারতের নানা ঠাঁইয়ে এক আন্তর্জ্জাতিক কারখানা বা যন্ত্র বা বাটখারা বা মাপকাঠি দাঁড়াইয়া যাইবে। প্যারিস, বার্লিন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি শহরে ভারতের গম তূলা রপ্তানী হইলে ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ ঠিক করিয়া দেয় কার কিম্মৎ কতখানি। কলিকাতার বাজারে এমন কোন বাটখারা বা যন্ত্রপাতি আছে কি যার সাহায্যে কোনো বিদেশী মাল দেখিবামাত্র বলিয়া দেওয়া সম্ভব কোন জিনিষের কিম্মৎ কতখানি? নাই ; গোটা ভারতে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই যা জার্ম্মাণি বা ফরাসী দেশ

থেকে কোনো জিনিষ আসিলে বলিয়া দিতে পারে তার কিম্মৎ অতটা। বিশ্বশক্তির পরীক্ষক বা জহুরী ভারত সন্তানদের একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। আমাদের মধ্যে এমন মাথা জন্মায় নাই যে বলিয়া দিতে পারিত আইনষ্টানের আবিষ্কারের দাম শতকরা ৬৫ কি ৮৫। সে ক্ষমতা আমাদের একটু একটু করিয়া হইতেছে যথার্থরূপে বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা হইলে পরে ভারতের ডিহিতে ডিহিতে আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক মাল-বিনিময়ের এমন সব বাজার দাঁড়াইয়া যাইবে যার দালালেরা টকাটক বলিয়া দিতে পারিবে কোন্ ফরাসীর কিম্মৎ কতখানি, কোন্ জার্ম্মাণের দর কতটা ইত্যাদি। তখন দুনিয়া বুঝিবে যে বৃহত্তর ভারত কেবল অতীতের ঐতিহাসিক বস্তু মাত্র নয়। বুঝিবে যে, কালিদাসের আমলে যেমন কুমার-জীব বিশ্বশক্তি মন্থন করিবার জন্য মধ্য এশিয়া ও চীন প্রবাসে গিয়াছিল সেইরূপ আজ বিংশশতাব্দীর যুগেও বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া দুনিয়ার ব্যবসা-বিজ্ঞান-বিচার-ব্যবস্থায় ভারতের চৌহদ্দি বাড়াইয়া দিবার মতন গণ্ডা গণ্ডা লোক বাংলাদেশেও পয়দা হয়।

বাড়তির পথে বাঙ্গালী

১। কাউন্সিল বাছাইয়ের খর্চ্চা

"কাউন্সিল" আর "অ্যাসেম্ব্লি" এই দুই সরকারী রাষ্ট্রসভায় জনগণের প্রতিনিধিরূপে গিয়া বসিবার জন্য আজকাল বাংলাদেশে কম সে কম তিনশ' লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন (১৯২৬)। হরদম চলিতেছে যাওয়া-আসা, রেলে, ষ্টীমারে, নৌকায়, উটে, গরুর গাড়ীতে, ঘোড়ার গাড়ীতে, অটোমোবিলে। আর চলিতেছে বচসা, বিতণ্ডা, হাতে মাথা কাটাকাটি আর "চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার।" এই দোষের দিক্‌টায় নজর দিবার দরকার নাই। কিন্তু "আর্থিক উন্নতি"র পক্ষে "যাওয়া আসা" কাণ্ডটা ফেলিয়া দিবার চিজ নয়। ইহার জন্য লাগে "রূপচাঁদ"। রাহা-খরচ আছে, সেলামি আছে, "মিষ্টিমুখ" আছে। তাহা ছাড়া আরও অনেক-কিছু আছে, যাহার জন্য দরকার হয় দক্ষিণা—পাণ্ডাদের প্রদত্ত "সুফল" অথবা ঐ জাতীয় মালের মূল্য।

আমরা যে শাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকি তাহার আসল কথাই হইতেছে কেনা-বেচা। "ভোট" তো আর সৃষ্টি-ছাড়া সামগ্রী নয়। ভোটেরও কেনা-বেচা সম্ভব। যখন স্বর্গলাভ বা নরক-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত কেনা-বেচার মামলায় আসিয়া ঠেকিতে পারে, তখন রাষ্ট্র-সভায় মাতব্বরি করিবার অধিকার, পদগৌরব বা ক্ষমতা, কেনা-বেচার বাহিরে থাকিবে কি করিয়া? ভোটেরও "হাট"-"বাজার" আছে।

আমাদের শ'তিনেক বাঙালী বন্ধুরা কে কত খরচ করিলেন তাহা সম্প্রতি আন্দাজ করিতে বসিয়া লাভ নাই। কেননা সরকারের কানুন আছে যে, এই সব বাছাইয়ের খরচপত্র প্রত্যেককেই গবর্মেণ্টের নজরে আনিতে হইবে। আর তখন দেশশুদ্ধ লোক তাহা জানিতে পারিবে।

অবশ্য সকল খরচই যে প্রত্যেকে অতি সুবোধ বালকের মতন বলিয়া দিবেন এরূপ বিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু মোটের উপর অনেকটা ধরিতে পারিব। বুঝা যাইবে, বাছাই-ব্যবসায় খর্চ্চা লাগে কত।

বাজে খরচ না ভাবুকতা

রাষ্ট্র-সভায় প্রতিনিধি হইবার জন্য বাঙালীরা টাকা খরচ করিতেছে, ইহা সুখের কথা। বুঝিতেছি যে,—"ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার" মতন লোক বাংলায় দেখা দিতেছে; আর তার জন্য টাকা ঢালিবার উন্মাদনাও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বাঙালী-চরিত্রে বোধ হয় এই একটা নয়া বিশেষত্ব। অন্ততঃ ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে এই বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যাইত না। যদিও বা দেখা যাইত, তাহা মাত্র দু'দশ জন লোকের ভিতর আবদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ ১৯২৬ সনে দেখিতেছি বাংলার প্রত্যেক জেলায়ই গণ্ডা গণ্ডা লোক এইরূপ "বাজে খরচের" নেশায় মাতোয়ারা।

অনেকে হয়ত এই খরচপত্রকে অপব্যয় বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু আমরা ইহাকে ভাবুকতার অন্যতম নিদর্শনরূপে সমাদর করিতে চাই। ইহাতে নিত্য-নৈমিত্তিক হাঁড়ীকুড়ি ডালচালের সীমানা ছাড়াইয়া খর্চ্চে লোকগুলাকে খানিকটা সূক্ষ্মতর সুখভোগের রাজ্যে চরিয়া বেড়াইবার সুযোগ দেয়। নিজের কথা আর নিজ পরিবারের কথা না ভাবিয়াও মানুষ যে দুই দণ্ড, দুই সপ্তাহ, দুই মাস কাটাইতে পারে আর তাহার জন্য টাকা ঢালিতে পারে, তাহা আমরা বাঙালীরা পূর্ব্বে বড় একটা জানিতাম না। বাছাইয়ের উপলক্ষে বাঙালী সমাজে এক অভিনব আদর্শ-নিষ্ঠা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি।

পারিবারিক খরচের নয়া দফা

সরকারী রাষ্ট্র-সভা অথবা বে-সরকারী কংগ্রেস-কনফারেন্স ইত্যাদির জন্য খরচপত্রকে আমরা বাজে খরচ বিবেচনা করি না। অবশ্য মাত্রাটা কবে কখন কোথায় গিয়া ঠেকে, তাহা যথা সময়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি দেখিতেছি এই পর্য্যন্ত যে, দেশের নামে অথবা দেশ-সেবার গন্ধের জন্য আমাদের উচ্চশিক্ষিত অথবা সম্পন্ন লোকেরা পয়সা খরচ করিতেছেন। ইহা সুলক্ষণ।

"আর্থিক উন্নতি"র তরফ হইতে আর একটা কথা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। পয়সা খরচ করিবার নতুন নতুন কতকগুলা উপলক্ষ্য বাঙালী (এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়) সমাজে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। আড়কাঠি বাহাল না করিলে ভোটের বাজারে সওদা করা চলে না। একমাত্র চরিত্রের জোরে কি বিদ্যার জোরে অথবা কর্ম্মদক্ষতার জোরে স্বয়ং ভগবানও কোনো মানব-সমাজে ভোট পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন কিনা সন্দেহ। ক্বচিৎ কখনো দু'এক ক্ষেত্রে একমাত্র গুণের শক্তিতেই ভোট টানিয়া আনা অসম্ভব না হইতেও পারে। কিন্তু সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই চাই গলাবাজি, কলমের জোর, কথা কাটাকাটি, আর তার জন্য লেখক ও বক্তা জাতীয় ডজন ডজন লোকের গতিবিধি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল লোকের "খোর পোষ" জোগানো ভোটপ্রার্থীর পক্ষে আবশ্যক। অর্থাৎ নিজ খাই খরচের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল খরচ বাঙালী সমাজে পারিবারিক জীবন-যাত্রার অন্যতম অঙ্গে পরিণত হইতেছে। ১৮৯৫—১৯০৫ সনের বাঙালী জীবন-যাত্রায় আর ১৯২৬ সনের বাঙালী জীবন-যাত্রায় এই এক প্রভেদ।

বুঝিতেছি যে, বাংলায় "কনজাম্পশ্যন্" নামক ধনবিজ্ঞানের পারিভাষিক

ভোগ-বস্তুটা আকারে ও প্রকারে বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা নয়া নয়া দফায় খরচ করিতে শিখিতেছি। কেবল শিখিতেছি মাত্র নয়,—খরচ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত আছে। সোজা কথায় ইহার নাম "ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিহ্বিংয়ের" (জীবন-যাত্রা প্রণালীর) বহর-বৃদ্ধি। যে যে ব্যক্তি অথবা যে যে পরিবার এই সকল নতুন দফায় টাকা পয়সা ঢালিতে সমর্থ, তাঁহারা তাঁহাদের বাপ-দাদাদের চেয়ে উচ্চতর আর্থিক ধাপে জীবন চালাইতেছেন।

এই সকল খরচপত্র বাড়ানো সম্ভবপর হইতেছে কোথা হইতে? সকলেই যে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"-নীতির ধুরন্ধর এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আর কোনো কোনো ভোটপ্রার্থী যে অন্যান্য দফায় খরচ কমাইতে বাধ্য হইয়াছেন এরূপ সংবাদও পাওয়া যায় নাই। মোটের উপর, অন্যান্য সাংসারিক খরচপত্রের উপরই এইটা বাড়্তি খরচ।

অন্যান্য খরচও কমে নাই আর কর্জ্জ করিয়া ভোট কেনাও চলিতেছে না,—এই যদি অবস্থা হয় তাহা হইলে টাকা-পয়সা আসিতেছে কোথা হইতে? জবাব সোজা।

বুঝা উচিত যে, নিজ নিজ আয় হইতেই খরচ চলিতেছে। যাঁহাদের নিজ ট্যাঁকে পয়সা নাই, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন হয় বন্ধুবান্ধব, না হয় সভা-সমিতি, এক কথায় "দেশের" লোক।

যে পথেই টাকা আসুক না কেন, টাকাটা আসিতেছে ইহাই ধন-বিজ্ঞানের তথ্য। অতএব যদি কেহ বলেন যে, অন্ততঃপক্ষে ভোট-প্রার্থীদের দলে বা সমাজে আয়ের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে তবে তাহাতে সন্দেহ করা কঠিন। গোটা বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের ভিতর কতটা উন্নত হইয়াছে তাহা একমাত্র এই তথ্যের জোরে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাঙ্গালী সমাজের কোনো কোনো

অংশে সম্পদ-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এইরূপ অনুমান লইয়া চিন্তাক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা যুক্তিহীন হইবে না।* দেশের দারিদ্র্য-সমস্যা আলোচনা করিবার সময় এই কথাটা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

ভোট-প্রার্থীদের ইস্তাহার

আমরা ভোট-প্রার্থীদের ইস্তাহার অনেক পড়িয়া দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া দৈনিকে সাপ্তাহিকে তাঁহাদের সপক্ষে বিপক্ষে নানা তথ্য পাইয়াছি। দলাদলির যা-কিছু দস্তুর তাহার কিছুই আমাদের সংবাদ-সাহিত্যে বাদ পড়িতেছে না। কিন্তু এই দুই মাস ধরিয়া যে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে তাহার ভিতর যেন কাজের কথা প্রচুর পরিমাণে বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

কোনো দলের সপক্ষে বিপক্ষে মতামত ঝাড়া আমাদের মতলব নয়। কিন্তু এ কথাটা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, স্বরাজ-স্বাধীনতা শব্দটার বানান, উচ্চারণ ও ব্যাখ্যা এবং হিন্দু-মুসলমান দুনিয়ার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল-অ্যাসেম্‌ব্লির একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়। এই দুই বিষয় বাদ দেওয়া উচিত আমরা এরূপ বলিতেছি না, বলিতেছি এই যে,—পাঁচ কোটি বাঙ্গালী নরনারীর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ভিতর আরও অনেক কিছু আছে। সেই সকল চিজ ভোট-প্রার্থীদের ইস্তাহারে পাওয়া কঠিন। তাঁহারা দেশের লোকের "প্রতিনিধি" কিনা অনেক ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ করা চলে।

চাষী-মজুর-কেরাণীর স্বার্থ

"আর্থিক উন্নতি"র চোখে এই ইস্তাহারগুলার কিছু সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। খুঁটিয়া খুঁটিয়া দফায় দফায় সকল কথা বলিবার ইচ্ছা

* "ত্যাদড়ের দর্শন" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নাই। কিন্তু দেখিতেছি, দেশের পল্লীতে পল্লীতে চাষীরা নতুন নতুন কথা শুনাইতেছে। তাহাদের বাণী ইস্তাহারে ইস্তাহারে ঠাঁই পায় নাই কেন? মজুরদের সুখ-দুঃখও আজকাল সমাজের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মূর্ত্তি পাইয়া উঠিতেছে। তাহাদের কথা ইস্তাহারগুলায় শুনিতে পাইলাম না কেন? দেশের লোক খাইতে পাইতেছে না বলিয়া চীৎকার করিতেছে। এই চীৎকারের প্রতিধ্বনিও ইস্তাহার-সাহিত্যে বিরল কেন? এই সকল এবং অন্যান্য এই শ্রেণীর বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত থাকা সম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যপ্রণালী থাকাও সম্ভব। সেই সকল মত এবং কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন দলেরও প্রাণস্বরূপ। কিন্তু কাগজে এই সকল বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হইল কৈ?

আর্থিক আইন-কানুন

আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। কাউন্সিল-অ্যাসেম্‌ব্লির আসল কাজ হইতেছে আইন-কানুন তৈয়ারী করা। আর এই আইন-কানুনের বার আনা চৌদ্দ আনা অংশ হইতেছে ধনদৌলত-সম্পর্কিত। বহির্ব্বাণিজ্য-অন্তর্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা কায়েম করা এই সকল আইন-গঠনের অন্তর্গত। রেলের আইন, জাহাজের আইন তাহাদের অন্যতম। ফ্যাক্টরি-কারখানার শাসন-পরিচালনা এই সব আইনেরই অধীনে চলিয়া থাকে। গো-জাতির উৎকর্ষবিধান, খাঁটি গো-দুধের ব্যবস্থা, পল্লী-শহরের স্বাস্থ্যোন্নতি ইত্যাদি সবই শেষ পর্য্যন্ত কাউন্সিল-অ্যাসেমব্লিতে আইন-সৃষ্টির উপর নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ে বাংলার যে যে "জন-নায়ক" অথবা রাষ্ট্রীয় দল বিশেষ কোনো মত পোষণ করেন না অথবা দেশবাসীকে কোনো আন্দোলনের সপক্ষে মত পোষণ

করিতে সাহায্য করেন না, তাঁহারা কাউন্সিল-অ্যাসেম্ব্লিতে যাইবার অযোগ্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আজকাল কয়েকটা বড় বড় সমস্যা সরকারী রাষ্ট্র-সভায় আলোচিত হইবার কথা। সরকারকে ভারতীয় নরনারীর ট্যাক্‌স দিবার ক্ষমতা কতখানি আছে, এই বিষয়ে সরকারী তদন্ত হইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধে বাঙালী ভোট-প্রার্থীদের মতামত কি তাহা তাঁহাদের ইস্তাহারে এবং নিজপক্ষীয় কাগজে আলোচিত হওয়া দরকার। এই বিষয়ে স্পষ্ট কর্ম্মপ্রণালী এবং আইনের খসড়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। বিদেশী মূলধনের সাহায্যে দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উপকার কতটা সাধিত হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে কিরূপ আইন গঠিত হওয়া উচিত, এই সকল বিষয়ও ইস্তাহারে ইস্তাহারে বিবৃত হওয়া উচিত। ভারতের সঙ্গে বিদেশের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে সকল ক্ষেত্রেই শুল্ক-নীতির বশবর্ত্তী করিয়া রাখা উচিত কিনা সেই সম্বন্ধে ভোট-প্রার্থীদের মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। মুদ্রা-সংস্কারের জন্য "রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক" গঠিত হইবার কথা উঠিয়াছে। এই বিষয়ে ভোট-প্রার্থীরা কে কি বুঝেন ও ভাবেন তাহাও দেশবাসীকে জানানো তাঁহাদের কর্ত্তব্য। আজকাল কৃষি-কমিশন বসিয়াছে। কৃষির উন্নতির জন্য কোন্ ভোট-প্রার্থী গভর্মেণ্টকে কিরূপ আইন তৈয়ারী করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাও দেশের লোক জানিতে অধিকারী।

ফরাসী আইনে আর্থিক ব্যবস্থা

মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে আইন-কানুনের যোগাযোগ অতি নিবিড়। মাস মাস ফ্রান্সে যে সকল আইন জারি হয় তাহার তালিকা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। জুন মাসে ২৩টা আইন জারি হইয়াছে

(১৯২৬)। একটার দ্বারা দিয়াশলাইয়ের কারখানায় মারাত্মক হল্‌দে ফস্‌ফেট ব্যবহার করা তুলিয়া দেওয়া হইল। এই বিষয়ে একটা আন্তর্জ্জাতিক সমঝৌতা ছিল। এতদিনে ফ্রান্স কাগজে কলমে সেই সমঝৌতা স্বীকার করিল। পেট্রোলিয়ম তেল সম্বন্ধে একটা আইন জারি হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের উপর কর বসাইবার জন্য প্যারিস শহরকে একতিয়ার দেওয়া হইল একটা আইনের দ্বারা। ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং গ্রেট্ বৃটেনের সঙ্গে উড়ো জাহাজের চলাচল লইয়া একটা বুঝা-পড়া সহি হইয়াছিল মে মাসে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আকাশপথে মাল আমদানি-রপ্তানির নিয়মও স্থিরীকৃত হয়। এক্ষণে এই দুই বিষয়ে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এক আইন জারি করিলেন। বিভিন্ন উপনিবেশ সম্বন্ধে চারটা আইন জারি হইয়াছে। বিলাসের সামগ্রী কাহাকে বলা হইবে তাহার ব্যবস্থা করা এক আইনের উদ্দেশ্য। রপ্তানির উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছে এক আইনের সাহায্যে। গবর্মেণ্ট কোনো কোনো কোম্পানীকে অ্যালকহল তৈয়ারী করিবার একতিয়ার বিক্রী করিয়াছেন। তাহার দর-দস্তুর নির্দ্ধারিত হইয়াছে এক আইনে। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় আট ঘণ্টার রোজ কায়েম করা এক আইনের উদ্দেশ্য।

ফ্রান্সে কৃষি-দৈব কানুন

শিল্প-কারখানার কাজ করিতে করিতে দৈবক্রমে মজুরদের কোনো অনিষ্ট ঘটিলে তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য অন্যান্য উন্নত দেশের মতন ফ্রান্সেও আইন আছে। কিন্তু কৃষি-ক্ষেত্রের মজুরদের জন্য "দৈব"-কানুন ছিল না। ১৯২২ সনের শেষের দিকে কৃষি-মজুরদের জন্যও দৈব-কানুন জারি হয়। সম্প্রতি,—১৯২৬ মে মাসে,—সেই কানুনের কতকগুলা অসম্পূর্ণতা সংশোধিত করা হইয়াছে। কোনো কোনো বিষয়ে

আইনটা অস্পষ্ট ছিল। কোনো কোনো দফার পরিবর্ত্তনও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া একটা নতুন কৃষি-দৈব কানুন জারি করা হইল।

আর্থিক জীবন বিষয়ক ফরাসী আইন

বিগত মে মাসের ভিতর ফ্রান্সে ১৩টা বিভিন্ন আইন জারি হইয়াছে। এই গুলার ভিতর পাঁচটা আল্‌জিরিয়া প্রদেশ সম্বন্ধে। আলজিরিয়া আফ্রিকায় অবস্থিত বটে। কিন্তু ফরাসীরা এই প্রদেশকে "কলোনি" বা উপনিবেশ বিবেচনা করে না। ফ্রান্সেরই একটা জেলা রূপে আল্‌জিরিয়ার শাসন চলিয়া থাকে। খাঁটি উপনিবেশ-বিষয়ক আইন ছিল দুইটা। মজুরদের স্বার্থে আইন জারি হইয়াছে দুইটা। দুইটা আইন রাজস্ব-বিষয়ক। ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কর আদায় করিবার কর্ম্মপ্রণালী এক আইনের বিষয়। আল্‌জিরিয়ায় বিদেশীদের অস্থাবর সম্পত্তির উপর কর বসানো অন্য আইনের উদ্দেশ্য। খুচরা দোকানদারদিগকে আট ঘণ্টার রোজ পালন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে তৃতীয় আইনের সাহায্যে। খাদ্যদ্রব্যের বিক্রেতারা এই আইনের আওতায় আসে না। খনির কাজে যে সব মজুর বাহাল আছে মালিকদিগকে তাহাদের আপদবিপদে আশ্রয়-সাহায্য জোগাইতে বাধ্য করা হইয়াছে অন্য এক আইনের জোরে।

ফরাসী পার্ল্যামেণ্টের কাজকর্ম্ম

বড় বড় দেশের লোকেরা পার্ল্যামেণ্টে বসিয়া কোন্ কোন্ বিষয় আলোচনা করে তাহার হিসাব রাখা আমাদের পক্ষে মন্দ নয়। ফরাসী "শাঁবর দে দেপুতের" (পার্ল্যামেণ্টের) দুই মাসের কার্য্য-বিবরণী হইতে

তাহার কিছু-কিছু মালুম হইবে। ১৯২৬ সনের মে-জুন মাসে 'শাঁবরের' প্রতিনিধিদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়ে মাথা ঘামাইতে হইয়াছে। (১) অস্থায়ী কর্জ্জগুলাকে স্থায়ী কর্জ্জে পরিণত করা ছিল তাঁহাদের এক ধান্ধা। (২) মজুরদের দৈব আলোচনা করা আর তাহার প্রতীকারকল্পে চিকিৎসার এবং ওয়ুধপত্রের খরচ জোগানো আর এক ধান্ধা। তাহা ছাড়া, (৩) পেট্রোলিয়ম তেলের উৎপত্তি ও বিক্রয় সম্বন্ধে শাসন, (৪) নাইট্রোজেন তৈয়ারী করিবার কারখানা সম্বন্ধে আইন জারি করিবার ব্যবস্থা, (৫) গরিবদের জন্য সস্তায় ঘরবাড়ী তৈয়ারী করা, (৬) চাষ-আবাদের মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে চুক্তি চালাইবার ক্ষমতা, (৬) সওদাগরি জাহাজে বিদেশী মজুর নিয়োগ, (৮) বার্দ্ধক্য-বীমা, (৯) ব্যাধি-বীমা, (১০) বিদেশী মালের প্রভাব হইতে দেশের বাজারকে রক্ষা করা, (১১) কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক সঙ্ঘ, (১২) রাজস্বে সমতা-বিধানের ব্যবস্থা, (১৩) মুদ্রার মূল্যের স্থিরতাসাধন, (১৪) নূতন নূতন সরকারী আয়ের পথ আবিষ্কার, (১৫) কারখানায় কাজ করিতে করিতে মজুরদের অনিষ্ট ঘটিলে তাহার জন্য দায়িত্ব কাহার? (১৬) পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী ব্যাঙ্ক, (১৭) খনির মজুর, (১৮) পারস্পরিক সাহায্য-সঙ্ঘ নামক সমবায়-নিয়ন্ত্রিত সমিতির কার্য্য-প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে ফরাসী পার্ল্যামেণ্টে বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। দেখা যাইতেছে, আর্থিক জীবন লইয়া মাতামাতি করা শাঁবরের সভ্যদের প্রধান কাজ।

রাষ্ট্র-শক্তির আর্থিক সদ্ব্যবহার

রাষ্ট্র একটা বিপুল যন্ত্র। লোকহিতের বাহনস্বরূপ এই যন্ত্রকে যখন-তখন অস্বীকার করিয়া চলা উচিত নয়। বস্তুতঃ, রাষ্ট্র-যন্ত্রকে ভারতবাসীর কব্‌জায় আনা চাই-ই চাই। কিন্তু রাষ্ট্রকে হাতিয়ারের

মত ব্যবহার করিতে হইলে পাকা কারিগর হওয়া আবশ্যক। আর্থিক হিসাবে দেশকে বড় করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্রকে কত উপায়ে নিজের কব্জায় আনা সম্ভব, সে সম্বন্ধে বাঙালী স্বদেশ-সেবকগণ এখনো বেশ সজাগ হইয়া উঠেন নাই। রাষ্ট্র-শক্তির আর্থিক সদ্ব্যবহার করিতে হইলে বাঙালীর পক্ষে যে-যে নূতন-নূতন যোগ্যতা অর্জ্জন করা আবশ্যক, সেই সকল যোগ্যতা ১৯২৬ সনের বাংলায় বেশী দেখা গেল না। সেই যোগ্যতা বাড়াইবার এবং সমাজের নানা স্তরে ছড়াইবার সুযোগ সৃষ্টি করিবার জন্য বর্ত্তমান হিড়িকে প্রস্তুত হইতে শিখিলে আমরা ১৯৩০ সনের জন্য উপযুক্ত হইতে পাবিব।

চাই বিভিন্ন আর্থিক নীতি

ক্বচিৎ কোনো কাগজে দু'একটা আথিক বক্তৃতা ছাপা হয় নাই সে কথা বলিতেছি না। কোনো কোনো ইস্তাহারে চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের নাম করা হয় নাই তাহাও বলিতেছি না। বলিতেছি এই যে,—বাংলা-দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য পুষ্ট করিবার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে চাষী-মজুর-কেরাণীর অন্ন-কষ্ট, জল-কষ্ট, স্বাস্থ্য-কষ্ট, শিক্ষা-কষ্ট ঘুচাইবার জন্য কোন ব্যক্তি বা কোন্ দল কিরূপ আইন তৈয়ারী করিতে বা করাইতে প্রস্তুত আছেন, সেই কথাটা কোথায়ও বড় একটা জমিয়া-মজিয়া উঠে নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় দলের একটা আর্থিক নীতি এবং কর্ম্মকৌশল থাকা আবশ্যক। আর কাগজে কাগজে সভায় সভায় সেই সম্বন্ধে বিপুল আন্দোলন চাই। তাহা যতদিন না দেখিতেছি ততদিন ভোট-প্রার্থী-দিগকে এবং দলগুলিকে আর্থিক হিসাবে দেশের লোকের যথার্থ প্রতিনিধি বলিতে পারিবনা। অবশ্য আর্থিক মত এবং আথিক কর্ম্ম-প্রণালী থাকিলেও "কাউন্সিল- অ্যাসেম্ব্লি"তে সেই সব কাজে পরিণত করিবার

সুযোগ বা ক্ষমতা পাওয়া যাইবে কিনা সে কথা স্বতন্ত্র। ১৯২৬ সনের বাছাই-কাণ্ডের আন্দোলনটা দেখিয়া যুবক বাঙলা ভবিষ্যতের জন্য স্বদেশ-সেবার কর্ম্মপ্রণালী ঢুঁড়িতে প্রবৃত্ত হইলে,—আমাদের একটা মস্ত শিক্ষালাভ হইয়া গেল বলিতে পারিব।

আর্থিক স্বার্থ ও হিন্দুমুসলমান

একটা বদখেয়ালের দলাদলি বাজারে বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। কথায় কথায় "হিন্দুর স্বার্থ", "মুসলমানের স্বার্থ" ইত্যাদি বোল ঝাড়া হইতেছে। এই সকল তথাকথিত হিন্দু-স্বার্থ, মুসলমান-স্বার্থ ঠিক কোন্ প্রকৃতির চিজ তাহা স্বদেশ-সেবার তরফ হইতে যাচাই করিয়া দেখা হয় নাই। সে দিকে নজর দেওয়া সম্প্রতি সম্ভব নয়।

আর্থিক উন্নতির তরফ হইতে মাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে,—সেই দ্বন্দ্ব আমাদের কোঠে অজ্ঞাত। যে-যে প্রণালী অবলম্বন করিলে বাংলার চাষী মজুর কেরাণী শিল্পী ও বণিক পরিবারগুলা দুই বেলা পেট পূরিয়া খাইতে পারিবে, শীতকালে গায়ে আলোয়ান জড়াইবে, গরমে-বর্ষায় ছাতা মাথায় দিবে, স্বাস্থ্যকর ঘরবাড়ীতে শুইতে পারিবে, ইস্কুল-কলেজে পড়িতে পারিবে, অসুখ হইলে ডাক্তার-কবিরাজ-হাকিম ডাকিতে পারিবে আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু টাকাও জমাইয়া রাখিতে পারিবে,—সেই প্রণালী-গুলা বাঙালী হিন্দুর পক্ষেও যা, বাঙালী মুসলমানের পক্ষেও তাই।

ধনবিজ্ঞানে জাতি-ভেদ, বর্ণ-ভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ, ভাষা-ভেদ নাই। এ হইতেছে অতিমাত্রায় সনাতন, বিশ্বজনীন বিজ্ঞান। আর্থিক উন্নতির ঝাণ্ডা খাড়া করিলে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ঐক্যবদ্ধ হইতে বাধ্য। যদি অনৈক্য দেখা যায়, সে অনৈক্য আসিবে ধনী-নির্ধনে, মজুর-মালিকে,

চাষী-জমিদারে,—ধর্ম্মে ধর্ম্মে নয়। সেই অনৈক্য-নিবারণের জন্য আবার অন্য কতকগুলা সনাতন দাওয়াই আছে। যুবক বাংলাকে বিচক্ষণরূপে রাষ্ট্রীয় সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে। মামুলি বুলি ছাড়িয়া নতুন পথের পথিক হইবার জন্য,—১৯২৬ সনের দলাদলি চিন্তাশীল বাঙালী কর্ম্মীদিগকে অনেক-কিছু সাহায্য করিবে আশা করিতেছি।

২। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতন

এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে (১৯২৭) কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক পাওনাদারদের টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সোজা কথায় ইহার নাম ব্যাঙ্ক-ফেল্। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ১৯০৭ সনে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মৃত্যুকালে উহার বয়স ছিল প্রায় বিশ বৎসর।

"চরম সময়ে" এই প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত ডিরেক্টরগণের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়।

১৯০৭ সনে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধনসহ এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই মূলধনের মধ্যে ১৫ লক্ষ ২ হাজার ৩ শত টাকার অংশ বিক্রী হয়। অংশ বিক্রয় করিয়া ৮ লক্ষ ৫ হাজার ৪ শত ৮৭ টাকা পাওয়া যায়।

সাত বৎসর চলিবার পর ব্যাঙ্কটীর দুঃসময় উপস্থিত হয়। ফলে পরিচালক সংসদের কিছু পরিবর্ত্তন করা হয় এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী উক্ত সংসদের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সনের স্থায়ী ও চল্‌তি আমানত খাতে ব্যাঙ্কে ২৫ লক্ষ টাকা গচ্ছিত ছিল। ব্যাঙ্কটির দুঃসময়ে এবং মামলা-মোকদ্দমার ফলে ঐ আমানত হ্রাস পাইয়া ২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। ইহা ১৯১৭ সনের ডিসেম্বর মাসের কথা।

ব্যাঙ্ক তথাপি কাজ চালাইতে থাকে এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমানতের টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

অ্যালায়্যান্স ব্যাঙ্ক পতনের ফল

১৯২৩ সনের এপ্রিল মাসে অ্যালায়্যান্স ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় ব্যাঙ্কের উপর লোকের বিশ্বাস কমিয়া যায়। ৩০শে এপ্রিল তারিখে এই ব্যাঙ্কের উপর পাওনাদারেরা চড়াও করে। চারদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে। সেই সময় আমানতদারদিগকে ২৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এই টাকার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক হইতে ধার করা হয় এবং অবশিষ্ট টাকা ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে দেওয়া হয়। এই টাকা তুলিয়া লওয়ার পরও কয়েক মাস যাবং অল্প অল্প টাকা তুলিয়া লওয়া চলিতে থাকে। নগদ টাকার অভাবে পরিচালকদিগকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হয়। এদিকে লোকেও টাকা জমা দেয় না। শেষকালে ১৯২৩ সনে যখন সর্ব্বত্র ব্যবসায়ে একটা মন্দা পড়িল সে সময় ব্যাঙ্ক নিজের টাকা আদায় করিতে পারিল না। তখন পরিচালকবর্গ বাধ্য হইয়া ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আরো দশ লক্ষ টাকা ধার লইলেন। তাহার পর ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল হইতে লাগিল এবং আমানত-দারেরাও টাকা জমা দিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে ব্যাঙ্ক আর নগদ টাকা জমাইতে পারিল না। ফলে এই হইল যে, গত এপ্রিল মাসে পুনরায় যখন ব্যাঙ্ক হইতে খুব বেশী টাকা তুলিয়া লওয়া আরম্ভ হইল সে সময় ব্যাঙ্ক আর টাকা দিয়া উঠিতে পারিল না।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম অবস্থা

১৯২৭ সনের জানুয়ারী মাসে যে পরিমাণ টাকা তুলিয়া লওয়া হইয়া-ছিল তাহা অপেক্ষা ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা অধিক আমানত করা

হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারীতে ৮৩ হাজার টাকা অধিক আমানত ছিল; কিন্তু মার্চ্চ মাসে আমানত অপেক্ষা ১৪ হাজার টাকা অধিক তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। তারপর এপ্রিল মাসে আমানত অপেক্ষা ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা অধিক তুলিয়া লওয়া হয়। অধিকন্তু আরো ৪ লক্ষ টাকা তুলিয়া লইবার দাবী হইয়াছিল।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ব্যাঙ্ককে খুব বেশী টাকা পরিশোধ করিতে হয়। ফলে ব্যাঙ্কের নগদ টাকা একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়। পরিচালকবর্গ টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করেন তাঁহারা অতি সামান্য টাকাই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। ২৭শে তারিখ অপরাহ্ণে দেখা যায় যে, যদি খুব মোটা রকমের টাকা সংগ্রহ না করা যায়, তবে ব্যাঙ্ক আর চলে না। টাকা সংগ্রহের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়, শেষকালে ২৮শে তারিখ পূর্ব্বাহ্ণে পরিচালকবর্গ টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন।

ব্যাঙ্কের কর্জ্জ

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের নামে ১০ লক্ষ টাকা করিয়া দুইখানি রেহাণী কবলা আছে। ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের টাকা পরিশোধের জন্য কয়েকটি বিশেষ সিকিউরিটি নির্দ্দিষ্ট ছিল। অধিকন্তু অনিশ্চিত সম্পত্তি হিসাবে ব্যাঙ্কের সমগ্র ব্যবসায়টিই ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকী কবলায় আবদ্ধ আছে। শেষোক্ত কবলায় এই মর্ম্মে একটি সর্ত্ত আছে যে, ব্যাঙ্ক যদি টাকা দেওয়া বন্ধ করে, তবে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক রিসিভার নিযুক্ত করিয়া সমগ্র ব্যাঙ্কটিকে দখল করিতে পারিবে। এই সর্ত্তের বলে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক, গত ২৮শে এপ্রিল অপরাহ্ণে মেসার্স লাভলক এণ্ড লুইস ফার্ম্মের তিনজন লোককে রিসিভার নিযুক্ত করে এবং তাঁহারা ব্যাঙ্কটিকে দখল করেন।

নগদ টাকা এবং যাহাদ্বারা অবিলম্বে টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব এইরূপ সিকিউরিটির অভাবেই ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে।

ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা

ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

স্থায়ী আমানত	৪৪০৭২০৯৮০
চল্‌তি খাতে	৩০৮৬৭১০ /৫
সেভিংস ব্যাঙ্ক	১৩৯৫৮৬॥/৩
কর্জ্জ	২৫৫২৬৮২৮ ২
মোট	১০১৮৬১৮৭৵১০

১ কোটি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ শত ৮৭ টাকা ২ আনা ১০ পাই।

ব্যাঙ্ক মোট ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯ শত ৮০ টাকা ১৩ আনা ৫ পাই খাটাইতেছে। তন্মধ্যে আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি, সম্পত্তি বা সহজে আদায়যোগ্য জিনিষে ন্যস্ত আছে। ব্যবসায়ীদিগকে ব্যাঙ্ক প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছে। অবশিষ্ট প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার কোন সিকিউরিটি নাই।

স্বদেশী আন্দোলন বলিলে বাঙালীরা যত কিছু সমঝিতে অভ্যস্ত তাহার ভিতর এই ব্যাঙ্কটা ছিল অন্যতম। এই ব্যাঙ্কটার সঙ্গে বিগত বিশ বৎসরের বহুবিধ বাঙালী শিল্পবাণিজ্যের যোগাযোগও ছিল গভীর। কাজেই বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতন-কাণ্ডটা বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে একটা বড়-গোছের দুর্য্যোগ বিবেচিত হইতেছে। গোটা স্বদেশী

আন্দোলনই যেন ফেল মারিল এই ধরণের একটা সন্দেহ মাথা তুলিয়াছে। আর বাঙালীর ভবিষ্যৎ শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধেও ঘোরতর দুশ্চিন্তা দেশের নানা মহলে দেখা দিয়াছে। একটা নৈরাশ্য ও কর্ম্মবিহ্বলতা দেশসুদ্ধ লোককে ছাইয়া ফেলিতেছে।

এই ব্যাঙ্কটা বাঙালীর "সবে ধন নীলমণি" নয়

কিন্তু দেশের অবস্থাটা তলাইয়া মজাইয়া দেখিলে অত্যধিক দুশ্চিন্তা বা দুঃখবাদের কারণ আছে বলিয়া মনে হইবে না। আজ যদি ১৯০৭।১০ সন হইত তাহা হইলে হয়ত বাঙালী সমাজে বাস্তবিক পক্ষে গভীর নৈরাশ্যের ঠাঁই থাকিত। এমন কি ১৯১৪।১৫ সনের অবস্থা থাকিলেও আজ বাঙালীর পক্ষে অতি বড় দুর্দ্দিন বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু আজ ১৯২৭ সনে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বাঙালী জাতির "সবে ধন নীলমণি" নয়। কলিকাতার ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এই ব্যাঙ্কের একটা ঠিকানা ছিল বটে। তাহাতে বাঙালী জাতির ইজ্জত খানিকটা বাড়িয়াছিল সন্দেহ নাই।

কিন্তু আজ বাংলার নরনারীকে খোলা চোখে দুনিয়া দেখিয়া বেড়াইতে হইবে। তাহা হইলেই দেখিব যে,—জলপাইগুড়ির বড় ব্যাঙ্কটা আর যশোহরের বড় ব্যাঙ্কটা প্রত্যেকেই কলিকাতার এই তথাকথিত "জাতীয়" প্রতিষ্ঠানের প্রায় জুড়িদার। আর এই দুইটার ধনশক্তি এবং কর্ম্ম-পরিমাণ একত্র করিলে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক তাহার নিকট কানা হইয়া যাইত।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের গায়ে "ন্যাশন্যাল" দাগটা দেখিবামাত্র তাহার ভিতর সমগ্র বাঙালীর সমবেত কৃতিত্ব দেখিতে বসা আহাম্মুকি। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারের সময়ে এই প্রতিষ্ঠান জন্মিয়াছিল বলিয়া

এইটাকেই বাঙালীর একমাত্র স্বদেশী ব্যাঙ্ক-কারবার সমঝিতে গেলে অন্যায় করা হইবে।

বাংলার জেলায় জেলায় জয়েণ্টষ্টক ব্যাঙ্ক

বাংলার নরনারী আজ দশ বার বৎসর ধরিয়া জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, পল্লীতে পল্লীতে বহুসংখ্যক লোন আফিস ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক চালাইতেছে। এইগুলার প্রত্যেকটাই বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের মতই "জয়েণ্টষ্টক লিমিটেড্" কোম্পানী। তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটাই বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের মতনই নানা প্রকার ব্যাঙ্ক কারবার চালাইয়া থাকে। তাহাদের প্রত্যেকটাই বিভিন্ন পরিচালকের সমবেত মস্তিষ্কের জোরে চালানো হইয়া থাকে। তাহাদের প্রত্যেকটারই আয়-ব্যয় পাশ-করা অডিটার কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদের প্রত্যেকটাই ফী বৎসর ব্যালান্স শীট বা উদ্বর্ত্তপত্র প্রচার করিতে অভ্যস্ত। এই সকল কথা "আর্থিক উন্নতি"র পাঠকদের পক্ষে নতুন সংবাদ নয়।

এই সকল ব্যাঙ্ক গুন্‌তিতে বড় কম নয়। সংখ্যায় ইহারা প্রায় শ' চারেক। বুঝিতে হইবে যে, বাংলাদেশে "আধুনিক রীতির" ব্যাঙ্ক-কারবার আর তাহার আনুষঙ্গিক ব্যবসা-বাণিজ্য আজ কোনো তথাকথিত স্বদেশী ব্যাঙ্কের বা ব্যাঙ্ক-পরিচালকের একচেটিয়া কেরদানির উপর নির্ভর করে না। বাঙালী জাতি কয়েক বৎসর ধরিয়া খুব বিস্তৃত ও গভীর ভাবে ব্যাঙ্ক-ব্যাবসাটাকে শক্ত মুঠার ভিতর পাকড়াও করিতে চেষ্টা করিতেছে। বাংলার মফঃস্বলকে যাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়া চলেন প্রধানতঃ তাঁহারাই কলিকাতার একটা প্রতিষ্ঠানের অকালমৃত্যুতে হাহুতাশ করিতে থাকিবেন মাত্র। কিন্তু এইরূপ হাহুতাশ কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, গবর্ণমেণ্ট-নিয়ন্ত্রিত কৃষি-সমবায় বিষয়ক ব্যাঙ্কগুলা এই শ'চারেক বাঙালী ব্যাঙ্কের অঙ্কে গুনিতেছি না। এই শ'চারেক প্রতিষ্ঠানের সবই ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক পুরা-স্বাধীন "পাশ্চাত্য" মতের বাঙালী-ব্যাঙ্ক। এই সমুদয় ব্যাঙ্কের গলদ ও দুর্ব্বলতা আছে অনেক। তাহা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের তুলনায় এই সমুদয় ব্যাঙ্কের গলদ যে বেশী তাহা প্রথম হইতেই ধরিয়া লওয়া উচিত হইবে না। ব্যাঙ্ক-পরিচালনা সম্বন্ধে কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক মফঃস্বলের প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত শ্রেণীর কোনো কৌশল শিখাইতে পারিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কাজেই কলিকাতার ব্যাঙ্কটা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া বাঙালীর ভবিষ্যৎ শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি সম্বন্ধে অন্ধকার দেখিতে বসিবার কিছুমাত্র দরকার নাই। মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক-গৌরব বাঙালী জাতিকে আজ ঘাড় খাড়া রাখিয়া সুস্থিরভাবে ভবিষ্যতের জন্য নতুন নতুন মোসাবিদা চালাইবার সুযোগ দিতেছে। কলিকাতার বাঙালী মফঃস্বলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকুক।

ক্ষতিগ্রস্ত কাহারা?

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতনে কয়েকটা বাঙালী কারখানার আর ব্যবসায়ী মহাজনের অল্প-বিস্তর ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। ব্যাঙ্ক-ফেল ঘটিলে কতকগুলা লোকের গায়ে আঁচড় লাগিতে বাধ্য। অধিকন্তু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী পরিবারের অনেকে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে শিখিতে-ছিল। তাহাদের অনেকেরই ক্ষতি হইবে। এই সকল ক্ষতির জন্য আমরা যারপরনাই দুঃখিত। কিন্তু কোন্ কারবারের বা গৃহস্থের হিস্যায় কতটা ক্ষতি পড়িবে তাহা ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা না জানা পর্য্যন্ত কিছুই বলা চলে না। যে-যে ব্যক্তির বা কারবারের কপালে

লোকসান লেখা আছে তাহাদের দুরবস্থায় সহানুভূতি দেখানো ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভবপর নয়।

এই সকল নানা শ্রেণীর ক্ষতি হজম করিয়াও বলিতেছি যে, বাংলাদেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এই ব্যাঙ্কের পতনে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না। যে সমাজে শ'চারেক ব্যাঙ্কের সঙ্গে গৃহস্থালী, মহাজনী, জমীদারি আর আধুনিক আমদানি-রপ্তানি সু-জড়িত, সেই সমাজে একটা মাত্র ব্যাঙ্কের ফেল-মারায় আর্থিক জীবনের পক্ষে অত্যধিক আলোড়িত হওয়া অসম্ভব।

ব্যাঙ্কটা ফেল মারিল কেন? ব্যাঙ্কের টাকা-কড়ির হিসাব যতদিন আইনের চোখে যাচাই না হয়, ততদিন কানাঘুষা নানারকম চলিবে। কিন্তু এই সব কানাঘুষায় কান না দিয়াও একটা কথা এখনি বলা চলে। ব্যাঙ্ক-ফেলের কারণ সর্ব্বত্রই একরূপ। যে টাকাটা লোকের নিকট হইতে আমানত স্বরূপ জমা হইতেছে, সেই টাকাটা অন্যান্য লোকের নিকট কারবারে খাটাইবার জন্য ধার দিতে হইবে। আমানতকারীরা যদি যখন তখন টাকা তুলিয়া লইতে চায়, তাহা হইলে "বেশীদিন" ধরিয়া কোনো কারবারে খাটাইবার জন্য টাকা ধার দিলে ব্যাঙ্কের পক্ষে দুর্যোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। কয়েক বৎসর হইল রোমের "ইতালিয়ানা দি স্কন্ত" ব্যাঙ্ক এই দুর্যোগেই চিৎ হইয়াছিল। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র যে দিন বাজারে বাহির হইবে সেদিন হয়ত ঠিক এইরূপ দুর্যোগের তথ্যই বেশ মোটা হারে পাওয়া যাইবে। ব্যাঙ্ক যে-সকল কারবারকে টাকা ধার দিয়াছিল তাহারা "অল্প সময়ের" ভিতর অথবা "যথাসময়ে" হয়ত টাকা ফেরৎ দিতে সমর্থ নয়। এই গেল ব্যাঙ্ক ফেলের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, সনাতন ও সার্ব্বজনীন কারণ। তবে প্রায় সর্ব্বত্রই অন্যান্য "হযবরল"ও থাকে বিস্তর। সেদিকে সম্প্রতি মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।

শাপে বর, - আত্ম-সমালোচনার সূত্রপাত

"শাপে বর" হইতে চলিল মনে হইতেছে। এই বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা জীবনের নানাক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলন চালাইয়া চলিতেছি। কিন্তু এই আন্দোলনের সু-কু আমরা স্বাধীনভাবে পরখ করিয়া দেখিতে সাহসী হই নাই। সর্ব্বত্রই আমরা নামজাদা লোকের মতামত, পয়সাওয়ালা লোকের কর্ম্ম-কৌশল, স্বার্থত্যাগী বীরবরের পাণ্ডিত্য, তথাকথিত বিশেষজ্ঞের কর্ম্ম-কেরদানি বিনা বাক্যব্যয়ে পূজা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত। পূজা খাইতে খাইতে আমাদের "জন-নায়ক" "ওস্তাদ" "মহাপ্রভুদের" ভুঁড়ি পুরু হইয়া গিয়াছে। আর আমাদের দেশের লোকও নিজ নিজ চিন্তাশক্তিকে ভোঁতা করিয়া ছাড়িয়াছে। প্রত্যেক মানুষের মগজেই যে কিছু কিছু ঘী থাকে সেই খেয়াল নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আত্ম-সমালোচনা আমাদের সমাজে এক প্রকার নাই। দেশের দোষ থাকিতে পারে—এইরূপ চিন্তা করা পর্য্যন্ত পাপ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

এমন অবস্থায় একটা নামজাদা স্বদেশী কিছু কাৎ হইয়া পড়ায় প্রকারান্তরে একটা মস্ত লাভই হইয়াছে। এইবার বেশ জোরের সহিত আত্ম-সমালোচনা নামক আধ্যাত্মিক দাওয়াই বাঙালী সমাজে কাজ করিতে থাকিবে। "যত দোষ নন্দ-ঘোষ"—এই নীতি আর যখন তখন বাজারে চলিবে না। আমাদের চরিত্রেও কতকগুলা দুর্ব্বলতা আছে,—বাংলার নরনারীকে কর্ম্মদক্ষতায় বড় হইতে হইবে,—ভারতীয় সমাজে মগজ-মেরামতের জন্য স্বতন্ত্র আন্দোলন আবশ্যক ইত্যাদি খেয়াল দেশের নানা ঘাঁটিতে এক সঙ্গে দেখা দিবে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি। আত্মসমালোচনার সূত্রপাত হইলেই যুবক ভারতে একটা নবযুগ সুরু হইবে। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের অকালমৃত্যু যুবক বাংলাকে কানে

ধরিয়া শিখাইয়া দিতেছে,—"ওরে বাপু, 'মধুর বহিবে বায়, বেয়ে যাব রঙ্গে'—সে দিন আর নাই। সাধু সাবধান! জীবনের মাপকাঠি বাড়াইয়া চল্, কর্ম্মদক্ষতার মাত্রা বাড়াইবার ব্যবস্থা কর্, মাথাটাকে পাকাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হ'।"

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই যুগান্তরের একটা লক্ষণ দেখিতে পাইব। ব্যাঙ্ক-পরিচালনা সম্বন্ধে বাঙালী সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে। বাংলা দেশে আজকাল শ'চারেক ব্যাঙ্কের সঙ্গে কম সে কম পাঁচ হাজার লোক ব্যাঙ্ক-পরিচালনার ছোট বড় মাঝারি কাজে মোতায়েন আছে। এই সকল ব্যাঙ্ককর্ম্মচারীর অনেকেই ব্যাঙ্ক-বিষয়ক বিদ্যা অর্জ্জন করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার পর ঠেকিয়া ঠেকিয়া হাতে কলমে যাহা-কিছু শিখিয়াছেন তাহার জোরেই বাঙালীর ব্যাঙ্ক-ব্যবসা চলিতেছে। কিন্তু যথার্থ বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাঙ্ক-টেক্‌নিক শিখিবার ও শিখাইবার ব্যবস্থা করা জরুরি হইয়া পড়িয়াছিল। সেই কথাটা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ফেল মারা উপলক্ষে প্রচুর পরিমাণে বুঝা যাইতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে অভাবটা মিটাইবার কিছু কিছু ব্যবস্থাও করা হইতে থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে।

ব্যাঙ্ক-ফেলের কারণ আলোচনা করিতে গিয়াই দেশের মামুলি লোকেরাও ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক-কিছু শিখিয়া ফেলিবে। ব্যাঙ্ক-পরিচালক ও ব্যাঙ্ক-কেরাণী এই দুই শ্রেণীর লোকেও বিষয়টা ব্যাপক ভাবে বুঝিবার জন্য যত্ন লইতে থাকিবেন। আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর বাংলা দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় ব্যাঙ্ক বিষয়ক একটা বড় গোছের সাহিত্যই গড়িয়া উঠিবে। ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বক্তৃতা আর পাঠশালার ব্যবস্থাও শিক্ষা-সংসারে একটা নূতনত্ব হইবে। সকল তরফ হইতে বাংলাদেশে একটা ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞানের আন্দোলন আশা করিতে পারি।

এই উপলক্ষ্যে একটা প্রস্তাব করিয়া রাখিতেছি। বাংলাদেশের ব্যাঙ্ক-পরিচালকগণ শীঘ্রই একটা সর্ব্ববঙ্গ ব্যাঙ্ক-সম্মেলনের ব্যবস্থা করুন। বাঙালীর তাঁবে আজকাল যে সকল লোন-আফিস ও অন্যান্য শ্রেণীর ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা মফঃস্বলের কোন কেন্দ্রে অথবা কলিকাতায় সমবেত হউন। বাঙালী ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান অবস্থা আর তাহা উন্নত করিবার উপায় সম্বন্ধে কর্ম্মদক্ষ ও চিন্তাদক্ষ লোকেরা পরামর্শ করুন। তাহা হইলে "কত ধানে কত চাল" বুঝিতে পারিয়া বাঙালী জাতি ভবিষ্যতের জন্য কর্ম্ম-পথ বাছিয়া লইতে পারিবে। এইরূপ সম্মেলন বৎসর বৎসর অনুষ্ঠিত হইলে ব্যাঙ্ক-বিদ্যা সম্বন্ধে বাঙালীর চিন্তা ত পুষ্ট হইতে থাকিবেই, সঙ্গে সঙ্গে বিপুলায়তন আধুনিকতম ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাও বাঙালীর কব্জার পক্ষে সহজ হইয়া উঠিবে।

৩। হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট *

প্যাক্ট জিনিষটা কি? ইহা একটা চুক্তিনামা, বিভিন্ন ব্যক্তি, দল বা শক্তির একটা আদান প্রদান। আপোষ নিষ্পত্তি বা লাভ লোকসানের সামঞ্জস্য বিধান করাই ইহার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আর্থিক জীবনের যেরূপ গড়ন, তাহাতে এই প্যাক্টের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলে নয়া ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে অপূর্ণ জ্ঞানেরই পরিচয় দেওয়া হইবে। আমাদের চারিদিকে যে বিভিন্ন রকমের শক্তি কাজ করিতেছে, এগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সকল শক্তি ও স্বার্থ প্রত্যেকটীর সঙ্গে আমাদিগকে আজ ভালরূপ পরিচিত

* "ফরোয়ার্ডের" চিত্তরঞ্জন সংখ্যায় (জুলাই ১৯২৮) প্রকাশিত সুবৃহৎ প্রবন্ধের কিয়দংশ হইতে তাহেরউদ্দিন আহমদ কর্ত্তৃক অনুদিত।

হইতে হইবে। কেবল পরিচয় মাত্র নয়। সেগুলার ধরণ ধারণ বুঝিয়া তাহাদের সাহায্যে নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও চিত্তের পুষ্টি সাধন করিতে হইবে।

চিত্তরঞ্জন ভারতের এই বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের পরস্পরের স্বার্থগত দ্বন্দ্বের বিষয় খুব পরিষ্কার ভাবেই উপলব্ধি ও অনুভব করিয়াছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের এই পরিষ্কার বস্তুনিষ্ঠ অনুভূতিই তাঁহার হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টে দিব্যভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। চাষীরা একটা শক্তিরূপে দেখা দিয়াছে। আর এই শক্তি যে দলবদ্ধরূপে গড়িয়া উঠিতেছে ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমানে এই সকল দল দ্রুত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বড় বড় শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হইতেছে। খনির শ্রমিক, রেলের মজুর, কল কারখানার মজুর, চা-বাগানের কুলি—ইহারা কি আজ সমাজের কতকগুলা নয়া শক্তি নয়? আর ইহারা কি নয়া নয়া সঙ্ঘে দলবদ্ধ হইতেছে না? নমশূদ্র, অব্রাহ্মণ, অস্পৃশ্য, পারিয়া ও অপরাপর অনুন্নত নিষ্পেষিত জাতিসমূহও কি আজ আত্মচৈতন্য লাভ করিয়া দাঁড়াইতেছে না? এই সব শক্তি সঙ্ঘবদ্ধরূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে ইহাই সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতীয় জাতিপুঞ্জে এই সকল বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। এই সম্প্রদায়গুলা "অনুন্নত" "অশিক্ষিত" হউক বা গুনতিতে "ছোট" হউক তাহাতে কিছু যায় আসে না। তাহাদের মধ্যে যে জীবনের প্রবাহ খেলিতেছে—তাহারা যে ইতিমধ্যেই আপন আপন স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জোর গলায় তাহাদের দাবীর কথা জানাইতেছে—ইহাই রাষ্ট্রনায়কগণের প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। অনুন্নত-উন্নত, বর্দ্ধিষ্ঠ-লঘিষ্ঠের কোন কথা না তুলিলেও ক্ষতি নাই।

মোসলমান শক্তি বলিয়া যে একটা বস্তু ভারতের মাটীতে আছে, সেই বস্তুটী সম্বন্ধে আজ আমাদিগকে সচেতন হইতে হইবে। যখনই কোন নতুন শক্তি দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়া খাড়া হয়, তখন তাহার বিষয় স্বদেশসেবীদিগের পক্ষে বিচক্ষণরূপে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। তাহাকে বুঝিতে হইবে—চিনিতে হইবে এবং তাহার সঙ্গে মিলনের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কেবল মাত্র হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টে চলিবে না—নয়া ভারতে আজ এ ধরণের গণ্ডা গণ্ডা প্যাক্ট কায়েম করা আবশ্যক।

আমরা চাই আজ জমিদার-রায়ত প্যাক্ট, ধনিক-শ্রমিক প্যাক্ট, হিন্দুমুসলমান-প্যাক্ট, অস্পৃশ্য-প্যাক্ট, নমশূদ্র-প্যাক্ট, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ-প্যাক্ট। এই ধরণের বহুসংখ্যক প্যাক্ট সৃষ্টি করিলে তবে ভবিষ্য-ভারতের গোড়াপত্তন করা সম্ভব হইবে।

হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট দ্বারা চিত্তরঞ্জন হিন্দুদিগকে "অসম্ভব রকমের" স্বার্থত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই তথাকথিত স্বার্থত্যাগের দ্বারা তিনি রাষ্ট্রের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করিবার প্রয়াসই পাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা নয়া ভারতকে তিনি দুনিয়ার নতুন হালচালের সম্বন্ধেই ওয়াকিব-হাল হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। দেশের মধ্যে এই যে তথাকথিত ছোটরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে, রাষ্ট্রে ও সমাজে আজ যে তাহারা ইজ্জত দাবি করিতেছে এবং তাহাদের দাবী যে ন্যায্য, এই কথাই চিত্তরঞ্জন যুবক-ভারতকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। দশ বছর পরে ভারতে যাহা অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দিবেই দিবে, হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট দ্বারা তিনি মোসলমানের সেই পাওনার কড়িটাই ছাড়িয়া দিবার জন্য হিন্দু-সমাজের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন।

ইহা সত্য যে, হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টে "ডাল ভাতের" কথাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। আর্থিক সুবিধার হস্তান্তর ও আর্থিক জীবনের

পুনর্গঠনই ইহার প্রধান অঙ্গ। গরু এবং বাদ্য সমস্যা আসল ব্যাপার নয়। সাধারণ লোকের সংস্কারগত মনোবৃত্তি কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্যই ঐ গরু ও বাদ্য সমস্যা সমাধানের কথা প্যাক্টে অবতারণা করা হইয়াছে।

হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট ১৯২৩ সনের ডিসেম্বর মাসে রচিত হয় এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্যাক্ট দ্বারা মোসলমানদের জন্য—লোক সংখ্যানুপাতে বাঙ্গলার কাউন্সিলে ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে কতকগুলি সভ্যপদ নির্দ্ধারিত করা হয়। সরকারী চাকুরীর ও সংখ্যানুপাতিক হিস্যা তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়। হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট বাস্তবিক পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সামঞ্জস্যের একটা মূল্যবান দলিল।

দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাওয়া পড়া আগে চাই। অন্ন-সমস্যাই সকলের বড় সমস্যা। রাষ্ট্রীয় অধিকার ও আর্থিক লেনদেন মীমাংসার গোড়াতে রহিয়াছে এই পেট-চিন্তা। অধ্যাত্মবাদ দ্বারা আত্মার মুক্তি হইলেও হইতে পারে কিন্তু ইহা দ্বারা জাগতিক কল্যাণ সম্ভবপর হয় কিনা সন্দেহ।

সংসারে বসবাস করিতে হইলে খাওয়া-পরার বিষয়ে অন্যের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার দরকার আছে। ক্ষুধার্ত্তের মগজে অধ্যাত্মবাদের চিন্তা আসিতে পারে না। তবে অধ্যাত্মকেই যাঁহারা জীবনের একমাত্র ব্রত করিতে চান, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁহাদিগকেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোদার দরগায় ভাত মাছের সিন্নি না দিলেও দুধ ঘীয়ের সিন্নি ভোগ দিতে হয়।

দেশের নেতারা যদি কিষাণদের যথার্থ মঙ্গল চান, যদি তাঁহারা স্বরাজ-সংগ্রামে তাহাদের সাহায্য চান, তবে কৃষকদের অভাব-অভিযোগ, ব্যথা

বেদনার কথা সকলের আগে তাঁহাদিগকে জানিতে ও বুঝিতে হইবে, কি ভাবে "উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদ" বন্ধ হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। জমাজমীর দখলী স্বত্ব, খাজনার আইনকানুন, উত্তরাধিকার, জমাজমীর ভাগ বাটোয়ারা, হস্তান্তর ক্ষমতা, প্রজার দায়গ্রস্ততা, মহাজনের ঋণজাল, টাকা কর্জ্জের ব্যবস্থা, ক্রয়-বিক্রয়ের লোকসান প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে বাঙ্গলার চাষীরা সজ্ঞানে অজ্ঞানে দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহার প্রতীকার করা চাই। ইহা না করিতে পারিলে কৃষকদের সঙ্গে দেশের নেতাদের প্রকৃত তুস্তি কায়েম হইতে পারে না।

কৃষকদের মত শ্রমজীবী বা কুলী মজুর প্রভৃতি শ্রেণীর উপর যে অত্যাচার অবিচার হইয়া থাকে তাহাও দূর করা আবশ্যক। কারখানায় শ্রমজীবীদের কাজের ঘণ্টা কম হওয়া আবশ্যক। তাহাদের বাসস্থান আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ করিয়া তোলা দরকার। সামান্য বেতনের মজুরও যাহাতে সামাজিক বীমার সুবিধা ভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। স্বরাজের আধ্যাত্মিক অর্থ ও দেশের মুক্তি সম্বন্ধে কৃষক ও শ্রমিকগণ নেহাৎ অজ্ঞ ও নিশ্চেষ্ট নহে; কিন্তু তাহারা সর্ব্বাগ্রে নিজেদের খাওয়াপরা চায়—পেটের ধান্ধাই তাহাদের সব চাইতে বড় ধান্ধা।

রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে হামেশাই ভাগ-বাটোয়ারা, চুক্তি, "রফা"-নিষ্পত্তির দরকার আছে। সকল কর্ম্মকেন্দ্রেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারীর জন্য যাহাতে সংখ্যানুপাতিক বখরা নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার দিকে নজর রাখা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই সকল অনুপাত ও হিস্যা নির্ণয় করিবার বেলায় সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় জীবনের কোন স্তর হইতেই এই অর্থ-নৈতিক সমস্যাটা বাদ দিলে চলিবে না। এটাকে কানার মতন এড়াইয়া গেলে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হইবে।

চিত্তরঞ্জন দিব্য দৃষ্টিতে এই কঠোর বাস্তবকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনই সর্ব্ব-প্রথম স্বদেশ ও স্বজাতির সমক্ষে বলিতে সাহস পাইয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা খাওয়া-পরার সমস্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি লাভের জন্য মোসলমানেরা অধিকতর সুযোগ সুবিধা চায়। ইহা তাহাদিগকে দিতে হইবে, না দিলে দেশের স্বার্থ পুষ্ট হইবে না—ইহাই দেশবন্ধু নির্ভীক কণ্ঠে তাঁহার দেশবাসীকে জানাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের মূলমন্ত্র।

আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যাঁহারা উচ্চস্থান দখল করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেছেন, অন্যের সুবিধার জন্য তাঁহাদিগকে আজ কিছু কিছু ছাড়িয়া দিতেই হইবে। জমীদার, তালুকদার, কলওয়ালা, মহাজন ও অন্যান্য ধনী সম্প্রদায় হয়ত ইহা শুনিয়া ভাবিবেন যে তাঁহাদিগকে মস্ত বড় একটা স্বার্থ-ত্যাগের কথা বলা হইতেছে। তাঁহারা এটাও মনে করিতে পারেন যে, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব, সামাজিক শান্তি ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কল্পে এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে তাঁহাদের ত্যাগস্বীকার বাস্তবিকই অত্যধিক। এতদিন যে সকল সুবিধা ও স্বার্থ তাঁহারা ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহার হস্তান্তরকে তাঁহারা খুব বড় উদারতা ও ত্যাগ স্বীকার বলিতে পারেন। কিন্তু অন্য পক্ষের লোক অর্থাৎ সুযোগ-সুবিধা-বিহীন নরনারী ইহার উত্তরে বলিবেন যে, সমাজ ও সংসারে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে যাহা না হইলেই নয়, কেবল তাহাই ইঁহাদের নিকট দাবী করা হইতেছে। এটা স্বার্থ-ত্যাগ হইলেও ভারতের সুখশান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য ইহা নেহাৎ বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসে এই তথাকথিত স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এইরূপ স্বার্থত্যাগ,—দলগত, সঙ্ঘগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত বা শ্রেণীগত স্বার্থত্যাগ কোথাও দেখা দিতেছে বিপ্লবের আকারে। কোথাও কোথাও নেহাৎ

আটপৌরে আইন-কানুনের সাহায্যেই এক শ্রেণীর নরনারীর জন্য অন্যান্য শ্রেণীর নর-নারীর স্বার্থত্যাগ মূর্ত্তি পাইতেছে। বোলশেভিক রুষিয়ার ধনী :ও আভিজাত্য সম্প্রদায়—দেশের প্রজাসাধারণ ও মজুর শ্রেণীর নিকট তাহাদের সকল ক্ষমতা ও সুবিধা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা এই শ্রেণীর স্বার্থ ত্যাগ, যদিও ইহা নেহাৎ অভূতপূর্ব্ব প্রণালীতে দেখা দিয়াছে।

কৃষক মজুর কারিগর ও সমাজের অন্যান্য নিম্নস্তরের সম্প্রদায় ধনীর এই স্বার্থত্যাগকে সেরূপ কোন ত্যাগ বলিয়া মনে না করিলেও বাস্তবিক পক্ষে ইহা ত্যাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। রুশিয়ার কাণ্ডে এই ত্যাগ স্বেচ্ছাপ্রদ নয় পরন্তু বাধ্যতামূলক। বাংলার মোসলমানদের ন্যায্য দাবী মিটাইতে হইলে হিন্দুদিগকে যে আজ ঢের ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। ইয়োরামেরিকার মজুর ও কিষাণ সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য আজ পর্য্যন্ত যে সকল ফ্যাক্টরি আইন, জমী-জমার আইন ও ব্যাধি-বার্দ্ধক্যদৈব-বীমা-বিষয়ক আইন-কানুন কায়েম হইয়াছে তাহার কোনটাই কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের স্বার্থত্যাগ বা ক্ষমতার হস্তান্তর ছাড়া সম্ভবপর হয় নাই। এই ধরণের ক্ষমতার হস্তান্তর বা সম্প্রদায়গত স্বার্থত্যাগ বর্ত্তমান জগতের অগ্রগামী দেশগুলায় মামুলি আইনের দৌলতে সম্ভবপর হইতেছে। জার্ম্মাণি বিলাত ইত্যাদি দেশ সেরা দৃষ্টান্তস্থল। যে সকল দেশ ও সমাজ আইন প্রণয়ন দ্বারা শান্তিপূর্ণ ও সহজভাবে এইরূপ স্বার্থত্যাগ ও ক্ষমতার হস্তান্তর করিতে কার্পণ্য করিয়াছে—সেইখানেই বিদ্রোহের অস্ত্রোপচার দরকার হইয়াছে। বোলশেভিকদের মূলনীতি আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম লক্ষণ। গোটা ইয়োরামেরিকা যাহা করিতে চায় বোলশেভিকরাও তাহাই চায়। উন্নতিপন্থী অগ্রগামী

দেশগুলার আদর্শে রুশিয়াকে গড়িয়া তোলাই বোলশেভিকদের চরম লক্ষ্য। এই কথাটা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া রাখা আবশ্যক।

হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের দ্বারা চিত্তরঞ্জন হিন্দুদিগকে তাহাদিগের কতকটা স্বার্থ ও সুবিধা যদি বাস্তবিকই হস্তান্তর করিতে বলিয়া থাকেন, তবে জগতের সকল আধুনিক আইন-প্রণয়ন-নীতি, বিদ্রোহ, গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি তাঁহার এই প্রচেষ্টা সমর্থন করিবে।

এই প্যাক্টের দ্বারা বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে ওলট পালট করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থের ন্যায্য হিস্যা ও অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্যই এই প্যাক্টের সৃষ্টি। বর্ত্তমান সময়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে মোসলমানদের এমন কোনই ইজ্জৎ বা প্রতিপত্তি নাই যাহা কিনা হিন্দু সম্প্রদায়ের হিংসার উদ্রেক করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সংখ্যানুপাতিক অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে "রাতারাতি" "অনুন্নত স্তর হইতে উন্নত স্তরে" লইয়া যাইবার প্রস্তাব খুবই বিদ্রোহমূলক সন্দেহ নাই। গোটা হিন্দুসমাজ ইহাতেই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অনুন্নতকে উন্নত স্তরে জোরজবরদস্তি করিয়া ঠেলিয়া তোলা অত্যাবশ্যক। অন্ততঃ পক্ষে তাহারা যাহাতে উন্নত স্তরে সহজেই উঠিতে পারে আর মাথা খাড়া করিয়া চলাফেরা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই যুগধর্ম্ম। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুশ সকলেই তাহাদের স্বদেশবাসিগণের জন্য এইরূপ "ঠেলিয়া তোলা"-নীতি সম্পন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছে ও একাজে অনেকটা সফল হইয়াছে। হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টে যে সংখ্যানুপাতিক শক্তি-বিভাগ ও সুযোগ-বিভাগ নিহিত আছে—তাহা বর্ত্তমান জগতের আদর্শ-মাফিক বস্তু।

রাষ্ট্র-সাধনায় হিন্দু-জাতি *

প্রত্নতত্ত্বের বাস্তব মালমশলাগুলিকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের কাঠামে ফেলিতেছি। দেখা যাউক ভারতীয় নরনারীর কোন্ মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসে।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞান কোনো একটা বিদ্যার নাম নয়। "জুরিস্-প্রুডেনস্" বা আইন-তত্ত্ব, ধন-বিজ্ঞান, নগর-বিজ্ঞান, রাজস্ব-বিদ্যা, লড়াই-বিদ্যা, "আবাপ" বা আন্তর্জ্জাতিক লেনদেন-তত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিদ্যার সমবায়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান গঠিত হয়।

গণ-তন্ত্রের রাষ্ট্রই হউক বা রাজ-তন্ত্রের রাষ্ট্রই হউক, প্রত্যেকের শাসনেই এই সকল প্রকার বিদ্যা কাজে লাগে। কাজেই শাসনের "রূপ" বা "গড়ন" বিষয়ক তথ্যগুলা "ঢুঁ ড়িয়া বাহির" করিতে হইলে অথবা এই সমুদয়ের "ব্যাখ্যায়" বা বিশ্লেষণে লাগিয়া যাইতে হইলে এই সকল বিদ্যারই ডাক পড়িতে বাধ্য। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ওঠাবসায়ই নৃতত্ত্ব ["আন্থ্রপলজি"] এবং চিত্ত-বিজ্ঞান ["সাইকলজি"] ও আবশ্যক।

বর্ত্তমান গ্রন্থের হিন্দু নরনারী সাত শ' বৎসর ধরিয়া গণ-তন্ত্রের "রাজ" চালাইতেছে,—আর ষোল সতের শ' বৎসর ধরিয়া রাজ-তন্ত্রের "রাজ" চালাইতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির "পাব্লিক ল" বা রাষ্ট্র-শাসন এই কয় পৃষ্ঠার ভিতর বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।

---

* "হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন" গ্রন্থের ভূমিকা।

কোথাও দেখিতেছি হিন্দু সমাজের মাতব্বরেরা নগরের স্বাস্থ্য-রক্ষায় মাথা ঘামাইতেছে। কোথাও বা পল্টনের খোরপোষ যোগাইবার জন্য ধন-সচিবেরা শশব্যস্ত। কখনও জনগণকে আত্ম-কর্ত্তৃত্বের সাধনায় নিরত দেখিতেছি। কখনও বা অসংখ্য পরস্পরবিচ্ছিন্ন জনপদ-গুলাকে ঐক্য গ্রথিত করিবার দিকে রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের মেজাজ খেলিতেছে।

এই আবহাওয়ায় হিন্দুজাতি শক্তি-যোগী এবং টক্কর-প্রিয়। ভারতের নরনারী এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে হিংসা-ধর্ম্মী এবং বিজিগীষু। রাষ্ট্রীয় লেনদেন-গুলা,—কি "তন্ত্রে"র কাজকর্ম্ম, কি "আবাপে"র কাজকর্ম্ম,—সবই ভারতবাসীর হাতের জোরের আর মাথার জোরের প্রতিমূর্ত্তি। প্রত্যেক সেনা-চালনায়, প্রত্যেক খাজনা-সংগ্রহে, প্রত্যেক "শ্রেণী"-স্বরাজে আর প্রত্যেক জমি জরীপে লোকগুলার রক্তের স্রোত ছুটিতেছে আর মাথার ঘাম পায়ে পড়িতেছে।

সেই রক্তের স্রোত আর মাথার ঘামই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আসল উপকরণ। হিন্দু রক্ত-দরিয়ার তেজ মাপিতে চেষ্টা করাই বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

জরীপ করিবার যন্ত্র

রক্তের তেজ মাপিতে হইবে। কেমন করিয়া? মাপ-কাঠি কোথায়? জরীপ করিবার যন্ত্রটা কৈ?

যাহা জানা আছে তাহার সাহায্যে অথবা তাহার তুলনায় অজানাকে জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। জানা আছে বর্ত্তমান জগৎ। অতএব বর্ত্তমান জগতের মাপ কাঠিতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির রাষ্ট্র-সাধনা জরীপ করা সম্ভব।

[১]

পদার্থ-বিজ্ঞানের রাজ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিব। আর্য্যভট্ট, বরাহ-মিহির, ভাস্করাচার্য্য ইত্যাদি ভারতীয় গণিত-পণ্ডিতদের বিদ্যার দৌড় কতটা? মাপা সম্ভব একমাত্র তাহার পক্ষে যে জানে নিউটন, ম্যাক্‌সোয়েল, আইনষ্টাইন ইত্যাদির মর্ম্মকথা। সেইরূপ পতঞ্জলি, নাগার্জ্জুন ইত্যাদির হিন্দু-রসায়নের কিম্মৎ বুঝে কে? যে বুঝে উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর "রস-রত্ন-সমুচ্চয়" বা রসায়ন-সমুদ্র কি চিজ। চরক সুশ্রুত ইত্যাদি সম্বন্ধেও এই "ফর্ম্মুলা"ই লাগিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই তুলনায় প্রাচীন ভারতকে লজ্জিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লজ্জা একমাত্র হিন্দুরক্তের লজ্জা নয়। গোটা প্রাচীন দুনিয়াই,—জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর তুলনায় "সেকেলে"।

পশ্চিমা পণ্ডিতেরা এই কথাটা মনে রাখিতে অভ্যস্ত নন। তাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বর্ত্তমান জগতের আসরে বসাইয়া মনের সুখে ভারত-মাতাকে বে-ইজ্জৎ করিতে ভালবাসেন। গ্রীক রোমাণ এবং "ক্যাথলিক-খৃষ্টিয়ান" ইয়োরোপের অজ্ঞান, কুসংস্কার, "তুক্‌মুক্" "হাঁচি," "টিক্‌টিকি," "ভুতুড়ে কাণ্ড" এবং লাখ লাখ অন্যান্য বুজরুক তাঁহারা বেমালুম ভুলিয়া যান। আর ভারতসন্তানেরা প্রাচীন এবং মধ্য যুগের ইয়োরোপীয়ান সভ্যতা-অসভ্যতা এবং সু-কু সম্বন্ধে প্রায় একদম কিছুই জানেন না। কাজেই পশ্চিমাদের সঙ্গে তর্ক করিতে অপারগ হইয়া ভারত সম্বন্ধে লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকা এতকাল আমাদের দস্তুর রহিয়াছে।

[২]

যাহা হউক, হিন্দু-নরনারীর রাষ্ট্রীয় শক্তিযোগ মাপিবার আর এক উপায় হইতেছে পুরাণো ইয়োরোপের দৌড়টা চোপর দিনরাত নিজের কব্জায় রাখা। গ্রীস রোম এবং মধ্য যুগের ইয়োরোপে গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা ইত্যাদি মুল্লুকে মানবজাতি কতখানি উঠিয়াছিল? সেই উঠার তুলনায় চরক, আর্য্যভট্ট, আর নাগার্জ্জুনকে মাথা হেঁট করিতে হইবে না।

এই সকল বিজ্ঞান বিদ্যার আখ্ড়ায় সেকালের হিন্দুরা বুক খাড়া করিয়া,—সেকালের গ্রীক, রোমাণ এবং খৃষ্টিয়ানদের সঙ্গে টক্কর চালাইয়া,—সমানে সমানে "বাপের বেটা" বলিয়া পরিচিত হইবার দাবী রাখিত। "হিন্দু অ্যাচীহ্বমেণ্ট্‌স্ ইন্ একৃজ্যাকৃট্ সায়েন্স্" অর্থাৎ "মাপজোকনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান-বিদ্যায় হিন্দু জাতির কৃতিত্ব" নামক গ্রন্থে [নিউ ইয়র্ক, ১৯১৮] হিন্দুরক্তের স্রোত এই তরফ হইতে দেখানো হইয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে রাষ্ট্র-সাধনার ময়দানে দাঁড়াইয়া হিন্দু-নরনারী গ্রীক রোমাণ এবং মধ্যযুগের খৃষ্টিয়ানদের সঙ্গে পাঞ্জা কষিতেছে। এই কেতাবের লড়াই বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে নয়,—উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী,—এবং তাহারও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী—ইয়োরোপের সঙ্গে।

"গড়ন-বিজ্ঞানে"র জাতিবিভাগ

"মর্ফলজি" বা "গড়ন"-তত্ত্ব অর্থাৎ রূপ-বিজ্ঞান সার্ব্বজনিক ও সনাতন। এক টুকরা হাড় দেখিবা মাত্র বলিয়া দেওয়া সম্ভব এটা বাঘের বুকের পাঁজরা না ভেঁড়ার পিঠের শির-দাঁড়া। জীবতত্ত্ববিদেরা

এই সমস্যা লইয়া দিন রাত ব্যাপৃত আছেন। কথাটার মধ্যে হেঁয়ালি কিছুই নাই।

"বুদ্ধদেবের দাঁত" নামক বস্তু "আবিষ্কৃত" হইবা মাত্র এই কারণেই অস্থিতত্ত্ববিৎ মহলে লড়াই উপস্থিত হওয়া সম্ভব। বস্তুটা যে শূয়রের দাঁত নয় আগে তাহার মীমাংসা করা দরকার হইয়া পড়ে।

ভূতত্ত্ববিদেরাও এই ধরণের গবেষণায়ই অভ্যস্ত। একটুকরা পাথর অথবা কয়লার চাপ বা এমন কি ধূলা বালুর নমুনা পাইলেই তাঁহারা বলিয়া দিতে পারেন দুনিয়ার কোন্ কোন মুল্লুকের কত হাত মাটীর বা "পাণি"র নীচে অথবা কোন্ পাহাড়ের ডগায় এই সব মাল পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা।

রূপ-বিজ্ঞান মানুষের বেলায়ও খাটে। দলবদ্ধ মানুষ বা সমাজ এবং সমাজের রাষ্ট্রীয় "তন্ত্র" ও "আবাপ" অর্থাৎ ঘরে-বাইরের সকল প্রকার লেন-দেন সম্বন্ধে ও মর্ফলজি বা গড়ন-তত্ত্বের "রূপ-কথা" খাটিবে। অনেক স্থলেই হয়ত "অন্তবীণ"যন্ত্রের অর্থাৎ "ইণ্টেন্সিভ্" বা গভীর দৃষ্টিশক্তির এবং সমালোচনা-শক্তির দরকার। কিন্তু সর্ব্বত্রই বিশ্বব্যাপী যুগ-বিভাগ, স্তর-বিভাগ, জাতি-বিভাগ, উপজাতি-বিভাগ ইত্যাদি শ্রেণী-বিন্যাস কায়েম করা সম্ভব। তথ্য "বিশ্লেষণ" সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিলেই হইল।

পল্লীজীবনের একচাপ দেখিবা মাত্র কখনো হয়ত বলিব এটা "আদিম"। কখনো বা "প্রাচীন" বলিয়া তাহার জাতি-নির্ণয় করা হইবে। আবার "মধ্যযুগের" পল্লী এবং "বর্ত্তমান" যুগের পল্লী ইত্যাদি বস্তু ও স্বতন্ত্র নিদর্শনের জোরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সেইরূপ লড়াইয়ের কায়দা বা জমিজমার বন্দোবস্ত দেখিলেই এই সবের "দেশ কাল পাত্র" ঠাওরানো সম্ভব। অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্ঝনানি,

শুল্ক ও খাজনার নাম ইত্যাদি শুনিবা মাত্র এই গুলার "কুলশীল" বলিয়া দেওয়া কঠিন বিবেচিত হইবে না।

রাজা, রাজপদ, রাজশক্তি ইত্যাদি বস্তু দুনিয়ায় আবহমান কাল ধরিয়া চলিতেছে। কিন্তু কালিদাস-শেক্‌স্‌পীয়ারের "রাজা" যে চিজ, বৈদিক সাহিত্য বা "ইলিয়াদ-ওদিসি"র "রাজা" সেই চিজ নয়। "রাজশব্দোপজীবী" যে কোনো ব্যক্তির রক্ত অনুবীণে পরখ করা যাইতে পারে। করিলেই বুঝা যাইবে ইহার ভিতর তাসিতুস-বিবৃত জার্ম্মান-রাজা, না "জাতক সাহিত্যের" গণ-রাজা, না ফ্রান্সের "বুর্ব্ঁ" বাদশা, না মৌর্য্য "সার্ব্বভৌম", না আধুনিক ইংরেজ সমাজের হাতপা-ঠুঁটা-করা রাজা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অন্যান্য কোষ্ঠীর মতন রাজ-রক্তের কোষ্ঠিতেও গণকেরা যুগ ও জাত খোলসা করিয়া দিতে সমর্থ।

গড়ন-বিজ্ঞান খাটাইয়া হিন্দুজাতির মূর্ত্তি-পরিচয় প্রদান করা হইতেছে। মান্ধাতার আমল, আদিম সমাজ, প্রাচীন দুনিয়া, মধ্যযুগের খৃষ্টিয়ান বিশ্বরূপ আর বর্ত্তমান জগৎ ইত্যাদি নৃতত্ত্ব-বিস্তার শব্দগুলা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সন তারিখ দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছি। গোঁজামিলের সম্ভাবনা নাই।

এই সকল পারিভাষিক শব্দ পশ্চিমা পণ্ডিতেরা নেহাৎ অসতর্ক ভাবে ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত,—বিশেষতঃ যখন ভারতীয় এবং প্রাচ্য তথ্য লইয়া তাঁহাদের কারবার চলে। এই জন্য রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আসরে গোঁজামিল ও কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। সেই কুসংস্কার এবং গোঁজামিল চলিতেছে আজকালকার ভারতীয় পণ্ডিতগণের ভারত-তত্ত্ববিষয়ক আলোচনার আসরেও। দেশী এবং বিদেশী দুই প্রকার পণ্ডিতের বিরুদ্ধেই বর্ত্তমান গ্রন্থ লড়াই ঘোষণা করিতেছে।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই

প্রায় এগার বৎসর পূর্ব্বে বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। সেই সময়ে—১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে এলাহাবাদের পাণিনি আফিস হইতে মৎ-প্রণীত "পজিটিভ্ ব্যাক্গ্রাউণ্ড অব্ হিন্দু সোসিঅলজি" অর্থাৎ "হিন্দু সমাজের বাস্তব ভিত্তি" নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। তাহাতে এই লড়াইয়ের সূত্রপাত করা হইয়াছে।

এই পৌনে এগার বৎসরে,—অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে,—বিদেশের সর্ব্বত্র সেই লড়াইকে সমাজ-বিজ্ঞানের আসরে আসরে আনিয়া হাজির করিয়াছি। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-বৈঠকে এই বাণী শুনানো হইয়াছে। মার্কিন সমাজের উচ্চতম বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় পত্রিকায় এই সংগ্রাম গিয়া ঠাঁই পাইয়াছে (১৯১৬-১৯২০)।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-ফ্যাকাল্টিতে এই লড়াই ঘোষণা করা হইয়াছে ফরাসী ভাষায়। "আকাদেমি দে সিয়ঁাস্ মোরাল্ এ পোলিটিক" নামক রাষ্ট্রবিজ্ঞান-পরিষদের "চল্লিশ অমরের" কানেও এই বাণী প্রবেশ করিয়াছে। পরে এই পরিষদের পত্রিকায় প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে (১৯২১)।

জার্ম্মাণ সমাজেও,—জার্ম্মাণ ভাষায়—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লড়াই উঠাইতে কসুর করি নাই। বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্ম্মাণির রাষ্ট্র-সাহিত্য এই সকল তথ্যের আবহাওয়ায় আসিয়া পড়িয়াছে (১৯২২-১৯২৩)।

যুবক ভারতের সংগ্রাম-দূত রূপেই এই অধম লেখক জগতের পণ্ডিত মহলে পরিচিত। "যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল, তোমারি কার্য্য সাধিবে,—" এই মাত্র ভরসা।

১৯২২ সালে লাইপ্ৎসিগ সহরে "পোলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশ্যন্‌স্ অ্যাণ্ড

থিয়োরিজ্ অব্ দি হিন্দুজ্" অর্থাৎ "হিন্দু জাতির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র-দর্শন" নামক ইংরেজি গ্রন্থ প্রচারিত করিয়াছি।

এক্ষণে তাহার প্রথম অংশের খানিকটা বাংলায় লিখিবার সুযোগ পাওয়া গেল। বর্ত্তমান গ্রন্থে হিন্দুজাতির রাষ্ট্রীয় "চিন্তা" বা "রাষ্ট্র-দর্শন" সম্বন্ধে কোনো কথা নাই। অধিকন্তু "প্রতিষ্ঠানে"র বৃত্তান্ত হিসাবেও এই কেতাবের মাল পূর্ব্বোক্ত ইংরেজি রচনার মাল হইতে কিছু কিছু পৃথক্। যাহা হউক,—বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের আনুকূল্যে এই গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ জুটিয়াছে বলিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছি।

ইতিমধ্যে ১৯২১ সালে "পজিটিভ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে। তাহাতে আছে একমাত্র "রাষ্ট্র-দর্শন" আর প্রধানতঃ শুক্রাচার্য্যের মতামতই তাহার ভিতর ঠাঁই পাইয়াছে।

আথেনীয় "স্বরাজের" অনুপাত

ভারতে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পঠন-পাঠন আজকাল কতটা হয় বলিতে পারি না। এই বিদ্যা বিষয়ক এম, এ পরীক্ষা পূর্ব্বে ছিল। এখনো আছে নিশ্চয়। বোধ হয় আজকাল পি, এইচ্, ডি ও চলে।

(১)

কিন্তু গোড়ায় গলদ। এশিয়ার সঙ্গে তুলনায় গ্রীস, রোম এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপকে পশ্চিমা পণ্ডিতেরা যে চোখে দেখিয়া থাকেন আমরাও বিনা বাক্য ব্যয়ে গোলামের মতন ঠিক সেই চোখেই দেখিতে শিখিয়াছি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার ইয়োরোপকে রক্ত-মাংসের মানুষ ভাবে দেখিবার এবং বুঝিবার চেষ্টা আমরা করি নাই।

তাহার জন্য অনুসন্ধান "রিসার্চ" গবেষণা আবশ্যক। সেদিকে ভারতবাসীর খেয়াল কৈ?

ইয়োরোপকে কথায় কথায় আমরা "স্বরাজে"র মুল্লুক, "স্বাধীনতা"র মুল্লুক, "জাতীয়তার মুল্লুক", "গণ-তন্ত্রে"র মুল্লুক, "আইনে"র মুল্লুক, "ঐক্যের" মুল্লুক, "শান্তি"র মুল্লুক ইত্যাদি রূপে বিবৃত করিতে অভ্যস্ত। আসল নিরেট সত্য গুলা কি? প্রায় এক দম উল্টা।

(২)

আথেনীয় সমাজে ২৫০০০ নরনারী মাত্র স্বাধীন স্বরাজী এবং গণতন্ত্রী,—চরম উন্নতির যুগে—অর্থাৎ পেরিক্লেসের আমলে (খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী)। "অনধিকারী" "গোলাম" "প্যারিয়া" তখন কত জন? চার লাখ।

মানবজাতির রাষ্ট্র-সাধনার তরফ হইতে এই অনুপাতটা কি বড় লোভনীয় চিজ? চার লাখ নরনারীকে "বাঁদি" করিয়া রাখিয়া পঁচিশ হাজার হিন্দু সেকালে কি কখনো কোথাও আত্ম-কর্ত্তৃত্ব এবং স্বাধীনতা ও সাম্য ফলাইতে পারে নাই? পঁচিশ হাজার লোকের সাম্য, স্বাধীনতা, স্বরাজ বস্তুটার ভিতর মানব সমাজের কোন স্বর্গ লুকাইয়া আছে?

প্রশ্নটাকে গভীর ভাবে আলোচনা করিবার জন্য খতাইয়া দেখিতে হইবে আথেন্স (আটিকা) রাষ্ট্রের চৌহদ্দি কতটুকু ছিল। আথেন্সের গৌরব যুগই বা ইতিহাসের কত বৎসর কত মাস কত দিন? বুঝা যাইবে যে,—এশিয়ানদের তুলনায় আথেনিয়েরা "অতি-মানুষ" ছিল না।

(৩)

কিন্তু ডিকিন্সন, গিল্‌বার্ট মারে, ব্যরি ইত্যাদি গ্রীকতত্ত্বের পাণ্ডারা ভারতসন্তানকে চোখে আঙ্গুল দিয়া সে সব কথা বুঝাইয়া দিতেছেন কি?

না! এরূপ বুঝানো তাঁহাদের স্বার্থ নয়। এই ধরণের তথ্য তাঁহাদের রচনায়ও পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবাসী শিখিয়াছে ঠিক উল্টা।

এই সকল ইংরেজ এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয়ান গ্রীক-তত্বজ্ঞ, প্রত্যেকেই এক একটি লর্ড কার্জ্জন! অর্থাৎ বর্ত্তমান এশিয়াকে ইয়োরোপের গোলাম রূপে পাইয়া তাঁহারা সেকালের প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যে ও আকাশ-পাতাল পার্থক্য আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন!

এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো ভারতবাসীর মাথা খেলিয়াছে কি? "গ্রীক-তত্বে"র ভিতরে আধুনিক "ইম্পীরিয়্যালিজ্‌ম্"—শ্বেতাঙ্গপ্রাধান্য ও এশিয়া-বিদ্বেষের দর্শন অতি সূক্ষ্ম ভাবে অসংখ্য বুজরুকি সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহা সন্দেহ করা পর্য্যন্ত বোধ হয় কোনো ভারত সন্তানের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

ইয়োরোপের ঐতিহাসিক ভুগোল ও রাষ্ট্রীয় ধারা

তারপর অন্যান্য কথা। ধরা যাউক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিষয়। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংরেজরা বিজিত "পরাধীন" জাতি। অর্থাৎ বর্ত্তমান গ্রন্থে ভারতের যে যে যুগ বিবৃত হইতেছে তাহার প্রায় সকল ভাগেই ইংরেজজাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছিল না। আইরিশ ঐতিহাসিক গ্রীণ একথা খুলিয়াই বলিয়া দিয়াছেন।

যে হিসাবে আজকালকার দিনে "জাতীয়তা" বুঝা হইয়া থাকে সে চিজ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইয়োরোপের অধিকাংশ জনপদেই অজ্ঞাত ছিল। ইংরেজ পণ্ডিত ফ্রীম্যান প্রণীত "ইয়োরোপের ঐতিহাসিক ভূগোল" (লণ্ডন ১৯০৩) ঘাঁটিলেই বুঝা যায় "কত ধানে কত চাল।"

অধিকন্তু, ইংল্যাণ্ডই ইয়োরোপের এক মাত্র দেশ নয়। আর, সর্ব্বত্রই "মাৎস্য-ন্যায়" আর বংশে বংশে "ষাঁড়ের লড়াই" ইতিহাসের প্রধান তথ্য।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, "ন্যাশন্যালিটী" ইত্যাদি বোল চাল "খৃষ্টিয়ান" অভিজ্ঞতায় মিলে কি? মিলে না। তুর্ক্-মুসলমানেরা যখন ইয়োরোপকে ছারখার করিয়া ছাড়িতেছিল তখন খৃষ্টিয়ান হ্বেনিস তাহাদের সঙ্গে দোস্তি পাতাইতে লজ্জা বোধ করে নাই।

আলেকজান্দারের আমল হইতে বুর্বঁ আমল পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়ানরা আত্মকর্তৃত্বহীন স্বরাজ-শূন্য পরপীড়িত জাতি। বাদশার যথেচ্ছাচার আর জমিদারের অত্যাচার ছিল এই সকল নরনারীর সনাতন "কন্‌ষ্টি-টিউশ্যন্" বা রাষ্ট্র-ধর্ম্ম।

নারীজাতীকে বে-ইজ্জৎ করিতে গ্রীক আইন, রোমাণ আইন এবং "খৃষ্টিয়ান" আইন সমান ওস্তাদ। ইয়োরোপীয়ান "সমাজে" নারীর ঠাঁই কোনো দিনই সম্মান সূচক বা এমন কি "সহনীয়"ও ছিল না। কথাটা বোধ হয় বিশ্বাসযোগ্যই বিবেচিত হইবে না। জার্ম্মাণ পণ্ডিত বেবেলের গ্রন্থ ঘাঁটিয়া দেখিলেই আপাততঃ চলিবে। পরে আর ও "ইণ্টেন্‌সিহ্ব্" "রিসার্চ্চ" বা গভীরতর খোঁজ চালানো যাইতে পারে।

ভূমি-গত গোলামী ইয়োরোপীয়ান কিষাণ সমাজ হইতে বিদূরিত হইয়াছে কবে? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। লাম্‌প্রেক্‌ট্, ব্যিশ্যর, সোম্বার্ট ইত্যাদি জার্ম্মাণ পণ্ডিত-প্রণীত আর্থিক ইতিহাস বিষয়ক রচনা গুলা পাকা সাক্ষ্য দিবে। এখনো ইতালিতে, পোল্যাণ্ডে এবং বল্কান অঞ্চলে সেই ভূমি-গোলামি কিছু কিছু চলিতেছে।

পাশ্চাত্য দণ্ড-বিধি

দণ্ড-বিধি বা পেন্যাল কোডের আইনে ইয়োরোপীয়ানরা মহা সভ্য, না? সেকালের গ্রীসে দ্রাকো-সংহিতা জারি ছিল। আথেন্সের ঋণ-কানুন ছিল পাশবিক। সে কালের রোমে ছিল 'দ্বাদশ বিধান" প্রচলিত। মধ্যযুগের খৃষ্টিয়ান রাষ্ট্রে "ইনকুইজিশ্যন" নামক নির্য্যাতন বিধি ও "আইন সঙ্গত" ব্যবস্থাই বিবেচিত হইত।

পরবর্ত্তী যুগের সাক্ষ্য দেখিতে পাই জার্ম্মাণির ন্যুর্ণব্যর্গ সহরে। এই নগরের দুর্গে "ফোল্টার-কাম্মার" বা নির্য্যাতন-ভবন আজও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয়ান দণ্ড-প্রণালীর সাক্ষী ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ভেনিসের দজে-প্রাসাদে ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালিয়ান বিচার-জুলুম মূর্ত্তিমান রহিয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থের বহর খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইয়োরোপের সমসাময়িক আইন গুলা ধারায় ধারায় আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে,—অত্যাচারী, নির্য্যাতন-প্রিয়, নিষ্ঠুরতার অবতার বেশী কাহারা। "সাইকলজি" বা চিত্ত-বিজ্ঞানের আসরে প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যে কোনো তফাৎ চালানো সম্ভবপর কিনা তাহার "বাস্তব" প্রমাণ হাতে হাতে ধরা পড়িবে।

আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। সপ্তদশ অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইংরেজ সমাজে কিরূপ আইন ছিল? "কেম্ব্রিজ মডার্ণ হিষ্টরি" নামক গ্রন্থে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত আছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের বিলাতী পেন্যাল কোডে অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে ২৫০টা অপরাধের তালিকা দেখা যায়। এই সকল অপরাধের একমাত্র সাজা প্রাণ-দণ্ড।

পরবর্ত্তী কালে যে সকল অপরাধকে অতি সামান্য বিবেচনা করা হইয়াছে সেই সকল অপরাধের জন্য ১৪০০ ইংরেজ নরনারীকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল ১৮১৫ হইতে ১৮৪৫ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসরের ভিতর। কোনো দোকানের জানালা ভাঙ্গিয়া দু এক আনা দরের রং চুরি করার অপরাধেও শিশুদের প্রাণ যাইত! হিন্দু নরনারীর দণ্ডবিধিতে কি এই তালিকা ছাপাইয়া উঠিবার প্রমাণ দেখা যায়?

যাঁহাদের পক্ষে "ক্রিমিনলজি" বা অপরাধ-বিজ্ঞান এবং বিশেষজ্ঞ-প্রণীত অন্যান্য আইন-কেতাব সংগ্রহ করা কঠিন তাঁহারা ঘরে বসিয়া অধম-তারণ "এন্‌সাইক্লোপীডিয়া"টা "ঘাঁটকাইতে" পারেন।

"বাপরে! গ্রীস?" "বাপরে! রোম?"

ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ দফায় দফায় খুঁটিয়া খুঁটিয়া মাপিয়া জুকিয়া আলোচনা করা দরকার। ইয়োরোপীয় সভ্যতা, দর্শন, ইতিহাস, সুকুমার শিল্প, ধর্ম্মকর্ম্ম ইত্যাদিতে যাঁহাদের দখল নাই তাঁহারা ভারতীয় জীবন চর্চ্চা করিতে অনধিকারী। একমাত্র ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের জোরে সেকালের ভারতখানাকে "বুঝা" সম্ভবপর নয়।

(১)

ইয়োরোপীয়ান পণ্ডিতদের ভিতর যাঁহারা "ভারত তত্ত্বের" আলোচনা করেন তাঁহারা ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মহা পণ্ডিত নন। তাঁহারা সংস্কৃত পালি আরবী ফার্শী ইত্যাদি ভাষা জানেন বটে। এই সকল ভাষায় প্রচারিত পুঁথি ঘাঁটা ঘাঁটি করিবার বিদ্যায় তাঁহাদের কাহারও কাহারও অভিজ্ঞতাও আছে প্রচুর সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই না জানেন নৃ-তত্ত্ব, না জানেন চিত্ত-বিজ্ঞান। কি সঙ্গীত, কি চিত্রকলা, কি আইন, কি তর্ক-প্রণালী, কি ধনদৌলত,

কি নগরজীবন, কি শিক্ষা-প্রণালী, কি পদার্থ-বিজ্ঞান, কি দর্শন-শাস্ত্র এই সকল বিষয়ের ইয়োরোপীয় ধারা সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেকেই অনভিজ্ঞ। কথাটা ভারতবাসীর মরমে প্রবেশ করিবে কি ?

ইংরেজ গাড়োয়ানরা শেকস্‌পীয়ারের ভাষায় কথা বলিতে পারে, হাসি-ঠাট্টাও করিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া ইংরেজ মাত্রকেই শেকস্‌পীয়ার সম্বন্ধে ওস্তাদ বিবেচনা করা চলিবে কি ? হিন্দু মাত্রেই "মহাভাষ্য" "সূর্য্য সিদ্ধান্ত" আর "সঙ্গীত-রত্নাকর" ইত্যাদি গ্রন্থের "বোদ্ধা" বিবেচিত হইবে কি ? সেইরূপ জার্ম্মান, ইংরেজ, ফরাসী, ইতালিয়ান, মার্কিন, রুশ ইত্যাদি ভারত-তত্ত্বের বেপারীরা ইয়োরামেরিকায় জন্মিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম, গ্রীক দর্শন, রোমান আইন, রেণেসাঁস যুগের স্থাপত্য, বুর্ব রাষ্ট্রনীতি, সমাজে পাশ্চাত্য নারীর ঠাঁই আর ইয়োরোপীয় কিষাণদের আর্থিক অবস্থা সবই বুঝেন এইরূপ বিশ্বাস করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। এই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এক একটা স্বতন্ত্র বিদ্যা। তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "লেখাপড়া", গবেষণা, অনুসন্ধান চালানো দরকার।

অর্থাৎ পশ্চিমা "ইণ্ডলজিষ্ট"রা আজ পর্য্যন্ত ভারত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন সবই "আলোচ্য বিষয়টার বিজ্ঞানের" কষ্টি-পাথরে ঘষিয়া দেখিতে হইবে। সংস্কৃত ফার্শী তাঁহারা যতই জানুন না কেন প্রত্যেক মিঞাকেই "বাজাইয়া" দেখা আবশ্যক। আমাদের ভাষায় তাঁহাদের দখল আছে বলিয়া তাঁহাদের পা চাটিতে অগ্রসর হওয়া আহাম্মুকি। পরিবার, সমাজ, ধনদৌলত, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদি তাঁহারা কতটা বুঝেন তাহার খতিয়ান আগে হওয়া আবশ্যক। তাহার পর ভারতীয় জীবন ও সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত আলোচনা করা যাইতে পারে।

(২)

এই গেল বিদেশী ভারত-তত্ত্বজ্ঞদের কথা। ভারতীয় ভারত-তত্ত্বজ্ঞদের অবস্থা কিরূপ? কেবল ভারত-তত্ত্বজ্ঞ কেন, আমাদের যে-কোনো লাইনের চরম পণ্ডিতেরাও ইয়োরোপীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আদর্শ এবং চিন্তা-প্রণালীর বিকাশ ধারা সম্বন্ধে প্রায় পূরাপূরি অজ্ঞ। কথাটা শুনাইতেছে খুবই কড়া। কিন্তু ভারতসন্তান বুকে হাত দিয়া বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ভারতীয় পাণ্ডিত্য তলাইয়া মজাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। দেখা যাইবে,—কেন এই কথাটা "ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়" না করিয়া খুলিয়া বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম না।

ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কেতাব মুখস্থ করিয়াছেন আমাদের অনেকেই। একথা অজানা নাই কাহারও। কিন্তু চাই "স্বাধীন" ভাবে "ভারতীয় স্বার্থে" ইয়োরামেরিকার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ক্ষমতা। পশ্চিমারা যেমন "ভারত-তত্ত্ব" "প্রাচ্য-তত্ত্ব" ইত্যাদি বিদ্যা কায়েম করিয়া নিজেদের জ্ঞান-মণ্ডল বাড়াইয়া তুলিতেছে ভারত-সন্তান সেইরূপ ইয়োরামেরিকা-তত্ত্ব বা পাশ্চাত্য-তত্ত্ব গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে কি? সেই ক্ষমতা সৃষ্টি করিবার জন্য ভারতে ব্যবস্থা কোথায়?

(৩)

এই অজ্ঞতা যতদিন থাকিবে ততদিন ভারতবাসী ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা সাধন করিতে ভয় পাইবে। "বাপ্‌রে! গ্রীস?" "বাপ্‌রে! রোম?" এইরূপ থাকিবে ততদিন ভারতীয় পণ্ডিতদের চিন্তা প্রণালীর ঢঙ্।

আর ততদিন ভারতবাসী ভারতীয় সভ্যতাকে "আধ্যাত্মিক" হিসাবে ইয়োরোপীয়ান সভ্যতা হইতে উচ্চতর ভাবিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া

গোঁফে চাঁড়া মারিতে লজ্জা বোধ করিবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কাপুরুষতা। রণে ভঙ্গ দেওয়ার নামান্তর ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়।

কিন্তু কাপুরুষতা দেখাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। গ্রীক সাহিত্য ল্যাটিন সাহিত্য এবং মধ্যযুগের ইয়োরোপীয়ান সাহিত্য,—মূলেই হউক বা অনুবাদেই হউক,—যুবক ভারতে সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত হইতে থাকুক। রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে সেকালের হিন্দু নরনারীর সু-কু সম্বন্ধে,—মায় তথাকথিত "জাতিভেদ" সম্বন্ধে ও একালের ভারত-সন্তানকে লজ্জিত হইতে হইবে না।

যুবক এশিয়ার দায়িত্ব

দুনিয়ায় আঁধারই বেশী। ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু "জ্যোতি" "সৎ" ও "অমৃত" আনিবার লড়াই জগতে দেখা গিয়াছে তাহাতে ইয়োরোপীয়ান "রাষ্ট্র-যোগে"র দান নিন্দা করিতে বসা মুখ্খুমি। আবার সেই লড়াইয়ে হিন্দু রাষ্ট্র-সাধনার ন্যায্য ইজ্জৎ দাবী করিতে না পারাও মুখ্খুমি মাত্র নয়,—গোলামি।

প্রাচ্য সংসারে ইয়োরোপীয়ান সংসার অপেক্ষা বেশী অন্ধকার বিরাজ করিত না। একথা স্বীকার করা পশ্চিমাদের স্বার্থ নয়। বিজ্ঞানের তর্কশাস্ত্রকে একমাত্র সহায় লইয়া যুবক এশিয়াকে এই পথে বহুকাল একাকী বিচরণ করিতে হইবে।

দুজন একজন করিয়া পশ্চিমা পণ্ডিত ও হয়ত ক্রমশঃ এই পথের দিকে ঝুঁকিতে থাকিবেন। তাহার পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। গড়ন-বিজ্ঞানের বিচারে হিন্দু নরনারীকে একঘরে করিয়া রাখা আর বেশী দিন সম্ভবপর হইবে না

তবে কুসংস্কারের মাত্রা বিজয়-গর্ব্বে অন্ধীকৃত পশ্চিমা বিজ্ঞান-মহলে এখনো অতি গভীর। "এ সব দৈত্য নহে তেমন!" "লেগেসি অব্ গ্রীস" অর্থাৎ "সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীক জাতির দান" নামক সদ্য-প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধ-সঙ্কলন-গ্রন্থের সুর দেখিলে পণ্ডিত মহাশয়দের বাড়াবাড়ি বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য 'শহ্বিনিজ্ম্' বা হাম্-বড়ামি এই কেতাবের আবহাওয়ায় চরম ভাবে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই হাম্-বড়ামির দাঁত ভাঙিয়া দেওয়া যুবক এশিয়ার অন্যতম দায়িত্ব।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের তর্ক-শাস্ত্র

(১)

বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রধান কথা হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন। এই জন্য রাষ্ট্রীয় লেনদেন বিষয়ক তথ্য গুলার দাম বাহির করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছে। জীবনের গতি-ভঙ্গীর সঙ্গে এই সকল তথ্যের সম্বন্ধ কিরূপ? এই প্রশ্নই তথ্যের দর-কষাকষি সমস্যার অর্থাৎ "ব্যাখ্যা"-সমস্যার আসল প্রশ্ন।

এই খানেই তর্ক-প্রণালী বা আলোচনা-প্রণালী লইয়া ঘাঁটা ঘাঁটি করিতে হইয়াছে। ইয়োরোপের আর্থিক ইতিহাস, শাসন-বিষয়ক ধারা, আইনের বিধান সবই আসিয়া জুটিয়াছে। নৃতত্ত্বের ছাপ, চিত্তবিজ্ঞানের প্রভাব আর দুনিয়ার আবহাওয়া এই সকল সূত্রে হাজির হইতে বাধ্য।

তুলনা-মূলক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের উপকরণ কিছু কিছু সঞ্চিত করা গিয়াছে। এমন কি রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিদ্যার ভূমিকা স্বরূপই এই কেতাবের বিভিন্ন অধ্যায় গৃহীত হইতে পারে। রাষ্ট্র-বস্তুটা কি, রাষ্ট্র শাসন কাহাকে বলে এই সকল কথা দফায় দফায় কাটিয়া ছিঁড়িয়া বিশ্লেষণ করিবার দিকে দৃষ্টি রহিয়াছে।

কোন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই দেওয়া হয় নাই। যে প্রদেশে অথবা যে যুগে প্রতিষ্ঠানটাকে যথাসম্ভব পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে পাকড়াও করিতে পারিয়াছি একমাত্র সেই প্রদেশ বা সেই যুগের সাক্ষ্যই লওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক প্রদেশ এবং প্রত্যেক যুগ হইতে রগড়াইয়া রগড়াইয়া তথ্য বাহির করিতে প্রয়াসী হইলে প্রত্যেক অধ্যায় লইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের আকারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। কোনো কোনো পরিচ্ছেদ লইয়াও স্বতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। সেই প্রয়াস করা কর্ত্তব্য ও বটে।

মোটের উপর হাজার দুই পৃষ্ঠা লিখিবার মতন মালমশলা আছে। তবে বর্ত্তমান গ্রন্থের মতলব তাহা নয়। এই উদ্দেশ্যে পাঁচ ছয় জন লেখক তিন তিন বৎসর করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে একত্রে খাটিলে বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব গ্রন্থমালা দেখা দিতে পারে।

এই কেতাবকে বহরে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র করা হইয়াছে আর এক উপায়ে। "লিপি"-সাহিত্য অথবা অন্য কোনো প্রমাণ-ভাণ্ডার হইতে লম্বা লম্বা বিবরণ উদ্ধৃত করা হয় নাই। এই সকল সুবিস্তৃত বিবরণের ভিতর সাধারণতঃ হয়ত বা কেবল মাত্র একটা বিশেষণে বা একটা ক্রিয়াপদে আসল কাজের কথা থাকে। বর্ত্তমান রচনায় সেই বিশেষণটা অথবা ক্রিয়াপদটা মাত্র—তাহাও আবার অনেক স্থলেই মূলের আকারে নয়,—খাঁটি বিংশ শতাব্দীর ঘাট মাঠের বাংলায়,—আনিয়া খাড়া করিয়াছি।

লম্বা লম্বা মৌলিক বৃত্তান্ত এবং তাহার দশগজি চওড়া তর্জ্জমা প্রত্নতত্ত্বের গ্রন্থে বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু জীবন-তত্ত্বের বেপারীর পক্ষে "ভিতরকার কথাটা" টানিয়া বাহির করাই বিজ্ঞান-চর্চ্চার একমাত্র লক্ষ্য। প্রত্নতত্ত্বের হাবিজাবি জবরজঙ্ ল্যাবরেটরিতে বা কর্ম্মশালায়

রাখিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখাইতেছি কেবল মাত্র হিন্দু নরনারীর রাষ্ট্রীয় রক্ত-তরঙ্গ।

গ্রন্থ-পঞ্জী

দেশী-বিদেশী পণ্ডিতেরা যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা সবই বোধ হয় পড়িয়া দেখিয়াছি। তাঁহাদের আলোচনা-প্রণালীর সঙ্গে অথবা সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলুক বা না মিলুক প্রায় প্রত্যেককেই বোধ হয় অগ্রজ হিসাবে ইজ্জৎও দিতে ত্রুটি করি নাই। তাঁহাদিগকে "ফুটনোটের" পায়ের গোড়ায় ফেলিয়া না রাখিয়া কেতাবের মালের সঙ্গেই তাঁহাদের নাম গাঁথিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিশেষতঃ, বর্ত্তমান গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হইতেছে বলিয়া গ্রন্থকারের একটা নতুন রকমের দায়িত্বও আছে। "বাংলা সাহিত্যের" সঙ্গে দেশী বিদেশী পণ্ডিত গণের "আবিষ্কৃত" ভারত-তত্ত্বের পরিচয় এক প্রকার নাই বলিলেই চলে।

কোলব্রুক, মেইন, জিব্‌লাঁ, সেনার, ফয়, হিল্লেব্রাণ্ট, ষ্টাইন ইত্যাদি বিদেশী ইণ্ডলজিষ্টদের নাম বাঙ্গালী বাংলা ভাষার সাহায্যে জানিতে পারে না। এমন কি রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়, কৃষ্ণস্বামী আয়্যাঙ্গার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি ভারতীয় সুধীর রচনা ও বঙ্গসাহিত্যে অজ্ঞাত। একমাত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহার অন্যতম ইংরেজি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক "প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি" নামে বাংলায় অনূদিত হইয়াছে (১৯২৩)।

বাঙালী পাঠকগণের সঙ্গে এই সকল এবং অন্যান্য লেখকের রচনার সংযোগ স্থাপন করা অন্যতম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছি :

(২)

তাহা ছাড়া গ্রীস্, রোম, এবং ইয়োরোপীয় মধ্যযুগ ও বর্ত্তমান জগৎ সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, আইন, রাজস্ববিজ্ঞান, পল্লী-স্বরাজ, রণনীতি, নগরজীবন, ভূমিবিধান ইত্যাদি বিষয় লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের যে সকল রচনা আছে সে সব ত বাঙালীর সাহিত্যে একদম অজানা। কতকগুলা গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নাম "এক কথায় পরিচয়ের" সহিত কেতাবের ভিতর যথাস্থানে বসাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

শ্মেমান, রামজে, আর্নল্ড, জেঙ্ক্স্, হ্বাল্‌শ্, ব্রিসো, জোসেফ-বার্থেলোম, লরোআ-ব্যোলিয়্যো, গুড্‌নো, হ্বিলোবি, গম, হ্বিনোগ্রাদফ্, হেপ্‌কে, গের্ডেস, হাইল, লোহ্বি, হোল্ডস্‌হ্বার্থ ইত্যাদি নানা "অকথ্য" নামে কেতাবের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের চৌহদ্দি বুঝিবার পক্ষে বাঙালী পাঠকের সাহায্য হইবে আশা করি। বাংলা সাহিত্য যে কত দরিদ্র তাহাও প্রত্যেক সুবিবেচকেরই সহজে মালুম হইবার কথা।

বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচনায় যে সকল বিদেশ-বিষয়ক গ্রন্থ কাজে লাগে তাহার কয়েকটা ইতিমধ্যে বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। নিম্নে এই গুলার নাম প্রদত্ত হইল :—

১। গীজো—প্রণীত "ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস" (ফরাসী গ্রন্থ)
অনুবাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

২। এঙ্গেল্স্—প্রণীত "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" (জার্ম্মাণ গ্রন্থ)
অনুবাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার

৩। লাফার্গ—প্রণীত "ধনদৌলতের রূপান্তর" (ফরাসী গ্রন্থ)
অনুবাদক ঐ

গ্রন্থ তিনটাই যন্ত্রস্থ।*

* তিনটাই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে (১৯২৬-৭)

যুবক ভারতের ইজ্জৎ রক্ষা

এই পৌণে এগার বৎসর ধরিয়া বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে বুঝাপড়া চলিতেছে অতি সজাগ ভাবে। পর্য্যটনের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ প্রকার তথ্য-সঙ্কলন, তথ্যের ব্যাখ্যা, জীবন-সমালোচনা আর দার্শনিক তর্কপ্রশ্ন জুটিয়াছে পর্ব্বত-প্রমাণ।

তাহার ভিতর সিদ্ধান্ত ও সমন্বয় বেশী আছে কি সংগ্রাম ও সংশয় বেশী আছে বলা কঠিন। তবে সর্ব্বত্রই ঝড় বহিয়া যাইতেছে।

প্রায় পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা বাংলায় এবং তিন হাজার পৃষ্ঠা ইংরেজিতে এই সকল দুনিয়া-জোড়া অভিজ্ঞতা মূর্ত্তি পাইয়াছে। তাহার চাপ,—ঝড় তুফানের ঝাপ্‌টা সমেত,—বর্ত্তমান গ্রন্থের ক্ষুদ্র কলেবরকেও বোধ হয় কিছু কিছু সহিতে হইল।

এক ঢিলে অনেক পাখী মারিতে চেষ্টা করিয়াছি। রচনার অধ্যায়ে অধ্যায়ে বহু ত্রুটি রহিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

আগামী দশ বৎসরের ভিতর এই কেতাবের "হুঁকো-নল্‌চে দুইই বদলানো" আবশ্যক হইলে যুবক ভারতের ইজ্জৎ রক্ষা পাইবে। এই বুঝিয়া বাঙলার বিজ্ঞান-সেবীরা এবং বিদ্যা-"সংরক্ষকে"রা ভাবুকতার বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

বোৎসেন, ত্রেন্তিনো (ইতালি)

১৪ নবেম্বর ১৯২৪

জাপানে-চীনে বৎসর দেড়েক

১। ভারতবাসীর জাপান-গবেষণা

(১)

অনেক ভারতসন্তানই জাপান দেখিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীরা জাপান সম্বন্ধে কমবেশী আলোচনাও করিয়া থাকেন। কাজেই জাপান সম্বন্ধে এই কেতাব একমাত্র রচনা নয়।

প্রথমবার জাপানে পৌঁছি হনলুলু হইতে—১৯১৫ সালের জুন মাসে। কাটাইয়াছিলাম মাস তিনেক। দ্বিতীয়বার আসি ১৯১৬ সালে চীন হইতে। কাটিয়াছিল চার মাস (জুলাই—অক্টোবর)।

এই কেতাবে প্রথমবারকার বিবরণ আছে। কাজেই বইটাকে "জাপানে তিন মাস" রূপে বিবৃত করা চলে।

তখন ফরাসী বা জার্ম্মাণ জানিতাম না। জাপানী ভাষাত কোন দিনই জানি না। একমাত্র ইংরেজির উপর ভর করিয়া তিন মাসে জাপানের যতটুকু হজম করা সম্ভব তাহার বেশী এই গ্রন্থের সম্পত্তি নয়।

(২)

ভারতবাসী জাপান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া থাকেন :—"জাপানীরা এশিয়ার মিত্র না শত্রু?" এই প্রশ্নের জুড়িদার আর একটা প্রশ্ন তুলিলেই সমস্যাটা সহজ হইবে। জিজ্ঞাসা করা যাউক—"জার্ম্মাণরা ইয়োরোপের শত্রু না মিত্র?" "ইংরেজরা ইয়োরোপের শত্রু না মিত্র?" "ফরাসীরা ইয়োরোপের শত্রু না মিত্র?"

"নবীন এশিয়ার জন্মদাতা,—জাপান" গ্রন্থের ভূমিকা।

এই ধরণের প্রশ্নের যে জবাব জাপান সম্বন্ধেও সেই জবাব। কেতাবের স্থানে স্থানে তাহার আলোচনা করা গিয়াছে।

জাপানীরা বৌদ্ধ বলিয়া বৌদ্ধ মাত্রেই জাপানকে বন্ধু বা মুরুব্বি বিবেচনা করিবে একথা বলিবে কেবল পাগলেরা। জাপান এশিয়ার একটা দেশ। তাই বলিয়া জাপানীরা সকাল বিকাল সন্ধ্যায় এশিয়ার হিত চিন্তা করিবে ইহাও রাষ্ট্রনীতিবিৎ বিবেচনা করিতে পারে না।

রাষ্ট্র-মণ্ডলে "খৃষ্টীয় ঐক্য" "ইয়োরোপীয় ঐক্য" "পাশ্চাত্য ঐক্য" "শ্বেতাঙ্গ ঐক্য" ইত্যাদি তথাকথিত ঐক্যগুলা যেরূপ মিথ্যা কথা "বৌদ্ধ ঐক্য" "মুসলমান ঐক্য" "এশিয়ার ঐক্য" "প্রাচ্য ঐক্য" ইত্যাদি ঐক্যগুলাও সেইরূপ শব্দ মাত্র এবং মিথ্যা। খৃষ্টানের বিরুদ্ধে খৃষ্টান লড়িয়াছে ও লড়িবে; শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ লড়িয়াছে ও লড়িবে। খৃষ্টানের বিরুদ্ধে খৃষ্টান অ-খৃষ্টানের সাহায্য লইয়াছে ও লইবে, শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ অ-শ্বেতাঙ্গের সাহায্য লইয়াছে ও লইবে।

ঠিক সেইরূপ মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমান, বৌদ্ধের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ, হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু লড়িয়াছে ও লড়িবে। আবার প্রয়োজন হইলে মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমান অ-মুসলমানের, বৌদ্ধের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ অ-বৌদ্ধের, হিন্দুর বিরুদ্ধে হিন্দু অ-হিন্দুর সাহায্য লইয়াছে ও লইবে।

এই সকল কথা মনে রাখিয়া জাপানের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলে যুবক ভারত পদে পদে ভুল করিয়া বসিবে না। রঙের কথা, জাতের কথা, ধর্ম্মের কথা ধামা চাপা রাখিয়া বর্ত্তমান জগতের জীবন-সংগ্রাম বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(৩)

এই গ্রন্থে জাপানের ফ্যাক্টরী, রাষ্ট্র শাসন, সমাজ কথা ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল অভিজ্ঞতা বিবৃত করা হইয়াছে, তাহার অনেকাংশই

আজ ১৯২৩ সালে অতি পুরাণা সেকেলে কথা। ১৯১৫—১৬ সালে দুনিয়ায় মহালড়াই চলিতেছিল, তখন জাপান এশিয়ায় এবং দক্ষিণ আমেরিকায় হুহু করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে বাড়িয়া চলিতেছিল। ১৯১৮ সালে লড়াই থামিবার পর হইতে সেই বাড়্‌তি থামিয়াছে।

অধিকন্তু ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনে যে বিশ্ব-সম্মেলন ডাকিয়াছিল, তাহাতে প্রশান্ত মহাসাগরে ও চীনে জাপানকে যারপর নাই খর্ব্ব হইতে হইয়াছে। ইংরেজের সঙ্গে জাপানের যে সন্ধি ছিল সেই সন্ধির উপর বিশ্বাস রাখা জাপানের পক্ষে আর চলে না। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ এবং ইয়াঙ্কি দুইয়ে মিলিয়া জাপানকে কুপোকষা করিতে ব্রতবদ্ধ দেখা যাইতেছে।

এদিকে দুনিয়ার সর্ব্বত্র যেমন, জাপানেও তেমন বোলশেভিক আন্দোলন দেখা দিয়াছে। শ্রমিকেরা ধনিকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনে জাপানী রাষ্ট্রকে এই কারণে অনেকটা দুর্ব্বলের মতন চলাফেরা করিতে হইতেছে।

তাহার উপর এই মাসের প্রথম সপ্তাহে জাপানকে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত সহিতে হইল। এক সঙ্গে ভূমিকম্প এবং অগ্নিকাণ্ড। লাখ লাখ লোকের মৃত্যু এবং কোটী কোটী টাকার ঘর বাড়ী ও যন্ত্রপাতির সর্ব্বনাশ। ১৯১৫—১৬ সালে যে তোকিও ইয়োকোহামা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার রূপ আগাগোড়া বদলাইয়া গেল বলিয়া মনে হইতেছে।

জাপানের ক্ষতিতে ইংরেজ এবং মার্কিনরা মনে মনে বেশ খুসী। তাহারা ভাবিতেছে "বাঁচা গেল। জাপানের ক্ষতিতে এশিয়াবাসী কিছু দিনের জন্য জগতে নরম হইয়া চলিবে। ভগবান ইয়োরামেরিকাকে আরও কিছু কালের জন্য দুনিয়ায় বিশেষতঃ এশিয়ায় বাধাহীন ভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দিলেন। জাপানীরা নিজ ঘর সামলাইতে এখন

ব্যস্ত থাকিবে। রাষ্ট্রমণ্ডলে জোরের সহিত কথা বলা জাপানের পক্ষে সহজ হইবে না।" কিন্তু এই দৈব দুর্ব্বিপাকে জাপানের ক্ষতি ঠিক কতটা হইয়াছে তাহার আন্দাজ করিয়া উঠা সুকঠিন। তবে কোবে, ওসাকা, নাগোয়া ইত্যাদি শিল্প প্রধান নগরের ফ্যাক্টরীগুলা সবই খাড়া আছে। কাজেই জাপান নেহাৎ একদম কাবু হইয়া পড়িবে না, বিশ্বাস করা চলে।

সকল দিক হইতেই ১৯২৩—২৪ সালের জাপান ১৯১৫—১৬ সালের জাপান হইতে পৃথক। সুতরাং জাপানী জীবনের সঙ্গে নয়া চোখে নয়া সম্বন্ধ পাতাইবার দিন আসিয়াছে। বস্তুতঃ জার্ম্মাণি এবং রুশিয়া এশিয়ার জীবন-স্রোতে আজকাল সম্পূর্ণ নয়া রূপে দেখা দিয়াছে। একমাত্র এই কারণেই এশিয়ায় জাপানের ঠাইটা বুঝিবার জন্য নতুন অভিযান পাঠানো আবশ্যক।

(৪)

১৯১৫—১৬ সালে জাপানকে "নবীন এশিয়ার জন্মদাতা"রূপে অভিনন্দন করিয়াছি। তখনও জাপান সত্য সত্যই এশিয়ার একমাত্র স্বাধীন দেশ ছিল এইরূপও অনেকবার ভাবিয়াছি। আজ ১৯২৩ সালে এশিয়ার অবস্থা অনেকটা উন্নত দেখিতেছি। গ্রীসবিজয়ী কমাল পাশার নেতৃত্বে যুবক তুরস্ক এশিয়ার পূর্ব্ব সীমানায় প্রাচ্য মানবের স্বাধীনতার প্রহরীরূপে বিরাজ করিতেছে। তোকিও এখন আর স্বাধীন এশিয়ার একমাত্র রাজধানী নয়। আঙ্গোরাও এই স্বাধীনতার নবীন কেন্দ্র। এশিয়ার নবশক্তি লাভে জাপানীরাও খানিকটা শক্ত হইবে, যুবক ভারতের পক্ষে এইরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত নয়।

নানা তরফ হইতে জাপানকে বুঝিতে চেষ্টা করা ভারতের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলার প্রত্যেককেই এক একটা

জাপানে পরিণত করা যায় কিনা সেই বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর এক প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। জাপানীরা শিল্পে, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, সমাজে, রাষ্ট্রে যাহা কিছু করিয়াছে তাহার সমান যতদিন পর্য্যন্ত ভারতসন্তানেরা স্বচেষ্টায় সামলাইতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহাদের পক্ষে ইয়োরামেরিকার গণ্যমান্য দেশের উচ্চতর মাপকাঠি চোখের সম্মুখে রাখা মার্জ্জনীয় নয়।

জাপান এশিয়াকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। জাপানের পথে চলিতে অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে এশিয়া ইয়োরামেরিকার সঙ্গে টক্কর দিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কাজেই জাপান নবীন এশিয়ার জন্মদাতা এবং উৎসাহদাতা মাত্র নয়। জাপান যুবক ভারতের, যুবক চীনের, যুবক আফ্‌গানের, যুবক পারস্যের, যুবক মিশরের ও দীক্ষাদাতা এবং শিক্ষাগুরু।

এই ক্ষুদ্র কেতাবে জাপানের পাহাড়, সাগর, বন, নদী, পল্লী, সহর, সবই যথাসম্ভব সিনেমা-চিত্রের মতন পাঠকদের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। যাঁহারা "গৃহস্থ" "উপাসনা" "প্রবাসী" ইত্যাদি মাসিক পত্রে ভ্রমণবৃত্তান্তগুলা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পর্য্যটকের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রত্যেক দেখাশুনা অথবা কথাবার্ত্তা নিজ নিজ অভিজ্ঞতারই অঙ্গ স্বরূপ বিবেচিত হইবে। অন্ততঃ যাহাতে এইরূপ বিবেচিত হয় সেই উদ্দেশ্যে পর্য্যটন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডেই দেশের প্রতি এই দায়িত্ববোধ জাগিয়া রহিয়াছে।

পর্য্যটকের ডায়েরিতে পাঠকেরা কখনও ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবেন, কখনও রাষ্ট্রীয় বিকাশের সমালোচনা পাইবেন, কখনও সাহিত্য

সুকুমার শিল্পের নানা রূপের সহিত পরিচিত হইবেন, কখনো বা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ফ্যাক্টরী কলকারখানার তথ্যতালিকা পড়িবেন। কোন কোন কথা হয়ত পাঠকের পূর্ব্ব হইতে জানা আছে। একদম নতুন কথাও হয়তো দু-চারটা জুটিতে পারে। কোন কোন আলোচনায় হয়তো একটা নতুন ব্যাখ্যাপ্রণালী পাওয়া যাইবে। আবার দু-একটা নতুন গবেষণার ক্ষেত্রই হয়ত কোন কোন কাহিনীতে আবিষ্কৃত হইয়া যাইবে।

কি জাপান, কি চীন, কি মিশর, কি ইংলণ্ড, কি ইয়াঙ্কিস্থান—কোন দেশেই "একচোখো" ভাবে পর্য্যটন করি নাই। সর্ব্বত্রই যথাসম্ভব পুরোপুরি ষোল আনা মানুষটাকেই ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। কাজেই "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর প্রত্যেকটাই বহুত্বময়, নানা কথায় ভরা, "পাঁচ ফুলে সাজি" বিশেষ।

প্রত্যেক দেশকেই অবশ্য একমাত্র সুকুমার-শিল্প, কিম্বা একমাত্র ব্যবসা বাণিজ্য কিম্বা একমাত্র শিক্ষাপদ্ধতি কিম্বা একমাত্র বিজ্ঞান-চর্চ্চা ইত্যাদি বিশেষ কোনো একটা তরফ হইতে যাচাই করিয়া দেখিবার দরকারও আছে। তবে সেইরূপ কোনো একতরফা বিশিষ্ট জরীপ করিবার ভার লইয়া বর্ত্তমান পর্য্যটক দুনিয়ায় বাহির হন নাই।

(৬)

ইয়োরোপীয়ান এবং আমেরিকান পণ্ডিতেরা দুনিয়ার নানা দেশ সম্বন্ধে পর্য্যটন-কাহিনী লিখিয়াছেন। তাহাদের কোন কোনটা অবশ্য ভারতে জানা আছে। লর্ড কার্জ্জন প্রণীত চীন ও পারস্য বিষয়ক কেতাব ভারতবাসী পাঠ করিয়া থাকেন। মান্ধাতার আমলের হুয়েন্থসাঙ ও মার্কো পোলো প্রণীত গ্রন্থাবলী ত সুপরিচিত বটেই। কিন্তু এশিয়ান বা ভারতসন্তান প্রণীত বিদেশবিষয়ক গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যে অতি

অল্পই আছে। বাংলা বা হিন্দী লেখকেরা সাহিত্যের এই বিভাগে যথোচিত দৃষ্টি দেন নাই। "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীকে পাশ্চাত্য পর্য্যটক প্রণীত ভ্রমণসাহিত্য ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলে ভারতের নানা প্রদেশের নানা পণ্ডিত এক অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করিতে উৎসাহী হইতে পারেন। যুবক ভারতের স্বাধীন চিন্তা বিকাশে এবং স্বাধীন রচনা প্রয়াসে বর্ত্তমান পর্য্যটকের অনুসন্ধান ও গবেষণা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবে এবং তাহার ফলে বর্ত্তমান জগৎকে যুবক ভারত শক্ত মুঠার ভিতর পাকড়াও করিতে সমর্থ হইবে,—এই আশা সর্ব্বদাই পোষণ করিয়া আসিতেছে।

বার্লিন, সেপ্টেম্বর, ১৯২৩।

২। একালের চীন*

এই গ্রন্থ শেষ হইয়াছে ১৯১৬ সালের জুন মাসে। তাহার পর পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। এই পাঁচ বৎসরে দুনিয়ার সর্ব্বত্র অনেক ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রভাব চীনেও পৌঁছিয়াছে। বলা বাহুল্য সেই প্রভাবের পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না। তাহার জন্য নূতন পর্য্যটনের আবশ্যক।

এক হিসাবে যাহা পর্য্যটকের ডায়েরি মাত্র আর এক হিসাবে তাহাই সভ্যতা-বিজ্ঞানের বা মানব-তত্ত্বের মশালা বা উপকরণ। "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডগুলা সমাজ-বিজ্ঞানের রসদ জোগাইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে।

প্রায় প্রত্যেক ভ্রমণ-কাহিনীরই এক অংশ বিবরণ মাত্র। পর্য্যটক চোখে যাহা দেখিতেছেন, কাণে যাহা শুনিতেছেন অথবা কেতাবে যাহা

* "বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য" গ্রন্থের ভূমিকা।

পড়িতেছেন তাহা সঠিক বর্ণনা করার দিকে তাঁহার প্রথম ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। অপরদিকে বিবৃত বস্তুগুলার ব্যাখ্যা করা এবং সমালোচনা করার ঝোঁকও কম বেশী সকল লেখকেরই থাকে। এই ব্যাখ্যা-সমালোচনার তরফটা অর্থাৎ কোনো সভ্যতাকে তলাইয়া মজাইয়া বুঝিবার ও বুঝাইবার ধরণ-ধারণটা লেখক মাত্রেরই নিজস্ব। এইখানেই "নানা মুনির নানা মত"।

সম্প্রতি চীনা তথ্যের কথা বলিতেছি। যাঁহারা আমার "চাইনীজ রিলিজ্যন থ্রু হিন্দু আইজ" (হিন্দু চোখে চীনা ধর্ম্ম) পড়িয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সেই গ্রন্থে কন্‌ফিউশিয় মত, শিন্তো, মহাযান, এবং পৌরাণিক-তান্ত্রিক-হিন্দু ধর্ম্মের তুলনায় আলোচনা সম্বন্ধে যে সকল ইঙ্গিত বা বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রাচীন এশিয়া-বিষয়ক কোনো গ্রন্থেই বোধ হয় পাওয়া যায় না। আবার, "বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য" গ্রন্থে পুরাণা ও নয়া চীনের জীবনধারা সম্বন্ধে যে সকল টীকাটিপ্পনী বা বিশ্লেষণ-সমালোচন প্রযুক্ত হইয়াছে সেইগুলির ভিতরও অন্য কোনো চীন-বিশেষজ্ঞের আলোচনাপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। মতগুলা স্বচিন্তিত ও স্বাধীন,— কতখানি গ্রহণীয় তাহা বিচারের বিষয়।

যে চোখে "বর্ত্তমান জগৎ" দেখিয়া বেড়াইতেছি তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পরিষ্কার করিয়া কোথাও লেখা হয় নাই। যাহারা এই গ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশসংক্রান্ত প্রবন্ধগুলা মাসিকপত্রের মধ্যে দেখিয়াছেন তাঁহারা অনেক ধানাই-পানাইয়ের ভিতর সেই চোখটাও হয়ত আবিষ্কার করিয়া থাকিবেন এটাকে বোধ হয় গোটা "যুবক এশিয়ার" চোখ বলিতে পারি। ইংরেজিতে শিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল জার্ন্যাল অব্ এথিকস্"নামক ত্রৈমাসিকে (জুলাই ১৯১৮) "ফিচারিজম্ অব্ ইয়ং এশিয়া" প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহার ভিতর

যুবক এশিয়ার আলোচনাপ্রণালী বা তর্ক-বিজ্ঞান সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে দেখানো হইয়াছে।

এই "লজিক্" বা যুক্তি সমাজ-বিদ্যায় প্রবর্ত্তিত হইলে সভ্যতা-বিজ্ঞান কোন্ মূর্ত্তিতে দেখা দিবে তাহারও কথঞ্চিৎ নমুনা দিয়াছি। আমেরিকার ক্লার্ক-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত জার্ণ্যাল অব ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল রেলেশুনস্" ত্রৈমাসিকের (জুলাই ১৯১৯) "আমেরিকানিজেশুন ফ্রম দি ভিউপয়েণ্ট অব ইয়ং এশিয়া" শিকাগোর "ওপন কোর্ট" মাসিকের (নবেম্বর ১৯১৯) "কন্‌ফিউশিয়ানিজম্, বুদ্ধিজম্ অ্যাণ্ড ক্রিশ্চয়ানিটি", এবং এলাহাবাদের "হিন্দুস্থান রিভিউ" মাসিকের (সেপ্টেম্বর ১৯২০) "কম্পারেটিভ পলিটিক্‌স্ ফ্রম হিন্দু ডাটা" এই তিনটা প্রবন্ধের উল্লেখ করিতেছি। 'ল্যভ্ ইন্ হিন্দু লিটারেচার" (তোকিও ১৯১৬) এবং "হিন্দু আর্ট ইট্‌স্ হিউম্যানিজম্ অ্যাণ্ড মর্ডানিজম্"(নিউ ইয়র্ক, ১৯২০) এই পুস্তিকা দুইটাও দ্রষ্টব্য।

এই গ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায় "প্রবাসী"তে, কয়েক পৃষ্ঠা "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন"-এ এবং একটা প্রবন্ধ (তাজা ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শন) "গৃহস্থ"য় বাহির হইয়াছিল। অধিকাংশই পূর্ব্বে কোনো কাগজে ছাপা হয় নাই। কতকগুলা ছবি "প্রবাসী" আফিস হইতে পাওয়া গিয়াছে। সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

চীন সম্বন্ধে লেখকের অন্যান্য রচনা নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

১। "দি ডেমোক্র্যাটিক্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড অব্ চাইনীজ কাল্‌চ্যর" (সায়েন্টিফিক মান্থলি, জানুয়ারি ১৯১৯, নিউ ইয়র্ক)।

২। "দি ফর্‌চুন্‌স্ অব্ দি চাইনীজ রিপাব্লিক (মডার্ণ রিভিউ, সেপ্টেম্বর ১৯১৯, কলিকাতা)।

৩। "পোলিটিক্যাল টেণ্ডেন্সীজ ইন্ চাইনীজ কালচার (ঐ, জানুয়ারী ১৯২০)।

৪। দি বিগিনিংস্ অব্ দি রিপাব্লিক ইন্ চায়না (ঐ, আগষ্ট ১৯২০।)

৫। "দি পেন অ্যাণ্ড দি ব্রাশ ইন চায়না (এশিয়ান রিভিউ অক্টোবর ১৯২০, তোকিও)।

৬। 'ইণ্টার্ণ্যাশন্যাল ফেটার্স অব্ ইয়ং চায়না (জার্ণ্যাল অব ইণ্টর্ণ্যাশন্যাল রেলেশ্যনস্ জানুয়ারী ১৯২১, ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা।

কাঙ্ ও লিয়াঙ, ইঁহারা গুরু ও শিষ্য। দুই জনেই আবার নবীন চীনের স্রষ্টা। তাঁহাদের নামের সঙ্গেই এই গ্রন্থ জড়িত থাকুক।

উৎসর্গ

কাঙ্ য়ু-ওয়ে ও লিয়াঙ্ চি-চাও,

তোমরা অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছ। এই জন্যই তোমরা যুবক এশিয়ার প্রণম্য।

হয়ত বা তোমাদের জীবন এক বিরাট পরাজয়ের মহানাট্য দেখাইতে দেখাইতেই ফুরাইয়া আসিবে। কিন্তু নবীন চীনের গোড়াপত্তনে তোমরাই প্রথম শিল্পী। এই কারণে দুনিয়ার কর্ম্মবীর ও ভাবুক সমাজ তোমাদিগকে নবতন্ত্রের পথ-প্রবর্ত্তকরূপে সম্বর্দ্ধনা করিতেছে।

সেই সম্বর্দ্ধনায় যোগ দান করিয়া যুবক ভারতও অগ্রণী-বীরদ্বয়ের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিবে।

প্যারিস, ফ্রান্স

৯ মার্চ্চ ১৯২১

৩। চীন-তত্ত্বের বনিয়াদ *

এই কেতাব লেখা হইয়াছিল সাড়ে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে,—চীনা আওতায় শাংহাইয়ে। তখন বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছে: কোন কোন অধ্যায় "ভারতবর্ষ", "গৃহস্থ" এবং "উপাসনা"য় বাহির হইয়াছে।

চীনে কাটিয়াছিল প্রায় এক বৎসর। চীনতত্ত্বের হজম করিতে পারিয়াছি অতি সামান্য মাত্র। যতটুকুই বা পারিয়াছি তাহার দশ ভাগের একভাগও বোধ হয় এই গ্রন্থে গুঁজিতে অবসর পাই নাই। চীন-প্রবাসের পর্য্যটন-কাহিনী অবশ্য আলাদা বইয়ে ছাপা হইবে।

যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান কেতাবের বনিয়াদ তাহার একটা তালিকা মৎপ্রণীত 'চাইনীজ রিলিজ্যন থ্রু হিন্দু আইজ্" (হিন্দু চোখে চীনা ধর্ম্ম) (৩২+৩৩১ পৃষ্ঠা, ১৯১৬, কমার্শ্যাল প্রেস, শাংহাই এবং পাণিনি অফিস, এলাহাবাদ) বইয়ের "বিব্লিওগ্রাফী" বা গ্রন্থ-পঞ্জীতে দ্রষ্টব্য। একটা ইংরেজী তালিকা এখানে ছাপিয়া বাংলা বইয়ের শ্রী নষ্ট করা অনাবশ্যক। তবে দুই খানা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিব:—(১) ওয়াইলি প্রণীত নোটস্ অন্ চাইনীজ লিটরেচার (চীনের সাহিত্য-প্রসঙ্গ) (লণ্ডন, ১৮৬৭) এবং (২) ওয়ার্ণার সঙ্কলিত চাইনীজ সোসিয়লজি (চীনের সমাজ-তত্ত্ব) (লণ্ডন, ১৯১০)। চীনমণ্ডলে প্রবেশ করিতে হইলে এই বই দুইখানার পাতা উল্টাইতেই হইবে।

তখনও জার্ম্মান এবং ফরাসী ভাষায় হাতে খড়ি হয় নাই। কাজেই এই দুই ভাষায় নিবদ্ধ "সিনলজির" (চীনতত্ত্বের) হিসাব রাখার দরকার ছিল না। চীনা কবিতাগুলা বাংলা "সাহিত্যে" স্থান পাইবার যোগ্য

---

* "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ" গ্রন্থের ভূমিকা।

করিয়া লিখিতে সময় জুটে নাই। হয়ত ক্ষমতাও নাই। তবে সবই তাড়াহুড়ায় লেখা,—এক নিশ্বাসে যেরূপ বাহির হইয়াছে প্রায় সকল স্থলে তাহাই রাখিয়া দিয়াছি। ঘষা মাজা সুরু করিলে বোধ হয় একদম কিছুই লেখা হইত না। আজও সেই সময়াভাব। যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া সময় লাগাইয়া স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত তাঁহারা এই দিকে নজর দিলে বাঙালীর কাব্যসংসার এক নয়া ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

ভারতে চীনা-প্লাবনের যুগ আসিতেছে। আরবী-ও সংস্কৃত-জানা হিন্দু-মুসলমান চীনা ভাষা দখল করিয়া বর্ত্তমান ও প্রাচীন চীনের জীবন মন্থন করিতে অচিরেই অগ্রসর হইবেন। আর, তাঁহাদের গভীরতর পাণ্ডিত্যের এবং সূক্ষ্মতর ভূয়োদর্শনের বিচারে এই ধরণের "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ" নিতান্ত হাল্কা, তরল ও ছেলেখেলা মাত্র বিবেচিত হইবে। আশা করি, সেই দিনের জন্য ভারতবাসীকে অধিক কাল বসিয়া থাকিতে হইবে না।

চীনের দার্শনিক-প্রবর য়ুয়ানচু-আঙের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

উৎসর্গ

য়ুয়ানচু-আঙ্,

ভারতের হিন্দু তোমাকে চীনের শঙ্করাচার্য্য বলিয়া জানে; এশিয়ার মুসলমান তোমাকে চীনের আল্-ফারাবি বলিয়া মানে।

সপ্তম শতাব্দীর ইয়োরেশিয়ায় তুমি বিজ্ঞানদর্শন-মণ্ডলের সর্ব্বোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

বিংশ শতাব্দীর যুবক এশিয়া তোমাকে বিপুল অধ্যবসায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং কর্ম্ম-কৌশলের অবতাররূপে পূজা করিয়া থাকে।

হে চীনা ভগীরথ, তুমি হোআংহো ও ইয়াংছিকিয়াঙে ‘তিয়েন্-চু” (“স্বর্গ”)-স্থিত গঙ্গা-গোদাবরীর স্রোত বহাইয়াছিলে। মৌর্য্য-গুপ্ত বিক্রমাদিত্যগণের উত্তরাধিকারী বর্দ্ধন-চালুক্যের ভারতবর্ষকে তুমি চীনা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে। তোমার আমদানি-করা বুদ্ধ-মার্কা হিন্দু সভ্যতার প্রভাবে “চুঙ্-হুআ” (“ভূ-মধ্য”) দেশে নব জীবনের ফোয়ারা ছুটিয়াছিল।

হে কন্‌ফিউশিয়াস্-শাক্যসিংহের সমন্বয়-সাধক, হে বিদ্যা-সঙ্ঘের ধুরন্ধর, আজ তোমার স্বজাতি মরিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই “আঁধার ঘোর” ও “কালিমার” আবেষ্টন ভেদ করিয়াও বিক্রমাদিত্যের বংশধরেরা চীনা সভ্যতার গৌরব-কথা বর্ত্তমান জগতে প্রচার করিতে উদ্‌গ্রীব হইতেছে;—হোআংহো-ইয়াংছির বারিও গঙ্গা-গোদাবরীতে আনিয়া ঢালিতেছে। প্রাচীন তাঙ্-সন্তানগণের বাণী শুনিয়া আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য জীবনের নব নব সাড়া প্রকটিত করিতেছে। নব্য ভারতের এই বিচিত্র জীবন-স্পন্দন যুবক চীনকেও জাগাইয়া এবং কর্ম্মঠ করিয়া তুলিবে।

হে চীনা কর্ম্মবীর, সহস্রাধিক বর্ষ পরে এইবার তবে ভারতবর্ষ চীনের ঋণ পরিশোধ করিতে চলিল।

প্যারিস্, ফ্রান্স,

১৯২১

৪। "চীন, জাপান ও যুবক ভারত" *

"আত্মশক্তির একজন পাঠক" আমার "চীন, জাপান ও যুবক ভারত" নামক প্রবন্ধের কতকগুলা ভুল বাহির করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। লেখাটা পড়িবামাত্র হঠাৎ ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বেকার কতকগুলো ঘটনা মনে আসিয়া পড়িল। তখন আমি জাপানে, কোরিয়ায়, মাঞ্চুরিয়ায়, আর চীনের প্রদেশে প্রদেশে "সেকেলে" বৃহত্তর ভারত খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম আর একেলে "বৃহত্তর ভারতের" জন্য খুঁটা গাড়িতেছিলাম। চীনা-জাপানীরা আমাকে "ইন্দো ভাই" বা 'ইন্দো দাদা' বলিয়া ডাকিত। তাহারা আমাকে নিজেদের লোক জ্ঞানে ভালবাসিত। আর আমিও আমার বাঙলা দেশকে বেশী জানি কি চীন-জাপানকে বেশী জানি মাঝে মাঝে এরূপ সন্দেহ করিতাম। কাজেই আমার চীনা-জাপানী কুটুম্বিতার যুগটা আর সমসাময়িক যুবক বাঙলার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আবহাওয়াটা আমার চিন্তায় ও কর্ম্মে এক বিপুল শক্তিরূপে রহিয়া গিয়াছে। চীন-জাপান আমার জীবনের এক বিরাট দুর্ব্বলতা।

তাহারই তাড়নায়, অন্য কাজ ফেলিয়াও, এই লেখাটা তৈয়ারি করিলাম। চীন ও জাপান সম্বন্ধে কতকগুলা কথা, যা হয়ত আমার সেই প্রবন্ধেও নাই আর সমালোচক মহাশয়ের আলোচ্যও নয়, এই সঙ্গে বলিয়া যাইতেছি। "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ" নামক বই যখন লিখি তখন আশা ছিল যে ৮।১০ বৎসরের ভিতর ভারতে চীনা-আন্দোলন দেখা দিবে। "চীনা-আন্দোলন" এখনো দেখা দেয় নাই বটে, কিন্তু আজ কাল তাহার সূত্রপাত দেখিতে পাইতেছি।

* "আত্মশক্তি", ২য় বর্ষ, ২৯ সংখ্যা (অক্টোবর, ১৯২৭)।

যুবক ভারত চীন সম্বন্ধে সজাগ। এই যুগে চীন-কথার রকমারি খরিদ্দার ও সমজদার বাঙলা দেশে আছে। তাহাদের জন্য কথাগুলো বলিতেছি। সমালোচকের উক্তিগুলা উপলক্ষ্য মাত্র।

তিব্বত ও চীন

বাঙালা দেশে সাধারণতঃ চীন বলিলে চীন সাম্রাজ্য বুঝা হইয়া থাকে, অন্ততঃ পক্ষে থাকিত। ইস্কুলে ম্যাপ দেখাইবার সময় মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ইত্যাদি সবই মোটের উপর চীনের সামিল সমঝিয়া লওয়া বোধ হয় এখনো আমাদের দস্তর। কাজেই তিব্বত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট কেনো বাঙ্গালী পণ্ডিতকে বাঙালীরা চীনতত্ত্বজ্ঞ বুঝিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বেশী কিছু নাই।

চীনা ভাষা

আমার প্রবন্ধে আছে, "চীনের ভিন্ন ভিন্ন সহরে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। লোকেরা নানা স্থানে, নানা ভাষায় কথা বলে।" সমালোচক লিখিয়াছেন,—লিখিত চীনে (আমার বিশেষণে চীনা) ভাষার কোনই প্রভেদ নাই। * * তবে প্রদেশ অনুযায়ী উচ্চারণের প্রভেদ আছে। যেমন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষার উচ্চারণের প্রভেদ। চীন দেশে বর্ত্তমানে ৮।৯ রকমের উচ্চারণ ভেদ আছে।"

দেখা যাইতেছে যে আমার রচনায় যেটা "ভাষার বিভিন্নতা", সমালোচকের রচনা অনুসারে সেটা "উচ্চারণের বিভিন্নতা" মাত্র। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভুলসংশোধনের জন্য সমালোচকের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু সমালোচক পরে আর এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমানে কথিত ভাষা লিখিত ভাষার ভিতর কিছু তফাৎ আছে—আমাদের দেশেও

যেমন আছে। চীনে নাটক নভেল ও সংবাদপত্রে এখনো কথিত ভাষার প্রভাব দেখা যায়।"

অতএব পাওয়া গেল দুই তথ্য,—(১) উচ্চারণে উচ্চারণে প্রভেদ কথ্য ভাষায়। যেমন খাশ "চাটগেঁয়ে" উচ্চারণওয়ালা বাঙালী "বাঁকড়ি" উচ্চারণওয়ালা বাঙালীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে পারিবেনা ঠিক তেমনি উত্তর চীনের কোন জেলার উচ্চারণওয়ালা চীনা লোকেরা যুন্নান অঞ্চলের উচ্চারণওয়ালা চীনা নরনারীর কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারিবে না।

২) কথ্য ভাষার প্রভাব চীনাদের সাহিত্যের ভাষায়ও আছে। অর্থাৎ চাটগাঁর লোক বাঁকুড়ায় সম্পাদিত পত্রপত্রিকায় বাঁকুড়ি শব্দ পাইবে আর বুঝিবে না। এই জন্যই হয়ত আমার রচনায় আছে, "চীনের ভিন্ন ভিন্ন সহরে...লোকেরা নানা স্থানে নানা ভাষায় কথা বলে।"

এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিছু উল্লেখযোগ্য। মাঞ্চুরিয়া হইতে পিকিঙে পৌঁছিয়াই একজন চীনা দোভাষী বাহাল করিয়াছিলাম। তাঁহাকে লইয়া চীনের নানা পল্লীসহর দেখিয়াছি। কিন্তু কাজ চলে নাই, তিনিও ভাষা সম্বন্ধে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিতেন। পরে ইংরেজ, জাপানী, ফরাসী ও রুশ চীন-প্রবাসীরা আমার দুরবস্থার কথা শুনিয়া আমাকে "ভারতবর্ষের বাঙাল" বিবেচনা করিয়া ঠাট্টা করিয়াছে। চীনের ভিন্ন ভিন্ন মুল্লুকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দোভাষী আবশ্যক,—এই ছিল তাঁদের মত। ইহা যে একমাত্র উচ্চারণের মামলা তাহা আমাকে বুঝানো হয় নাই। বরং ইংরেজ লেখক মেডোজ-প্রণীত বইয়ে উণ্টাই বুঝিয়াছি।

জার্ম্মান চীনতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত হির্ট আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে "সিনলজির" অধ্যাপক ছিলেন। নিউইয়র্কে থাকিবার সময় তাঁহার

নিকট কিছুদিন ধরিয়া নিয়মিতরূপে সাগরেতি করিয়াছিলাম। চীনা-ভাষায় হাত মক্‌স করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। তাঁহার টোলেও মেডোজ-প্রচারিত মতই পাইয়াছি।

তাহা ছাড়া লিখিত ভাষায় কম সে কম চার রীতি লক্ষ্য করা সম্ভব :— (১) প্রাচীন (কনফিউশিয়ান ও অন্যান্য দার্শনিকদের ভাষা), (২) হেবেন-চাঙ বা পণ্ডিতি (টুলো আবহাওয়ায় পঠন-পাঠনের ভাষা), (৩) ব্যবসায়ী (সরকারী দলিল দস্তাবেজের ভাষা), (৪) মামুলি (নাটক নভেল সংবাদপত্র ইত্যাদির ভাষা)। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান, মার্কিন ইত্যাদি জাতীয় লোকেরা নিজ নিজ মতলব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে হাতে খড়ি দিয়া থাকে। শিক্ষানবীশদিগকে এইরূপ পরামর্শ দেওয়া তাহাদের চীনতত্ত্বজ্ঞদের দস্তুর।

চীনা ভাষা যখন আমার জানা নাই, আর কোনো ভারতীয় চীনতত্ত্বজ্ঞ যখন আমাকে ১৯০৪-১৬ সনে এই বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ, তখন বিদেশী চীনতত্ত্বজ্ঞদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া আর কেতাব ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি। "আত্মশক্তি"র ঐ প্রবন্ধটুকু ছাড়া এই বিষয়ে আমার অন্যান্য লেখাও আছে। তবে এই বিষয়ে আমি অনেক কিছু শিখিতে ইচ্ছা করি। সমালোচক মহাশয় যদি বর্ত্তমান তর্কপ্রশ্নের আসর ছাড়িয়া স্বাধীন ভাবে চীনা ভাষার বিভিন্নতাগুলা সম্বন্ধে কোন মাসিক পত্রিকায় বাংলা বা ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমার উপকার ত হইবেই। বহু ভারতীয় চীন-প্রেমিকেরও সে সব বেশ কাজে লাগিবে।

চীনে ভারতাভিযান

আমার প্রবন্ধে কয়েকজন প্রসিদ্ধ বাঙালীর নাম করা হইয়াছে। তাঁহারা চীনে গেলে ভাল হয় এইরূপ লিখিয়াছি ১৯১৫ সনে। বুঝিতে হইবে যে তখন রবিবাবুর চীনযাত্রা ঘটিতে অনেক দেরি। যে কয়জন লোকের নাম করিয়াছি তাঁহারা নানা বিদ্যার ক্ষেত্রে যশস্বী। লিখিয়ে-পড়িয়ে প্রায় যে কোনো বাঙালীই তাঁহাদিগকে চিনিত। একজনের সম্বন্ধে সমালোচক জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"তাঁকে চীনদেশে প্রেরণ করবার ভার কি বিনয়কুমার নিজে নিবেন?" বার বৎসর পূর্ব্বে এবং তাহার বহু পূর্ব্বেও আমি চীনে ভারতাভিযান বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিতাম। এখনও করি। কিন্তু তাহা বলিয়া "প্রেরণ করবার ভার"টাও যে এই অধমেরই ঘাড়ে পড়িতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখি নাই। তবে প্রশ্নটা যখন জবাব দিতেছি,—"আমার যদি পয়সা থাকে আর কর্ম্মদক্ষ বিদ্যানিষ্ঠ চীনযাত্রাকাঙ্ক্ষীদের যদি পয়সা না থাকে তাহা হইলে সেই ভার আমি লইতে চিরকালই প্রস্তুত আছি।"

বর্ত্তমান চীনের বিদ্যা চর্চ্চা

আমার রচনায় আছে "চীনারা এশিয়া-তত্ত্বের অ, আ, ক, খও জানে না। আর নব্য পাশ্চাত্য তত্ত্বেও সবে হাতেখড়ি দিতেছে।" সমালোচক এই উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছেন। যুবক চীনের কৃতিত্ব তাঁহার অনুরাগের বস্তু। ইহা সুখের কথা। এই বিষয়ে অনুরাগ হিসাবে তাঁহার সঙ্গে হয়ত আমার আধ কাঁচ্চাও প্রভেদ নাই। চীনারা, জাপানীরা আর মার্কিনরা আমার চীন-প্রীতির কথা বেশ জানে। কিন্তু আমার উক্তিটা কিছু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। (১) "এশিয়া-তত্ত্বে" (অর্থাৎ তুরস্ক, পারস্য, ভারত ইত্যাদি বিষয়ক বিদ্যায়) যুবক চীনের দখল কতটা

ছিল ১৯১৫ সনে? এই প্রশ্নের জুড়িদার আর একটা প্রশ্ন করা যাউক। ১৯০৫ সনে "এশিয়া-তত্ত্বে" যুবক ভারতের দখলই বা কতটা ছিল? এই দুই প্রশ্নের জবাব নির্ভর করিবে বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য বিষয়ক মাপকাঠির উপর। আমার বিবেচনায় ১৯০৫ সনে "এশিয়া-তত্ত্ব" সম্বন্ধে যুবক ভারতের জ্ঞান অ, আ, ক, খ পর্য্যন্ত গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। (আজ ১৯২৭ সনে অবস্থা কথঞ্চিৎ উন্নত)। ঠিক সেই মাপেই ১৯১৫ সনে যুবক চীন সম্বন্ধে ঐ মত প্রচার করিয়াছি। (২) নব্য পাশ্চাত্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছি (১৯১৫) সনে যে, চীনারা "সবে হাতে খড়ি দিতেছে।" পাশ্চাত্য শিক্ষা চীনে কবে সুরু হইয়াছে, আর কবে কিছু পুষ্টিলাভ করিয়াছে এই সন তারিখগুলা দেখিলেই ১৯১৫ সনের বাঙ্গালীর পক্ষে চীন সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি প্রকাশ করা আশ্চর্য্যের হইবে না। আসল কথা, সকল প্রকার শিক্ষার অভাবই বর্ত্তমান চীনের দুর্গতির অন্যতম বিপুল কারণ।

জাপানীরা কতটা ফোঁপরা

আমার রচনায় আছে, "জাপান যে কত ফোঁপরা ইঁহারা (ভারতীয় অভিযান) স্বচক্ষে যাইয়া দেখুন।" আমরা ভারতে পরাধীন জাতি। এই কারণে যে-কোনো স্বাধীন জাতিকে আমরা অতি-কিছু সমঝিতে অভ্যস্ত। কিন্তু আমার বিবেচনায় এই অভ্যাসটা নিরেট তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। জাপানীরা স্বাধীন। তাহাদিগকে আমি "নবীন এশিয়ার জন্মদাতা" বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি। এইজন্য অনেকে আমাকে অতিমাত্রায় জাপানী-প্রেমিক বলিয়া গালাগালিও করে। যাক সে কথা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমার মাপকাঠিতে, বাঙালীরা যে-যে কর্ম্মক্ষেত্রে আর যে-যে বিদ্যার আখড়ায় কৃতিত্ব দেখাইবার কিছু-কিছু

সুযোগ পাইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে আর বিদ্যার আখড়ায় তাহারা জাপানীদের চেয়ে কোনো হিসাবে নিকৃষ্ট জীব নয়। আমরা পরাধীনতার দরুণ অনেক সময়ে আমাদের যতটুকু কর্ম্মদক্ষতা বা গুণপনা আছে তাহার ইজ্জৎ দিতে সঙ্কোচ করি। এইজন্য নামজাদা করিৎকর্ম্মা কয়েকজন বাঙালী মাঝে মাঝে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রের জাপানীদের সঙ্গে দহরম মহরম চালাইলে তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন যে, স্বাধীন এশিয়ার লোকের পক্ষেও "ফোঁপরা" হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নয়। অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কর্ম্মদক্ষতা যতটা দেখানো সম্ভবপর হইয়াছে তাহা কোনো কোনো পুরা-স্বাধীন দেশের পক্ষে নিন্দনীয় নয়। এই কথারই আর এক পিঠ হইতেছে,—পৃথিবীর (কেবল এশিয়ার নয়, ইয়োরামেরিকারও) সব কয়টা স্বাধীন দেশই জ্ঞানবিজ্ঞানে "হাতী-ঘোড়া" নয়। যুবক বাঙ্গলার এই কথাটা জানা আবশ্যক।

চীনাদের বিদেশী উপাধি

সমালোচক বলিতেছেন, "চীন দেশের বড় পণ্ডিতরা অবশ্য ইউরোপ অথবা আমেরিকায় গিয়ে বড় উপাধি নিয়ে আসেন না।" এইখানে "বড় পণ্ডিত" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই শব্দের অর্থ যদি ভারতীয় চতুষ্পাঠীসমূহের সংস্কৃতজ্ঞ (এবং মোটের উপর বিদেশী ভাষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শনে অনভিজ্ঞ) পণ্ডিত শ্রেণীর লোক বুঝা যায় তাহা হইলে কথাটা ঠিক। কিন্তু যদি বর্ত্তমান চীন বা "যুবক চীন" কোথায় "উপাধি" পাইতে যায় তাহা আলোচ্য বিষয় হয় তবে বলিব যে সমালোচক যাহা লিখিয়াছেন খাঁটি অবস্থা প্রায় একদম তাহার উল্টা। বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জ্জন করিবার "উচ্চতর" ব্যবস্থা চীনে ১৯১৫ সনে অল্প মাত্র ছিল। আমেরিকায়, ফ্রান্সে, জার্ম্মানিতে ও ইংলণ্ডে না গেলে

এমন কি সাধারণ বি. এ., বি. এস্-সি., এম্, এ., এম্. এস্-সি. পদের বিদ্যা লাভ করাই যুবক চীনের পক্ষে কঠিন ছিল। আস্তে আস্তে তাহাদের অবস্থা এই দিকে উন্নত হইতেছে। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের আধুনিক শিক্ষার জন্য "রূপ চাঁদ" কত লাগে ভারতে তাহা অজানা নয়। চীনারা রূপচাঁদে বড় বেশী সচ্ছল নয়। কাজেই বিপুল মহাদেশের জন্য "সর্ব্বোচ্চ" শিক্ষা বিস্তারের যথোচিত ব্যবস্থা করা আজ ১৯২৭ সনেও সম্ভবপর হয় নাই।

চীনা ভাষায় চীনা পাণ্ডিত্য

সমালোচক বলিতেছেন, "তাঁরা (চীনা পণ্ডিতরা) কাজ করে' থাকেন এবং সে কাজ ইংরেজিতে প্রকাশ না করে' চীনা ভাষায় প্রকাশ করে' থাকেন।" বলা বাহুল্য, যে লোকটা চীনা ভাষা জানে না সে এই উক্তি শুনিবা মাত্র চুপ করিতে বাধ্য। কিন্তু কথাটা বিশ্লেষণ করা সম্ভব। চীনারা কোন্ কোন্ বিদ্যাক্ষেত্রে "কাজ" করিতেছে? বর্ত্তমান যুগে চীনারা লেখাপড়া সুরুই করিল সেদিন। এই কয়দিনের ভিতর "বেশী" সংখ্যক চীনা নরনারী "স্বদেশে" উচ্চতর অথবা "উচ্চতম" জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে নাই। এইরূপ সন্দেহ আমার ছিল ১৯১৪।১৬ সনে। ইয়োরামেরিকায় এবং চীনে যত চীনা পণ্ডিতের,—ছোঁড়া, বুড়া, একেলে, সেকেলে শিক্ষিত লোকের—সঙ্গে আলাপ হইয়াছে তাহাদিগকে আধুনিক চীনা সাহিত্যের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাহাদের নিকট বুঝিয়াছি প্রধানতঃ নিম্নরূপ। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ছোট বড় মাঝারী বই চীনা ভাষায় তর্জ্জমা করা হইয়া থাকে। এই তর্জ্জমার কাজে খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদের প্রয়াসও উল্লেখযোগ্য। বইগুলা ইস্কুল কলেজে টেকস্টবুক রূপে ব্যবহৃত হয়।

কথঞ্চিৎ উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশী ভাষায় লিখিত বই ব্যবহার করা হইয়া থাকে, বিদেশীদের লেখা। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রিলাভ করিবার জন্য চীনারা বিদেশী ভাষায়ই "থীসিস্" (গবেষণা) গ্রন্থ লিখিয়া থাকে। ডিগ্রিলাভের জন্য যে সকল বই লেখা হয় তাহা কোনো দেশেই সাধারণতঃ অতি উঁচু দরের চীজ বিবেচিত হয় না। যাহা হউক, চীনা ভাষায় যে আজকালকার চীনারা বড় বড় জিনিষ প্রকাশ করিতেছে তাহা বর্ত্তমান চীনের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাশীল লোক প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইবে না। বিশেষতঃ যুবক চীনের করিৎকর্ম্মা প্রতিনিধিদের নিকট হইতে যখন বস্তুনিষ্ঠরূপে নিজ নিজ কৃতিত্বের বিবরণ সংগ্রহ করা যায় তখন একটা অতি-কিছুর পরিচয় পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য আবার প্রশ্ন উঠিবে,—বিদ্যা জরীপ করিবার মাপ্ কাঠিটা কিরূপ? একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাঙলা ভাষায় আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকখানা ইংরেজি বইয়ের তর্জ্জমা বা সার-সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব সম্বন্ধে আমরা বাঙালী হিসাবে হয়ত বলিব, "বেশ কিছু হইয়াছে।" হয়ত ১৮৫৭ সনের তুলনায় বলিব, "অনেক কিছু হইয়াছে।" কিন্তু কোনো ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ বা মার্কিণ পর্য্যটক কি বলিবে?

জাপানকে ভাল করিয়া জানা

সমালোচক বলিতেছেন—"জাপানকে ভাল করে' জানলে" আমি তাঁদের "ফোঁপরা" বলতাম না। জাপানী ভাষা আমি জানি না। এই পর্য্যন্ত ঠিক। কিন্তু কতদিন ধরিয়া কয়টা পল্লী ও সহর, কতগুলা প্রতিষ্ঠান আর কত ডজন কতপ্রকারের সুধী-শিল্পী-ব্যবসায়ীর পরিচয় জানা থাকিলে একটা দেশকে ভাল করিয়া জানা হয় তাহার বিচার করা

সহজ নয়। জাপানে, কোরিয়ায়, মাঞ্চুরিয়ায়, আর চীনে আমার বৎসর দেড়েক কাটিয়াছে। চীনা-জাপানী সভ্যতার একাল-সেকাল বুঝিবার জন্য বিদেশী ভাষায় লিখিত কতগুলা বই পড়িয়াছি, আর কতগুলা লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল ও আছে তাহার তালিকা দিয়া কোনো লাভ নাই। এই সকল অভিজ্ঞতার কিছু কিছু পরিচয় চীন-জাপান-ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। এই সবের কিম্মৎ কতটা তাহার বিচারক অবশ্য আমি হইতে পারি না। কিন্তু যে-লোক কিছু জাপানী ভাষা জানে সে একমাত্র এই ভাষা-জানার খাতিরে তাহার যথার্থ বিচারক কিনা সন্দেহ।

সমালোচক লিখিতেছেন,—"জাপানী পণ্ডিতগণ তাঁদের অধিকাংশ কাজই জাপানী ভাষায় বাহির করেন। ইংরেজিতে তাঁরা কমই লেখেন।" জাপানীদের বিদ্যাচর্চ্চার নিন্দা করা আমার মতলব নয়। আমার দেশও যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাপানী মাপে প্রশংসনীয়ই বটে এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। জাপানীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে জার্ম্মান-ইংরেজ-মার্কিণ-ফরাসীদের সমান নয় এই আমার মত। ইংরেজিতে জাপানীদের রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রাণবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণার পরিচয় নানা ইয়োরামেরিকান বিজ্ঞান-পত্রিকায় পাওয়া যায়। কাজেই জাপানী কৃতিত্বের দৌড় জাপানী ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশীদের পক্ষেও জানিবার উপায় আছে। কয়েকজন অতি প্রসিদ্ধ লোকও আছেন সন্দেহ নাই। জাপানী ভাষায় জাপানীরা যে-কাজ করিতেছেন তাহাকে জাপানী-জান্তা বিদেশী লোকের পক্ষে হয়ত বা অতি-কিছু বিবেচনা করিবার কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু জাপানীরা সাধারণতঃ বলে,—"আমরা বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান মাতৃভাষায় প্রচার করিতেছি।" আধুনিক জাপানী সাহিত্যের এই হইল প্রধান লক্ষণ। দর্শনচর্চ্চা সম্বন্ধেও এইরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া

গিয়াছে। আর সেদিন বিলাতের "রয়্যাল ইকনমিক জার্ন্যাল" পত্রিকায় জাপানী ধনবিজ্ঞান-সেবীদের "কাজ" জাপানী পণ্ডিত কর্তৃক বিবৃত দেখিলাম। বুঝিতেছি যে, ইয়োরামেরিকার "বাঘা" "বাঘা" পণ্ডিতদের মতামতগুলা প্রচার করাই জাপানী ভাষায় জাপানী ধনবিজ্ঞানাধ্যাপকদের প্রধান "কাজ।" হয়ত কোথাও কোথাও খানিকটা মৌলিক চিন্তা থাকা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয় বলাই বাহুল্য।

জাপানে ভারত-নিন্দা

১৯১৫-১৬ সনে জাপানে থাকিবার সময় নানা জাপানী মহলে একাধিকবার দুএকটা ভারত-নিন্দা আমার কাণে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু সমালোচক মহাশয় জাপানে থাকিবার সময় সেই নিন্দাটা শুনেন নাই। ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? এমন কি আমি যে সময়ে ছিলাম সেই সময়ে অন্যান্য ভারতসন্তানও জাপানে ছিল। তাহা বলিয়া আমি যে যে মহলে যাহা কিছু দেখিয়াছি শুনিয়াছি অন্যান্য জাপান-পর্য্যটকও ঠিক সেই সবই দেখিতে শুনিতে বাধ্য কি?

চীনা পণ্ডিতের কৃতিত্ব

জাপান আর ভারতের মতন চীনও আস্তে আস্তে মানুষ হইতেছে। এই "আস্তে আস্তে" শব্দটার অর্থ জাপান সম্বন্ধে এক প্রকার, ভারত সম্বন্ধে আর এক প্রকার, আর চীন সম্বন্ধে অন্য এক প্রকার। এই ধরণের কথা আমি নানাস্থানে বলিয়াছি। কাজেই ১৯২৪-২৭ সনের চীনে, অথবা এমন কি ১৯১৫-১৬ সনের চীনেও লিখিয়ে-পড়িয়ে চীনাদের ভিতর করিৎকর্ম্মা লোক ছিল বা আছে তাহা বুঝা খুবই সহজ। আর এ বিষয়ে স্থানে স্থানে তালিকা প্রকাশও করিয়াছি। কিন্তু তাহা লইয়া বাড়াবাড়ি করা আমার পক্ষে সম্ভবপর

নয়। ১৯০০ সনের "বকসার" যুগের তুলনায় ১৯১৫-২৫ সনের যুবক চীন খুব বড়। কিন্তু ১৯১৫-২৫ সনের বর্ত্তমান জগতে যুবক চীন নগণ্য। এই বর্ত্তমান জগতে যুবক ভারতও নগণ্য। তবে এই দুই নগণ্যের ভিতর যুবক ভারতকে মোটের উপর আমি যুবক চীনের "বড়্দা" বিবেচনা করিয়া থাকি। এ হইতেছে আবার মাপকাঠির মামলা। ইহা নিন্দাপ্রশংসার কাববার নয়। কারবার হইতেছে দুঃখের আর এশিয়ার ভবিষ্যজীবন-গঠনের।

সমালোচক বলিতেছেন, "চীন দেশের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের সাহায্য না পেলে ইয়োরোপের কিম্বা জাপানের কোনো পণ্ডিতই চীন-তত্ত্বের আলোচনায় অগ্রসর হতে পারতেন না।" প্রথমতঃ, আমি এক জায়গায় কোনো বাঙালী পণ্ডিত সম্বন্ধে "ভাষাতত্ত্ববিৎ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। সেটা শুধরাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, "ভাষাবিৎ বলা উচিত ছিল।" তাঁহার বর্ত্তমান উক্তিতে চীনা পণ্ডিতেরা ভাষাতত্ত্ববিৎ কি ভাষাবিৎ তাহা পরিষ্কার নয়। যাহা হউক, দ্বিতীয় কথা হইতেছে সোজা। চীনের লোকেরা চীনা ভাষা জানে—কাজেই জাপানীরা, জার্ম্মানরা, ফরাসীরা, ইংরেজরা, মায় বাঙ্গালীরাও চীনতত্ত্বে পণ্ডিত হইবার জন্য চীনাদের সাহায্য লইতে বাধ্য। ইয়োরোপীয়ান পণ্ডিতেরা সেকালে আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহায্য লইয়াছেন। একালেও লইতেছেন। আর বাঙলা, ওড়িয়া, মারাঠি, তামিল ইত্যাদি ভাষা দখল করিবার জন্যও তাঁহারা "নেটিভ" পণ্ডিতদের সাহায্য লইয়া থাকেন। অধিকন্তু প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার আর ঐতিহাসিক খনন ইত্যাদি কাজেও আমাদের ছোট-বড়-মাঝারি পণ্ডিতদের সাহায্য বিদেশী পণ্ডিতদের বিশেষ কাজে লাগে। ঠিক এই ধরণেরই সাহায্য চীনারা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুঁথির বিবরণ, চীনা বইয়ের তর্জ্জমা ইত্যাদি কাজ কিছু কিছু চীনাদের নামেও বাহির

হইতেছে। সবই স্বাভাবিক, সবই সুখের কথা। কিন্তু মাপকাঠিটা আবার সঙ্গে রাখা আবশ্যক।

তবে আবার ১৯১৪-১৬ সনের কথা মনে পড়িতেছে। সেই সময়ে যুবক চীনের বিদেশী পি, এইচ, ডি উপাধিধারী নানা বন্ধু আমাকে বলিত, "ছাখ্। তোদেরকে আমরা খুব হিংসা করি। কেন জানিস্? আজকাল যখনই রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণ্যালটা খুলি তখনই দেখি হয় টীকটিপ্পনীতে, না হয় চিঠিতে আর কখনো কখনো প্রবন্ধের তালিকায়ও ভারতীয় লেখকদের নাম: কিন্তু চীনাদের এই অবস্থা কবে হবে এখনো বুঝতে পারছি না।"

চীনা সভ্যতায় প্রবেশ

সমালোচক উপসংহারে বলিতেছেন,—"যতদিন তাদের না বুঝছি বা তাদের সভ্যতার ভিতর না প্রবেশ করছি ততদিন বিচার করতে না যাওয়াই উচিত।"

উপদেশটা ভাল, কিন্তু আলোচনা-সাপেক্ষ। কেননা জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে "বিনয়ী" হওয়া অত্যাবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু "বিনয়ের অবতার" হইতে চেষ্টা করা আহাম্মকি।

একটা লোকের বৎসর দেড়েক ব্যাপী স্থানীয় অনুসন্ধান-গবেষণার ভিতর রেলের খবর, রাজস্বের খবর, ইস্কুল-কলেজের খবর, কুটীর শিল্প-ফ্যাক্টারী-কারখানার খবর, আইন-কানুনের খবর, কাব্যনাট্যের খবর, মঠ মন্দিরের খবর, পারিবারিক সংস্কার-কুসংস্কারের খবর ইত্যাদি নানা খবর অল্পবিস্তর স্থান পাইল। এই খবরগুলা জুটিল নরনারীর সঙ্গে সহরে পল্লীতে গা-ঘেঁশাঘেঁশি করিবার ফলে। এই খবরগুলার কোনোটা জোগাইল একেলে পণ্ডিত, কোনোটা জোগাইল সেকেলে পণ্ডিত। কোনো কোনো

খবর আসিল বুড়া জননায়কদের ঘাঁটি হইতে, কোনো কোনো খবর আসিল তরুণ জীবনের নানা মহল হইতে। আর তাহার উপর চেষ্টা চলিতে থাকিল প্রতিদিন বহুঘণ্টা ধরিয়া সরকারী-বেসরকারী লাইব্রেরিতে বিদেশী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পরিচয় লাভ। অধিকন্তু প্রত্যেক কথাবার্ত্তায় দোভাষীর সাহায্য ত আছেই।

জানা নাই কেবল ভাষাটা আর সময়ের পরিমাণ মাত্র বৎসর দেড়েক। এই অবস্থায় যে একটা সভ্যতায় প্রবেশ লাভের চেষ্টা করা হয় নাই তাহা স্বীকার করা হয়ত কোনো "বিনয়ের অবতারের" পক্ষে সম্ভব। আবার কোনও "বিনয়ের অবতার" হয়ত বলিবে যে, এই অবস্থায় সভ্যতাটা বিচার করিতে না যাওয়াই উচিত। কিন্তু "সাধারণ বিনয়ী" লোকের বাণী হইবে অন্যরূপ। সে বলিবে,—"যতটুকু তথ্য পাইয়াছ সেই তথ্যগুলার উপর টীকা টিপ্পনী চালাইবার এক্তিয়ার অর্থাৎ জীবনটা বিচার করিবার অধিকার তোমার আছেই আছে। অন্যান্য তথ্য পাইবা মাত্র হয়ত তোমার ব্যাখ্যা, তোমার বিচার, তোমার দর্শন বদলানো আবশ্যক হইবে। তাহার জন্য তুমি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিও। আর যে যে তথ্য তুমি পাইয়াছ তাহা একদম নির্ভুল এরূপ বিবেচনা করিয়া বসিয়া থাকাও সুবিবেচকের কার্য্য নয়। ভুলচুকগুলা হামেষা শুধরাইবার জন্য চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তোমার মতামত, তোমার ব্যাখ্যা, তোমার বিচার সকলেই মানিয়া লইবে কিনা সন্দেহ। কেন না জীবনের বিশ্লেষণ, সভ্যতার বিচার ইত্যাদি বস্তু একমাত্র বা প্রধানতঃ ভাষাজ্ঞানের উপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার রাজ্যে কার কিরূপ মতিগতি তাহার উপর।"

ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা

১। কার্ল্ মার্ক্স ও ফ্রিড্রিশ্ এঙ্গেল্স *

ধনবিজ্ঞানে যুগান্তর

(১)

ভারতে যাঁহারা ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট জার্ম্মাণ্ লেখক ফ্রিড্রিশ (ফ্রেডরিক্) এঙ্গেল্সের রচনাবলী অজানা জিনিষ নয়। এঙ্গেল্স্-প্রণীত "বিলাতী মজুর-শ্রেণীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা" নামক গ্রন্থ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল. জনগণের পারিবারিক আয়-ব্যয় এবং সমাজের অন্যান্য আর্থিক তথ্য বিষয়ে জগতের সর্ব্বত্র জ্ঞানলাভের যে প্রচেষ্টা দেখা যায়, তাহার জন্য সুধীগণ এঙ্গেল্সের এই গ্রন্থের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। নরনারীর জীবনে সুখ-স্বচ্ছন্দতা মাপিবার বাস্তব যন্ত্র এঙ্গেল্সের প্রদর্শিত পথেই আজও সকল মহলে কায়েম করা হইতেছে।

জার্ম্মাণির সমাজ-চিন্তায় এঙ্গেল্সের (১৮২০-৯৫) ঠাই খুব উঁচু। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক দর্শনে দুইজন জার্ম্মাণ ইহুদী ইয়োরামেরিকায় নামজাদা হন। একজনের নাম কার্ল্ মার্ক্স্ (১৮১৮-১৮৮৩)। দার্শনিক হেগেলের আলোচনা-প্রণালীর বিরুদ্ধে কলম ধরিয়া ইনি ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণে এক নবযুগের সূত্রপাত করেন। অধিকন্তু খাঁটি ধন-বিজ্ঞান এবং সমাজ-তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বহু বিষয়ে ইঁহার রচনাবলী জার্ম্মাণ পণ্ডিত-মহলের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছে।

---

* "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" নামক অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা।

মজুর এবং দরিদ্র লোকেরা ক্রমশঃ কার্ল্ মার্ক্‌স্‌কে যুগাবতার-জ্ঞানে পূজা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এই জ্ঞান আজকাল কেবলমাত্র জার্ম্মাণিতেই আবদ্ধ নয়। ইয়োরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড,—জগতের সকল দেশেই—"ওঁ কার্ল্‌মার্ক্‌সায় নমঃ" বলিয়া মজুরেরা, মজুর-প্রতিনিধিরা এবং সমাজ-লেখকেরা কাষ্য আরম্ভ করিয়া থাকে।

কার্ল্ মার্ক্‌সের সময়কার অপর জার্ম্মাণ-ইহুদী সমাজ-দার্শনিকের নাম ফার্ডিনাণ্ড লাসাল্ (১৮২৫-১৮৬৪)। ১৯১৮ সালে গণতন্ত্র স্থাপিত হইবার পর পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া এবার্টের সভাপতিত্বে যে রাষ্ট্রীয় দল জার্ম্মাণিতে রাজত্ব করিতেছে সেই দলের আদি পুরুষই লাসাল্। জার্ম্মাণ জাতি লাসালকে "সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাটিশে পার্টাই"র বা (সমাজ-সাম্যের দলের) প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া জানে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণিতে সর্ব্বপ্রথম মজুর-পরিষৎ স্থাপিত হয়।

মজুর সমাজকে আর্থিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছিল লাসালের জীবনের সাধনা। লাসাল্ প্রাচীন গ্রীক্-দর্শন এবং রোমাণ আইনকানুন বিষয়ক গবেষণা-মূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া সুধী-মহলে যশ পাইয়াছিলেন। সমসাময়িক খাজনা মজুরি এবং অন্যান্য আর্থিক তথ্যের বিশ্লেষণেও তাঁহার দক্ষতা সেইরূপ যশই পাইয়াছে।

(২)

মার্ক্‌সের সঙ্গে লাসালের কোনো কোনো ক্ষেত্রে একত্রে কাজকর্ম্মও চলিয়াছিল। লাসাল্ মার্ক্‌সকেই গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরু-শিষ্যরূপ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ মার্ক্‌সে এবং এঙ্গেল্‌সেই বেশী মাত্রায় পাকিয়া উঠিয়াছিল। মার্ক্‌স্ এবং এঙ্গেল্‌স্ "হরিহর-আত্মা" ছিলেন,

এইরূপ বলিলেই ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ঠিক বুঝা যাইবে। এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, এঙ্গেল্‌স্ ছিলেন খৃষ্টান, অর্থাৎ ইহুদী নন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মার্ক্‌সের সঙ্গে এঙ্গেল্‌সের প্রথম দেখা হয়। মার্ক্‌সের বয়স তখন ছাব্বিশ বৎসর; এঙ্গেল্‌স্ তাঁহার দুই বৎসরের ছোট। ইঁহারা দুইজনে মিলিয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে "দুনিয়ার নির্য্যাতিতদের নিকট" কমিউনিষ্টদের (ধন-সাম্য-পন্থীদের) ইস্তাহার প্রকাশিত করেন। মার্ক্‌স্-প্রবর্ত্তিত একাধিক সংবাদপত্রে এঙ্গেল্‌স্ সর্ব্বদাই লেখকরূপে হাজির থাকিতেন। মার্ক্‌সের মৃত্যু পর্য্যন্ত পূরাপুরি চল্লিশ বৎসর ধরিয়া দুই জনের বন্ধুত্ব বজায় ছিল।

এই চল্লিশ বৎসরের ভিতর কার্ল্ মার্ক্‌সের বহুসংখ্যক পুস্তিকা, বক্তৃতা, গ্রন্থ, সমালোচনা, তর্কবিতর্ক ইত্যাদি রচনা বাহির হইয়াছে। কিন্তু এইগুলির কোন্ কোনটায় কতখানি লেখা এঙ্গেলসের এবং কতখানি মার্ক্‌সের নিজের তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইলে গভীর গবেষণায় প্রবেশ করিতে হইবে। এই তথ্য হইতেই জার্ম্মাণির উনবিংশ শতাব্দীতে এবং দুনিয়ার ধন-বিজ্ঞানে, সমাজতন্ত্রে আর "দরিদ্র নারায়ণে"র পূজায় এঙ্গেল্‌সের কৃতিত্ব কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়।

কার্ল্ মার্ক্‌সের "ডাস্ কাপিটাল্" (বা পুঁজি) গ্রন্থে প্রচলিত ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার তীব্র সমালোচনা আছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাহির হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় যাইবার পূর্ব্বেই মার্ক্‌সের মৃত্যু হইয়াছিল। সম্পাদনের ভার ছিল এঙ্গেল্‌সের হাতে। এঙ্গেলসের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় ১৮৮৫ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। এই দুই খণ্ডে এঙ্গেল্‌সের স্বাধীন হাত প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ যে গ্রন্থ মার্ক্‌স্-নীতির গীতাস্বরূপ তাহার অনেক স্থলেই এঙ্গেল্‌সের কলম কাজ করিয়াছে।

এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ

(১)

যখনই আজকাল যেখানে মার্ক্‌সকে যুগাবতার বলা হইতেছে, সেখানে তখনই এঙ্গেল্‌সও পূজা পাইতেছেন। এই সূত্রে বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেল্‌স্ যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে "ড্যর উরস্প্রুং ড্যর ফামিলিয়ে ডেস্ প্রিফাট্‌ আইগেণ্টুম্‌স্ উণ্ড্ ডেস্ ষ্টাটেস্" (পরিবার, নিজস্ব এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি) নামে। তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে মার্ক্‌সের মৃত্যু হইয়াছে।

এঙ্গেল্‌স্ লিখিয়াছেন :—"এই গ্রন্থ রচনা করিয়া আমি প্রকারান্তরে একটা উইল-মাফিক্ কাজ করিতেছি। মর্গ্যানের অনুসন্ধানগুলাকে ধনবিজ্ঞানের তরফ্ হইতে ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন একজন যে-সে লোক নন। তিনি স্বর্গগত মহাপুরুষ কার্ল্ মার্ক্‌স্। ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা মার্কসের আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা-প্রণালী। এই ব্যাখ্যা-প্রণালী ফুটাইয়া তুলিতে আমিও অনেক কাল ধরিয়া তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছি। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রণালী দার্শনিক সাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

"এক্ষণে মর্গ্যান্ আমেরিকার আদিমবাসীদিগের জীবন আলোচনা করিতে গিয়া সেই প্রণালীই পুনরায় আবিষ্কার করিয়াছেন। "বার্ব্বার" সভ্যতার সঙ্গে "উৎকর্ষে"র যুগের তুলনায় মর্গ্যান প্রায় মার্কসের সিদ্ধান্তেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই কারণেই মার্কস্ মর্গ্যানের তথ্যগুলা গ্রহণ করিয়া নিজ দর্শনকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

"আমার বন্ধুবর নিজের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন

নাই। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কাজ করিয়া আমি একটা যথাসাধ্য ঠাঁই পূরণের ব্যবস্থা করিলাম। তবে মর্গ্যানের কথা লইয়া মার্ক্স্ যেখানে যেখানে টিপ্পনী বা টীকা করিয়া গিয়াছেন সেগুলা পুরাপুরি ব্যবহার করিতে ছাড়ি নাই।"

কাজেই বর্ত্তমান গ্রন্থও মার্ক্স্ এবং এঙ্গেল্স্ দুই জনেরই সন্তান এইরূপ ধরিয়া না লইলে গ্রন্থের জন্মকথা পরিষ্কার হইবে না।

(২)

এঙ্গেল্স্ তাঁহার রচনাকে "পরিবার, নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি" নামে প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই গ্রন্থে প্রথম বিবৃত হইয়াছে পরিবার বা বিবাহ পদ্ধতি ও যৌন সম্বন্ধের ইতিহাস। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় গেন্স্ বা গোষ্ঠী-প্রথার সমাজ-শাসন। তাহার জন্য আমেরিকার "ইণ্ডিয়ান্" (এবং বিশেষরূপে ইরোকোআ) জাতির প্রতিষ্ঠানগুলা আলোচনায় ঠাঁই পাইয়াছে।

এঙ্গেল্সের তৃতীয় কথা গোষ্ঠীর ভাঙন বা রাষ্ট্রের জন্ম। ইণ্ডিয়ান সমাজের লোকেরা গোষ্ঠী-কেন্দ্র ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাদের সমাজে রাষ্ট্রের চিহ্ন পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের জন্ম-কথা ঢুঁড়িয়া বাহির করিবার জন্য প্রাচীন ইয়োরোপের গ্রীক্, রোমাণ, কেল্টিক এবং জার্ম্মাণ জাতির স্মৃতিশাস্ত্র ও সংহিতাগুলা আলোচনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয়গুলার তালিকা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই গ্রন্থের মুখ্য কথা নয়। মুখ্য কথা পরিবার, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র এই তিন জীবনকেন্দ্রের ইতিহাস। এই কারণে বাংলা ভাষায় এঙ্গেল্সের রচনা "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের জন্ম-কথা" নামে প্রচারিত হইল।

নিজস্ব বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি গ্রন্থে মুখ্য কথা নয় বটে, কিন্তু এই বিষয়ই এঙ্গেল্‌সের "প্রাণের কথা"। সেই প্রাণের কথাটা গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের যেখানে সেখানে পাঠকের কান স্পর্শ করে। বস্তুতঃ ধনদৌলতের আকার-প্রকার মানবজাতির শৈশব-কালে কখন, কেন ও কিরূপ ভাবে বদ্‌লাইয়াছে তাহার আলোচনা করাই এঙ্গেল্‌সের উদ্দেশ্য ছিল। আর্থিক ইতিহাসের কোন্ স্তরে ব্যক্তিগত ধন-দৌলতের সৃষ্টি হইয়াছে, সে কথা এই গ্রন্থে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে বিবৃত হইয়াছে।

খাঁটি ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা বলিলে যে সাহিত্য নজরে আসে, এই গ্রন্থকে সেই সাহিত্যের অন্তর্গত করা চলিবে না। এই রচনা নৃতত্ত্ববিদ্যার মহলেই ঠাঁই পাইবার যোগ্য। নৃতত্ত্বের তথ্যগুলার উপরে আর্থিক ব্যাখ্যা চালাইলে যে-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা এঙ্গেল্‌স্ এখানে সেই তত্ত্বের প্রচারক। সমাজদর্শন, সভ্যতার ইতিহাস ইত্যাদি বস্তু প্রাচীন মানবের জীবনকথায় বা পুরাকাহিনীতে যতখানি পাওয়া যাইতে পারে, সেই দর্শন ও সেই ইতিহাসই বর্ত্তমান কেতাবের দান।

"নৃতত্ত্ব" বিদ্যা

নৃতত্ত্ব দুই শাখায় বিভক্ত :—শারীরিক ও সামাজিক। এক শাখায় পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন জাতির শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাপিয়া-জুকিয়া তুলনা করিয়া মানুষের উৎপত্তি, শ্রেণী-বিভাগ ইত্যাদির আলোচনা করিয়া থাকেন। এই বিদ্যাকে কম্পারেটিভ অ্যানাটমির (বা তুলনা-মূলক অস্থি-বিদ্যার) এবং জীববিজ্ঞানের জের বিবেচনা করা যাইতে পারে।

অপর বিভাগের পণ্ডিতেরা জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের নরনারীর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, লেন-দেন, স্মৃতিশাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, সু-কু ইত্যাদি জীবনের সকল খুঁটিনাটি আলোচনা করেন। সহজে

এই বিভাগের নৃতত্ত্ববিদ্‌গণকে লোকাচারতত্ত্ববিৎ বলা চলে। ধর্ম্ম, শিল্প, ধন-দৌলত, রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তুলনা-মূলক বিজ্ঞানগুলা সবই এই সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ্যার সামিল।

এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, "ইতিহাস" নামে যা-কিছু সাহিত্য রচিত হইয়া থাকে সবই নৃতত্ত্ব। কিন্তু পারিভাষিক হিসাবে এইখানে আর-একটা প্রভেদ চলিয়া আসিতেছে। অতি সাবেক কাল, মান্ধাতার আমল, প্রাগৈতিহাসিক যুগ ইত্যাদি সময়কার মানব-কথা অর্থাৎ মানব-সভ্যতার গোড়াটা লইয়া যাঁহারা অনুসন্ধান চালাইতেছেন একমাত্র তাঁহাদিগকেই নৃতত্ত্বের গবেষক বলা হয়।

অধিকন্তু বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন জনপদে যে সকল "আদিম" অনুন্নত, অসভ্য জাতি "সভ্যতার শৈশবাবস্থায়" জীবিত রহিয়াছে তাহাদের আচার ব্যবহার এবং স্বধর্ম্মের সকল প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যে সকল অনুসন্ধানকারীর মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁহারাও নৃতত্ত্ববিদরূপে পরিচিত। এই হিসাবে পর্য্যটক, ভৌগোলিক আবিষ্কারক ইত্যাদি শ্রেণীর লোক নৃতত্ত্বের সংসারে নাম করিয়া থাকেন।

মর্গ্যানের সিদ্ধান্ত

মর্গ্যান্ লোকটা কে? চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই লেখক আমেরিকার ইণ্ডিয়ান সমাজে তথ্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। ইরোকোয়াদের কুটুম্ব-সম্বন্ধ বা আত্মীয়তার প্রথা সম্বন্ধে ইনি ১৮৭১ সালে যে-সকল তথ্য প্রকাশ করেন তাহার ফলে গোটা লোকাচারতত্ত্ব, বিবাহ-পদ্ধতি এবং সামাজিক নৃতত্ত্বে এক নবযুগ সুরু হয়। ইঁহার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম

"এন্‌শ্যেন্ট সোসাইটি" (বা প্রাচীন সমাজ)। "স্তাহ্বেজ" (বা সহজ) অবস্থা হইতে মানবজাতি কোন্ পথে "বার্ব্বার" সভ্যতা অতিক্রম করিয়া "উৎকর্ষে"র স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছে সেই তথ্যগুলা নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থ ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মর্গ্যানের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, মানব-সমাজে এককালে "দলগত" বিবাহ অর্থাৎ অবাধ যোনিসংস্রব প্রচলিত ছিল। এই অবাধ সংস্রবে বিধি-নিষেধ কায়েম হইতে থাকে। ক্রমশঃ গেন্‌স্ বা গোষ্ঠী-প্রথা দেখা দেয়। গোষ্ঠী-নীতি আবিষ্কার করা মর্গ্যানের দ্বিতীয় কীর্ত্তি। গোষ্ঠী সংরক্তজ জীবন-কেন্দ্র। এক গোষ্ঠীর ভিতর পরস্পর-বিবাহ নিষিদ্ধ। গোষ্ঠী পরিচালিত হইত প্রথম প্রথম নারীর তরফ হইতে "জননী-বিধি"র নিয়মে। সেই "জননী-বিধি"র গোষ্ঠী আজও চলিতেছে ইরোকোআ সমাজে। এই গেল মর্গ্যানের তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

"নারীর আমল" গোষ্ঠীধর্ম্ম হইতে পরে উঠিয়া যায়। তাহার পরিবর্ত্তে দেখা দেয় "পুরুষ-বিধি" এবং পুরুষাধিপত্য। গ্রীক্, রোমাণ এবং জার্ম্মাণ সমাজগুলার প্রাচীনতম স্মৃতিশাস্ত্রে পুরুষ-প্রাধান্যশীল গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠানই দেখিতে পাওয়া যায়। মর্গ্যানের এই আবিষ্কার প্রাচীন ইয়োরোপের ইতিহাস-রচনায় যুগান্তর আনিয়াছে।

(২)

এই চার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াই মর্গ্যান আলোচনা খতম করেন নাই। "উৎকর্ষে"র যুগ সম্বন্ধে অর্থাৎ যে যুগের ভরা জোয়ারে বর্ত্তমান জগতের "সভ্য" নরনারী বসবাস করিতেছে—সেই স্তরের জীবন-যাত্রাকে ইনি চরম ভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন। লাভের লোভই এই যুগের ধনোৎপাদনের গোড়ার কথা,—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ধনজীবীরা আর কিছু চিন্তা

করে না,—ইহাই মর্গ্যানের মতে উৎকর্ষশীল মানবের মূল মন্ত্র। ফরাসী সোশ্যালিষ্ট ফুরিয়ে যে-ভাবে বর্ত্তমান জগতের আর্থিক ব্যবস্থার নিন্দা করিয়াছেন, মর্গ্যানও সেইরূপই করিয়াছেন।

"উৎকর্ষে"র যুগকে গালাগালি দেওয়াটাই মর্গ্যানের শেষ কথা নয়। একটা ভবিষ্য সমাজের স্বপ্নও তাঁহার মাথায় ছিল। কোথায় একটা অনুন্নত আদিম অসভ্য জাতির আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বৃত্তান্ত-প্রকাশ এবং প্রাচীন ইয়োরোপের মান্ধাতার আমলের গ্রীক-রোমাণ-জার্ম্মাণদের জীবন কথার আলোচনা, আর কোথায় বর্ত্তমান মানবের জন্য সমাজ-সংস্কার, পরিবার-সংস্কার, আর রাষ্ট্র-সংস্কারের খোসাবিদা! সমাজ-সংস্কারক হিসাবে মর্গ্যান প্রায় মার্ক্সের বিপ্লব-পথেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কারণ মর্গ্যানের মতে ভবিষ্য মানব সেই মান্ধাতার আমলেরই যৌথসম্পত্তি-নিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠীধর্ম্মের এক নবরূপ প্রকটিত করিবার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় পাণ্ডিত্য

এঙ্গেল্সের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। ইহার ইংরেজী সংস্করণ বাহির হয় ১৯০২ সালে। অন্যান্য ভাষায় ইহার তর্জ্জমা পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিন্তু কি মর্গ্যানের আবিষ্কারগুলা, কি এঙ্গেল্স্-মার্ক্সের আর্থিক ব্যাখ্যা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিতর ভারতীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করে নাই।

সেকালের কোনো ভারতীয় লেখক এই সকল তথ্য বা তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। অধিকন্তু প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারত বিষয়ক আর্থিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় তথ্যগুলা এই মর্গ্যান মার্ক্স্-প্রবর্ত্তিত সমাজ-বিজ্ঞানের আওতায় আনিয়া পরখ্ করিতেও কোনো ভারতীয় গবেষক চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। রামমোহন,

বঙ্কিম, ভূদেব, চন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ইত্যাদির প্রবন্ধাবলীতে সে যুগের দৌড় জরীপ করা চলিতে পারে।

ভারতে যা-কিছু ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রায় সবই মাত্র ১৯০৫ সালের সম সম কালে এবং পরে দেখা দিয়াছে। রাজেন্দ্রলাল, রমেশচন্দ্র ইত্যাদির ঐতিহাসিক গ্রন্থরাজি ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে একটা ঐতিহাসিক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। অধিকন্তু বিগত বিশ বৎসর ধরিয়া যুবক-ভারত ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিদ্যার জন্যও সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ইয়োরামেরিকান গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হইতেছে। কিন্তু ধন-বিজ্ঞানের তরফ হইতে ভারতীয় মান্ধাতার যুগকে যাচাই করিবার দিকে অথবা মানব-সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বুঝিবার দিকে কোনো চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশের কুত্রাপি ত নাই-ই, ভারতের কোথাও দেখি না।

বিষাক্ত "প্রাচ্যামি"

(১)

একদম নাই বলিলে ভুল হইবে। কেননা প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ভারতীয় লেখকদের কয়েকখানা ইংরেজি কেতাব বাহির হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের যে যে অংশ প্রাচীন তথ্যগুলার খাঁটি বিবরণ মাত্র সেই সকল অংশ প্রত্নতত্ত্ব-হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানেই বিদেশী—বিশেষতঃ ইয়োরামেরিকান তথ্যের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনার ইঙ্গিত মাত্র আছে সেইখানেই গোড়ায় গলদ ধরা পড়ে।

লেখকগণ প্রাচীন ভারতকে বিলকুল সৃষ্টিছাড়া ভূখণ্ডরূপে প্রচারিত

করিবার জন্য বিজ্ঞান-সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। অথবা বিদেশী প্রতিষ্ঠান-গুলার সন-তারিখ, "জাতিভেদ", স্তর-বিন্যাস বা যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই ইঁহারা ভারতীয় "স্বদেশী সমাজে"র স্বধর্ম্ম, বিশেষত্ব, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন! ফলতঃ যে-সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দুনিয়ার সকল জাতিরই "সামান্য ধর্ম্ম" মাত্র সেইগুলাকেও অতি মাত্রায় ভারতাত্মার ও প্রাচ্য-জীবনের প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রচারিত করা হইতেছে। চিত্রকলা, স্থাপত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি "রসে"র সমালোচনায়ও এই বিষাক্ত "প্রাচ্যামি"র জয়জয়-কার চলিতেছে।

এইরূপ ভ্রমাত্মক আলোচনায় পথ দেখাইয়াছেন ইয়োরামেরিকার প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ "ওরিয়েণ্ট্যালিষ্ট্" পণ্ডিতগণ। তাঁহাদের জুড়িদারস্বরূপ পাশ্চাত্য, বিজেতা-জাতীয়, সাম্রাজ্য-শাসক, "কলোনিয়ালিষ্ট" (উপনিবেশ-তন্ত্রী) রাষ্ট্রিকেরাও সমাজ-বিজ্ঞানের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী। এই দুই শ্রেণীর লোক প্রায় এক শ' বৎসর ধরিয়া পূর্ব্বকে পশ্চিম হইতে ফারাক্ করিয়া রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দুনিয়ার শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্যের যুগে শ্বেতাঙ্গদিগকে "একঘরে" করিয়া রাখা শ্বেতাঙ্গ বিজ্ঞান-সেবীদের স্বার্থ এবং স্বধর্ম্ম। পশ্চিমের চিত্তে আর পূর্ব্বের চিত্তে কোনো প্রকার মিল বা সাদৃশ্য আছে এ কথা স্বীকার করিলে পশ্চিমাদের ইজ্জৎ রক্ষা হয় না। পশ্চিমাদের এই ঘোরতর প্রাচ্য-বিদ্বেষই তথাকথিত "প্রাচ্যামি"র জনক।

তুলনামূলক সমাজ-বিদ্যার আলোচনায় ভুল কেন প্রবেশ করিয়াছে এবং এই বিজ্ঞানের সংস্কার কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহার আলোচনা মৎপ্রণীত "ফিউচারিজ্‌ম্ অব্ ইয়ং এশিয়া" বা "যুবক

এশিয়ার ভবিষ্য-নিষ্ঠা" (লাইপ্‌ৎসিগ্‌ ১৯২২) গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গেল গোটা সভ্যতা-বিজ্ঞান বা সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা।

সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও সিদ্ধান্তগুলার কিম্মৎ বাহির করিবার জন্য "পোলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশ্যান্‌স্‌ অ্যাণ্ড থিয়োরিজ অব্‌ দি হিন্দুজ্‌" অর্থাৎ "হিন্দুজাতির শাসন-পদ্ধতি ও রাষ্ট্রনীতি" (লাইপ্‌ৎসিগ্‌ ১৯২২) নামক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের ভারতসন্তান ভালয় মন্দয়, গ্রীক, রোমাণ এবং জার্ম্মাণদেরই সমকক্ষ ছিল—এই কথা সেই গ্রন্থের প্রাণ। বর্ত্তমান ভারত অথবা ভবিষ্য ভারত সম্বন্ধে এই কেতাবে কোনো কথা বলি নাই।

ভবিষ্য-নিষ্ঠার দর্শন

ভবিষ্য ভারত কোন্‌ পথে চলিবে? এই সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ খুসী তিনি সেইরূপ আদর্শ প্রচার করিতে অধিকারী। গোটা দুনিয়া কোন্‌ পথে চলিবে? এই সম্বন্ধে যেমন প্রত্যেক লেখক, সমাজ-সংস্কারক, বৈজ্ঞানিক বা প্রপাগাণ্ডিষ্ট্‌ নিজ নিজ মত জাহির করিতেছে, ভারত সম্বন্ধেও ভবিষ্যবাদীরা সেইরূপ করিবে ইহা স্বাভাবিক। স্বাধীন চিন্তায় বাধা দিবে কে? যাহার মাথায় কিছু কিছু মগ্‌জ আছে, সেই এক-একটা দল পুরু করিতে অধিকারী।

কিন্তু তাহা বলিয়া কোনো-একটা পথকে "পূরবী" এবং অপর কোনো পথকে "পশ্চিমা" দাগে চিহ্নিত করিতে বসিলে তর্ক-বিতর্কের আখ্‌ড়ায় আসিয়া পাঞ্জা কষিতে হইবে। এই আখ্‌ড়ায় আদর্শ, ভাবুকতা, মানব-জাতির আশা, সমাজ-সংস্কারকের স্বপ্ন বা পীরবরের বাণী খাটে না। এখানে খাটে কেবল তথ্য, বাস্তব তথ্য, যাহা ঘটিয়াছে এবং যাহা ঘটিতেছে তাহার নিরেট বিবরণ। অর্থাৎ দেশী-বিদেশী, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, ভারতীয়

এবং অ-ভারতীয় সকল প্রকার জীবন-কেন্দ্রের সন-তারিখ-সমন্বিত এবং দফায় দফায় তুলনা-মূলক ইতিহাস বা নৃতত্ত্ব।

ধরা যাউক যেন চর্‌খা চালাইয়াই ভবিষ্য ভারত স্বর্গে উঠিবে। অথবা যেন পল্লী-কেন্দ্রেই ভারতের ভবিষ্য-বিকাশ ঘটিতে বাধ্য অথবা যেন কুটীর-শিল্প ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার শিল্প-ব্যবস্থা ভারত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত, অথবা যেন ভবিষ্য-ভারতে রাষ্ট্র-শাসন চলিবে পল্লী-পঞ্চায়তেরই বিধানে। ভবিষ্যবাদীরা এই চার দফায় ভারতীয় জীবন গড়িয়া তুলুন—আপত্তি কি? কিন্তু এই চার দফার কোনোটাকে ভারতীয় "আধ্যাত্মিকতার"ই বিশিষ্ট আবিষ্কার বলা যাইতে পারে কিসের জোরে? এই "চার মহা-সত্য" জগতের অন্যান্য দেশে কোনো কোনো যুগে নরনারীর জীবন-কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করে নাই কি?

এই "সত্য-চতুষ্টয়"ই যদি আধ্যাত্মিকতা এবং মানব-সভ্যতার চরম নিদর্শন হয় তাহা হইলে দুনিয়ার আদিম, অসভ্য "বাব্বার", অনুন্নত জাতিগুলা চরম মাত্রায় আধ্যাত্মিক এবং সভ্যতাশীল নয় কি? তাহা হইলে প্রাচীন ইয়োরোপের গ্রীক, রোমাণ, জার্ম্মাণরা এবং মধ্য যুগের পর হইতে ফ্যাক্টরি যুগের কলচালিত শিল্প-ব্যবস্থার আমল পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় খৃষ্টানরা আধ্যাত্মিকতা এবং সভ্যতার দাবী হইতে বঞ্চিত হইবে কেন?

তাহা হইলে পাশ্চাত্য-সংসারের সোশ্যালিষ্ট্‌ পন্থীরা এবং বিশেষতঃ কমিউনিষ্ট বা যৌথ-সম্পত্তি-পন্থী ধনসাম্যধর্ম্মীরা কি দোষ করিল? তাহা হইলে লেনিন্‌-ট্রট্‌স্‌কিপ্রবর্ত্তিত বোল্‌শেভিক্‌ রুশিয়া কম-সে কম আদর্শ হিসাবে আধ্যাত্মিকতা এবং সভ্যতার মাপকাঠিতে চরমে গিয়া ঠেকে নাই কি? তাহা হইলে লেনিন্‌-ট্রট্‌স্‌কির "গুরুর গুরু" জার্ম্মাণ-ইহুদীর বাচ্চা কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ তথাকথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এবং

ভারত-ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি নয় কি? পূর্ব্বই বা কোথায়? পশ্চিমই বা কোথায়?

তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞান

এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ ভারতীয় সমাজে প্রচারিত হইলে ভারতবাসী নিজ নিজ স্মৃতি-নীতি-ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষশাস্ত্রগুলার দিকে এক নূতন চোখে দৃষ্টিপাত করিতে সুরু করিবে। ভারতের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সম্বন্ধে যুবক-ভারত বহু বুজ্‌রুকি এবং কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে শিখিবে। তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞান-বিদ্যা কিছু কিছু করিয়া ভারত-সন্তানের পেটে পড়িতে থাকিবে।

মর্গ্যান, মার্ক্‌স্‌, বা এঙ্গেল্‌স্‌ কাহারও মত বা বাণীই বেদবাক্য নয়। সকলের কথাই তথ্যের জোরে কষিয়া দেখা আবশ্যক। কিন্তু ইঁহাদের রচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধের সমাজ-চিন্তা পুষ্ট হইয়াছে। এখনো এইগুলার দাম বিজ্ঞানের বাজারে ঢের। এই কারণে ভারত-সন্তানের পক্ষে এইগুলা জানিয়া রাখা দরকার। ১৯২৪ সালের পূর্ব্বে এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয় নাই, ইহা লজ্জার কথা। এই ধরণের আরও অনেক গ্রন্থ এতদিনে বাংলা ভাষায় পাওয়া উচিত ছিল।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীতে "প্রাচীন সমাজ" সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া নিউইয়র্কে এই সকল গবেষণার ফল নানা গ্রন্থে প্রচারিত হইতেছে (১৯২০-২২)। রবার্ট লোহ্বি, আর্থার গোল্ডেনহ্বাইজার্‌ এবং প্লিনি গডার্ড্‌ এই তিন জন লেখকের রচনাবলী পাঠ করিলে মর্গ্যানের পরবর্ত্তী কালের সকল সিদ্ধান্ত ইংরেজিতে পাওয়া যায়। সেই সকলের চুম্বক-প্রকাশ এই ভূমিকায় চলিতে পারে না।

ইতিহাসের "আর্থিক ব্যাখ্যা"

(১)

মানব-জাতির শৈশব সম্বন্ধে তুলনা-মূলক আলোচনা এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থের প্রথম কথা। তুলনাসিদ্ধ ইতিহাস হিসাবে এই রচনা এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আর এক তরফ্ হইতেও এই কেতাব সুধী-মহলের শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে। সে ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা বা সভ্যতার আর্থিক ব্যাখ্যার তরফ্।

এই "আর্থিক ব্যাখ্যা", "ভৌতিক ব্যাখ্যা" ইত্যাদি ধরণের "ব্যাখ্যা"টা কি চীজ ? এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ স্বয়ংই এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর প্রয়োগ-ক্ষেত্র। কেতাবটা ঘাঁটিলেই "ফলেন পরিচীয়তে।" সেই ব্যাখ্যা-প্রণালী প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই কেতাব বাংলায় দেখা দিল।

ভারতবাসীর পক্ষে "আর্থিক ব্যাখ্যা" হজম করা কিছু কঠিন। কেননা লেখায়, বক্তৃতায়, পাঠশালায়, বাক্‌বিতণ্ডায়, কবিতায়, ইতিহাসে, খবরের কাগজে, মায় রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের সভায় সভায় ও আমাদের পণ্ডিত এবং জননায়কগণ আমাদিগকে দুই পুরুষ ধরিয়া একটা মাত্র বুখ্‌নি শিখাইয়া আসিয়াছেন। সেই বুখ্‌নির মোটা কথা এই—"হিন্দু-মুসলমান আমলে নর-নারীরা ইহলোকের ধার ধারিত না। তাহারা পরলোক লইয়াই মস্‌গুল থাকিত। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ছিলেন পুরামাত্রায় আত্মিক। ভৌতিক জগৎটা তাঁহাদের জ্ঞান ও কর্ম্মের বহির্ভূত ছিল। যদিও বা কিছু অন্তর্গত ছিল তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।"

(২)

প্রাচীন ভারতের লোকগুলা যে মানুষ ছিল, ইহাদের যে রক্ত-মাংসের শরীর ছিল, অতএব রক্ত-মাংসের স্বধর্ম্ম হিন্দু-মুসলমানদিগকে নিয়ন্ত্রিত

করিত—এই কথা বিশ্বাস করা আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহারা ছিলেন বোধ হয় প্রায় সকলেই ইতিহাসের "আত্মিক ব্যাখ্যার" ধুরন্ধর, অধ্যাত্মবিদ্যার পাঁড় বিশেষ। সভ্যতার এবং মানব-জীবনের একবগ্‌গা আত্মিক ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য মুলুকেও বহুকাল চলিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বুখ্‌নিটাই বোধ হয় ভারতীয় সমাজ-সংস্কারক এবং ইতিহাস-লেখক-মহলে অতিমাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল।

এই একবগ্‌গা আত্মিক ব্যাখ্যার উপর চাবুক লাগানো হইয়াছে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত মৎপ্রণীত "পজিটিভ্‌ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড অব্‌ হিন্দু সোসিঅলজি" (অর্থাৎ হিন্দু সমাজ-তত্ত্বের বাস্তবভিত্তি) নামক গ্রন্থে (পাণিনি-কার্য্যালয়, এলাহাবাদ)। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে ১৯২১ সালে। ভারতীয় মানুষের ক্ষিধে পায়, ভারতীয় মানুষ হাওয়ায় উড়িয়া বেড়ায় না, পায়ে হাঁটিয়া চলে, ভারতীয় মানুষ জমি-জমা লইয়া মারামারি করে, ভারতীয় মানুষ লড়াই করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে চায়, ভারতীয় মানুষ "একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং" কামনা করে, ভারতীয় মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন করে, ভারতীয় মানুষ স্ত্রী-পুত্রের জন্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্য সুখ-স্বচ্ছন্দতার বিধান করিতেও অভ্যস্ত,—এই সকল অতি মামুলি বস্তু এই গ্রন্থের তথ্য।

"ট্রান্সেণ্ডেণ্টাল্‌" বা অতীন্দ্রিয় তরফ্‌টাকে ফুলাইয়া তুলিলে হিন্দুজীবন, হিন্দুত্ব, প্রাচ্য ধর্ম্ম, প্রাচ্যের সভ্যতা বুঝিতে পারা যাইবে না। ইতিহাস-রচনায় প্রচলিত "অতীন্দ্রিয়ামি" বা "আধ্যাত্মিকামি"র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুরু করিবার জন্যই ভারতীয়দের বাস্তবনিষ্ঠা প্রদর্শিত করা হইয়াছে। ফরাসী দার্শনিক কঁৎ-প্রবর্ত্তিত "পজিটিভ্‌" শব্দের দ্বারা গ্রন্থের পরিচয়

দেওয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ, বাস্তবিক, "লোকায়ত", ইহলৌকিক, ভৌতিক, "মেটিরিয়ালিষ্টিক্" সাংসারিক, "ইকনমিক্," "আর্থিক"—এসব শব্দ একই অর্থের এপাশ ওপাশ মাত্র বিবৃত করে। সম্প্রতি জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত "ডী লেবেন্‌স্-আন্‌শাউং ডেস্ ইণ্ডার্‌স্" (ভারতীয় জীবন-সমালোচনা) গ্রন্থেও (লাইপৎসিগ্, ১৯৩) বিজ্ঞানমহলে প্রচলিত কুসংস্কারগুলা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

"পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড" গ্রন্থে ভারতীয় ইতিহাসের বাস্তব বা ভৌতিক (এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক) "ভিত্তি" মাত্রের সূচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের আর্থিক বা ভৌতিক "ব্যাখ্যা" বলিলে যাহা বুঝায় তাহা "ভিত্তি" মাত্রের সমান নয়। এই ভিত্তিটাকে জীবনের, সভ্যতার এবং ক্রমবিকাশের "কারণ" রূপে প্রদর্শন না করা পর্য্যন্ত আর্থিক "ব্যাখ্যা" জারি করা হইয়াছে বলা হইবে না।

অর্থাৎ কৃষিশিল্প-বাণিজ্যের কতকগুলা তথ্য ইতিহাস-গ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে ছড়াইয়া দিলেই সভ্যতার আর্থিক "ব্যাখ্যা" করা হইল না। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নির্ণয় এই ব্যাখ্যার আসল কথা। খাওয়াপরার ব্যবস্থা দ্বারা, অন্নসংস্থানের উপায়ের দ্বারা, সোজা কথায় ভাত-কাপড়ের প্রভাবে দুনিয়ার ধর্ম্ম, সুকুমার শিল্প, পারিবারিক রীতিনীতি সৌজন্য, শিষ্টাচার এবং রাষ্ট্রশাসনের বিধি-নিষেধ সবই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, —এই কথা যে-সকল ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন একমাত্র তাঁহারাই সভ্যতার ভৌতিক "ব্যাখ্যা" প্রচার করিতেছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ইতালীয় ইতিহাস-দার্শনিক ভিকো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এই

ভৌতিক ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মার্ক্স্-এঙ্গেল্স-প্রচারিত "ডাস্ কোমুনিষ্টিশে মানিফেষ্ট্" অর্থাৎ ধনসাম্যধর্ম্মীদের অনুশাসন বা ইস্তাহার (১৮৪৮) নামক পুস্তিকায় এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর মূলসূত্রগুলা জগতে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছে। বিলাতে থরল্ড্ রজার্স্ নামক প্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞানবিদের "ইকনমিক্ ইন্টারপ্রেটেশন্ অব্ হিষ্টরি" এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর পূর্ব্বাপর ইতিহাস এবং সমালোচনা নিউইয়র্কের অধ্যাপক সেলিগ্ম্যানের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ফরাসী পণ্ডিত জিদ্ এবং রিস্ত্ প্রণীত "ইস্তোআরদে দোক্‌ত্রিন্ জেকোনোমিক্" গ্রন্থের শেষ অর্দ্ধে এই সকল চিন্তা-প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ সুপরিচিত।

প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় মানব-সভ্যতার উপর ভাত-কাপড়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্ বর্ত্তমান জগৎকে "আত্মিক ব্যাখ্যা", আধ্যাত্মিকামি এবং অতীন্দ্রিয়ামির কবল হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের মাথাও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

অন্নচিন্তা ও দর্শন-সাহিত্য

(১)

"সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!"—এই গুঁতোর চরম গুঁতো হইতেছেন ভাতকাপড়ের টান, "অন্নচিন্তা চমৎকারা"। একথা আজকালকার দিনে কোনো ভারতবাসীকে এমন কি ফর্সা কাপড়-জামা-পরা পরীক্ষায়-পাশকরা মস্তিষ্কজীবী "ভদ্রলোক"দিগকেও—চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইবার দরকার নাই। ইয়োরামেরিকায় কোনো নরনারীই এই বিষয়ে অন্ধ নয়। সভ্যতার "আর্থিক ব্যাখ্যা" বিংশ

শতাব্দীর এক প্রথম স্বতঃসিদ্ধ। বলা বাহুল্য, দুনিয়ার "হাভাতো" "হাঘরো" দরিদ্র নির্য্যাতিত প্যারিয়াদের পক্ষে ইহাই একমাত্র বেদান্ত।

যাহারা চাষ-আবাদে জীবন ধারণ করে, তাহাদের "স্বধর্ম্ম" অর্থাৎ রীতিনীতি লেনদেন শাসন-শোষণ—একপ্রকার। আবার যাহারা জানোয়ার চরাইয়া সভ্যতা গড়িয়া তুলে তাহাদের ধরণ-ধারণ "আত্মিক" জীবন আর একপ্রকার!

সেইরূপ যাহারা "রোজ আনে রোজ খায়" তাহারা বিশ্বশক্তিকে এক চোখে দেখে। আবার যাহারা যে জিনিষ তৈয়ারী করে সেই জিনিষ খায় না, সেইগুলার বদলে বাজার হইতে আর-একপ্রকার জিনিষ "কিনিয়া" আনিয়া খায়, আবার কিছু কিছু জমাইয়াও রাখে; তাহাদের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি, তাহাদের দর্শন, তাহাদের জীবন-সমালোচনা, তাহাদের বিশ্বদৃষ্টি ("হ্বেল্টান্‌শাউঙ") অন্যবিধ।

আবার চাষ-আবাদের ফলে বা আওতায় যে বিবাহ-পদ্ধতি, যে শিল্পকলা, যে ভগবদ্ভক্তি দেখা দেয় অন্য কোনো প্রকার ধনসৃষ্টির ফলে বা আওতায় ঠিক সেইরূপভাবে এইসব না গজাইতেও পারে। শিল্পকর্ম্ম হাতের জোরে চলিলে একধরণের পারিবারিক ও সামাজিক নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠে। কিন্তু সেই শিল্পই যন্ত্রের দ্বারা চালিত হইলে দর্শন, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের সম্বন্ধ, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ, সবই নবরূপে দেখা দেয়। পল্লীস্বরাজ নামক সমাজ-শাসন বা রাষ্ট্রশাসন যে ধরণের কৃষিশিল্পবাণিজ্যের প্রতিমূর্ত্তি, নগরকেন্দ্র ঠিক সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থার সন্তান নয়; ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২)

এই সকল বিভিন্নতা ও পার্থক্যের ভিতর জগতে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম দিক-ভেদ নাই। শাদা চামড়া, লাল চামড়া, কাল চামড়া, হলদে

চামড়ার প্রভেদও নাই। ধনোৎপাদনের প্রণালী দুনিয়ার যত জায়গায় এবং যত যুগে একপ্রকার, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি মানব-সভ্যতার অভিব্যক্তিগুলা তত জায়গায় এবং তত যুগে একজাতীয় সমশ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান।

বাষ্প চালিত শিল্প-বাণিজ্যের যুগারম্ভ পর্য্যন্ত কি এশিয়া কি ইয়োরামেরিকা সকল ভূখণ্ডের মানবজাতিই এক "আদর্শে" চলিয়াছে। ইয়োরামেরিকা বর্ত্তমান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে হাতের জোরে এবং মাথার জোরে। এই সৃষ্টিকার্য্যে এশিয়া এক কাঁচ্চাও সাহায্য করিতে পারে নাই। এই যুগে এশিয়াবাসীর মগজ পচিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান জগৎ সৃষ্ট হইবামাত্র ইয়োরামেরিকা প্রায় বোল আনাই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এই জন্যই আজ গতানুগতিকপন্থী এশিয়ার নরনারী ইয়োরামেরিকান্‌দিগকে কোনো মতেই চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

তবে ইয়োরামেরিকার আবিষ্কৃত বর্ত্তমান জগৎটা এশিয়ায়ও আসিয়া হাজির হইয়াছে। চীন, জাপান, ভারত, পারস্য, মিসর, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের যেখানে যতখানি এই বর্ত্তমান জগতের প্রভাব দেখা যায় সেইখানে ততখানি এশিয়ান্ নরনারী ইয়োরামেরিকান্‌দের "মাসতুত ভাইয়ের" মতনই চলা-ফেরা করিয়া থাকে। ষ্টীম এঞ্জিন হইতে বোলশেভিজম্ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জগতের সকল "সমস্যাই" আজ খাঁটি প্রাচ্য স্বদেশী মাল।

রক্তমাংসের স্বধর্ম্ম

মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌স্-প্রচারিত স্বতঃসিদ্ধগুলা অন্যান্য বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ-সমূহেরই অনুরূপ। প্রত্যেক স্বতঃসিদ্ধেরই সীমানা আছে। আজকালকার বিজ্ঞান-জগতে আইনষ্টাইনের "রেলেটিভিটি" বা আপেক্ষিকতা দিগবিজয়

লাভ করিয়াছে। আইনষ্টাইনের তত্ত্বটা যদিও বুঝি না তাঁহার বোল্‌টা ব্যবহার করিতে ভয় পাইতেছি না। এই পারিভাষিক হিসাবে বলিতে চাই যে, আর্থিক ব্যাখ্যা-প্রণালীর স্বতঃসিদ্ধগুলাও "রেলেটিভ" অর্থাৎ আপেক্ষিক।

মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌সের কট্টর সেবকেরা অবশ্য এইসকল সূত্রের আপেক্ষিকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। তাঁহারা একবগ্‌গা লোক, অদ্বৈতবাদী "মোনিষ্টিক্‌"। কিন্তু বর্ত্তমান লেখক মানবজীবনকে কোনো এক খুঁটায় খাড়াভাবে দেখিতে বুঝিতে বা ব্যাখ্যা করিতে অপারগ। এক সঙ্গে বহু শক্তি জীবনকে পুষ্ট করিতেছে। এই বহুত্বের ভিতর শারীরিক কাঠাম, শরীরের শক্তিযোগ, রক্তমাংসের স্বধর্ম্ম, সংগ্রামধর্ম্মের স্বাস্থ্যভিত্তি, আর্থিক মেরুদণ্ড, "দেহাত্মকবুদ্ধির" বস্তুনিষ্ঠা ইত্যাদি সম্পর্কিত শক্তিগুলার ইজ্জৎ খুব বড়। জগতের পণ্ডিতেরা ভৌতিক ধর্ম্মের ইজ্জৎ সহজে দিতে রাজি নন। সেই সকল অধ্যাত্মনিষ্ঠ একবগ্‌গা পণ্ডিতের একদেশ-দর্শিতা ধ্বংস করিবার জন্য সভ্যতার আর্থিক ব্যাখ্যার, এমন কি সময় সময় একবগ্‌গা আর্থিক ব্যাখ্যারও প্রয়োজন আছে। "যেমন কুকুর, তেমন মুগুর।"

এ প্রয়োজনটা ভারতে যতই বুঝা যাইতে থাকিবে ততই সুকুমার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্র, পরিবার, সামাজিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য জীবন-কেন্দ্রগুলা বুঝিবার পক্ষে যুবক ভারত দিন দিন উন্নতি লাভ করিবে। অধিকন্তু ভবিষ্য ভারতকে কোন্‌ পথে চালাইলে কত চালে কিস্তিমাৎ হইবে তাহার অনেক সঙ্কেতই এই আর্থিক-ব্যাখ্যা-সমন্বিত ইতিহাস-বিজ্ঞানের আলোচনায় পরিষ্কার হইয়া আসিবে। এই ব্যাখ্যাই যুবক-ভারতে যুগান্তরের দ্বিতীয় স্তর গঠন করিবে। ভারতীয় "যৌবন পূজা"র আন্দোলনে অতীত-নিষ্ঠা এবং ভবিষ্য-নিষ্ঠা দুইই নবরূপে দেখা দিবে।

এই সকল বিষয় "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের নানাখণ্ডে ঠারে ঠোরে উত্থাপন করিয়াছি। সুবিস্তৃত গ্রন্থ লিখিবার সুযোগ ও সময় জুটে নাই। কিন্তু এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থে বাঙ্গালী পাঠক নবীন ইতিহাস-বিজ্ঞানের রস এক খাঁটি ফোয়ারার স্রোতেই—বস্তুতঃ স্বয়ং ভগীরথের তত্ত্বাবধানেই—চাখিয়া দেখিবার সুযোগ পাইবেন। যাহারা ইংরেজি জানেন না বা কম জানেন তাঁহাদের কাজে আসিলেই এই অনুবাদ-গ্রন্থ সার্থক হইবে।

লুগানো, সুইটসার্ল্যাণ্ড

৮ই এপ্রিল, ১৯২৪

২। পোল লাফার্গের গ্রন্থ*

পারিসের "নুহেবল রেহিব্যু" নামক পত্রিকায় পোল লাফার্গ প্রণীত "ধনদৌলতের ক্রমবিকাশ" বিষয়ক প্রবন্ধগুলা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। ফ্রান্সের এবং ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন মহলে এই রচনাবলী তারিফ করিয়া সেই সময়ে অনেকে নানা কথা লিখিয়াছিলেন।

বিলাতী বিজ্ঞান-লেখক হাক্‌স্‌লে সুইস-ফরাসী প্রকৃতি-পূজক সমাজ-লেখক সাহিত্যবীর রুসো কর্ত্তৃক প্রচারিত মানবজাতির সাম্য ও ঐক্যের বিরুদ্ধে কলম চালাইতেন। হাক্‌স্‌লের মত খণ্ডন করিয়া লাফার্গ প্রাচীন সমাজে সুপ্রচলিত ধনসাম্য এবং যৌথ সম্পত্তির ব্যবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। জাতিগত ধনদৌলতের তথ্যগুলা লণ্ডনের "ডেলি নিউজ" এবং "টেলিগ্রাফ" ইত্যাদি দৈনিক পত্রের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তখনকার দিনে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে জার্ম্মাণির সোশ্যালিষ্ট-পন্থী রাষ্ট্রীয় দলের তত্ত্বাবধানে "সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাটিশে বিব্লিওটেক"

* "ধনদৌলতের রূপান্তর" নামক অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা।

নামে সমাজসাম্যধর্ম্মের গ্রন্থাবলী বাহির হইত। লাফার্গের গ্রন্থ তাহার অন্তর্গত হইয়া জার্ম্মাণ আকারে দেখা দেয়। তাহার পর ইংরেজি, ইতালিয়ান, পোলিষ ইত্যাদি নানা ইয়োরোপীয় ভাষায় লাফার্গের তথ্য এবং মত প্রচারিত হইয়াছে।

১৮৯০ সালের "ফাশ্চ অপেরাইঅ" নামক ইতালির মজুরপন্থী রাষ্ট্রীয় দলের দৈনিক কাগজের এক সংখ্যায় সম্পাদক বলিতেছেন, "ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা অনুসারে লাফার্গ ধনদৌলতের জন্ম এবং ধারাবাহিক রূপান্তর-গ্রহণ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

সেই বৎসরই জার্ম্মাণ সোশ্যালিষ্ট দলের "সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাট" নামক দৈনিকে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়—"লাফার্গের পড়া-শুনা আছে বিস্তর। প্রাগৈতিহাসিক যুগ বা মান্ধাতার আমল-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বিশেষরূপেই উল্লেখযোগ্য। নৃতত্ত্ববিদ্যার নানাবিধ তথ্যের আলোচনায়ও তিনি সময় দিয়াছেন। কাজেই ধনদৌলতের ইতিহাস রচনার পক্ষে লাফার্গ যথেষ্ট যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। এই কেতাব যিনিই পড়িবেন তিনিই অনেক কিছু শিখিবেন এবং অনেক নূতন দিকে চিন্তা করিবার ইঙ্গিত ও সাহায্য পাইবেন।"

"পুঁজি" এবং "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র"

(১)

জার্ম্মান কার্ল মার্ক্‌স্ প্রণীত "কাপিটাল" (পুঁজি) গ্রন্থ লাফার্গের চিন্তায় বেদ-বাইবেল-কোরাণ-স্বরূপ। কাজেই এই গ্রন্থের এক বয়েৎ লাফার্গের বইয়ের মলাটেই স্থান পাইয়াছে।

মার্ক্‌স্ হইতে উদ্ধৃত বাণী এই,—"মানব সমাজের আর্থিক কাঠামের উপরই নরনারীর স্মৃতি ও নীতিশাস্ত্র অর্থাৎ আইন-কানুন এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আর্থিক জীবনের মাফিকই মানুষেরা

সামাজিক জীব-হিসাবে সু-কুর চিন্তা করিয়া থাকে। এক কথায় বলিতে পারি যে, মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আত্মিক জীবন তাহার ধনোৎপাদন-প্রণালীর প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।"

ভাবার্থ :—ভাত-কাপড়ের বিধি-ব্যবস্থা অথবা জীবনের আর্থিক ধাক্কা যাঁহারা আলোচনা করেন না, তাঁহারা কোনো জাতির দর্শন, ধর্ম্ম, সুকুমার শিল্প, সাহিত্য, রীতিনীতি, জাতিভেদ, দলাদলি, "জমিদারি-মহাজনি," আচার-বিচার, আইন-আদালত, পুলিশ-পল্টন ইত্যাদি কিছুই পুরাপুরি বুঝিতে অসমর্থ। ইহার নাম "ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা" অথবা "সভ্যতার বাস্তব ভিত্তি।"

লাফার্গের চিন্তায় আর একজন পণ্ডিত যুগাবতার বিশেষ। তাঁহার নাম মর্গ্যান। এই ইয়াঙ্কি নৃতত্ত্ববিদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "এন্শেণ্ট সোসাইটী" (প্রাচীন সমাজ)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে নৃতত্ত্বসেবীরা, বিশেষতঃ ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যাকারেরা এই কেতাবের ইজ্জদ আর একখানা বেদ-বাইবেল-কোরাণের কোঠায় আনিয়া ঠেকাইতেন। মর্গ্যান-পূজা আজও কম-বেশী প্রায় সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু চলিতেছে।

লাফার্গ-উদ্ধৃত মর্গ্যানের এক সূত্র বর্ত্তমান কেতাবের মলাটেই খোদা দেখিতে পাই। মর্গ্যান বলিতেছেন :—"ধনদৌলত বিষয়ক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ বেশ খুঁটিনাটির সহিত সমালোচনা করিতে অগ্রসর হইলে আমরা মানবজাতির আত্মিক (মানসিক) ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ঘরে আলোক ফেলিতে পারি।"

ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনায় মার্ক্‌স্‌ যে সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তেই মর্গ্যানও নৃতত্ত্ব-আলোচনার পথে স্বাধীনভাবে আসিয়া ঠেকিয়াছেন। মার্ক্‌স্‌-মর্গ্যানের সমাজ-দর্শন বর্ত্তমান জগতের অন্যতম বিশেষত্ব।

(২)

জার্ম্মাণ এঙ্গেল্‌স প্রণীত "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" লাফার্গের ধনদৌলত বিষয়ক রচনার অগ্রদূত। এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থে যে সকল তথ্য আংশিকরূপে আলোচিত হইয়াছিল, সেইগুলার উপর সকল নজর ফেলাই লাফার্গের উদ্দেশ্য। মার্ক্‌স্‌-মর্গ্যানের সমাজ-দর্শন এই দুই কেতাবের সাহায্যে অনেকটা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

সেই নবীন সমাজ-চিন্তার সঙ্গে সজীব ঘনিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য বই দুইখানা ঘাঁটা দরকার। এই বুঝিয়া কেতাব দুইটা একসঙ্গে বাংলায় প্রচারিত করা গেল।

এই ধরণের রচনা ভারতীয় সাহিত্যে নাই। মারাঠা, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী পণ্ডিতেরা ইংরেজিতে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার ভিতর এ ধাঁচের কোনো চিজ ঢুঁড়িয়া পাওয়া যায় না। উর্দ্দুতে শুনা যায় ইয়োরামেরিকান সমাজদর্শনের অনেক কেতাবই নাকি অনূদিত আছে। তাহার ভিতর মার্ক্‌স্‌-মর্গ্যান-তত্ত্ব ঠাই পাইয়াছে কিনা বলিতে পারি না। হিন্দীতেও যতটুকু পড়িয়াছি শুনিয়াছি, তাহার ভিতর এসবের নাম গন্ধ পাই নাই।

বাঙ্গালীরা ইংরেজিতে বা বাংলায় এই দিকে কখনো কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মৌলিক গ্রন্থ ত নাই-ই—বোধ হয় তর্জ্জমাও বাংলা ভাষার সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করে নাই।

সমাজ-চিন্তায় বাঙালীর দৌড়

বাঙ্গালীর সমাজ-চিন্তা দু'এক কথায় জরীপ করা যাউক। সেকালে ভূদেব "পারিবারিক প্রবন্ধ," "সামাজিক প্রবন্ধ," "আচার প্রবন্ধ" ইত্যাদি গ্রন্থের রচনা করেন। বঙ্কিম-সাহিত্যের "প্রবন্ধ"-বিভাগে সমাজ-দর্শন

বাদ পড়ে নাই। রামেন্দ্রস্থন্দরের মাথায় নানা প্রকার চিন্তাই কিলবিল করিত। তাঁহার কোনো কোনো "কথা"য় সমাজ-বিষয়ক আলোচনা বাহির হইয়াছে। তাহা ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের এখানে-ওখানে সমাজ লইয়া নাড়া-চাড়া করিবার যুক্তি খেলিয়াছে।

খাঁটি সাহিত্যপদ-বাচ্য রচনা অর্থাৎ কাব্য-নাটক-উপন্যাস ইত্যাদির খতিয়ান করা হইতেছে না। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক লেখার কথাই বলা হইতেছে। যে চার জনের বাংলা লেখার উল্লেখ করা হইল এই ধরণের আরও বাঙালী লেখক ইংরেজিতে এবং বাংলায় সামাজিক জীবন লইয়া কিছু কিছু লিখিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সকলের নাম উল্লেখ করা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

ভূদেব, বঙ্কিম, রামেন্দ্রস্থন্দর, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি সকলের মাথায়ই দুনিয়ার সমস্যা বহিয়া গিয়াছে। রামমোহনের কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কোনো বাঙালীই গোটা জগতের উঠানামা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তুলনা-সাধন, বিশ্বসভ্যতার ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তমান, এক কথায় মানবজাতির ক্রমবিকাশ ইত্যাদির ভাবনা ঘাড়ে না লইয়া তিষ্টিতে পারেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা,—মানুষের পেটে যে ক্ষিধে পায়, এবং ক্ষিধে পাইলে যে কষ্ট হয় এই অতি সোজা কথাটা তাঁহাদের কাহারও মগজে প্রবেশ করে নাই! মধুচ্ছন্দার আগুনের গাথায়ও যে ভাতকাপড়ের ধাক্কা আছে, এই ধারণা কোনো বাঙালী দার্শনিকের প্রচারিত জীবন-সমালোচনায় বা বিশ্ব-সমালোচনায় আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি না। এঙ্গেল্‌স্‌-লাফার্গের তথ্য ও ব্যাখ্যাগুলা যুবক ভারতের গবেষক, লেখক ও স্বদেশসেবকগণের চোখে আঙ্গুল দিয়া তাঁহাদের একটা মস্ত অসম্পূর্ণতার মুল্লুক দেখাইয়া দিবে।

ইতিহাস বনাম প্রত্নতত্ত্ব

(১)

এঙ্গেল্‌স্‌-লাফার্গের তথ্যগুলা ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিষয়ক। এই দুই ঘরের বস্তুই গোটা ভারতে বিরল। প্রথমতঃ, ইতিহাস বলিলে আমরা বুঝি একমাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও আমরা সবে "হাতে খড়ি" সুরু করিয়াছি মাত্র। এই হাতে-খড়ির যুগে চলিতেছে "প্রত্নতত্ত্বে"র আরাধনা। ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্ব এক জিনিষ নয়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র হইতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যন্ত ইতিহাস নামে যাহা কিছু চলিতেছে তাহা ইতিহাসের কাঠাম-স্বরূপ প্রত্নতত্ত্ব; তাহা ইতিহাস নয়। খোট্টা বাদশা চন্দ্রগুপ্ত খড়ম পায়ে চলিতে চলিতে পল্টনকে ব্যূহ-রচনার হুকুম করিতেন কি মেগাস্থেনীসের মারফৎ এশিয়া-মাইনরের বাজার হইতে বুট আনাইয়া গ্রীক-মার্কা জুতা পরিয়া ঘোড়-সওয়ার হইতেন; আওরাংজেব সকালে উঠিয়া বদনা হাতে পায়খানায় যাইতেন কি গাড়ু হাতে নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি পালন করিতে বসিতেন; বাঙালী সেনাপতি সোমনাথের নেতৃত্বে একসঙ্গে কত হাজার ফৌজ যুদ্ধ-শিল্পে ওস্তাদ হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত; নেপালী দোঁহাগুলা বাংলা না প্রাকৃত; য়ুয়ান চুয়াঙের মাথায় টিকি শোভিত কি না; যৌবন-ধর্ম্মের অবতার, অসাধ্য-সাধনের প্রতিমূর্ত্তি, ভাবুকশ্রেষ্ঠ, জগদ্বরেণ্য কর্ম্মবীর শিবাজি লোকটা নেহাৎ গণ্ডমূর্খ ছিল কি না,—এই সকল প্রশ্নের খাঁটি জবাব জানিবার প্রয়োজন আছে। সন-তারিখ-সমন্বিত ভাবে এই ধরণের লাখ লাখ খুঁটিনাটি না জানিলে ইতিহাসের গোড়ায় আসিয়া পৌঁছানো সম্ভব নয়। কিন্তু এইগুলাকে ইতিহাস বলিলে ভুল করা হইবে।

(২)

মানুষের জীবনটাকে বুঝিবার প্রয়াস যেখানে নাই সেখানে ইতিহাস নাই। জীবনটাকে বুঝায় আর জীবন সম্বন্ধে কতকগুলা তথ্য আবিষ্কার করায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভারতবাসীর জীবনটাকে ধারাবাহিক-রূপে "বুঝিবার" অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিবার ও সমালোচনা করিবার প্রয়াস কোনো লেখকই করেন নাই। এদিকে যেটুকু প্রয়াস হইয়াছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়।

কতকগুলা হাড়মাস, শিরানাড়ী ও পেশীরক্তের জবরজঙ একত্র করিতে পারিলেই একটা জ্যান্ত জানোয়ার বা মানুষ খাড়া করিয়া তোলা যায় না। "আনাটমি"তে (অস্থিবিদ্যায়) চাই "ফিজিঅলজির" (শারীর-বিদ্যার) দখল। তাহা হইলেই মরা-হাড়ে ভেল্কি খেলিতে পারে, অর্থাৎ রক্তমাংসের জীবজন্তু পায়দা হয়।

প্রত্নতত্ত্বকে ইতিহাসে পরিণত করিতে হইলে এই ধরণেরই দখল দরকার। কাঠখোট্টা পাণ্ডিত্য ছাড়া প্রত্নতত্ত্ব জন্মিতেই পারে না। কিন্তু একমাত্র এই ধরণের পাণ্ডিত্যের জোরে ইতিহাস সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাহার জন্য চাই চিত্ত-বিজ্ঞানে আধিপত্য, তাহার জন্য চাই বিশ্বশক্তিগুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিবার ক্ষমতা, তাহার জন্য চাই হিংসাধর্ম্মী, বিজিগীষু শক্তিধর মানবের সনাতন অধ্যবসায়ের গতিবিধি দেখিয়া তাহার সঙ্গে-সঙ্গে নাচিবার-লাফাইবার উন্মাদনা। অর্থাৎ মেজাজ যাহার তাতিয়া উঠে না, মাথাটা যাহার টগবগ করিয়া ফুটিতে শিখে নাই সে ব্যক্তি রক্ত-মাংসের মানুষের প্রাণস্পন্দনের সম্মুখে "রাগদ্বেষ-বহিষ্কৃত" এবং নির্ব্বিকার থাকিতে বাধ্য। অর্থাৎ ইতিহাস রচনা তাহার কোষ্ঠীতে লেখে নাই.

ভারতীয় সাহিত্য হইতে,—খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রত্নতত্ত্বের মালমশলায় "ফিজিঅলজির" দস্তুল লাগাইবার দৃষ্টান্ত বাহির করা কঠিন। এলাহাবাদের মেজর বামনদাস বসু ১৮৫৭ সালের পরবর্ত্তী শতবৎসরের ভারত-কথায় কিছু কিছু দস্তুল দিতেছেন। লাজপত রায় জেলে বসিয়া প্রাচীনভারত সম্বন্ধে একখানা কেতাব তৈয়ারি করিয়াছেন। বোধ হয় তাহাতেও ঐতিহাসিক দস্তুলের কিছু পরিচয় আছে। আর সেকালের চিন্তাবীর মহাদেওগোবিন্দ রাণাডে মারাঠা-জাতির জীবন-তথ্য আলোচনা করিবার সময় ভারতবাসীর জন্য কিছু কিছু দস্তুল বাঁটিয়া গিয়াছেন। আর সেই দস্তুল প্রয়োগের প্রয়াস যৎকিঞ্চিৎ দেখিতে পাই রমেশচন্দ্র দত্তের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যা কার্য্যে। তাঁহাদের মতামতগুলা টেকসই কি না অথবা কতখানি স্বীকার্য্য, সে কথা সম্প্রতি তুলিতেছি না।

এই চার লেখকের কোনো রচনাই বাংলা ভাষার গৌরব নয়। সুতরাং ইতিহাস রচনার যেটুকু আংশিক আরম্ভ ভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই। কাজেই ঐতিহাসিক তথ্যমূলক. এঙ্গেল্‌স্‌-লাফার্গের রচনাগুলির মতন সাহিত্য তৈয়ারি করিবার ক্ষমতা—বাংলা দেশে দেখিতে পাই না।

"নৃতত্ত্বে" বিশ্ব-সংবাদ

এঙ্গেল্‌স্‌-লাফার্গের রচনাবলী—কোনো একদেশের তথ্যে ভরা নয়। মান্ধাতার আমলে যে সকল "সভ্য"-"অসভ্য" জাতি দুনিয়ায় দাগ রাখিয়া গিয়াছে, আর ইতিহাস-পরিচিত নানা যুগে দুনিয়ার নানা মুল্লুকে যে সকল সমাজ উঠাবসা করিয়া আসিতেছে, অধিকন্তু "স্যাভেজ," "বার্ব্বার" ইত্যাদি নামে যে সকল "অসভ্য" জাতি আজও জগতের পথে-বিপথে

চলা-ফেরা করিয়া থাকে,—সেই সকল নানা-দেশবাসী, নানারক্তজ নরনারীর জীবন-কথা এই সকল লেখার আলোচ্য।

এই ধরণের কেতাব বাঙালীর পক্ষে লিখিবার যোগ্যতা কোথায়? এই মাত্র বলিয়াছি,—প্রত্যেক বাঙালী মনস্বীকেই দুনিয়ার ভাবনা ভাবিতে হইয়াছে। আসল কথা, এই ভাবনাটা অতি ভাসাবাসা, হাল্কা ও তরল। বিদেশ সম্বন্ধে যত খানি নিরেট জ্ঞান থাকিলে মানুষ সজীবভাবে বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর আশা-হর্ষ, সু-কু আলোচনা করিতে অধিকারী হয়, ততখানি জ্ঞান বাংলার জ্ঞানমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে নাই।

ভূদেব বোধ হয় ইস্কুলপাঠ্য কেতাব হিসাবে গ্রীস এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। ইহাতে স্বদেশের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, এই পর্য্যন্ত। প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "গ্রীক ও হিন্দু" সে যুগের এক তুলনামূলক গ্রন্থ। আজকাল গ্রীকভাষা হইতে রজনীকান্ত গুহ মেগাস্থেনীস এবং সোক্রাতিসের রচনাবলী বাংলায় আনিয়াছেন। ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহাসিক কথা কিছু কিছু পাওয়া যায় আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কেতাবে। অধিকন্তু জাপান এবং আমেরিকা সম্বন্ধে দুএক খানা ভ্রমণ-বৃত্তান্তও বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয় বিদেশী তথ্য লইয়া আলোচনা চালাইবার দৌড় বাংলায় এই তালিকা ছাড়াইয়া বেশী দূর যায় না। অবশ্য কিছু অত্যুক্তি করা হইল।

তাহা ছাড়া বাঙালীর ইংরেজি-সাহিত্যে আছে ভূতত্ত্ববিৎ প্রমথনাথ বসু প্রণীত "সভ্যতার যুগ-পরম্পরা"। যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় "বিলাতী ভূমি-স্বত্ব" বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা। আর সম্প্রতি বাহির হইয়াছে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের হাতে "তুলনামূলক ধন-বিজ্ঞান" এবং "এশিয়ার স্বরাজ-প্রতিষ্ঠান" সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

ফ্রান্স বা ইতালি সম্বন্ধে কোনো কথা বাঙালী বাংলাভাষায় জানিতে

পারে কি? জার্ম্মাণি আর রুশিয়া ত আরও দূরের কথা। কাজেই দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, জীবনবেদ, ধর্ম্মকর্ম্ম এবং আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বাঙ্গালী মাথা খেলাইবে কিসের জোরে?

"ভাত-কাপড়ের" ক্রমবিকাশ

আর এক কথা। ধনদৌলতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, আর্থিক জীবনের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সম্পত্তির ইতিহাস, সভ্যতার আর্থিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি বস্তুই মার্ক্‌স্-মর্গ্যান-প্রবর্ত্তিত সমাজ-চিন্তার প্রাণ। সেই প্রাণই এঙ্গেল্‌স্-লাফার্গের রচনাবলীতে বিশদরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। এই সকল দিকে বাঙ্গালীর মাথা কোনো দিন খেলিয়াছে কি?

টেকচাঁদের ভাই কিশোরীচাঁদ ইংরেজিতে এবং বাংলায় এদেশের কৃষক ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু লেখা রাখিয়া গিয়াছেন। রমেশচন্দ্র "বৃটিশ ভারতের আর্থিক ইতিহাস" বিষয়ক ইংরেজি গ্রন্থে অনেক কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। সে সব তথ্যের কিয়দংশ সখারাম গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা" হিসাবে বাংলা-ভাষীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছে। বৎসর দুশেক ধরিয়া দেখিতেছি, ইংরেজিতে কোনো কোনো বাঙালী লিখিতেছেন রেলসম্বন্ধে, কোনো কোনো মারাঠা লিখিতেছেন মুদ্রাসম্বন্ধে, কোনো কোনো মান্দ্রাজী লিখিতেছেন ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে। তাহা ছাড়া পল্লী-স্বরাজের "রোমান্টিক" পূজায় যোগ দেওয়া আজকাল ভারতের সর্ব্বত্র একটা বাতিকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ষাট সত্তর বৎসর কাল আডাম স্মিথ, মিল, ফসেট এবং আজকাল মার্শ্যাল ও ইয়াঙ্কি ধনবিজ্ঞান-বিদ্‌গণের কেতাব মুখস্থ করিবার জোরে ভারতসন্তান এই পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়াছে।

সভ্যতার সঙ্গে মানবের আর্থিক অবস্থার যোগাযোগ আলোচনা করিবার সাধ্য ভারতে এখনো গজায় নাই। এত বড় বিশ্বজোড়া চিন্তায় মাথা খেলানো কঠিন ত বটেই। এমন কি ভারতের প্রাচীন এবং মধ্য-যুগে যে সকল সমাজ-ব্যবস্থা, দর্শন-বেদান্ত, শিল্পকর্ম্ম, রীতিনীতি, "হাঁচি-টিকটিকি," গজিয়াছে মরিয়াছে, সেইগুলার সঙ্গে খাওয়াপরার কথাটা কতখানি জড়িত তাহা বুঝিবার দিকে ভারতীয় সাহিত্যের ঝোঁক নাই। এঙ্গেল্‌স্‌-লাফার্গের রচনায় ধনদৌলতের "বিশ্বরূপ" বুঝিবার পক্ষে বাঙালীর সুযোগ জুটিবে। অধিকন্তু, কিরূপে আর্থিক খোলস বদলাইতে বদলাইতে "ভারতাত্মা" যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে সেই বিষয়ে খোঁজ চালাইবার জন্যও অনেকের খেয়াল জাগিবে।

বর্ত্তমান জগতের কর্ম্মকাণ্ড ও চিন্তা-ধারা

(১)

"ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা" বর্ত্তমান জগতের নবীনতম সমাজ-চিন্তার অন্যতম বিশেষত্ব। সত্তর আশী বৎসর পূর্ব্বের ইয়োরামেরিকান দার্শনিকেরা এই প্রণালীতে মানব-জীবন বিশ্লেষণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই দর্শন যারপর নাই প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে।

বিগত দশ বৎসর ধরিয়া বিদেশের শহরে, মফঃস্বলে, হাটে, বাজারে, বড় সড়কে, গলি-ঘোঁচে এই দর্শনের প্রভাব স্পর্শ করিয়া আসিতেছি। কাজেই "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগে ইহার ছায়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, সুইটসার্ল্যাণ্ড, ইতালি, জাপান এবং এমন কি চীন বিষয়ক ভ্রমণ-গ্রন্থগুলায় দুনিয়ার এই নবীন আবহাওয়া তাহার শক্তি প্রকাশ করিয়াছে। "দুনিয়ার আবহাওয়া" নামক গ্রন্থেও

তাহার সবিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। কি পাঠশালায়, কি কর্ম্মশালায়, কি পণ্ডিতের বৈঠকে, কি মজুরদের মজলিশে কোথাও এই চিন্তার আওতা এড়াইতে পারি নাই।

১৯১৮-১৯ সালের রাষ্ট্রবিপ্লবে জার্ম্মাণি গণতন্ত্রের স্বরাজে পরিণত হইয়াছে। সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া যে "সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাটিশ" দল জার্ম্মাণ মুল্লুক শাসন করিতেছে, সেই দলের বেদান্তই এই সমাজ-চিন্তার গোড়ার কথা। বিশ বৎসর ধ্বস্তাধ্বস্তি করিবার পর বিলাতে মজুরপন্থী রাষ্ট্রবীরেরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজা হইয়া বসিয়াছে (১৯২৪)। এই সকল লোকেরাও শয়নে-স্বপনে এই দর্শনেরই সেবা করিতে অভ্যস্ত।

ফ্রান্সে আজকাল পোঁআকারে রাজত্ব করিতেছেন বটে। কিন্তু তাঁহাকে রাস্তায়, ঘাটে, সভায়, কাগজে প্রতিদিন যে সকল লোক নাস্তা-নাবুদ করিয়া ছাড়িতেছে, তাহাদের চিন্তার খোরাক জোগায় এই সমাজ-দর্শন মুসলিনি ইতালিতে "ফাশিষ্ট" ধর্ম্মের দিগ্‌বিজয় চালাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মপ্রণালীর প্রধান এবং একমাত্র মুগুরই হইতেছে এই দর্শনের সেবক উত্তর ইতালির সোশ্যালিষ্ট দল।

তাহা ছাড়া সোভিয়েট রুশিয়ার মজুর-সম্রাটেরা ত এক হাতে কাল-মার্ক্‌স্ এবং অপর হাতে বোমা লইয়া দুনিয়ায় সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার যুগান্তর ঘটাইতে প্রয়াসী। এই চিন্তার আওতা হইতে আত্মরক্ষা করা ইয়াঙ্কিস্থান এবং জাপানের শাসনকর্ত্তাদের পক্ষেও এখন আর সম্ভব নয়

(২)

রাষ্ট্রনীতির মুল্লুকই এই চিন্তাপ্রণালীর একমাত্র ল্যাবরেটরি নয়। ইয়োরামেরিকার সাহিত্য-সমালোচনায়, সুকুমার শিল্পের গবেষণায়,

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অনুসন্ধান-ক্ষেত্রে, চিত্তবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-কাণ্ডে সর্ব্বত্রই এই আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে। "ভট্টচাজ্জি-পাড়া"র কোনো মিঞাই এই চিন্তারাশির সঙ্গে গা ঘেঁশাঘেঁশি না করিয়া নিজ নিজ টোল চালাইতে পারিতেছেন না।

কাণ্ট-হেগেলের প্রশিষ্যেরা, প্লেটো-পাস্কালের প্রশিষ্যের প্রশিষ্যেরা,—বিলাতী ব্রাড্‌লে-বোসাঙ্কে, ফরাসী বুত্রু-ব্যর্গ্‌সঁ, জার্ম্মাণ অয়কেন, ইতালিয়ান ক্রচে, ইয়াঙ্কি রয়স্ ইত্যাদি দর্শনবীরগণ "আত্মিক" "স্বধর্ম্মে"র ধ্বজা আজও জোরের সহিত খাড়া রাখিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের কেল্লার উপর হামলা চালাইতেছে হাজার হাজার বাস্তবনিষ্ঠ, আর্থিক ভিত্তির ধুরন্ধরেরা। আর তাহাদের সকলের মুখেই বোল শুনিতেছি—"জয় কাল্‌ মাক্‌সের জয়।"

বর্ত্তমান জগৎ-সম্বন্ধে যিনিই রিপোর্টার হইয়া আসুন তাঁহাকেই এই বিপুল আন্দোলনের কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই লক্ষ্য করিতে হইবে। কর্ম্মকাণ্ডের পরিচয় কিছু কিছু দিয়াছি প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠার ফাঁকে ফাঁকে,—যখন যেরূপ সুযোগ জুটিয়াছে। এইবার শ'ছয়েক পৃষ্ঠা তর্জ্জমা করিয়া দুইখানা বইয়ের মারফৎ জ্ঞানকাণ্ডের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। এই নবীন সমাজ-দর্শনের স্বপক্ষে-বিপক্ষে বাঙালীরা মাথা খেলাইতে অগ্রসর হউন

তর্জ্জমা-প্রণালী

তর্জ্জমাগুলা খাঁটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়। পূর্ব্বে "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" এবং জার্ম্মাণির ফ্রেডরিক লিষ্ট প্রণীত "স্বদেশী ধন-বিজ্ঞান" গ্রন্থের ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলার অনুবাদে যে প্রণালী অবলম্বন করা গিয়াছে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই করা হইল।

গ্রন্থকারদের প্রত্যেক তথ্য বজায় রাখিয়াছি। একটা তথ্যও নিজের তরফ হইতে জুড়িয়া দিবার চেষ্টা করি নাই। গ্রন্থকারদের প্রত্যেক যুক্তিও যথারীতি রক্ষা করিয়াছি। সমালোচনার ওজর করিয়া অথবা বিশদরূপে বুঝাইবার ছলে একটা যুক্তিও বেশীর ভাগ বসাইতে প্রয়াসী হই নাই। যেখানে-সেখানে কাটিয়া ছাঁটিয়া সংক্ষেপে সারিবার জন্য নিরেট তথ্য বা যুক্তিগুলা কমাইতেও ঝুঁকি নাই। অধিকন্তু লেখকদের আসল পারিভাষিক শব্দগুলার ইজ্জদ বাঁচাইয়া চলা গিয়াছে। ফলতঃ মূলে গ্রন্থ দুইটার যতগুলা পাতা অনুবাদেও প্রায় ততগুলাই রহিয়া গিয়াছে।

তাহা সত্ত্বেও তর্জ্জমায় আর মূলে প্রভেদ লক্ষিত হইবে। বাক্যে বাক্যে মিল দেখিতে পাওয়া যাইবে না। প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফেও মিলাইয়া দেখিতে গেলে গোলে পড়িতে হইবে। গ্রন্থকারেরা বাঙালী হইয়া বাঙালী পাঠকের জন্য বাংলা ভাষায় লিখিতে হইলে ১৯২৪ সালে তাঁহাদিগকে যে ধরণের বোলচাল ও লিখন কায়দা ব্যবহার করিতে হইত, সেই বোল-চাল এবং লিখন-কায়দাই এই অনুবাদ-গ্রন্থ দুইটায় কায়েম করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

যুবক ভারতের আবহাওয়া

ভারতীয় সমাজে ও পণ্ডিতমহলে এই নবীন সমাজ-চিন্তা আজ আর অবজ্ঞাত হইবে না। পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-নিষেধের আর্থিক ব্যাখ্যা, রাষ্ট্রীয় জীবনে ধনদৌলতের প্রভাব, সভ্যতার বাস্তব ভিত্তি,—সোজা কথায় "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্,"—ইত্যাদি কথা আজ ভারত-বাসীর মরমে পশিয়াছে।

লড়াইয়ের পর হইতে ভারতে "শিল্প-বিপ্লবে"র ঢেউ রোজ রোজ নব-শক্তি লাভ করিতেছে। মজুরদের ধর্ম্মঘট আর কিষাণদের দাঙ্গা আজকাল

ভারতীয় গৃহস্থের নিত্য সহচর। তথাকথিত মস্তিষ্কজীবী "ভদ্রলোক" এখন আর "পেটে ক্ষিধে, মুখে লাজ" নীতি অনুসরণ করে না। "হরতালের" আবহাওয়ায় মধ্যবিত্ত বাবুরা মজুর-কিষাণদের সঙ্গেই হামদর্দ্দি করিতে অভ্যস্ত হইতেছে। অন্নচিন্তার অগ্নিতাপে সামাজিক শ্রেণীগুলার ভিতর উঠানামা সাধিত হইতেছে সজোরে। সে সব চোখের সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি।

এই আবহাওয়ায়,—দর্শনের উপর বাস্তবের প্রভাব যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষেই মন-মাফিক কথা বিবেচিত হইবে। মার্ক্‌স্‌-মর্গ্যানের সমাজ-চিন্তা এঙ্গেল্‌স্‌-লাফার্গের ব্যাখ্যার সাহায্যে যুবক ভারতেও নবীন দুনিয়ার উপযোগী নবীন দর্শন গজাইয়া তুলিবে।

লুগানো, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড

এপ্রিল, ১৯২৪।

"বর্ত্তমান জগৎ"-রচনার আবহাওয়া

১। আমেরিকা-প্রবাসের কথা *

১৯১৪ সালের নভেম্বরে নিউইয়র্কে পৌঁছি, ১৯১৫ সালের মে মাসে ইয়াঙ্কিস্থানের জের হওয়াই দ্বীপ ছাড়ি। এই ছয় মাসের বৃত্তান্ত প্রথম এগারো অধ্যায়ে লেখা আছে। তখনও যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপীয় লড়াইয়ে মাতে নাই।

১৯১৬ সালের নভেম্বরে আবার আমেরিকায় আসি। তাহার কয়েকমাস পরে মার্কিন নরনারী জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে লড়িতে সুরু করে। দ্বিতীয়বারের আমেরিকা-প্রবাস দ্বাদশ অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিবৃত রহিয়াছে।

দুইবারকার আমেরিকা-দেখার মধ্যে কাটিয়াছে চীন-জাপানে পর্য্যটনের কাল। এত অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে "চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ," "বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য" এবং "নবীন এশিয়ার জন্মদাতা—জাপান" এই তিন গ্রন্থে। এই আওতায়ই ইংরেজিতে লেখা হয় "হিন্দু চোখে চীনা ধর্ম্ম" (শাংহাই, ১৯১৬) এবং "ভারতবর্ষের প্রেম-সাহিত্য" (তোকিও, ১৯১৬)।

দ্বিতীয়বার আমেরিকায় কাটে পুরাপুরি প্রায় চার বৎসর। এই চার বৎসরের কাহিনীতে প্রথমবারকার রচনাপ্রণালী অবলম্বন করা হয় নাই। কতকগুলা মোটা কথা আলোচনা করা গিয়াছে মাত্র। প্রথমবার রোজনামার বহু দিকেই খুঁটিনাটির চর্চ্চা করা গিয়াছিল।

এই চার বৎসরের ভিতর ইংরেজিতে প্রকাশিত হইয়াছে "হিন্দু জাতির বিজ্ঞান-সম্পদ" (নিউইয়র্ক, ১৯১৮) এবং এক কবিতা-গ্রন্থ

* "ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ" গ্রন্থের ভূমিকা।

(বষ্টন, ১৯১৮)। সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ত্রৈমাসিক পত্রিকাতে কতকগুলা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।

"বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন কেতাবে কথঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তথ্য আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা "ইংরেজের জন্মভূমি" পড়িয়াছেন, তাঁহারা "ইয়াঙ্কিস্থান" দেখিলে সহজেই পার্থক্যটা ধরিতে পারিবেন।

কোনো লেখকের কোনো মতই তথাকথিত বেদবাক্যস্বরূপ চিরকাল শিরোধার্য্য নয়। এইরূপ চিন্তা ভারতে দেখা দিয়াছে। কাজেই আশা করা যায়, "বর্ত্তমান জগৎ"-প্রণেতাকে কথায় কথায় জবাবদিহি করিতে হইবে না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান গ্রন্থকার নিজের মত এবং ব্যাখ্যা বেশী দিন পুষিয়া রাখিতে অভ্যস্ত নন।

তথ্যগুলা সম্বন্ধে গোজামিল বোধ হয় রাখি নাই। যথাসম্ভব নির্ভুল ভাবে বস্তু ও ঘটনা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেইগুলা নিরেট সত্য আজও, কিন্তু সেইগুলার ব্যাখ্যা করিতে বসিলে আজ অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো নয়া কথা বলিতে হইবে। অর্থাৎ গ্রন্থের ভিতরকার অনেক মতের সঙ্গেই গ্রন্থকারের এখনকার মতের মিল নাই।

এই অমিলে এবং মতভেদেই দুনিয়া বাড়িয়া চলিতেছে। আর অনৈক্য এবং বহুত্ব ভারতীয় জীবনের সকল বিভাগেই দেখা যাইতেছে বলিয়া বর্ত্তমান জগতে যুবক ভারতের দাবী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া যাইতেছে।

"গৃহস্থ", "প্রবাসী", "উপাসনা", "ভারতবর্ষ" ইত্যাদি মাসিক পত্রে প্রথম এগারো অধ্যায় বাহির হইয়াছিল।" "ভারতী" কার্য্যালয় হইতে দশম অধ্যায়ের অনেকটা পাণ্ডুলিপি হারাইয়া গিয়াছে। তাহাতে স্যান ফ্রান্‌সিস্কোর বিশ্বমেলার সচিত্র বিবরণ ছিল।

বার্লিন, অক্টোবর, ১৯২২।

২। বিশ্বশক্তির ত্রে-ধারা *

(১)

এই লেখাগুলা "শঙ্খ", "বঙ্গবাণী", "ভারতবর্ষ", "প্রবাসী", "বসুমতী", "নব্যভারত", "সারথী", "শিশির", "ভারতী", "বিজলী" ইত্যাদি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে প্রথম বিবৃত ঘটনার তারিখ। কেতাবের জগৎ-কথা খতম হইয়াছে ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে। প্রায় আড়াই বৎসরের দুনিয়ার আবহাওয়া এই পাতাগুলার ভিতর আটক রহিয়াছে।

জার্ম্মাণি, আষ্ট্রিয়া, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড এবং ইতালি এই চার দেশে বসবাসের আওতায় রচনাগুলার উৎপত্তি। জার্ম্মাণ এবং ফরাসী দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজের মারফৎ খবরগুলা পাওয়া গিয়াছে। বিলাতী ও মার্কিন তথ্য সমূহও প্রধানতঃ জার্ম্মাণ এবং ফরাসী চোখেই দেখিবার সুযোগ জুটিয়াছিল। অধিকন্তু লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া এবং রাস্তায় হাঁটিয়া ও হাট্‌ বাজারে গা ঘেঁশাঘেঁশি করিয়া যাহা কিছু বুঝিয়াছি সুঝিয়াছি, তাহাও এই সকল সংবাদের ভিতর গুঁজিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

(২)

বিশ্ব-শক্তির বেপারীরা জগতের মেলায় মেলায় এক সঙ্গে নানা সওদার দরদস্তর করিতে বাধ্য হয়। মানুষের জীবন "পাঁচ ফুলে সাজি"। দুনিয়ার আবহাওয়ায় কোনো এক-তরফা শক্তির ঝড় বহিয়া যায় না। শক্তিগুলা বহুমুখে বিভিন্ন উৎসে ছুটিতেছে।

* "দুনিয়ার আবহাওয়া" গ্রন্থের ভূমিকা।

শক্তিযোগের কোনো কোনো শাখায় বিশেষজ্ঞ হওয়া খুবই দরকার। "সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি ফর্ম্মূলা অনুসারে জীবন না চালাইলে কেহই কখনো জগতে একটা কিছু রাখিয়া যাইতে পারে না। এক-বগ্‌গা, "অদ্বৈতবাদী," শক্তি-বিশেষের ধুরন্ধরগণই নিজ নিজ গণ্ডীর ভিতর জগতের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা।

কিন্তু জীবনের কোন্ রসটা সকল রসের সেরা? সমাজের কোন্ শক্তিটা আদ্যাশক্তি? জগতের কোন্ "বিশেষজ্ঞ" গোটা দুনিয়াকে বলিতে অধিকারী যে "অন্যান্য সব কিছু বয়কট করিয়া একমাত্র আমার পিছু পিছু ছুট"?

কেহ কেহ হয়তো বলিবেন যে, "রাষ্ট্র-নৈতিক রসেই সেই আদ্যাশক্তি বিরাজ করিয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় বিশেষজ্ঞেরাই দুনিয়ার হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা"। তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া অন্যেরা বলিবেন,—"দুনিয়ার আব্-হাওয়ার আদ্যাশক্তি হইতেছে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প। এক কথায় ইহাকে বলে উৎকর্ষ, সভ্যতা, "কালচ্যর", "কুল্‌টুর" ইত্যাদি। কুল্‌টুরের শক্তিতেই জগতের নরনারী কি ব্যক্তিগত হিসাবে কি রাষ্ট্রীয় ও সঙ্ঘগত বা সমাজবদ্ধ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির গতিবিধি জরীপ করিলেই দুনিয়ার আবহাওয়া হাতে হাতে ধরা পড়িবে।"

এই দুই ধরণের অদ্বৈতবাদীকে সমান ভাবে ঠুঁকিবার জন্য আর এক প্রকার অদ্বৈতবাদী দেখা যায়। তাহাদের বিচারে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের রসই মানবজীবনের সকল রসের গোড়ার কথা। টাকা পয়সা, ধনদৌলত, ব্যাঙ্ক, ফ্যাক্টরী ইত্যাদির কল যাহারা টিপিতেছে তাহারাই 'কল্‌টুর"কে উঠাইতেছে বসাইতেছে। তাহারাই আবার রাষ্ট্র-শাসন, স্বদেশ-সেবা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদির চাবী নিজ ট্যাঁকে লইয়া ঘুরাফিরা করে।

(৩)

বর্ত্তমান কেতাবের তথ্যগুলায় দেখা যাইবে যে, দুনিয়া বাস্তবিক পক্ষে কোনো এক রসে মসগুল নয়। জগৎ খাড়া আছে এবং চলিতেছে এক সঙ্গে তিন খুঁটারই জোরে। মানব জীবনের এই ত্রিধারাকে সমানভাবে ইজ্জদ দিলেই মানুষের সুখ-দুঃখ, সু-কু দখল করা সম্ভব।

প্রত্যেক তথ্যই মানুষের রক্তবিন্দু বিশেষ। নরনারীর মাথার ঘাম, আনন্দধ্বনি, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস এইগুলাই এক একটা ঘটনায় মূর্ত্তি গ্রহণ করে। মানবজীবনের এই রক্তের দরিয়ায় যে সকল লোকেরা সাঁতার দিতে পারে তাহারাই ইতিহাস হজম করিতে সমর্থ।

যুবক ভারতে আজ যাহা কিছু মাথার ঘাম, আনন্দধ্বনি ও নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাসরূপে প্রকটিত হইতেছে, ঠিক সেই সবই দুনিয়ার অলিতে গলিতে লক্ষ্য করা যায়। আবার দুনিয়ায় যাহা কিছু আজ ঘটিতেছে অথবা কাল ঘটিয়াছে, ভারতেও আজ কিম্বা কাল তাহা ঘটিবে। ভারত সৃষ্টি-ছাড়া মুল্লুক নয়।

(৪)

জগৎ চলিতেছে,—কোথায়ও কোনো অনুষ্ঠানে, কোনো প্রতিষ্ঠানে, কোনো আদর্শে, কোনো কেন্দ্রে বসিয়া নাই। বিশ্বশক্তির সন্ধানে যাহারা ব্রতী, তাহারা কি রাষ্ট্রীয় জীবনে, কি বিজ্ঞান-দর্শন-সুকুমার শিল্পের ক্রম-বিকাশে, কি ধনদৌলতের রূপান্তরে মানবজীবনের গতি, অগ্রগতি ঊর্দ্ধগতি লক্ষ্য করিতে বাধ্য।

যে আড়াই বৎসরকে এই কয় পৃষ্ঠার ভিতর বন্দী করিয়া রাখা গিয়াছে সেই আড়াই বৎসরের মানব-প্রয়াসগুলা এই গতিশীলতার এবং মানবচিত্তের উন্নতি-প্রবণতার সাক্ষ্য দিবে। এই হিসাবে তথ্যগুলা

পরস্পর-সম্বন্ধহীন বা খাপছাড়া সংবাদ মাত্র মনে হইবে না। মানুষের রক্তমাংসের গন্ধে, মানুষের প্রাণের স্পন্দনে এই সকলের ভিতর একটা ঐক্যের বন্ধন পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক তথ্যে, প্রত্যেক সংবাদে, প্রত্যেক ঘটনায়, প্রত্যেক বিজয়-কাহিনীতে, প্রত্যেক পরাজয়ের কথায়ও এক একটা জীবন-সংগ্রাম, স্বার্থদ্বন্দ্ব, পরস্পর-বিরোধ, অথবা জটিল-চক্রান্ত মাখানো আছে। সেই মারপ্যাঁচগুলা, সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ লড়াইয়ে ভরা শ্বাস-প্রশ্বাসগুলা, বিভিন্ন শ্রেণীর ও জাতির জীবনের সাড়াগুলা পাকড়াও করিতে পারিবার জন্যই দু'নয়ার আবহাওয়া বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

আড়াই বৎসরের জগৎ-কথায় মাত্র আড়াই বৎসরের দুনিয়ার আবহাওয়াই আছে এইরূপ বুঝা ভুল। জগতের সনাতন কথাগুলাই এই আবহাওয়ার প্রাণ। জ্যান্ত নরনারীর জীবনের সাড়াসমূহ এবং রক্ত-মাংসের "স্বধর্ম"গুলা কেতাবের পাতায় পাতায় অঙ্কিত রহিয়াছে।

(৫)

জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী ভাঙ্গিয়া যাইবার পর ইয়োরোপে কতকগুলি নয়া রাষ্ট্র জন্মিয়াছে। এইগুলাকে সংক্ষেপে মোটের উপর "বল্কান-চক্র" ও বল্কান-সমস্যার অন্তর্গত করা চলে।

এই আড়াই বৎসরে সোভিয়েট রুশিয়ায় অনেক কিছু ঘটিয়াছে। যুবক তুর্কও জগতে নবরূপে দেখা দিয়াছে। তাহা ছাড়া ইতালি দুনিয়ার আবহাওয়ায় মাথা চাঁড়িয়া তুলিয়াছে।

কাজেই এই চার জনপদ বর্ত্তমান গ্রন্থে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকা এই তিন মুল্লুকের বনিয়াদি সমাজ দুনিয়ার সর্ব্বত্রই জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে নরনারীর,

জীবনযাত্রা গড়িয়া তোলে। এই তিন দেশের ছায়া লেখাগুলার উপরও পড়িয়াছে।

জার্ম্মাণির হাত-পা খোঁড়া। তথাপি "মরা হাতী লাখ টাকা।" সুতরাং দুনিয়ার আব্‌হাওয়ায় জার্ম্মাণ-কথা অনিবার্য্য।

জাপান এবং চীনও বাদ পড়ে নাই।

(৬)

এই গ্রন্থ ভ্রমণ বা ডায়েরী-সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড এবং ইতালিতে পর্য্যটনের কাহিনী স্বতন্ত্র আকারে বাহির হইবে।

সেই সকল বৃত্তান্তের ভিতর "কুল্‌টুর" বিষয়ক তথ্য ছড়ানো হইয়াছে। এই কারণে "দুনিয়ার আব্‌হাওয়া"য় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা, সভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের দিকে নজর কিছু কম পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ঘটনা এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে এই সমুদয়ের প্রভাব বর্ত্তমান রচনার প্রায় অর্দ্ধেক স্থান অধিকার করিতেছে।

(৭)

সমসাময়িক ইতিহাস, পররাষ্ট্রনীতি, বর্ত্তমান জগৎ ইত্যাদি বলিলে যাহা কিছু বুঝা যায় তাহা ১৯০৫ সালে ভারতীয় জ্ঞানমণ্ডলে জানা ছিল না। এমন কি ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কেরা এবং শিক্ষা-দীক্ষার গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণ এদিকে নজর দেন নাই।

১৯১৪ সালে লড়াইয়ের হিড়িকে বর্ত্তমান জগৎ আপনা-আপনিই ভারতে আসিয়া হাজির হয়। তাহার ফলে ভারত-সন্তান দুনিয়ার আব্‌-হাওয়া সম্বন্ধে কম বেশী চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে এই চিন্তার অস্তিত্ব এক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৯২৩ সালের বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজি রচনায় যুবক ভারত "পর-চর্চ্চার" পরিচয় দিতে সুরু করিয়াছে। জগতের রাষ্ট্রিক কথা, আত্মিক কথা এবং আর্থিক কথা ধীরে ধীরে ভারতবাসীর মাথায় প্রবেশ করিতেছে।

(৮)

এই স্রোতের মুখে "দুনিয়ার আবহাওয়া" প্রকাশিত হইতে চলিল। লেখকের পক্ষে এই কেতাব রচনা নানা কাজের এক কাজ মাত্র। যাঁহারা এই ধরণের লেখাপড়াকে জীবনের একমাত্র বা প্রধান কাজরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিবেন তাঁহাদের রচনায় বর্ত্তমান গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা সমূহ তিষ্ঠিতে পারিবে না সন্দেহ নাই।

যে সকল তথ্য, ঘটনা, সংবাদ বা বৃত্তান্ত আংশিক ও অসম্বদ্ধভাবে এই পৃষ্ঠাগুলার ভিতর প্রচার করা যাইতেছে সেই সব সম্বন্ধে অনুসন্ধান, গবেষণা এবং পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ভারতের কুত্রাপি নাই। কিন্তু ইয়োরামেরিকায় সর্ব্বত্র এবং জাপানেও তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

দুনিয়ার আবহাওয়ায় ওস্তাদ্ হইয়া উঠিবার জন্য ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, জাপানী এবং অন্যান্য দেশীয় যুবকেরা সকলেই সর্ব্বদা বিদেশে গিয়া আড্ডা গাড়ে না। নিজ নিজ স্বদেশেই বর্ত্তমান জগৎকে মন্থন করিবার আয়োজন রহিয়াছে। এই সকল আয়োজন ব্যবহার করিয়াই উহারা কেহ "কন্সাল" হয়, কেহ "অ্যাম্ব্যাস্যাডার" হয়, কেহ পররাষ্ট্র-সচিব হয়, কেহ বিজিত দেশের "লাট সাহেব" হয়, কেহ আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক হয়, কেহ সংবাদপত্রের পরিচালক হয়। অবশ্য দেশ বিদেশে টোটো করিয়া ভবঘুরে-গিরি চালাইবার ব্যবস্থাও থাকে।

ভারতে এই ধরণের কোনো জীব একপ্রকার নাই। কিন্তু এই জীবের সাক্ষাৎ পাওয়া চাই। তাহাদিগকে গড়িয়া তোলা ভারতীয় স্বরাজ-আন্দোলনের অন্যতম কর্ত্তব্য।

(৯)

১৯২১ সালে প্যারিসে বসিয়া "ফরেণ পলিসি অব্ ইয়ং ইণ্ডিয়া" ("যুবক ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি") সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেটা কলিকাতার "মডার্ণ রিভিউ"য়ে বাহির হইয়াছে। পররাষ্ট্রনীতির দার্শনিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলাম ১৯১০ সালে ময়মনসিংহের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে "ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানব জাতির আশা" প্রবন্ধে।

সেই প্রবন্ধ দুইটাকে "দুনিয়ার আবহাওয়া"র ভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে "বিশ্বশক্তি" (১৯১৪) গ্রন্থের কোনো কোনো অংশ এবং "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে"ও দ্রষ্টব্য।

বোল্‌ৎসান, ইতালি
১৪ই এপ্রিল ১৯২৫।

৩। ইতালি-ভ্রমণ ও "বর্ত্তমান জগৎ"

(১)

ইতালিতে ভবঘুরেগিরি করিয়াছি চার বার। দুই বার সুইট্‌সাল্যাণ্ডের লুগানো হইতে, একবার রেলপথে, আর একবার হ্রদ-পথে। এই দুইবারে পাদুয়া, ভেনিস, মিলান, ত্রেন্ত আর লেক্কো, প্রধানতঃ এই পাঁচ জনপদের সঙ্গে পরিচয়। ১৯২৪ সনের ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি

হইতে জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই অভিজ্ঞতার বছর। এই মাস চারেকের ভিতর ইতালিয়ান ভাষায় হাতে খড়ি দিতে চেষ্টা করি নাই। দু-একখানা ইতালিয়ান কেতাব ও কাগজ উণ্টাইতে পাণ্টাইতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। এই সময়ের মধ্যেই আবার একবার কিছু দিনের জন্য লুগানোয় ফিরিয়া গিয়াছিলাম। ঋতু হিসাবে, উত্তর ইতালির লম্বাদি, হ্বেনেৎসিয়া আর পাহাড়ী ত্রেন্তিন (বা জার্ম্মাণ-অষ্ট্রিয়ান পারিভাষিকে দক্ষিণ-টিরোল) এই তিন প্রদেশের বসন্ত আর গ্রীষ্ম চাখিতে পারিয়াছি।

ইতালিতে শেষ দুইবার আসি অষ্ট্রিয়ার ইনস্‌ব্রুক হইতে। প্রথমবার ১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। জুলাই ও আগষ্ট অর্থাৎ গ্রীষ্মের শেষার্দ্ধ কাটে "টিরোলী আল্পসের তালে তালে" আর জার্ম্মানির ব্যাহ্বেরিয়া প্রদেশে। সেপ্টেম্বর মাস হইতে বসবাস ইতালির বোল্‌ৎসান (জার্ম্মাণ, এ ক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়ান নাম বোৎসেন) নগরে। আঙ্গুর-পেয়ারা-আপেল-পীচের এই আবেষ্টনে প্রায় এগার মাস কাটিয়াছিল, ১৯২৫ সনের জুন পর্য্যন্ত। মেরাণ আর হ্বিপিতেন (জার্ম্মাণ ষ্টাৎসিঙ) এই দুই অঞ্চলেও মাঝে মাঝে ঘুরাফিরা করিয়াছি।

পরে জুলাই-আগষ্ট মাসের কিছুদিন আবার অষ্ট্রিয়ার ইন্‌স্‌ব্রুকে কাটিয়াছে। আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত কয়েক সপ্তাহ বোল্‌ৎসানয় কাটাইয়া সেপ্টেম্বরস্থ প্রথম দিবসে হ্বেনিসে কিস্তী পাকড়াও করিলাম। যথা সময়ে ইতালিয়ান জাহাজ,—"ক্রাকোহ্বিয়া",—বিনা দৈবদুর্ব্বিপাকে বোম্বাই বন্দরে আসিয়া ঠেকিল (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫)। সাড়ে এগার বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৭ সনের ৮ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাইয়েই "যাচ্ছি কোথায় জানিনাক' চল্লাম ছেড়ে হিন্দুস্থান।"

(২)

যাহা হউক, ইতালির বোল্‌ৎসান জনপদে কাটিয়াছে প্রায় মাস এগার। এই খানেই,—১৯২৫ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইতালিয়ান ভাষায় হাতে খড়ি দিই। জার্ম্মাণ লেখক সাওয়ার প্রণীত "ইটালিয়েনিশে কোন্‌ফার্সাটিসিয়োনস্-গ্রামাটিক" (ইতালিয়ান্ কথা কওয়া ও ব্যাকরণ শিক্ষা) নামক গ্রন্থ গলাধঃকরণ করিতে লাগিয়া যাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৪ (য়ুলিয়ুস গ্রোস কোং, হাইডেলব্যর্গ, ১৯২৩)। চার সপ্তাহে,—প্রতিদিন ঘণ্টা দেড়েক করিয়া আদা-নুন খাইয়া লাগায় শ' তিনেক পৃষ্ঠা হজম করিয়া ফেলি। এই সঙ্গে সাথী ছিল একখানা জার্ম্মাণ-ইতালিয়ান অভিধান। তাহার পর হইতেই নানা প্রকার ইতালিয়ান কেতাব পড়িয়া চলিতেছি।

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, চার সপ্তাহে যতখানি বা যতটুকু ইতালিয়ান দখল করিতে পারিয়াছি, ততটুকু জার্ম্মাণ দখল করিতে লাগিয়াছিল পাঁচ সপ্তাহ, আর ততটুকু ফরাসী দখল করিতে তিন সপ্তাহ দিয়াছিলাম। অর্থাৎ ফরাসীর চেয়ে ইতালিয়ান কঠিন বোধ হইয়াছে। ফরাসীর সাহায্যে ইতালিয়ানে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় নাই।

ফরাসী ভাষায় দখল কতটা আছে তাহা ফ্রান্সে থাকিতে থাকিতেই ফরাসী নরনারীর মহলে মহলে,—"খোলা মাঠে" যাচাই করাইবার সুযোগ পাইয়াছি। জার্ম্মাণির ঘাটে ঘাটেও জার্ম্মাণ বিদ্যার দৌড় "কাগজে কলমে" পরখ করানো গিয়াছে। কিন্তু ইতালিয়ানে এইরূপ খোলা মাঠের যাচাই সম্ভবপর হয় নাই। ফ্রান্সে, প্রথম হইতেই, লোকজনের সঙ্গে চিঠি-পত্র চালাইয়াছি,—বিশ্ববিদ্যালয়ে, আকাদেমী'তে বক্তৃতা করিয়াছি,—আর মোলাকাতে বোল ব্যবহার করিয়াছি,—আগাগোড়া

ফরাসীতে। জার্ম্মাণিতে, অষ্ট্রিয়ায় আর সুইট্সার্ল্যাণ্ডেও সর্ব্বত্র সকল ক্ষেত্রেই চালাইয়াছি,—ঐ সকল দেশবাসীর মাতৃভাষা জার্ম্মাণ।

কিন্তু ইতালিতে,—আশ্চর্য্যের কথা,—একদিনও ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলি নাই। নিজে কোনো দিন একখানা চিঠি পর্য্যন্ত ইতালিয়ানে লিখি নাই। একটা প্রবন্ধ রচনায় হাত মক্স করিয়াছি মাত্র। সম্পাদকেরা সেটা কাগজে ছাপিয়াছেনও যতদিন ইতালিয়ান জানিতাম না,—যথা পাদহ্বা, হ্বেনিস, মিলান ইত্যাদি জনপদে,—ততদিন চালাইয়াছি ফরাসী। আর যে দিন হইতে ইতালিয়ান জানি,—যথা বোল্ৎসানয়, সেদিন হইতে হ্বেনিসে সওয়ারি হওয়া পর্য্যন্ত ছয় সাত মাস ধরিয়া প্রতিদিনই আজ এখানে, কাল ওখানে চলাফেরা করার সম্ভাবনা ছিল। ইতালিতে কতদিন থাকা হইবে তাহার স্থিরতাই ছিল না। যখন-তখন ইতালি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এই অবস্থায় ইতালিয়ান ভাষায় লেখালেখির অভ্যাস করিতে একদম চেষ্টিত হই নাই,—ঐ প্রবন্ধটা ছাড়া। হরেক রকম ইতালিয়ান বই আর কাগজ পড়িয়াছি মাত্র। তবে, ইতালিয়ান নর-নারীর নিকট হইতে পাওয়া ইতালিয়ান ভাষায় লেখা চিঠি বুঝিবার জন্য কোনো দোভাষীর সাহায্য লইতে হয় নাই।

(৩)

এই সূত্রে ইতালি-প্রবাসের আর একটা বিশেষত্ব উল্লেখ করা আবশ্যক। অধিকাংশ সময়,—মাস এগার কাটিয়াছে বোল্ৎসানয়, মেরাণয়, হ্বিপিতেনয়। এই শহর তিনটার নরনারী আগাগোড়া জার্ম্মাণ (অষ্ট্রিয়ান)। রাষ্ট্রিক হিসাবে এই অঞ্চল মহাযুদ্ধের পর হইতে ইতালির একটা প্রদেশ বটে। কিন্তু এখানে আসল ইতালির গন্ধ মাত্র নাই।

ইন্‌সব্রুককে অষ্ট্রিয়ান-জার্ম্মাণরা জানে উত্তর-টিরোলের কেন্দ্র বলিয়া। তাহাদের বিবেচনায় বোল্‌ৎসান (বোৎসেন) সেইরূপ দক্ষিণ-টিরোলের কেন্দ্র। কাজেই বোল্‌ৎসানর আবহাওয়ায় দশ-এগার মাস কাটানো আর ইন্‌সব্রুকে দশ-এগার মাস কাটানো একই কথা,—কি ভাষায়, কি সাহিত্যে, কি সৌজন্য-শিষ্টাচারে, কি লেনদেনে, কি হাস-ঠাট্টায়। সুতরাং এই কয় মাসের জীবনকে ইতালিয়ান অভিজ্ঞতা রূপে বিবৃত না করিলেই বোধ হয় ইতালির প্রতি সুবিচার করা হইবে।

রোম, ফ্লোরেন্স, বোলোনিয়া, নেপল্‌স ইত্যাদি শহর হইতে বক্তৃতাদির নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। কিন্তু সে সব গ্রহণ করা হয় নাই, ওসব দিকে যাওয়াই হয় নাই মিলান, পাদহ্বা ইত্যাদি শহরগুলা খাঁটি ইতালিয়ান সভ্যতারই কেন্দ্র। কাজেই বর্ত্তমান গ্রন্থের যে সকল অভিজ্ঞতা এই সব জনপদের সম্পর্কে, সেই সকল অভিজ্ঞতায় আসল ইতালির আত্মাই স্পর্শ করা হইতেছে।

বোল্‌ৎসানয় থাকিবার সময় ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা আর পুস্তকাদি হইতে নানা তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করা গিয়াছে। তাহা নানা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থেও তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল,—পরিশিষ্টে।

"দুনিয়ার আবহাওয়া" (১৯২৫) গ্রন্থের কয়েক অধ্যায়ে "ইতালির বনাম ক্যাবিনেট", "ইতালির দিস্কন্ত ব্যাঙ্ক", "জেনোয়া কন-ফারেন্সের আবহাওয়ায়", "ইতালি ও মধ্য ইয়োরোপ", "ইতালি ও আঙ্গোরা", "ইতালিতে বোলশেভিকা", "ইতালিতে ম্যালেরিয়া লোপ", "ইতালির কর্ফু দখল", "বৃহত্তর ইতালি", "মুসলিনি ও দিরিভেরা", "সুইস-ইতালিয়ান সামানায়", "উত্তর ইতালির সমাজ-সমস্যা" নামক

বিভিন্ন বিষয় বিবৃত আছে। অধ্যায়গুলা বর্ত্তমান গ্রন্থের সঙ্গে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখা যাইতে পারে।

ইতালি বিষয়ক কয়েক অধ্যায় "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" (আর্থিক উন্নতি, মান্দ্রাজ, ১৯২৬), এবং "পলিটিক্‌স্ অব বাউণ্ডারীজ" (সীমানার রাষ্ট্রনীতি, কলিকাতা, ১৯২৬) নামক দুই ইংরেজি গ্রন্থেও প্রকাশিত হইয়াছে। এই বই দুইটার কিয়দংশ ইতালির নানা কেন্দ্রে লেখা হইয়াছিল। আর একখানা বই, "বিব্লিওগ্রাফিক্যাল, কাল্‌চ্যর্যাল অ্যাণ্ড এডুকেশ্যন্যাল নিউজ ফ্রম আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি অ্যাণ্ড ইত্যালি" নামে বাহির হইতেছে। তাহাতেও ইতালির কথা আছে।

(৪)

ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণি (অষ্ট্রিয়া ও সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড), ফ্রান্স এবং আমেরিকার তুলনায় ইতালিকে বর্ত্তমান জগতের সভ্যতায় অনেকটা ছোট মনে হইয়াছে। এই কারণেই ইতালিতে যুবক ভারতের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ বহু খুঁটিনাটি পাইবার সম্ভাবনা। ইতালির পল্লীতে শহরে অনেকদিন ভবঘুরেগিরি করিতে পারিলে ভারতসন্তান স্বদেশের জন্য নানা প্রকার সঙ্কেত ও ইঙ্গিত সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষ আজ বর্ত্তমান সভ্যতার অনেক নিম্নস্তরে অবস্থিত। আধুনিক মানবের আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় নরনারীর জীবনে নেহাৎ কম দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তরে দাঁড়াইয়া ইংরেজ, জার্ম্মাণ, মার্কিণ ও ফরাসী আধ্যাত্মিতার নাগাল পাওয়া যারপর নাই কঠিন। ইতালিয়ানরা ঠিক যেন মাঝামাঝি অবস্থায় রহিয়াছে।

এই সব দেখিয়া-শুনিয়া ভারতের তরফ হইতে ইতালিকে ইয়োরোপের জাপান অথবা জাপানকে এশিয়ার ইতালি বিবেচনা করা আমার

দস্তুর। ভারতের রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও আত্মিক উন্নতির কারিগরেরা ইতালিয়ান-জাপানী স্তরটা আগে পাশ না করিয়া পরবর্ত্তী স্তরে পা ফেলিতে পারিবেন না। ইতালির সঙ্গে আর জাপানের সঙ্গে যুবক ভারতের আত্মীয়তা নিবিড়রূপে কায়েম করা আবশ্যক।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। ইতালি যুদ্ধের পর হইতে,—বিশেষতঃ মুসলিনির আমলে,—বেগে উন্নতি লাভ করিতেছে। রাষ্ট্রীয় ডেমোক্রেসী বা স্বরাজের কথা ভুলিয়া এই মত জারি করিতেছি। ১৮৭০ সনের পর জার্ম্মাণি ইয়োরোপে যে-বেগে দৌড়িতেছিল, ১৯১৯-২২ সনের পর ইতালি যেন প্রায় সেই বেগেই দৌড়িতেছে। আগামী ত্রিশ বৎসরের ভিতর ইতালি ইয়োরোপের এক প্রবল শক্তিতে দাঁড়াইয়া যাইবে। এই কারণেও উন্নতি-প্রয়াসী যুবক ভারতের পক্ষে ইতালির সঙ্গে সাহচর্য্য বিশেষ দরকার।

(৫)

এই কেতাব ("ইতালিতে বারকয়েক"), "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর শেষ খণ্ড। পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে,—(১) কবরের দেশে দিন পনর (১৯১৫, ২১০ পৃষ্ঠা), (২) ইংরেজের জন্মভূমি (১৯১৬, ৫৮৬ পৃষ্ঠা), (৩) বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (১৯১৫, ১৩০ পৃষ্ঠা), (৪) ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ (১৯২৩, ৮২৪ পৃষ্ঠা), (৫) নবীন এশিয়ার জন্মদাতা,—জাপান (১৯২৭, ৪৮৫ পৃষ্ঠা), (৬) বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য (১৯২৮, ৪৫০ পৃষ্ঠা)। (৭) সুইটসার্ল্যাণ্ড (১৯২৯, ৭৫ পৃষ্ঠা)।

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলা যন্ত্রস্থ :—(৮) ফ্রান্স (৩০০ পৃষ্ঠা), (৯) জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়া (৫০০ পৃষ্ঠা)।

এই দশখণ্ড ছাড়া "দুনিয়ার আবহাওয়া"কে (১৯২৫, ১৭৬ পৃষ্ঠা) এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত করা চলে। এটা অবশ্য পর্য্যটনকাহিনী নয়।

জার্ম্মাণিতে, অষ্ট্রিয়ায়,সুইটসার্ল্যাণ্ডে ও ইতালিতে থাকিবার সময়ে জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইতালিয়ান কেতাব-কাগজের মারফৎ যাহা জানা-শুনা গিয়াছে, এই বই তাহারই দলিল। এই সঙ্গে "নবীন রুশিয়ার জীবন প্রভাত" (১০০ পৃষ্ঠা প্রায়) ও উল্লেখযোগ্য। বইটা জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা-সার। "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর বারখানা বইয়ের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪,০০০ এর উপর।

পর্য্যটন-কাহিনী "ডায়েরি" বা "দিন-লিপি" হিসাবে আত্মজীবন-চরিত বিশেষ। "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীকেও আত্মজীবন-চরিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই সমুদয়ের ভিতর আমি অমুক সময়ে অমুক লোকের সঙ্গে এইরূপ কথা বলিলাম অথবা অমুক লোকের নিকট এইরূপ শুনিলাম কিম্বা আজ সকালে অথবা বিকালে অমুক স্থান ছাড়িয়া অমুক স্থানের দিকে রওনা হইলাম ইত্যাদি শ্রেণীর তথ্য ছাড়া আত্ম-চরিতের আর-কোন বস্তু হয়ত পাওয়া যাইবে না। যথাসম্ভব নিজের সুখ-দুঃখ, উল্লাস-উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিয়া কাটখোট্টা বস্তুনিষ্ঠভাবে দুনিয়ার নরনারীকে ভারত-সন্তানের সঙ্গে মোলাকাৎ করাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তবে জগতের সভ্যতা জরীপ করিবার প্রণালীটার ভিতর আর জরীপের ফলাফল-প্রচারের ভিতর লেখকের নিজস্ব ধরা পড়িতে বাধ্য।

এই হাজার চারেক পৃষ্ঠায় দুনিয়ার নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্ম্ম-পরিবার ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য নানা প্রকারে খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, সমাজ-তত্ত্ব, তুলনামূলক ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি বিদ্যার অনেক কথাই এই সকল বইয়ের ভিতর আছে। কিন্তু লেখকের পক্ষে গ্রন্থাবলীটা এক বিপুল বিশ্বকোষের সূচীপত্র মাত্র। প্রত্যেক খণ্ডকেই বিভিন্ন দেশ-সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ-পঞ্জীর সংগ্রহালয় মাত্র বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

তথাপি একথাও বলিয়া রাখা উচিত যে, প্রত্যেক খণ্ডের রচনায়ই হাড়ভাঙা খাটুনি আবশ্যক হইয়াছে। লাইব্রেরিতে বহু ঘাঁটাঘাঁটি করা, হাসপাতাল-ব্যাঙ্ক-বিজ্ঞানশালা-চিত্রগৃহ-ফ্যাক্টরি-মিউজিয়াম-প্রদর্শনীর বিবরণী পড়িয়া রাখা, বহুসংখ্যক লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া নানা মুনির নানা মতের সংস্পর্শে আসা আর প্রতিদিনই দৈনিক অনুসন্ধান-গবেষণা-টীকাটিপ্পনী যথাসময়ে সংক্ষেপে বা সূত্রাকারে কাগজস্থ করা যারপর নাই মেহনৎ-সাপেক্ষ। তাহার উপর অন্যান্য লেখাপড়া আর কাজকর্ম্ম ত আছেই।

বিদেশে বক্তৃতা ও লেখালেখি

(১)

বিদেশে অনুষ্ঠিত কাজকর্ম্মের তালিকায় দুইটা দফা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। একটা হইতেছে উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ে আর পণ্ডিত-পরিষদে বক্তৃতা। আর একটা উচ্চতম মাসিক, ত্রৈমাসিক বা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ-প্রকাশ। দফা দুইটা কাগজে-কলমে যত সোজা মালুম হইতেছে, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে তত সোজা নয়। এই সকল কথা পূর্ব্বে নানাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। এইখানে দুএকটা কথা বলিব।

১৯১৪-২৫ সন নেহাৎ "সেকেলে" যুগ নয়। কিন্তু এশিয়ার সঙ্গে (অবশ্য ভারতের সঙ্গেও) ইয়োরামেরিকার 'আত্মিক" লেনদেন-ঘটিত কারবারে এই যুগটা একপ্রকার "সেকেলে" যুগই বটে। কম্‌সে-কম এই বৎসর বার'র ভিতরে একাধিক যুগ আছে। তাহা ছাড়া বিগত তিন-চার বৎসরের ভিতরেই অনেক-কিছু নতুন নতুন ঘটিয়াছে আর ঘটিবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে।

১৯১৪-১৮ সনের যুগটা ধরা যাউক। তখনকার দিনে, লড়াইয়ের

যুগে, যে ইয়োরামেরিকা বর্ত্তমান ছিল, সেই ইয়োরামেরিকার হোম্‌রা-চোম্‌রা লোকেরা, অর্থাৎ "বাঘা" "বাঘা" পণ্ডিত আর জাঁদরেল প্রতিষ্ঠানসমূহ,—এশিয়ার অবশ্য ভারতবর্ষেরও) নরনারীকে "সমানে" "সমানে" লেখক, বক্তা, গবেষক ইত্যাদি সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত ছিল না। "ইয়োরামেরিকায় ভারতসন্তান" শব্দের প্রধান বা একমাত্র অর্থই ছিল "ইয়োরামেরিকান পণ্ডিতদের ভারতীয় ছাত্র বা শিষ্য, ডিগ্রিপ্রার্থী বা সার্টিফিকেটের উমেদার।" কোনো ভারতসন্তান ইয়োরামেরিকার বড় বড় পণ্ডিতদের বৈঠকে বক্তৃতা করিতে অধিকারী এইরূপ চিন্তা পর্য্যন্ত "সেকালে" পাশ্চাত্য মগজে,—এমন কি আমেরিকায়ও একপ্রকার ঠাঁই পাইত না। তবে রাস্তায় ঘাটে বক্তৃতা করা, ক্লাবে-নৈশমজলিসে আলোচনা, অথবা ক্কচিৎ কখনো দ্বিতীয়-তৃতীয় বা আরও নিম্নশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় নদনদী, স্ত্রীপুরুষের বেশভূষা, সাপব্যাঙ্‌, হাঁচিটিকৃটিকি, অহিংসা, বিশ্বপ্রেম ইত্যাদি লইয়া চিত্তাকর্ষক গল্প শুনানো হয়ত নেহাৎ অপ্রচলিত ছিল না।

কিন্তু ১৯০৫ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত আটদশ বৎসরের যুবক এশিয়া ইয়োরামেরিকার "বড় বড় পণ্ডিতমহলে" দন্তস্ফুট করিবার সুযোগ একপ্রকার পায় নাই বলা চলে। কে কোথায় কতটুকু সুযোগ পাইয়াছে আর তাহার কিম্মৎ কত তাহা খুঁজিয়া দেখা বর্ত্তমান পর্য্যটকের অন্যতম ধান্ধা ছিল। নানাস্থানে তাহার আলোচনা করিয়াছিও। সমাজতত্ত্ব বিদ্যায় আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যুবক ভারতের যাঁহারা অনুসন্ধান-গবেষণা চালাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই বিষয়টা বেশ গভীরভাবে বস্তুনিষ্ঠরূপে তলাইয়া-মজাইয়া আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। বর্ত্তমান জগতের সভ্যতার ইতিহাসে এই আন্তর্জ্জাতিক তথ্যগুলা মূল্যবান।

যাহা হউক, জগতের সর্ব্বত্র "বড় বড় পণ্ডিতমহলে" ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে এবং ভারতীয় পাণ্ডিত্যের বিরুদ্ধে প্রবল কুসংস্কার ও বিদ্বেষ লক্ষ্য

করা মোটের উপর আমার অভিজ্ঞতার প্রধান কথা। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, ভারতসন্তানকে কোনো উচ্চ অঙ্গের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় সহযোগীরূপে নিমন্ত্রণ করা তাঁহাদের মজ্জাবিরুদ্ধ কাণ্ড ছিল। ইয়োরামেরিকানদের এই মজ্জাগত ভারতবিদ্বেষ ভাঙিয়া দিবার কাজে এই অধমকে—অবশ্য নিজগণ্ডীর ভিতর,—অনেক গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছে। বহুৎ ধাক্কাধাক্কির পর আমেরিকায়, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে এক একটা দুয়ার খোলাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছি। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, যাঁহারা ভারতসন্তানের জন্য এইরূপ দুয়ার খুলিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ কাণ্ড নিজ নিজ কোষ্ঠীর সর্ব্বপ্রথম ঘটনা।

এই লড়াই আজও শেষ হয় নাই। যুবক ভারতকে বহুদিন ধরিয়া এই বিজ্ঞান-সংগ্রামে লাগিয়া থাকিতে হইবে। ভারতসন্তান মাত্রেই যে পাশ্চাত্যদের ছাত্র নয়, আর তাহাদের "ফ্যাকাল্টি"তে দাঁড়াইয়া "বাঘা" "বাঘা" লোকের সম্মুখে কোনো কোনো ভারতসন্তানও যে মতামত প্রকাশ করিতে অধিকারী,—এই দাবী প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইয়োরামেরিকায় গণ্ডা গণ্ডা উপযুক্ত ভারতীয় পর্য্যটকের নিয়মিত স্রোত বহানো আবশ্যক।

উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ে বা পণ্ডিত-পরিষদে অথবা অধ্যাপকের "ফ্যাকাল্টি"তে বক্তৃতা করিবার সুযোগ পাইলেই কিস্তী মাত হইল, এইরূপ সমঝিয়া রাখা উচিত নয়। "এ সব দৈত্য নহে তেমন।" কোনো কোনো সময়ে হয়ত ভদ্রতার খাতিরে কোনো ভারতসন্তানকে কোনো পণ্ডিত-বৈঠকে খানিকটা বক্তৃতা করিবার সুযোগ দেওয়া হইল। কিন্তু সেই বক্তৃতাটা কোনো উচ্চাঙ্গের মাসিকে, ত্রৈমাসিকে বা পরিষৎ-

পত্রিকায় ছাপাছাপি লইয়া আবার মাথা ফাটাফাটি! কেন না, যে জিনিষটা কোনো বড় কাগজে ছাপা হইয়া যায় তাহার ইজ্জৎ তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞান-জগতে খুব বেশী, অন্ততঃ পণ্ডিত মহলে লোকজনের ধারণা এইরূপ! লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই ইজ্জৎ ভারতসন্তানকে বড় শীঘ্র ইয়োরামেরিকান পণ্ডিতেরা দিতে প্রস্তুত নয়।

যে যুগের অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান লেখকের জীবন-কথা, সেই যুগে নানান্ দেশের নানান্ ঘাঁটিতে ভারত-বিদ্বেষ ঘনীভূত দেখিয়াছি। কোনো একটা "দৈনিক" কাগজ—বিশেষতঃ "সোশ্যালিষ্ট" পরিচালিত দৈনিকে—"রাষ্ট্রনীতি"-ঘেঁশা লেখা হয়ত বা অল্প মেহনতেই ছাপা হইতে পারে। কিন্তু "বুর্জোআ"-মহলে "বৈজ্ঞানিক" পত্রিকায়, "দার্শনিক" আখড়ায় ভারতীয় মগজের রচনা ছাপার হরপে খোদা থাকিবে, ইহা একপ্রকার আকাশ-কুসুম বিশেষ।

ঘটনাচক্রে এই অধমকে পত্রিকা-গত লেখালেখির দুনিয়ায়ও বেশ একটু লড়িতে হইয়াছে। বড় বড় ঠাঁইয়ের এখানে-ওখানে, ফ্রান্সে, জার্ম্মাণিতে, আমেরিকায়, ভারতীয় কলমের আঁচড় রাখিয়া আসা পর্য্যটন-কাণ্ডের একটা লক্ষ্য ছিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভারতসন্তানকে এইরূপ আঁচড় মারিবার সাহসে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রবাসের সময় ত চেষ্টা করিয়াছিই, আর আজও করিতেছি। হয়ত বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধরণের উৎসাহ-প্রদানের ফল কিছু কিছু ফলিয়াছেও।

(৩)

ইয়োরামেরিকার প্রসিদ্ধ পত্রিকায় লেখালেখি করা যত কঠিন, সেখানকার প্রকাশকদের দ্বারা নিজ নিজ বই প্রচার করানো তত কঠিন নয়। "হাতে কলমে" দুই প্রকার অভিজ্ঞতাই আছে। এই জন্য প্রভেদটা পাকড়াও করিতে পারা গিয়াছে।

লেখকের ট্যাঁকে যদি পয়সার জোর থাকে আর বইটা যদি টেক্‌স্‌ট্ বুকরূপে 'চলনসই' হয় অথবা ঘটনাচক্রে বইটা যদি বিক্রী করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে বিদেশী প্রকাশকেরা ভারতীয় গ্রন্থকারদের বই ছাপিতে বেশী ইতস্ততঃ করে না—ভারত-বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও। তবু আজ পর্য্যন্ত বিদেশে-ছাপা ভারত-সন্তানের বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। বই ছাপাছাপি, অনেকটা একপ্রকার নিছক ব্যবসার কথা। কিন্তু পত্রিকায় প্রবন্ধ-প্রকাশ পয়সার খেলা নয়, এক্ষেত্রে প্রধানতঃ খাঁটি বৈজ্ঞানিক কিম্বৎ অপর দিকে খাঁটি ভারত-বিদ্বেষ এই দুই শক্তির লড়াই চলিয়া থাকে। এই লড়াইয়ে ভারতবাসীর কিছু কিছু বিজয়লাভ নেহাৎ সেদিনকার কথা মাত্র। যার যেখানে যতটুকু শক্তি বা সুযোগ আছে, তার সেটুকুর সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

যুবক ভারতের লেখক-বক্তা-পণ্ডিতদিগকে ইয়োরামেরিকার "উচ্চতম" প্রতিষ্ঠানে আর "উচ্চতম" পত্রিকায় ভারতীয় মাথার ঘী জাহির করিবার জন্য ব্রতবদ্ধ করা আমি স্বদেশ-সেবার এক বিপুল অঙ্গ বিবেচনা করিয়া থাকি। বর্ত্তমান জগতের উপযোগী "বৃহত্তর-ভারত" গড়িয়া তুলিবার কাজে এইরূপ মগজের অভিযান অন্যতম খুঁট।

দুনিয়ার পর্য্যটন-সাহিত্য

(১)

একালের দুনিয়ায় পর্য্যটকদের ভিতর সাহিত্য-সংসারে যে কয়জন লেখক নং ১ শ্রেণীর অন্তর্গত সুইডেনের সবেন হেডিন, ফ্রান্সের প্যের লতি আর ইংল্যাণ্ডের নাথানিয়েল কার্জন অন্যতম। ঘটনাচক্রে এই তিন জনই এশিয়া-পর্য্যটক আর এশিয়া-বিষয়ক সাহিত্যের স্রষ্টা। উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীতে পর্য্যটকদের সংখ্যা অগণিত, আর

পর্য্যটন-সাহিত্যও প্রচুর। রকমারি উদ্দেশ্য লইয়া জগতের নরনারী একালে দুনিয়ায় টোটো করিয়া থাকে। আর এই ভবঘুরে-বিবরণী হইতে নানান্ জাতি নানা প্রকার রসকস্ নিংড়াইয়া লইতে অভ্যস্ত। এই কারণে "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর শেষ ভূমিকায় এই তিন জন শ্রেষ্ঠ লেখকের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

"লর্ড" আর লাট হইবার বহুপূর্ব্বে ইংরেজ যুবা নাথানিয়েল কার্জন গোটা এশিয়াকে নখদর্পণে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীসমূহ একাধিক গ্রন্থে বাহির হইয়াছে। "রাশিয়া ইন্ সেণ্ট্রাল এশিয়া" গ্রন্থে (১৮৯৫) মধ্য এশিয়ার খুঁটিনাটি বিবৃত আছে। পারস্যের অলিগলি ইংরেজ সমাজে সুপরিচিত করিবার জন্য তিনি "পার্শিয়া অ্যাণ্ড দি পার্শিয়ান কোয়েস্‌চ্যন" রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "প্রব্লেমস্ অব দি ফার ইষ্ট"গ্রন্থ (১৮৯৪) জাপান, চীন, ও কোড়ীয়াকে বিলাতের নরনারীর নিকট খুলিয়া ধরিয়াছে। ১৮৮৯-৯৪ সনের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা তাঁহার নব প্রকাশিত আফগানিস্থান-বিষয়ক গ্রন্থেও প্রতিষ্ঠিত।

এশিয়া-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লোক—এশিয়ান বা ইয়োরামেরিকান—কার্জনের সমান খুব অল্পই ছিল কিন্তু তাঁহার গ্রন্থগুলাকে খাঁটি ভ্রমণ-সাহিত্যরূপে বিবৃত করা চলিবে না। ভ্রমণের অভিজ্ঞতাগুলা লইয়া পরবর্ত্তীকালে কয়েক বৎসর খাটিয়া আধা-ঐতিহাসিক আধা-ভৌগোলিক সাহিত্য সৃষ্টি করা তাঁহার বিশেষত্ব। এই হিসাবে "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর রোজনামচা বা ডায়েরি-রীতি কার্জনের লিখন-প্রণালী হইতে আগাগোড়া স্বতন্ত্র। এই সাহিত্যে "রোজ আনা রোজ খাওয়া" প্রথা কায়েম করা হইয়াছে। প্রায় কোথাও একদিনকার বাসি মালও রাখা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ধারার বৃত্তান্ত প্রকাশ করা "বর্ত্তমান জগৎ"-বইগুলার মতলব নয়।

অধিকন্তু ইংরেজ যুবা ছিলেন সাহিত্যের আসরে প্রধানতঃ বা একমাত্র রাষ্ট্রনীতির বেপারী। "বর্ত্তমান জগৎ" রাষ্ট্রনীতি ছাড়া অন্যান্য ঘাটেও ডিঙা লাগাইয়া পানি চাখিয়া দেখিতে সচেষ্ট।

লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া বাঙলার নরনারী ১৯০৫ সনে যুবক ভারতের জন্ম দিয়াছে। কাজেই হয়ত যুবক ভারত কার্জন-সাহিত্যকে সুনজরে দেখিতে চাহে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ইংরেজদের স্বদেশ-সেবক হিসাবে কার্জনের কর্ত্তব্যজ্ঞান আর স্বজাতি-প্রিয়তা যুবক ভারতকেও স্বদেশসেবার আর স্বরাজ-সাধনার নয়া নয়া পথ দেখাইয়া দিতে সমর্থ। অপর পক্ষে কার্জনের মাথার জোর, পাণ্ডিত্য, বিদ্যানুরাগ ও বিজ্ঞান-গবেষণা অতি উচ্চাঙ্গের বস্তু। অধিকন্তু লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক হিসাবে কার্জন যতখানি পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা দেখিলে যুবক ভারতও পরিশ্রমী আর কর্ম্মযোগী হইতে শিখিবে বলিয়া বিশ্বাস করা চলে।

কার্জনের ভ্রমণ-সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে আত্মবিশ্বাস, আত্মনিষ্ঠা, ব্যক্তিত্বের 'অহঙ্কার' ইত্যাদি সদ্‌গুণের প্রতিমূর্ত্তি। সহজেই লোকেরা সাধারণতঃ এই সদ্‌গুণকে "আত্মম্ভরিত্ব" বা অহঙ্কারের অসদর্থে মহা-দোষরূপে ধরিয়া লইতে হয়ত প্রলুব্ধ হইবে। কিন্তু মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান প্রণীত "লীভ্‌স্ অব গ্রাস্" (তৃণ-পত্র) নামক কাব্য-গদ্যে বা গদ্য-কাব্যে যে ধরণের "আমি, আমি, অহং, অহং" এর ধূয়া দেখিতে পাই, কার্জন-সাহিত্যের "অহঙ্কার"ও অনেকটা যেন সেই ধরণের চীজ। এই চীজ ভারতীয় সাহিত্যেও অজানা নয়। সেই ঋগ্‌বেদ-অথর্ব্ববেদের আমলেও দুনিয়াকে লক্ষ্য করিয়া "পুরুষ" বলিতেছেন:—

"অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়্ আশামাশাং বিষাসহি ॥"

অর্থাৎ "পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামে আমায় জানে সবে ধরাতে,
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,
জন্ম আমার দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে॥"

কার্জন-সাহিত্য এই বৈদিক "আধ্যাত্মিকতায়"ই ভরপুর। যৌবনের অহঙ্কার এই রচনাবলীর প্রাণ। যুবক ভারতে এই সকল রচনা সমাদৃত হইবার যোগ্য। কার্জন যৌবনশক্তির অবতার।

(২)

এইবার প্যের লতির কথা কিছু বলিব। একালের গদ্য লেখকগণের আসরে ফরাসীরা লতিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া থাকে। তাঁহার রচনাগুলা এক হিসাবে সবই ভ্রমণমূলক। ফ্রান্স-বিষয়ক এক বইয়ে আছে পিরেনীজ পাহাড়ের পল্লীজীবন চিত্রিত আর এক বইয়ের কথাবস্তু ব্রিটানি প্রদেশের চাষী জীবন হইতে গৃহীত। লতির তিনখানা বইয়ে আফ্রিকার জনপদ ও নরনারী অমর হইয়া রহিয়াছে। একখানা মরক্কো-বিষয়ক, একটায় সাহারা মরুর গল্প আর একটায় মিশরের পুরা-কাহিনী মূর্ত্তি পাইয়াছে।

এশিয়া-বিষয়ক বইয়ের ভিতর ভারত-কথা একটার আলোচ্য বস্তু। এক গ্রন্থের প্রাণ জেরুজেলেমের খৃষ্টকথা। দুই কেতাব লেখা হইয়াছে জাপান সম্বন্ধে। আর শ্যাম-দেশের "ওঙ্কারধাম" চতুর্থ বইয়ের কথা জোগাইয়াছে।

লতিকে কবি, ঔপন্যাসিক বা আখ্যায়িকা-লেখক হিসাবে সম্বর্দ্ধনা করিলেই তাঁহার রচনাবলীর যথার্থ ইজ্জৎ দেওয়া হইবে। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীগুলার ভিতর বস্তুনিষ্ঠা চরম মাত্রায়ই দেখিতে পাই: মিথ্যা কথায়,

অলীক গল্পে বা আজগুবি কল্পনায় লাগাম ঢিল দেওয়া লতির উপন্যাস-শিল্পের অঙ্গ নয়। কিন্তু তথাপি ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা নৃতত্ত্ব-বিষয়ক রচনা হিসাবে এই সমুদয় কেতাব ঘাঁটিতে বসিলে অন্যায় করা হইবে। সরস সুকুমার সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নমুনা চাখিয়া দেখিবার জন্যই লতির সাহচর্য্য করা উচিত। বলা বাহুলা, "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর ভিতরকার অনুপ্রেরণা আর সাহিত্য-শক্তি বিলকুল অন্য ধরণের। অধিকন্তু লতি প্রধানতঃ বা একমাত্র ধর্ম্ম, মন্দির, কারুকার্য্য পরকাল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত। বস্তুনিষ্ঠ হইয়াও লতি ষোল আনা রোমাণ্টিক বা ভাবুক। এই হিসাবে লতির মগজে আর কার্জনের মগজে আকাশ-পাতাল প্রভেদ কার্জন-সাহিত্যে এশিয়ার শিল্প-ধর্ম্মাদি বস্তু অতি বিরল। তাহা ছাড়া এশিয়ার সঙ্গে ইয়োরোপের পরস্পর-সম্বন্ধ বিষয়ে কার্জন-নীতির উল্টা হইতেছে লতি-নীতি। লতি সর্ব্বত্রই স্বাধীনতার পুরোহিত আর কার্জন চাহিতেছেন গোটা এশিয়ায় ইংরেজের প্রভুত্ব-বিস্তার।

লতির বইগুলা পড়িলে এশিয়ার নরনারী সম্বন্ধে "রোমাণ্টিক", কবিত্বময়, রহস্যপূর্ণ মানবজীবনের কয়েকটা দিক্ চিত্তাকর্ষক ও চটকদার-রূপে ধরা পড়িবে। তাহাতে যারপরনাই একচোখো অতএব অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক জ্ঞান জন্মিতে বাধ্য। এই কথাটা বলিয়া রাখা আবশ্যক। কিন্তু কার্জন-সাহিত্যে এশিয়ার যে সকল অঙ্গ খুলিয়া ধরা হইয়াছে তাহাতে লতি-সুলভ উল্লাস, মনোহারিত্ব বা কাব্য-ঘেঁষা স্বপ্ন জাগিয়া উঠিবে না। তাহাতে বর্ত্তমান এশিয়ার দৈন্য-দারিদ্র্য আর দুর্দ্দশাই অতি নিষ্ঠুর কঠিন-কঠোরভাবে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। হয়ত বা এই চিত্রেও আংশিক সত্যই প্রকাশিত হইয়েছে। কিন্তু এশিয়া-বিষয়ক এই কেঠো তেতো নির্ম্মম সত্যের ভিতরই পাঠকেরা সত্যের পরিমাণ বেশী পাইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—"বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর তথ্য ও তত্ত্বরাশির ভিতর কার্জনের একবগ্‌গা আলোচনা বর্জ্জিত হইয়াছে। সেইরূপ লতির একচোখো রোমান্টিকতাও এই সকল বইয়ের ভিতর পাওয়া যাইবে না। মানবজীবনের "বত্রিশ বিদ্যা, চৌষট্টি কলা" সবই এক সঙ্গে,—হয়ত বা ছিটে-ফোঁটার আকারে—গণ্ডূষ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

হেডিনের পর্য্যটন মধ্যএশিয়া, চীন আর তিব্বতের ভিতর সীমাবদ্ধ। হেডিন-সাহিত্যে না আছে রাষ্ট্রনৈতিক পিপাসা, আর না আছে ভাবুকতাময় উচ্ছ্বাসময় ধর্ম্মানুসন্ধান। হেডিন আগাগোড়া ভৌগোলিক। ভূগোলের চৌহদ্দি বাড়াইবার বিজ্ঞান হেডিনের একমাত্র উপাস্য। যে সকল দেশ পৃথিবীতে কেহ কখনো চোখে দেখে নাই, সেই সকল দেশের বন-নদী-মরু-পাহাড় আবিষ্কার করার শিল্পে হেডিন আজীবন সাধনা করিতেছেন। এই হিসাবে কার্জনের পারস্য-বিষয়ক গ্রন্থে হেডিন-শক্তিও কিছু কিছু দেখিতে পাই বলিতে পারি। কেননা পারস্যে আসিয়া ভৌগোলিক অনুসন্ধানে কার্জন বেশ খানিকটা হাত দেখাইয়াছেন। কিন্তু হেডিন পূরাপূরি ভূগোল-বীর আর এই মহলে তাঁহার কৃতিত্বও তিব্বতী পাহাড়ের মতই উঁচুদরের জিনিষ।

একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর কোথায়ও এমন কোন মুল্লুক নাই, যেটা কোনো মানুষ পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই। এমন কি ভারতসন্তানের অ-দেখা বা অ-শুনা জনপদও এই ভ্রমণ-সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। সবই চেনা-শুনা ঠাঁই আর চেনাশুনা নরনারীর কাহিনী। তবে বাঙলা সাহিত্যে ভৌগোলিক রস নেহাৎ কম। ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্য ভূগোল ছাড়া দেশদেশান্তরের প্রকৃতি-তত্ত্ব আর

নৃ-তত্ত্ব আমাদের পাতে বড় একটা অন্ততঃ "সেকালে" পড়িত না। হয়ত বা এই হিসাবে নানান্ দেশের, নানান্ জাতের, নানান্ ভাষার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ বাঙালীর পক্ষে খানিকটা নতুন বোধ হইলেও হইতে পারে। যাঁহারা বস্তুনিষ্ঠার আদর করেন, তাঁহারা এই বাংলা বইগুলায়ও হেডিন-রীতি কিছু কিছু পাইবেন।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। প্যারিসে থাকিবার সময় একজন ফরাসী পণ্ডিত বর্ত্তমান লেখককে আর একজন ফরাসী পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিবার উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন,—"এ এসেছে ভারত হ'তে কলাম্বসের চোখ নিয়ে। চায় আমাদের ফ্রান্স আর পশ্চিম মুল্লুক আবিষ্কার কর্তে।" এই ধরণের উপমা বা তুলনা ইংল্যাণ্ডে, ইয়াঙ্কিস্থানে, ইতালিতে নানা দেশেই একাধিকবার শুনিতে হইয়াছে। অবশ্য কোন একটা ভালমন্দ মতামত বেমালুম হজম করিয়া ফেলা এই অধমের হাড়মাসে লেখা নাই। কাজেই "ভারতীয় কলাম্বাস" উপাধি খাইয়াও অথবা "কলাম্বাসের চোখ" পাইয়াও বিশেষ কিছু চঞ্চল হইয়া পড়ি নাই।

(৪)

তবে বর্ত্তমান জগৎটা "আবিষ্কার" করা যে যুবক ভারতের পক্ষে একটা মস্ত সমস্যা, সে বিষয়ে এই পর্য্যটকের কোনো দিনও সন্দেহ ছিল না, এখনো নাই। শ' দুই-দেড়েক বৎসর ধরিয়া "বর্ত্তমান জগৎ" ভারতাত্মাকে খুব জোরসে ঘায়ের পর ঘা লাগাইতেছে। তবুও "বর্ত্তমান জগৎ"কে পাকড়াও করিবার আন্তরিক আর যথোচিত প্রয়াস ভারতীয় নরনারী করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে ভারত-সন্তান বড়ই উদাসীন। এই সম্বন্ধে নানা কথা নানা উপলক্ষ্যে বলিয়াছি বাংলায় ও ইংরেজিতে।

জাপানী চরিত্রে আর ভারতীয় চরিত্রে এই ক্ষেত্রে জবর প্রভেদ সুতরাং "ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ" আর শিক্ষাদীক্ষা সব কিছুই ভারতবর্ষের জন্য আবিষ্কার করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই ভবঘুরেগিরি করিতে বাহির হইয়াছিলাম। তুনিয়ার জলস্থলনভোমণ্ডলের আর জীব-জন্তু-তরুলতার কতটুকু এই "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীতে দখল করিতে পারা গিয়াছে তাহার কথা স্বতন্ত্র। আকাঙ্ক্ষাটার কথা বলিয়া রাখিলাম মাত্র।

আগে একবার বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থাবলী এক বিপুল গ্রন্থের মালমশলা বা সূচীপত্র বিশেষ। সেই গ্রন্থ এই হাতে কোনো দিন লেখা হইবে কিনা জানি না। হয়ত যুবক বাঙ্‌লার কোনো কোনো গবেষক-পর্য্যটক এই ফরমায়েস ও সঙ্কেত মাফিক কাজ চালাইয়া বর্ত্তমান পর্য্যটকের অলিখিত গ্রন্থটা বাঙালী জাতিকে উপহার দিতে উৎসাহী হইবে।

বিশ্বশক্তিকে শক্তমুঠায় পাকড়াও করিবার উপর ভারতের আত্মিক, আর্থিক আর রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পূরাপূার নির্ভর করিতেছে। কাজেই "বর্ত্তমান জগৎ"সম্বন্ধে অনুসন্ধান-গবেষণা সাহিত্য-সংসারের বিলাস-সামগ্রী মাত্র নয়। বহুসংখ্যক উঁচুদরের বাঙ্গালী-মগজকে বিজ্ঞান সাধনার এই কর্ম্মক্ষেত্রে সমবেতরূপে মোতায়েন রাখিতে পারিলেই কাজ হাঁসিল করা সম্ভবপর হইবে।

নানা ঘাটের জল

১৯১৪ সনের এপ্রিল মাসে বোম্বাই ছাড়িয়াছিলাম। ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই ফিরিয়া আসিয়াছি।

এই সাড়ে এগার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত নানা ঘাটের জল খাইয়াছি আর "নানা বর্ণের ও নানা আশ্রমের" লোকজনের সঙ্গে জীবন

কাটাইয়াছি। স্বাধীন, পরাধীন, নিম-স্বাধীন সকল প্রকার জাতিই অভিজ্ঞতায় ঠাঁই পাইয়াছে। গরীব লোক, বড় লোক, মামুলি লোক, নামজাদা লোক, পথের কাঙাল হইতে রাজকুমার পর্য্যন্ত কোন লোকই নিবিড় আত্মীয়তার গণ্ডীতে বাদ পড়ে নাই।

সকলের সঙ্গে মেল-মেশেই পাইয়াছি মধুর ব্যবহার আর বন্ধুত্বের সম্বন্ধ। সর্ব্বত্রই, সকল সমাজেই, এমন কি বিলাতেও নরনারীর সঙ্গে লেনদেনগুলা অকপট সৌহার্দ্দ্য ও আনন্দের প্রতিমূর্ত্তিই ছিল।

কাজেই বিফলতা, নৈরাশ্য, দুঃখবাদ ও বুকভাঙ্গা বেদনার দর্শন আর যুক্তিশাস্ত্র এই লেখকের মজ্জায় বসিতে পারে নাই। জগতের নরনারীকে সস্নেহ চোখেই দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। আর পৃথিবীকে, খোলাখুলি, মোটের উপর, নানা দুঃখদারিদ্র্য-গোলামী-নির্য্যাতন-নিপীড়ন-হিংসা-পরশ্রীকাতরতা নিমকহারামি সত্ত্বেও,—সুখের আস্তানারূপে প্রচার করাই স্বধর্ম্মে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাই লিখিয়াছি,—

এই পৃথিবী স্বর্গ আমার
ছাড়্‌ব নাক' আমি এরে,
নয়া দুনিয়ার তল্লাসেও
দিল্ দিবনা ছেড়ে।
চাঁদের বুক জাঁকাল বটে,
হৃদয়ে নাই অগ্নিহার,
নাসায় বয়না প্রাণের নিঃশ্বাস
পোড়া পাহাড় মূর্ত্তি তার।
সূর্য্যালোকে দীপ্ত সে যে
ময়ূর পাখায় কাকের মতন,

ধরার যমজ বোন যদিও
চাঁদে বসেনা আমার মন।
'মার্স'-এ করছে জগৎ সৃষ্টি
'লোয়েল' বিশ্বামিত্র সম,
কলিকাল,—তাই এড়াচ্ছে সে
ত্রিশ দৃষ্টি নিরমম!
মার্স-এর উত্তর-দক্ষিণ মেরু
বরফ-চাপে রয় ঢাকা,
বসন্তে এই বরফ-গলা
জলেই সেথায় জীবন রাখা;
হাজার হাজার মাইল নাকি
খাল কেটেছে 'মার্স'বাসী,—
শস্যশ্যামল মহামিশর
গড়েছে সে 'মার্স'ঋষি!
প্রাণভরা এ খোলা বাতাস
পাব কি সেই 'মার্স'দেশে,—
দিবারাত্রি যখন তখন
স্বাধীন খেয়াল উঠলে হেসে?
প্রাণের খেয়াল মিটিয়ে তাই
মুক্ত নীলাকাশের তলে
সূর্য্যের আগুন বুকে করে'
থাকব আমি ধরার কোলে।

এই সাড়েএগার বৎসর ধরিয়া অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে যুবক ভারতের কর্ম্মক্ষেত্র ঢুঁড়িয়া বাহির করিতে সচেষ্ট

ছিলাম। ভারতাত্মার প্রতিনিধি স্বরূপ কোথাও বা এক টুকরা পাথর, কোথাও বা এক ছটাক সুরকি, কোথাও বা একটা কড়ি বা বর্গা, কোথাও বা একটা ছোট কুঁড়ে ঘর রাখিয়া আসিয়াছি। আজকাল এইদিকে অন্যান্যের দৃষ্টিও কিছু কিছু পড়িতেছে জগতের নানাস্থানে এইরূপ সমবেত চেষ্টায় একটা বর্ত্তমান যুগের "বৃহত্তর ভারত" গড়িয়া উঠিতেছে। এই "বৃহত্তর ভারতে"র সুদৃঢ় ইমারত তৈয়ারি করিবার জন্য যুবক বাঙ্‌লা হইতে দলে দলে প্রবাসাভিযান সুরু হউক। ভারত-সন্তান কোথাও নেহাৎ আত্মীয়-হীন বন্ধুবান্ধব-হীনরূপে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে না, এইরূপ বিশ্বাস করিবার মতন সাহস রাখি।

শিক্ষাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান

১৯০৫-৭ সনের আবহাওয়ায় সুরু করিয়াছিলাম "শিক্ষাবিজ্ঞান"-সাহিত্য। তাহার পরিকল্পনায় নব-প্রসূত যুবক বাঙ্‌লার উৎসাহ, ভাবুকতা ও সৎসাহস মূর্ত্তি পাইয়াছিল। ঘটনাচক্রে তাহাকে পরিণতির দিকে লইয়া আসিবার সুযোগ ও সময় জুটে নাই। অধিকন্তু এই বিশবাইশ বৎসরের ভিতর আসল কর্ম্মক্ষেত্রে সেই শিক্ষাবিজ্ঞানের যথোচিত যাচাইয়ের সুযোগ জুটিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। যাহাহউক, এই অসম্পূর্ণতার কথা সর্ব্বদা মনে পড়িতেছে।

তাহার পর ১৯১৩ সনে সংস্কৃত "শুক্রনীতি"র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত করি। তখন হইতে তুলনামূলক ইতিহাস, সমাজ-তত্ত্ব আর রাষ্ট্রনীতির নানা মহলে অনুসন্ধান-গবেষণা আর পঠন-পাঠন চলিতেছে। এশিয়ার আর ইয়োরামেরিকার একাল-সেকাল এক সঙ্গে আলোচনা করা এই সকল ইংরেজি, বাঙ্‌লা, ফরাসী ও জার্ম্মাণ রচনাবলীর উদ্দেশ্য।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া বিদ্যা-চর্চ্চাও সাহিত্যসেবার আর এক মুল্লুকে চলাফেরা করিতেছি। বোম্বাইয়ে নামবার পরই "ইণ্ডিয়ান্ ডেলি মেল" (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫; কাগজের প্রতিনিধিকে যে সব কথা বলিয়াছি, তাহার ভিতর এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ আছে। প্রথমতঃ আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড আজকালকার সাধনায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, ধনবিজ্ঞান আর আর্থিক জীবন-সম্পর্কিত গবেষণায় আর আন্দোলনেও প্রচুর সময় দিতে হইতেছে।

এই দুই ধারার কর্ম্ম বিদেশে থাকিতে থাকিতেই সুরু হইয়াছে। তাহার চিহ্ন "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেণ্ট" আর "পলিটিক্স্ অব বাউণ্ডারীজ" নামক দুই গ্রন্থ। দেখা যাউক এই দিকে কত দূর অগ্রসর হওয়া যায়।

১৯১৪ সনের গোড়ার দিকে যে বাঙ্‌লা দেশ দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় আজকার বাঙ্‌লা দেশ ঢের উন্নত, বিস্তৃত ও গভীর। বাঙ্‌লার নরনারী কর্ত্তব্যজ্ঞানে, কর্ম্মদক্ষতায়, ব্যবসা-বুদ্ধিতে, শিল্প-কর্ম্মে, বিদ্যাচর্চ্চায়, সাহিত্য-সেবায় অনেক দূর উঠিয়াছে। ১৯০৫।৭ সনের ভাবুকতায় যে সকল লক্ষ্য ও আদর্শকে আমরা আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা বিবেচনা করিয়া চলিতাম, তাহার কিছু কিছু আজ কার্য্যে পরিণত দেখিতেছি। বাঙালী জাতি এত বাড়িয়াছে যে, দুই বৎসরের ভিতরও এই ক্রমিক বৃদ্ধির সকল অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে খতিয়ান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইহা যারপর নাই আশাপ্রদ ও আনন্দের কথা।

বাঙালী আজ এক উচ্চতর ধাপে অবস্থিত। এই ধাপের জন্য জীবনের উচ্চতর আদর্শ ও লক্ষ্য আবশ্যক। আর সেই আদর্শ ও লক্ষ্য

মাফিক চিন্তা ও কাজ চালাইবার জন্য উচ্চতর সমালোচনা আর মাপকাঠিও আবশ্যক এই উচ্চতর আদর্শ, লক্ষ্য, সমালোচনা আর মাপকাঠির যুগেও আবার বঙ্গজননীর উপযুক্ত সেবক থাকিতে পারিলেই জীবন ধন্য বিবেচনা করিব।

কাশী, সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

বিদেশ-ফের্ত্তার অত্যাচার *

(১)

বিদেশে ভারত-সন্তানেরা যাহা কিছু করিয়াছেন বা করিতেছেন মাঝে মাঝে তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। সংবাদ হিসাবে এই সকল কৃতিত্বের বিবরণ প্রকাশ করা গিয়াছে। কোনো কর্ম্মবিশেষের সমালোচনা অর্থাৎ সু-কুর আলোচনা করা এই সকল বিবরণের উদ্দেশ্য নয়। বাস্তব ইতিহাসের তথ্য সঙ্কলনের তরফ হইতে লোকজনের নাম ও কাম একত্র করা হইয়াছে মাত্র। অবশ্য সকল পর্য্যটকের সকল প্রকার কথাই আমার নজরে পড়িয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে না।

কোনো ব্যক্তি-বিশেষের বা বিদ্যা-বিশেষের বা ব্যবসা-বিশেষের স্বপক্ষে টানিয়া এই সমুদয় সংবাদ সংগ্রহ করা হয় নাই। অধিকন্তু, কোনো দল-বিশেষের, জাতি-বিশেষের বা প্রদেশ-বিশেষের গুণ গাহিবার দিকেও লক্ষ্য ছিল না। কি পর্য্যটক, কি বেপারী, কি ছাত্র-ছাত্রী, কি গবেষক, কি বক্তা, কি লেখক, কি রাষ্ট্রনৈতিক প্রচারক,—সকলেরই বিদেশ-সংক্রান্ত জীবন-কথা ছুঁইয়া রাখিবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

(২)

সম্প্রতি দেশ হইতে নানাপ্রকার খবর পাইতেছি। কানাঘুষায় প্রকাশ যে,—আমাদের বিদেশ-ফের্ত্তারা দেশের উপর জুলুম

---

* এই প্রবন্ধ প্রথমবারকার বিদেশ-পর্য্যটনের শেষ রচনা, ইতালির বোল্‌ৎসানোর লেখা হইয়াছিল ১৯২৫ সনের জুন মাসে। তখনও দেশে কবে ফেরা হইবে অথবা শীঘ্র ফেরা হইবে কিনা ঠিক জানা ছিল না।

চালাইতেছেন। বাদশাহী-মেজাজে চোখ রাঙাইয়া জনসাধারণকে কাবু করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের চরিত্রে দেখা যাইতেছে।

"সকল" বিদেশ-ফের্ত্তা সম্বন্ধেই এইরূপ কুখ্যাতি রটিয়াছে এরূপ সন্দেহ করিবার বোধ হয় কারণ নাই। কিন্তু হয় ত বা কেহ কেহ, যে সকল ভারতবাসী বিদেশ দেখেন নাই তাঁহাদের উপর "চাল" মারিতেছেন। বিদেশফের্ত্তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইবার সময় নাকি অন্যান্যেরা কিছু ভয়ে ভয়ে চলিতে বাধ্য হন।

কথায় কথায় নাকি বিদেশফের্ত্তারা বিদেশের নজির দিয়া থাকেন। বিদেশ-প্রবাসের অভিজ্ঞতা, বিদেশী ভাষায় পাণ্ডিত্য, বিদেশী-বিদেশিনীদের সঙ্গে চিঠি-বিনিময়, বিদেশী পণ্ডিতদের সঙ্গে বন্ধুত্বের গল্প-গুজব,—ইত্যাদি তথ্যের জোরে বিদেশ-ফের্ত্তারা অন্যান্য নরনারীকে অপ্রতিভ ও "কানা" করিয়া ছাড়িতেছেন শুনিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের দেমাকও হু-হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে

প্রত্যেক প্রদেশে এবং বড় বড় সহরেই নাকি এইরূপ দুই চার দশ বিশজন বিদেশ-ফের্ত্তা "ধরাখানাকে সরা" জ্ঞান করিতে প্রলুব্ধ হইতেছেন। দেশ, ধর্ম্ম, বিদ্যা, ব্যবসা ইত্যাদি সকল বিষয়েই ইঁহারা একমাত্র "বোদ্ধা" এইরূপ ইঁহাদের বিশ্বাস। অন্যান্য নরনারী নাকি এই বোদ্ধাদের গরমে অস্থির। এ এক নূতন আপদ ও অত্যাচার।

(৩)

যাঁহারা বেদান্তবাগীশ এবং অহিংসা-ধর্ম্মী, তাঁহারা এই অবস্থায় হয় ত দেমাকী লোকজনকে ডাকিয়া হিতোপদেশ শুনাইতে প্রবৃত্ত হইবেন। তাঁহারা বোধ হয় বলিতে থাকিবেন:—"দেমাক করা কি ভাল? নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ। দেশের লোকেরা সকলেই ত ভাই ভাই এক

ঠাঁই। না হয় তুমি কিছু বেশীই বা জান, তাই বলিয়া অপরকে কি তুচ্ছ করিতে আছে? ছিঃ।" ইত্যাদি।

কিন্তু অহঙ্কারী লোকের চিত্ত বিশ্লেষণ করা বর্ত্তমান লেখকের মতলব নয়। অথবা দেশের নরনারীকে "রাগদ্বেষ-"শূন্য "সত্যযুগের" দেবদেবীতে পরিণত করিবার যন্ত্রপাতি লইয়া ঘাঁটা-ঘাঁটি করাও তাঁহার ব্যবসা নয়। যাঁহারা সুনীতি-কুনীতির চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহারা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। যদি লাভ হয়, ভালই।

তবে ভারতীয় বিদেশ-ফের্ত্তাদের ভিতর দেমাকী লোক আছেন,—এই তথ্যটা একমাত্র "নীতি", "ধর্ম্ম", "চরিত্রবত্তা" ইত্যাদির মামলা নয়। বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের লেন-দেন একটা অতি-বড় কাণ্ড। এই কাণ্ড ক্রমশই আরও বড় হইয়া চলিবে। কাজেই, বিদেশফের্ত্তাদের সঙ্গে অন্যান্য ভারতবাসীর যোগাযোগ একটা মস্ত প্রশ্ন। গোটা সমাজকে বা দেশকে এই সমস্যাটা এক বিস্তৃততর ও গভীরতর ক্ষেত্র হইতে সম্‌ঝিয়া দেখিতে হইবে। এই হিসাবে "নীতি," "ধর্ম্ম", "বেদান্ত", "হিতোপদেশ" ইত্যাদির ধান্ধা ছাড়িয়া দিলেও বিদেশফের্ত্তাদের লইয়া সকল ভারতবাসীরই কিছু কিছু মাথা ঘামানো আবশ্যক।

(৪)

"সেকালে" বিলাত-ফের্ত্তারাই ভারতের একমাত্র বা প্রধান বিদেশ-ফের্ত্তা ছিলেন। আজকাল ইয়োরামেরিকার সকল দেশ,—বস্তুতঃ দুনিয়ার প্রায় সকল দেশই ভারতীয় বিদেশ-ফের্ত্তাদের কিছু কিছু করিয়া কব্‌জায় আসিয়াছে।

আগেকার দিনে প্রধানতঃ ছাত্রেরাই ছিলেন বিদেশ-ফের্ত্তা।

আজকাল প্রায় সকল ব্যবসা এবং সকল বয়সের লোকই বিদেশ-ফের্ত্তা হইয়াছেন।

সেকালে বিদেশ-ফের্ত্তারা প্রধানতঃ হইতেন বড বড় সরকারী চাকরো বা ব্যারিষ্টার। তাঁহারা একঘরো হইয়া থাকিতেন এবং নিজেদের গণ্ডীর ভিতর একটা জাত গড়িয়া তুলিতেন। আজকাল চাকরো ছাড়াও অন্যান্য জীব বিদেশ-ফের্ত্তাদের ভিতর দেখা যায়। "বিদেশ-ফের্ত্তাদের জাত্‌" এখনো বোধ হয় কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়া থাকে। তবে সেই গণ্ডীর বিশেষত্ব অনেকটা ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে, বিশ্বাস করি।

এই সকল কথা ১৯১৫ সালের পরবর্ত্তী দশ বৎসর সম্বন্ধে প্রধানভাবে খাটে। ১৯০৫ সালের যুগে অবশ্য ভারতীয় বিদেশ-ফের্ত্তাদের এই নবযুগের সূত্রপাত।

(৫)

বিদেশ-ফের্ত্তারা অহঙ্কারী কেন হন? প্রথম কথা,—তাঁহারা টাকা রোজগার করেন কিছু মোটা হারে। যাঁহাদের বেতন পুরু তাঁহারা দেমাকী। "রুধিরের" দস্তুরই তাই, একালে সেকালে, স্বদেশে বিদেশে।

কিন্তু সকল বিদেশ-ফের্ত্তাই মোটা মাহিয়ানা পাইতেছেন কি বা উঁচুদরের স্বাধীন রোজগার করিতেছেন কি? কখনই না। যাঁহারা কোনো দিন বিদেশে পা মাড়ান নাই তাঁহাদের অনেকেই বিদেশ-ফের্ত্তাদের চেয়ে বেশী রোজগার করিয়া থাকেন। কাজেই, "তঙ্খার" তরফ হইতে বিদেশ-ফের্ত্তাদের দেমাকী হওয়া আহাম্মুকি।

(৬)

দ্বিতীয় কথা,—ভাষায় অভিজ্ঞতা। যাঁহারা আমেরিকা হইতে স্বদেশে ফিরিয়াছেন তাঁহারা বোধহয় ভাষার “জাঁক” করেন না। ফরাসী এবং জার্ম্মাণ তাঁহাদের কেহ কেহ হয়ত উচ্চতম শিক্ষালয়ে কিছু কিছু গিলিতে অভ্যস্ত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সকল ভাষায় “পাণ্ডিত্য” তাঁহাদের দেমাকের খোরাক জোগাইতে পারে না।

যাঁহারা বিলাতের বাহিরের ইয়োরোপে কিছুকাল কাটাইয়া গিয়াছেন তাঁহারা ফরাসী জার্ম্মাণ এবং ইতালিয়ান শিখিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কতখানি শিখিয়াছেন?

আমাদের দেশের বি, এ, বি, এস্ সি, এমন কি ইণ্টার্মীডিয়েট বা মাট্রিকুলেশ্যন ক্লাসে আমরা যতটুকু বা যতখানি ইংরেজি শিখি ততটুকু বা ততখানি ফরাসী, জার্ম্মাণ এবং ইতালিয়ান দখল করা কয়জন ভারতীয় বিদেশ-ফের্ত্তার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখার কথা। কথাটা খুলিয়া বলা আবশ্যক।

ইংরেজি ভাষার সাহায্যে ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালি ইত্যাদি দেশের গণ্যমান্য ঘাঁটিতে অনেক কাজই চলিয়া যায়। কাজেই ভারতীয় বিদেশ-প্রবাসীরা “সস্তায় যাহা সম্ভব” সেই দিকেই ঝুঁকিয়া থাকেন। মানুষ “সর্ব্বাপেক্ষা কম বাধার পথটা” ঢুঁড়িতেই অভ্যস্ত। নতুন নতুন ভাষা শিখিবার চেষ্টা চলিতে থাকে বটে, কিন্তু এই চেষ্টা বেশী দূর অগ্রসর হয় না।

(৭)

অধিকন্তু ভাষাগুলা দখল করা কঠিন। ইংরেজির সঙ্গে ফরাসীর কিছু কিছু যোগ আছে। কিন্তু ইংরেজির সঙ্গে জার্ম্মাণের একপ্রকার কোনো

যোগ নাই। আর ইতালিয়ানের সঙ্গে জার্ম্মাণের সম্বন্ধ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। ফরাসী ও ইতালিয়ানকে যদিও দুই ল্যাটিন "বোন" বলা হইয়া থাকে, তথাপি ফরাসী-জানা লোকের পক্ষে ইতালিয়ান পড়িতে হইলে প্রত্যেক লাইনে তিনবার করিয়া অভিধান খুলিতে হয়।

ভাষা-বিজ্ঞানের নজির দেখাইয়া, ব্যাকরণের তুলনা চালাইয়া, শব্দের সংখ্যা গুণিয়া ইংরেজি, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইতালিয়ান এই চার ভাষায় "বৈজ্ঞানিক আত্মীয়তা" প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। এ কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু ভাষা শিখিবার মেহনৎ যখন চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন বলিব যে, ইংরেজি-জানা ভারত-সন্তানকে অপর তিনটা ভাষার জন্য তিন তিনবার নতুন করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়।

ধরা যাউক, কোনো ব্যক্তি ফ্রান্সে দেড়, দুই বা তিন বৎসর কাটাইল। আর ফরাসী ছাড়া অন্য কোনো ভাষার দিকে সে নজর দিল না। তথাপি সে ফরাসী ভাষায় নির্ভুল চিঠি বা প্রবন্ধ লিখিতে পারিবে কি না সন্দেহ। আটপৌরে কথাবার্ত্তা চালান কঠিন নয়। কিন্তু যে হাটে দশ বারজন ফরাসী নর-নারী কোনো "অপরিচিত" বিষয়ে খোসগল্প চালাইতেছে সেই হাটে বসিয়া তাহাদের রসে যোগদান করা সহজ বিবেচিত হইবে না।

(৮)

তবে একমাত্র ভাষা শিক্ষা করাই যদি মতলব থাকে তাহা হইলে কথা স্বতন্ত্র। অথবা এমন কি, যদি ভারতীয় তরুণ-তরুণীর বয়স বিশ বাইশের বেশী না হয় এবং অন্যান্য কাজের চাপ কম থাকে তাহা হইলে নতুন দেশে বসবাসের ফলে বিদেশী ভাষাটা "রপ্ত" করা অসাধ্যসাধন বিবেচিত হইবে না। কিন্তু যে সকল ভারতবাসী ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সে বিদেশে আসেন এবং নানা ধান্ধা মাথায় লইয়া আসেন তাঁহারা দেড় দুই

বা এমন কি তিন বৎসরেও একটা বিদেশী ভাষায় "পণ্ডিত" হইতে অসমর্থ।

বিদেশী কাগজপত্র এবং কেতাব ঘাঁটিবার ক্ষমতা জন্মে সন্দেহ নাই। বিদেশী চিঠি পড়িয়া বুঝিবার ক্ষমতাও দেখা দেয়। কিন্তু বিদেশী ভাষায় *চিঠি লেখা অথবা প্রবন্ধ রচনা করিতে অগ্রসর হওয়া "পাপের ভোগ"* বিবেচিত হইতে বাধ্য। কথাগুলা সাধরণ ভাবে বলা হইতেছে। ব্যতিরেক আছে সন্দেহ নাই, তবে প্রত্যেক ব্যতিরেকেরই কোনো না কোনো "বিশেষ" কারণ দেখানোও সম্ভব।

এখন জিজ্ঞাস্য এই,—যে সকল ভারত-সন্তান স্বদেশে বসিয়াই ফরাসী, জার্ম্মাণ বা ইতালিয়ান এবং রুশ বা জাপানী পড়িতেছেন তাঁহারা বিদেশ-ফের্ত্তাদের চেয়ে "ভাষার অভিজ্ঞতা" হিসাবে কম কিসে? তাঁহারাও বিদেশী ভাষার কাগজপত্র এবং কেতাব ঘাঁটিবার ক্ষমতা রাখেন। বিদেশী ভাষার চিঠি পড়িবার ক্ষমতাও তাঁহাদের জন্মে। দরকার হইলে দুই চার দশ লাইন ফরাসী বা জার্ম্মাণ লিখিতে যে তাঁহারা অসমর্থ এরূপ বুঝিবার কোনো কারণ দেখি না। অবশ্য "কথা বলিবার" অভ্যাস তাঁহাদের নাই। কিন্তু ভারতে বসিয়া বিদেশী ভাষায় কথা বলিবার দরকারই বা পড়ে কখন্?

কাজেই ভাষা লইয়া বড়াই করা বিদেশ-ফের্ত্তাদের আর এক আহাম্মুকি। আর, সমাজের তরফ হইতেও বিদেশ-ফের্ত্তাদিগকে লইয়া নাচা-নাচি করা অবিবেচকের কার্য্য। দেশের নর-নারী এই কথাটা বুঝিলে বিদেশ-ফের্ত্তারা আপনা আপনিই "ঢিট" হইয়া আসিবেন।

(৯)

বিদেশী নরনারীরা ভারতে কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর কাটাইয়া স্বদেশে ফিরিবার পর ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন অথবা কেতাব লিখেন।

এই সকল কেতাব ও বক্তৃতা ভারতবাসীর পক্ষে অনেক সময়েই পছন্দসই নয়। সমালোচনার উপলক্ষ্যে আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি :—"লেখক বা বক্তা ভারতের তথ্য বেশী কিছু জানেন না। রেলে ষ্টীমারে ট্রামে বসিয়া আমাদের দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে যতটুকু দেখাশুনা যায় তাহার বেশী অভিজ্ঞতা এই সকল বিদেশী পর্য্যটকের নাই।" ইত্যাদি।

ভারতীয় বিদেশ-ফের্ত্তাদের বিদেশ-বিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও বিদেশী-বিদেশিনীরা ঠিক এইরূপ সমালোচনা করিতেই অধিকারী নয় কি? বাস্তবিক পক্ষে, ভারত-সন্তানদের ভিতর যাঁহারা বিদেশ-পর্য্যটন করিয়াছেন তাঁহারা বিদেশ-সম্বন্ধে কতখানি জানেন? এই প্রশ্নটা ভারতীয় সমাজে তলাইয়া মজাইয়া আলোচনা করা দরকার। এই দিকে আমাদের যথোচিত দৃষ্টি পড়ে নাই।

(১০)

আলোচনা করাও বড় সহজ নয়। যে সকল ভারতীয় বিদেশ-ফের্ত্তা বিদেশ-পর্য্যটনের ডায়েরি ছাড়িয়াছেন তাঁহাদের রচনা এই হিসাবে প্রধান সাক্ষী। ইংরেজি, বাংলা বা হিন্দীতে এই বিদেশ-সাহিত্য অল্পবিস্তর গড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু একমাত্র এই সাহিত্যের উপর নির্ভর করিলে বিদেশ-ফের্ত্তাদের প্রবাস-জীবন-সম্বন্ধে নেহাৎ কম পরিচয় পাওয়া যায়। যতটুকু পাওয়া যায় তাহাতে এই বুঝি যে, এই জীবন অতি অল্প পরিমাণ অভিজ্ঞতার ছাপ পাইয়াছে। আর এই অভিজ্ঞতার গণ্ডীও অতিশয় সঙ্কীর্ণ।

ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যে সকল অভিজ্ঞতা ঠাঁই পায় নাই সেই সমুদয় জানিবার উপায় পর্য্যটকদের সঙ্গে মৌখিক আলোচনা করা। কিন্তু হাজার হাজার

বেপারী, পর্য্যটক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতর কয়জনের সঙ্গেই বা "ভিতরকার কথা"-গুলা স্পষ্টাস্পষ্টি আলোচনা করা সম্ভব ?

যাহা হউক, চীনে, জাপানে, বিলাতে, আমেরিকায় এবং ইয়োরোপের নানা দেশে নানা শ্রেণীর এবং নানা জাতির ভারতীয় মোসাফিরদের সঙ্গে কমবেশী ছোঁআ-ছুঁআি করা গিয়াছে। দূর হইতেও কিছু কিছু লক্ষ্য করিবার সুযোগ জুটিয়াছে। অধিকন্তু, পরস্পর পরস্পরের চলাফেরা, লেন-দেন ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলাবলি করেন তাহারও কিছু কিছু কানে পৌঁছিয়াছে। তাহা ছাড়া নিজের দেখাশুনার দৌড় হইতেও অন্যান্য দশ বিশ জনের দৌড় সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ করা সম্ভব।

(১১)

ভারতীয় বিদেশ-ফের্ত্তারা বিদেশে প্রধানতঃ তিন মূর্ত্তিতে দেখা দেন। প্রথমতঃ—বেপারী, দ্বিতীয়তঃ—পর্য্যটক, তৃতীয়তঃ—ছাত্র। বিদেশী সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার ইত্যাদি সম্বন্ধে এই তিন শ্রেণীর লোকের কাহার কতটুকু বা কতখানি বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা জন্মিবার সম্ভাবনা ? ব্যতিরেকগুলা ছাড়িয়া দিতে হইবে বলাই বাহুল্য। আলোচনা করা যাউক।

বিদেশী বেপারীরা ভারতে গণ্যমান্য লোক। প্রথমতঃ, তাঁহারা বড় বড় ব্যবসার কর্ণধার ; কাজেই, পয়সাওয়ালা লোক। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা মুখ্যতঃ অথবা গৌণতঃ একটা উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার প্রতিনিধি।

কিন্তু বিদেশে ভারতীয় বেপারীদের ইজ্জৎ আছে কি ? এমন কি, জাপানেও তাঁহারা বড় বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক নন। ইয়ো-রামেরিকার দেশগুলার কথা ত স্বতন্ত্র। অধিকন্তু পয়সাওয়ালা ভারতীয়

বেপারী বলিলে বুঝিতে হইবে পার্শীদিগকে। কিন্তু পার্শীরা বিদেশে ভারত-সন্তান নামে পরিচিত কিনা সন্দেহ।

অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বিদেশীদের সঙ্গে "আফিসে" দেখা করেন। আফিসী জীবনের বাহিরে বিদেশী নর-নারীদের ধরণ-ধারণ কিরূপ তাহা দেখিবার সুযোগ প্রায়ই জুটে না। শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার, মহাজন, ফ্যাক্টরির মালিক ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব কায়েম করা কয়জন ভারতীয় বেপারীর পক্ষে ঘটিয়া উঠিয়াছে তাহা হয় ত আঙ্গুল গুণিয়া বলা যায়। এই শ্রেণীর বিদেশীদের পরিবারে প্রবেশ করা এক প্রকার অসম্ভব। বড় জোর,—কোনো রেষ্টরাণ্টে বা হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন বা চা পানের নিমন্ত্রণ ছাড়া মাখামাখির অন্য কোনো সুযোগ নাই।

তাহা হইলে,—ভারত-সন্তান বিদেশের কতখানি দেখিতে পান? যে হোটেলে বস-বাস করা হয় তাহার ঝি-চাকরাণী হইতেছে বিদেশী-সমাজের প্রধান নারী-প্রতিনিধি। রাস্তায় ঘাটে সন্ধ্যাকালে যে সকল বারাঙ্গনা ঘুরাফিরা করে তাহারা হয় দ্বিতীয় প্রতিনিধি। অধিকন্তু, সিনেমার এবং নাচঘরের দর্শক-মণ্ডলী বা নট-নটী ভারতীয় বেপারীদের পক্ষে বিদেশী-সমাজের অন্য এক বড় সাক্ষী।

(১২)

খাঁটি পর্য্যটক বা মোসাফির যাঁহারা, তাঁহারা কোনো শহরে পাঁচ সাত দিনের বেশী থাকেন না। যাঁহার যেমন পয়সার জোর তিনি সেইরূপ হোটেলে বা বাড়ীওয়ালীর ঘরে অতিথি হন। মিউজিয়াম দেখিতে যাওয়া কাহারও কাহারও সখ আছে। তাঁহারা এই সব দেখিয়া যানও। তবে "সহর দেখা" বলিলে বাগ-বাগিচা, বাড়ী-ঘর ইত্যাদি ভিতর বাহির হইতে যে-সব চিজ দেখা দরকার সেই সবের অনেকগুলা দেখা হইয়া

যায়। বিদেশী লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ সাধারণতঃ প্রায়ই জুটে না। কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব কায়েম করা ত অসম্ভব বটেই।

বিদেশের বড় বড় সহরে আজকাল দু'চার জন ভারতীয় নর-নারী প্রায়ই স্থায়ী বা কথঞ্চিৎ স্থায়িভাবে বস-বাস করেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা অনেক ভারতীয় পর্য্যটকের এবং বেপারীর পক্ষে সম্ভব। তাহাতে আগন্তুকদের সাহায্যও কিছু কিছু হয়। কিন্তু তাহাতে মোটের উপর ভারতীয় "আবহাওয়া"ই গুলজার।

আজকাল আবার সর্ব্বত্রই ছোট বড় "ভারতীয় সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নামজাদা ভারতীয় পর্য্যটক বা বেপারী কোথাও উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে এই সমিতির তরফ হইতে অভ্যর্থনা করা হয়। কখনো কখনো এই সকল সমিতির মারফৎ দু'চারজন বিদেশী-বিদেশিনীর সঙ্গে তাঁহাদের করমর্দ্দন ও বাক্য-বিনিময় করা ঘটিয়া উঠে।

(১৩)

তবে এই করমর্দ্দন ও বাক্য-বিনিময়ের সময় ভারতীয় বেপারী ও পর্য্যটকেরা বিদেশী-বিদেশিনীদের নিকট দেশের ইজ্জৎ নষ্ট করিয়া ছাড়েন। যে কোনো বিদেশীকে অদ্বিতীয় পীর বিবেচনা করা ভারত-সন্তানের স্বভাব। বিদেশীদের সঙ্গে ঘাড় খাড়া করিয়া কথা বলিতে আমাদের অধিকাংশই অসমর্থ। আমাদের নীচাশয়তা এবং গোলাম-চরিত্র দেখিয়া বিদেশীরা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতি নীচু ধারণা পোষণ করিতে শিখিয়াছেন। এ সংবাদটা যুবক ভারতের মহলে মহলে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

বিদেশীদের ভিতর যাঁহারা সত্য সত্যই নামজাদা বা কৃতিত্বশীল লোক

তাঁহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে দৈবক্রমে কোনো কোনো ভারত-সন্তানের মৌখিক আলাপ ঘটে না এমন নয়। কিন্তু সেই সকল ক্ষেত্রে আমরা একেবারে দিক্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি। তাঁহাদের পা চাটিতে লাগিয়া যাই। অনেক সময়ে—আমাদের প্রসিদ্ধ জননায়কেরাও নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়া বিদেশীর সঙ্গে সমানে সমানে লেন-দেন চালাইতে পারেন না। অতিমাত্রায় খোসামোদ, অতি-প্রশংসা ইত্যাদির দৌরাত্ম্যে ভারতীয় নরনারী বিদেশীদের চোখে যারপর-নাই ঘৃণ্য জীবে পরিণত হয়।

যে সকল বেপারী ও মোসাফির কিছু বেশী দিনের জন্য কোনো সহরে সময় কাটাইতে বাধ্য হন তাঁহারা বিদেশী লোকজনের ভিতর বন্ধু জুটাইতে পারেন কি? বলা কঠিন। আমাদের অধিকাংশ লোকই "রাহা খরচ" মাত্র সম্বল করিয়া বিদেশে আসিতে বাধ্য। কোনো মতে হোটেলের খরচ চালাইয়া দিনাতিপাত করিতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক!

বিদেশীদের সঙ্গে মাখামাখি করিতে হইলে পয়সা খরচ হয়। কোনো পরিবারে যদি কোনো ভারতীয় অতিথি নিমন্ত্রিত হন তাহাতে পরিবারের খরচ বেশী কিছু নয়। দশ জন খাইতেছে,—তাহার সঙ্গে আর একজন খাইলে হিসাব বাড়িয়া যায় না। কিন্তু কোনো ভারত-সন্তান যদি দুই একজন বিদেশী-বিদেশিনীকে নিমন্ত্রণ করিতে চাহেন তাহা হইলে খরচ বড় কম নয়। "ভদ্রলোকেরা" যে সকল হোটেলে বা রেষ্টরাণ্টে খায় সেই সকল জায়গা ছাড়া অন্য কোথায়ও নিমন্ত্রণ করা চলে না। কিন্তু এই সকল মহলে একবার পাঁচ সাত জনের নৈশ ভোজন দিতে হইলে ভারত-সন্তানের এক মাসের খরচ পুরাপূরি উজাড় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। কাজেই, বিদেশীদের সঙ্গে ভারত-সন্তানের "এলে গেলে কুটুম্ব" নীতি বজায়

রাখা অসম্ভব। ফলতঃ, বিদেশ সম্বন্ধে ভারতীয় বিদেশ-ফের্ত্তাদের অভিজ্ঞতাও যারপর-নাই অগভীর।

(১৪)

ছাত্র-ছাত্রীরা বিদেশী সমাজে কতদূর প্রবেশ করিতে পারেন? তাঁহারা প্রধানতঃ দুই বা তিন বৎসর বিদেশে থাকেন। প্রত্যেকের মাসিক বৃত্তি গড়পরতা দেড় শ,' দুই শ' বা আড়াই শ' টাকা। যাঁহারা "গবেষক" বা অধ্যাপক তাঁহাদের অবস্থাও এইরূপ।

এই টাকায় স্কুল-কলেজের বেতন দিয়া বাকী থাকে অতি সামান্য। তাহার সাহায্যেই খাওয়া-পরা চালাইতে হয়। এই খোরপোষ অতি নিম্নদরের হইতে বাধ্য। যে সকল "বোর্ডিং হাউসে" "ডর্মিটরি"তে বা ছাত্রাবাসে দরিদ্রতম লোকের সন্তানেরা থাকে আমরা তাহার উপরে উঠিতে পারি না। যে সকল রেষ্টর‍্যাণ্টে বা ভোজনালয়ে গাড়োয়ান এবং কুলীশ্রেণীর লোক খানাপিনা করে আমাদের দৌড় তাহার উঁচুতে নয়।

বৎসরে একবারের বেশী ভাল একটা থিয়েটার দেখা বোধ হয় অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কনসার্টে বসিয়া উচ্চতর সঙ্গীত শুনিবার সাধ হয়ত আমাদের অনেকেরই কিছু কিছু জাগে, কিন্তু "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।"

অর্থাৎ বেপারীরা এবং মোসাফিরেরা বিদেশী সমাজ সম্বন্ধে যতখানি বুঝিবার সুঝিবার সুযোগ পান ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সুযোগ তাহার চেয়ে অনেকটা কম। "বাড়ীওয়ালীর বেটী বা ঝি চাকরাণী" আর বাড়ীওয়ালীর "মাস্তুত বোন" এবং ঐ ধরণের অন্যান্য পাড়া-পড়সী ছাড়া আমাদের ছাত্রেরা বিদেশে অন্য কোনো শ্রেণীর লোকের সংস্রবে সাধারণতঃ আসিতে পান না। বিদেশ, বিদেশী সমাজ, পাশ্চাত্য আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা

হে সকল লম্বাচৌড়া বোলচাল ঝাড়ি তাহার পশ্চাতে বাস্তবিক অভিজ্ঞতা এই পর্য্যন্ত।

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যাপকদের "কেহ কেহ" ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ কায়েম করিতে অভ্যস্ত। এই সূত্রে অধ্যাপকের পত্নী, অধ্যাপকের বেটী, অধ্যাপকের শাশুড়ী বা মা ইত্যাদি দুএক জনের সঙ্গে বৎসরে দুএকবার করমর্দ্দনের সুযোগ জুটে। কিন্তু এই সকল সুযোগে বিদেশী-সমাজের "আটপৌরে" জীবন স্পর্শ করা সম্ভব নয়। অধ্যাপকের পরিবার বা আত্মীয় স্বজন ভারতীয় শিষ্যকে নিজ নিজ "পোষাকী" আদব-কায়দা দেখাইবার দিকে বেশী নজর দিয়া থাকেন। অধিকন্তু আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রায়ই অন্যান্য ভারত-সন্তানের মতন বিদেশীদের পদলেহন করিতে সুপটু। কাজেই মেলা-মেশার আসল বন্ধুত্ব গজিয়া উঠিবার সম্ভাবনা খুবই অল্প। কথাটা শুনাইতেছে খারাপ। কিন্তু যুবক ভারতে কঠোর আত্ম-সমালোচনার যুগ আসিয়াছে।

(১৫)

বিদেশ সম্বন্ধে বিস্তৃত এবং গভীর জ্ঞান লাভ করা ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। এই বিষয়ে ভারতীয় বিদেশ-ফের্ত্তারা আজ পর্য্যন্ত বেশী দূর অগ্রসর হইবার সুযোগ পান নাই। মোটামুটি এইরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অন্ততঃ এইরূপই আমার বিশ্বাস। গোঁজামিল রাখিয়া কথা বলিতেছি না।

ভারত-সন্তানকে বিদেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বা "বিদেশ-দক্ষ" রূপে গড়িয়া তুলিবার কৌশল ভারতে আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। সেই আলোচনায় সম্প্রতি মাথা ঘামাইব না। কেবল বুঝিয়া রাখা গেল যে আজ পর্য্যন্ত এই দিকে আমাদের ওস্তাদির মাত্রা খুব কম।

তবে যে সকল ভারত-সন্তান বিদেশ দেখিবার কোনো সুযোগ পান নাই তাঁহাদের চেয়ে বিদেশ-ফের্ত্তারা যে বিদেশ-সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞতা রাখেন সে কথা বলাই বাহুল্য। এই হিসাবে তাঁহারা যদি "দেমাকী" হন তাহা হইলে অন্য লোকের বলিবার কিছুই নাই। এই মাত্র বারে বারে মনে হইবে যে,—"নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

(১৬)

তথাপি প্রত্যেক বিদেশ-ফের্ত্তাকেই বাজাইয়া দেখা দরকার হইবে। প্রথম জিজ্ঞাস্য—তুমি কত দিন কোন্ দেশে ছিলে? সে দেশে কতজন লোকের সঙ্গে তোমার করমর্দ্দন এবং বাক্য-বিনিময় ঘটিয়াছে? তাহাদের কয়জনের ঠিকানা তুমি জানিতে বা এখনো জানো? একাধিকবার আলাপ-পরিচয় হইয়াছে কত জনের সঙ্গে? মেলমেশা ঘটিত তাহাদের বাড়ীতে না কোনো সার্ব্বজনিক ঠাঁইয়ে? তাহারা কোন্ কোন্ বয়সের এবং ব্যবসার লোক? ইত্যাদি।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য—তুমি বিদেশের কোনো মফঃস্বল দেখিয়াছ কি? ছোটখাটো সহরে অথবা পল্লীগ্রামে কয় রাত কাটাইবার সুযোগ জুটিয়াছে?

তৃতীয় জিজ্ঞাস্য—তোমার পরিচিত নর-নারীর ভিতর ইহুদির সংখ্যা ছিল কিরূপ? ইহুদিদের পরিবারে বা পারিবারিক ও সামাজিক মজলিসে খৃষ্টিয়ান অতিথি বা বন্ধু-বান্ধবের আগমন দেখিয়াছ কতবার? আবার খৃষ্টিয়ান পরিবারে ইহুদি নর-নারীর যাতায়াত লক্ষ্য করিয়াছ কি? ইত্যাদি।

(এইখানে জানিয়া রাখা দরকার যে—ইহুদিরা শিক্ষা-দীক্ষায় যত উঁচুই হউন না কেন, ইয়োরামেরিকান্ "সমাজে" তাঁহারা "অস্পৃশ্য"।

ইহুদিদের সঙ্গে মেলমেশ ঘটিলে "পাশ্চাত্য আদর্শ" বুঝা হইল এইরূপ বিবেচনা করা চলিবে না। অবশ্য খৃষ্টিয়ানদের ইহুদি-বিদ্বেষ ভারত-সন্তানকেও নকল করিতে হইবে এমন কথা হাস্যাস্পদ। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের "জাতিভেদ" যে অতি গভীর তাহা ভারতে জানিয়া রাখা আবশ্যক

(১৭)

বিদ্যা ... বক হইতে ভারতীয় বিদেশ-ফের্ত্তাদের দৌড় জরীপ করা যাউক। যে-সকল ভারতীয় বিদ্বান্ বিদেশে পা মাড়ান নাই, তাঁহাদিগকে এই বিদেশ-ফের্ত্তা পণ্ডিতেরা বিদ্যায় পরাস্ত করিতে পারিয়াছেন কি? বর্ত্তমান লেখকের মতে, পারেন নাই; অতএব বিদ্যার মজলিসে বিদেশ-ফের্ত্তাদের জাঁক করা আর এক আহাম্মুকি।

ভারতীয় জননায়ক ও শিক্ষা-সেবকেরা এই প্রশ্নটা কখনো তুলিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু তুলিয়া দেখা মন্দ নয়। আমি সম্প্রতি সংক্ষেপে দু'চার কথা বলিয়া যাইতেছি।

আমাদের ছাত্রেরা জাপানে, আমেরিকায়, বিলাতে, ফ্রান্সে এবং জার্ম্মানিতে যশস্বী হইয়াছে। অর্থাৎ জাপানী, মার্কিণ, ইংরেজ, ফরাসী এবং জার্ম্মাণ ছাত্রদের তুলনায় ভারতীয় শিক্ষার্থীরা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নয়, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে যে, গোটা ভারত হইতে ঝাটাইয়া একমাত্র সব্‌সে সেরা ছাত্রই বিদেশে পাঠানো হইয়াছে এরূপ বলা চলে না। উত্তম, মধ্যম, অধম অর্থাৎ সকল দরের মাথাওয়ালা ছাত্রেরই চালান বিদেশে গিয়াছে। আর বিদেশী মাপ-কাঠিতে উত্তমদের আসনে ভারতীয় উত্তমরা কল্কে পাইয়াছে, মধ্যমদের সঙ্গে টক্কর দিয়াছে ভারতীয় মধ্যমরা,

ইত্যাদি—ইত্যাদি। যুবক ভারত যে যুবক দুনিয়ার যে-কোনো জাতের সমকক্ষ তাহা বুঝিতে বিশ্ববাসীর আর বাকী নাই।

ইহার দ্বারা বুঝা গেল কি? এই যে,—যে-সকল ভারত-সন্তান কোনোদিন বিদেশে যাইয়া বিদেশী-বিদেশিনীদের সঙ্গে টক্কর দিবার সুযোগ পায় নাই, তাহারাও প্রকারান্তরে বিশ্বশক্তির কর্ম্মক্ষেত্রে কোনো হিসাবে পশ্চাদ্‌পদ নয়। প্রায় যে-কোনো ভারত-সন্তানের 'মাথা', যে-কোনো বিশ্ববাসীর মাথার সমান,—অবশ্য উত্তম, মধ্যম, অধম ইত্যাদি শ্রেণী-বিভাগ মনে রাখিতে হইবে।

কিন্তু ইহার দ্বারা এইরূপ প্রমাণিত হয় কি যে,—বিদেশ-ফের্ত্তা ছাত্রেরা স্বদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্বানদের চেয়ে উঁচু? কখনই নয়। বিদেশ-ফের্ত্তারা যুবক-ভারতের প্রতিনিধিরূপে বিদেশে থাকিবার সময় স্বদেশের ইজ্জৎ বাড়াইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু একমাত্র তাহার জোরে যুবক-ভারতের অন্যান্য লোক হইতে তাঁহারা উন্নততর মাথার পরিচয় দিয়াছেন এরূপ বলা চলিবে না। যাঁহারা ছাত্র হিসাবে বিদেশে গিয়া বিদেশ হইতে ডিগ্রী লইয়া ফিরিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই এখানে বলা হইতেছে।

(১৮)

মাথার ভিতরকার "ঘী" বা মগজটা মাপা সোজা কথা নয়। প্রথমতঃ, আমরা যাহাকে বিদ্যা বলি তাহার অধিকাংশই মেহনৎ। আসল মগজের বা ঘীর হিস্যা বিদ্যার মুল্লুকে বেশী নয়।

দ্বিতীয়তঃ,—বিদ্যার সংখ্যা অগণিত। আর প্রত্যেক বিদ্যারই শাখা-প্রশাখা অজস্র। এইগুলার ভিতর কোন্‌টায় কতখানি মেহনৎ লাগে আর কোন্‌টায় কতখানি মগজ লাগে, তাহা বিশ্লেষণ করিতে হইলে

পর্ব্বত-প্রমাণ বিদ্যায় দখল থাকা চাই। বলা বাহুল্য, সেই দখল এই লেখকের কেন ?—কোনো ব্যক্তিবিশেষরই নাই। তবে যে-যে বিষয়ে কোনো জ্ঞান নাই তাহার কোনো কোনটা সম্বন্ধে ওস্তাদদের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি।

এমন কতকগুলা বিদ্যা ও বিদ্যার শাখা-প্রশাখা আছে, যে সম্বন্ধে ভারতে উচ্চ শিক্ষার বা এমন কি মামুলি শিক্ষারও আয়োজন নাই। এইগুলার যে-যেটা ভারতীয় বিদেশফের্ত্তারা বিদেশে থাকিবার সময় শিখিয়া গিয়াছেন সেই সকল বিষয়ে তাঁহারা অন্যান্য ভারত-সন্তানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ,—বলাই বাহুল্য। নতুনের ইজ্জৎ আছেই আছে।

কিন্তু আসল প্রশ্ন বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অন্যরূপ। যে-যে বিদ্যা বা বিদ্যার শাখা ভারতে শিখা সম্ভব সেই সকল বিষয়ে বিদেশ-ফের্ত্তারা অন্যান্য ভারতীয় বিদ্বানকে হারাইতে সমর্থ হইয়াছেন কি ? এই সম্বন্ধেই প্রথমে বলিয়া রাখিয়াছি,—হন নাই।

গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষা-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প-শাস্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভারতীয় বিদ্বানেরা আজকাল গবেষণা করিতেছেন, প্রবন্ধ ছাপিতেছেন, বই লিখিতেছেন। এই সকল গবেষণা, অনুসন্ধান, "রিসার্চ্চ" এবং ছাপাছাপি কাণ্ডে বিদেশ-ফের্ত্তারা অন্যান্যদের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর লোক নন। হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে,—স্বদেশে বসিয়াই ভারতীয় বিদ্বানেরা দেশে-বিদেশে যাহা কিছু ছাপিয়াছেন তাহার তুলনায় বিদেশী "ডিগ্রীওয়ালা"দের কাজকর্ম্ম অতি-কিছু নয়। বিদেশ-ফের্ত্তা ছাত্রদিগকে মাথায় করিয়া নাচিতে থাকিলে যুবক-ভারত নিজকে বেআকুব সপ্রমাণ করিয়া ছাড়িবে মাত্র। ব্যতিরেকগুলার কথা বলিতেছি না।

(১৯)

তবে কি বিদেশে লেখাপড়া শিখিবার কোনো দরকার নাই?— খুবই আছে। নতুন নতুন বিদ্যা এবং বিদ্যার শাখা-প্রশাখা দখল করিতে হইলে বিদেশে আসিতেই হইবে। তাহা ছাড়া যে সকল বিদ্যা ভারতেই দখল করা সম্ভব সেই বিষয়েও অনেক "নতুন কিছু" বিদেশে আছে, তাহার জন্যও "যথা সময়ে" বিদেশে আসা আবশ্যক।

"বাঘা-বাঘা" অধ্যাপক বিদেশের নানা সহরে আছেন অনেক। "বাঘা-বাঘা" কাহাকে বলে? তাঁহারা প্রত্যেকে দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ, শ', দেড়শ' তরণ-তরুণীকে একসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে "রিসার্চ", অনুসন্ধান, গবেষণা, আবিষ্কার ইত্যাদির কাজে মোতায়েন রাখিতে সমর্থ। এত ভিন্ন ভিন্ন দিকে মাথা খেলানো যে-সে লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। লড়াইয়ের মাঠে বড় বড় সেনাপতি বা নৌ-নায়কের যে দায়িত্ব বিদ্যার লাইনে "বাঘা-বাঘা"দের সেই দায়িত্ব,—খানিকটা ঐরূপই বুঝিতে হইবে।

আর এক কথা, "বাঘা-বাঘা"রা সপ্তাহে সপ্তাহে এবং মাসে মাসে নতুন নতুন অনুসন্ধান চালাইতে চালাইতে পাকিয়া উঠিয়াছেন। প্রত্যেক সপ্তাহের এবং প্রত্যেক মাসের কাজ ও চিন্তাগুলা লইয়া অন্যান্য সমকক্ষ পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কদ্বন্দ্ব চালানো তাঁহাদের জীবনের আসল অভিজ্ঞতা। খোলা মাঠের সমালোচনা হজম করিয়া করিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাঁচ-ঘা লাগাইয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর তরফ হইতে সাত ঘুঁসা খাইয়া তাঁহারা মজবুত হইয়াছেন।

এই ধরণের "বাঘা-বাঘা" পণ্ডিত ভারতে কয়জন আছেন? গুণিতে সুরু করিলেই দেখিব যে, যুবক-ভারতকে বিদ্যার লাইনে পাকাইয়া তুলিতে হইলে একমাত্র ভারতীয় বিদ্যাপীঠের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না।

বিদেশী "বাঘা-বাঘা"দের সঙ্গে গা-ঘেঁশা-ঘেঁশি করিবার সুযোগ পাওয়া যুবক-ভারতের অধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বাঞ্ছনীয়। কেবল বাঞ্ছনীয় নয়,—নেহাৎ আবশ্যক।

ভারতে বসিয়া তরুণ-তরুণীরা "ভূঁইফোড়" পণ্ডিত হইতেছেন। অধ্যাপকদের আসল সাহায্য ভারতে জুটে না। কেন না যথার্থ অধ্যাপক-পদবাচ্য লোক ভারতে বিরল। তাহা সত্ত্বেও যুবক-ভারত অনেক কিছু করিয়া দেখাইয়াছে। "বাঘা-বাঘা"দের আবহাওয়ায় ছয় মাস দেড় বৎসর দুই বৎসর কাটাইতে পারিলে আরও অনেক কিছু দেখাইবার অধিকারী হইতে পারিবে। ভারতে আজকাল যাঁহারা গুরুগিরি করিতেছেন, তাঁহাদের "বাঘা-বাঘা"য় পরিণত হইতে এখনো পনেরো বিশ বৎসর দেরী। পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোনো বিদেশী পণ্ডিত সাধারণতঃ "বাঘা-বাঘা" বিবেচিত হন না।

তার পর আর এক কথা,—গ্রন্থশালা তৈয়ারী করিতে লাগে লাখ লাখ টাকা। সেই পরিমাণ টাকা দরকার হয় ল্যাবরেটরি গড়িবার জন্য মিউজিয়াম, চিত্রশালা ইত্যাদিও লাখ লাখ টাকার মামলা। এই সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের কর্ম্মকেন্দ্র ভারতে দশ বিশ ত্রিশ বৎসরের ভিতর মাথা তুলিতে পারিবে কি? সেইরূপ বিশ্বাস করিবার কোনো কারণ দেখিতে পাইতেছি না। অথচ বিদেশে এই সকল প্রতিষ্ঠানের ছড়াছড়ি। এইগুলা হইতে সম্পদ লুটিবার জন্যও যুবক-ভারতকে দলে দলে "দিগ্‌বিজয়ে" বাহির হইতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের "বৃহত্তর ভারত" অনেক সময়ে এই মূর্ত্তিতেই দেখা দিবে।

(২০)

দেখিতেছি, দেমাকী হওয়ার পক্ষে বিদেশ-ফের্ত্তাদের আসল কোনো কারণ নাই। কিন্তু দেমাকী হাওয়াটা কোনো যুক্তিযুক্ত কারণের উপর

নির্ভর করে কিনা সন্দেহ। যে ব্যক্তি অহঙ্কারী এবং অত্যাচারী হইবে অথবা নিজকে হাম্‌-বড়া বিবেচনা করিবে বাহির হইতে তাহাকে বাধা দেওয়া হয়ত কঠিন। কোনো প্রকার তর্কশাস্ত্র বা বিজ্ঞান তাহার মুগুর নয়।

দেমাকের আধ্যাত্মিক কারণ যাহাই হউক তাহার ভৌতিক কারণ অতি সোজা। যাহা অন্যের নাই যদি তাহা তোমার থাকে তাহা হইলে তুমি অন্য হইতে স্বতন্ত্র। এই "পার্থক্য" তোমাকে অন্যান্য লোক হইতে "উচ্চতর" বিবেচনা করাইবার পথে ঠেলিয়া তুলিতে পারে। এই ধরণের স্বতন্ত্রতা এবং পার্থক্যসূচক দাগ যাহাদের গায়ে আছে তাহারা সহজেই অ-দাগীদিগকে অবজ্ঞা করিবার দিকে অগ্রসর হয়।

দেমাকী লোকের-দেমাক ভাঙিবার দাওয়াই তবে কি? "বিষস্য বিষমৌষধম্।" দেশের ভিতর অনেকগুলা দেমাকী লোক সৃষ্টি কর। ইহাই হইতেছে চরিত্র-চিকিৎসার চমৎকার ব্যবস্থা। গীতা-বেদান্তের হিতোপদেশ একদম নিষ্প্রয়োজন। চাই কেবল গণ্ডা-গণ্ডা, ডজন-ডজন, শতশত দাগওয়ালা স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট পার্থক্যশীল নর-নারী। তাহা হইলে, দাগীদের আর কোন দাম থাকিবে না।

যতদিন বড় বড় সহরে দু-চার দশজন মাত্র বিদেশফের্ত্তা "সবে ধন নীলমণি"রূপে "হংসমধ্যে বকো যথা" বিচরণ করিবেন ততদিন "পার্থক্য" ইত্যাদি স্পষ্ট থাকিতে বাধ্য। ততদিন বুঝিয়া না বুঝিয়া মামুলিরা বিদেশ-ফের্ত্তার কদর করিবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু যদি প্রত্যেক জিলায় আর মহকুমায় বিদেশ-ফের্ত্তা ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য লোক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে তাহা হইলে প্রত্যেকেরই "গোমর ফাঁক" হইয়া যাইবে। কেহ কাহারও দিকে তাকাইবে না, তাকাইবার

অবসরই পাইবে না। বিদেশ-ফের্ত্তারা যে একটা আল্‌গা জাত সে কথাই সমাজ ভুলিয়া যাইবে। চাই এখন হাজার হাজার বিদেশ-প্রবাসী ভারতীয় গবেষক, পর্য্যটক, অনুসন্ধানকারী নর-নারী। একমাত্র খাঁটি ছাত্রের কথা বলা হইতেছে না—চাই বহুসংখ্যক সকল বয়সের এবং সকল ব্যবসার বিদেশ-ফের্ত্তা।

তখনও যদি কোনো বিদেশ-ফের্ত্তা দেমাকী থাকিতে চাহেন তবে একমাত্র নিজের ল্যাজ নিজে কামড়াইয়া মরা ছাড়া তাঁহার আর কোনো গতি থাকিবে না।

"আমার নাম ১৯০৫ সন,—
আমার নাম যুবক এশিয়া" *

এই এলাহি কারখানার ভিতর আমি যদি দুএকটা বেয়ারা বেফাঁস কথা বলে ফেলি তা হলে কিছু মনে কর্‌বেন না। স্বভাব বদলান কঠিন। তারপর ভাষার উপর জোর রাখা আরো কঠিন। অশুদ্ধ ভাষায় কথা বল্‌তে গিয়ে যদি দোষের কিছু হয় ভাব্‌বেন না আমি দূষণীয় কিছু বল্‌ছি।

কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতার বাইরে

আপনারা আমাকে যা শুনালেন এজন্য যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তাহলে হয়ত মনে কর্‌বেন লোকটা কি বেয়াক্কেল,—যা কিছু প্রশংসা হল সব বেমালুম কোৎ করে গিলে ফেল্লে। আর যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করি তাহলে মনে করবেন লোকটা নিমকহারাম। এই অবস্থায় আমি শুধু বল্‌তে চাই যে, কৃতজ্ঞতা আর অকৃতজ্ঞতা নামক যে বস্তু তার বাহিরে আমি রয়েছি। লড়াইএর যুগে একখানা জার্ম্মাণ বই দুনিয়ায় নামজাদা হয়েছিল। তার ইংরেজি নাম "বেঅণ্ড গুড্‌ অ্যাণ্ড ঈভ্‌ল্‌"। লেখক নীট্‌শে। "ভাল আর মন্দ, এ দুইএর বাইরে" একটা জিনিস যদি কল্পনা

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক অনুষ্ঠিত (১৮ এপ্রিল, ১৯২৭) সম্বর্দ্ধনার উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারমর্ম। শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী। পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য)।

করা সম্ভব হয়, তা'হলে তারি জুড়িদার হচ্ছে এমন ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থা যেটা "কৃতজ্ঞতা আর অকৃতজ্ঞতা নামক দুই পদার্থের বাইরে।"।

যুবক বাঙলার চাকর আমি

ব্যাপার এই,—যারা আমাকে খেতে পরতে দেয় আমি তাদের নিন্দা করি। আর মজার কথা হচ্ছে এই যে, তাদের নিন্দা করি বলেই তারা আমাকে খেতে পরতে দেয়। এই ধরণের বেদান্তবাগীশ হওয়া কিছু বিচিত্র বটে। কারণটা কিন্তু অতি সোজা। আমার ব্যবসা কিছু বিচিত্র রকমের। আমি চাকর। বাঙ্গালী জাতির, যুবক বাংলার চাকর আমি। চাকরের ব্যবসা মনিবের অভাব পূরণ করা, অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করে দেওয়া। আমি ঝাড়ুদার, জঞ্জাল ঝাঁটিয়ে সাফ করবার জন্য দেশ আমাকে বাহাল করেছে। কাজেই দেশের নিন্দা করাটা আমার পেশাগত মজ্জাগত কর্ত্তব্য বিশেষ। দেশের দোষ, দেশের অসম্পূর্ণতা, দেশের দুঃখ, দেশের দারিদ্র্য, দেশের দৈন্য সম্বন্ধে সজাগ থাকা আর দেশের লোককে সজাগ করে দেওয়া আমার অন্নবস্ত্র বিশেষ। আমি ঝাড়ুদার,—অতএব নিন্দনীয় বর্জ্জনীয় কোন্ কোন জিনিষ আছে তার তালিকা আমার কাছে বড় জিনিষ। আমি বেশ বুঝি যে, আমার দেশ বড়, বড় হচ্ছে, বড়'র পর আরো বড় হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বেশ বুঝি যে, দেশ যতই বড় হউক না কেন, ফরাসী আমাদের চেয়ে বড় রয়েছে, জার্ম্মাণ আমাদের চেয়ে বড় রয়েছে, জাপানী আমাদের চেয়ে বড় রয়েছে, আর বাঙ্গালীর চেয়ে ইংরেজ বড় ত বটেই। আমি চাকর, আমি ভাবছি যুবক বাংলার যে যে জায়গায় দৈন্য আছে, দোষ আছে, দারিদ্র্য আছে, সেই সেই জায়গায় প্রতিমুহূর্ত্তে আমার নতুন নতুন কর্ত্তব্য বাড়ছে।

কাজেই বল্‌ছি কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতা নামক বস্তু আমার বিশ্বকোষে দাঁড়াতে পারে না।

এই চাকরী আমি কর্‌ছি ২০।২২ বৎসর ধরে। আমিই অবশ্য বাঙলার একমাত্র চাকর নই, আরো হাজার হাজার এই ধরণের চাকর রয়েছে। সম্প্রতি শুধু আমার নিজের কথা বল্‌ছি। দরকার যখন হল, খালি গায়ে, খালি পায়ে, মুদীর দোকানে বসে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে, যে বাঙালী ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌ছে তাকে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার সম্বন্ধে বই পড়ে শুনিয়েছি। যেমন লোকে রামায়ণ পড়ে শুনায়, মহাভারত পড়ে শুনায়, সেইরূপ ম্যালেরিয়া বা সমবায় সম্বন্ধে বই পড়ে শুনিয়েছি। অথবা লোক বাহাল করে', "কথক" লাগিয়ে এই ধরণের পুঁথি পাঠের ব্যবস্থা কায়েম করেছি। এ একপ্রকার জ্যান্ত চলন্ত-পাঠাগার বা লাইব্রেরী বিশেষ। দরকার হল, নতুন বীজের তরীতরকারী পাড়াগাঁয়ে সুরু করা গেল। অথবা সুরু করার জন্য ব্যবস্থা করা হল। কোথাও এক কাঁচ্চা সংস্কৃত, কোথাও এক ছটাক ইতিহাস, কোথাও এক পোয়া ভূগোল এই ধরণের সওদা নিয়ে পাঠশালা চালিয়েছি। আবার কোথাও বা দরকার মাফিক "নাইট ইস্কুল" করা গেল.

আমার নাম যুবক এশিয়া

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ঘটনাচক্রে সস্তায় কিস্তী পেয়ে হাজির ঈজিপ্টের কায়রো নগরে। তারপর লণ্ডনে, নিউইয়র্কে, স্যানফ্রান্সিস্‌কোয়, হনুলুলুতে, জাপানে, কোরিয়ায়, মঙ্গোলিয়া-মাঞ্চুরিয়ায়, চীনে। সব জায়গায় চলেছি, ঘুরেছি, ফিরেছি বাংলার চাকর হিসাবে, যুবক বাংলার সেবক হিসাবে। ইংরেজেরা ইয়াঙ্কিরা জিজ্ঞাসা করেছে "কিরে! তোর নাম কি?" বলেছি "আমার নাম ১৯০৫ সন"। তারা

বলেছে "এ তো হেঁয়ালী।" কাজেই বিলাতী মার্কিণ সমাজের কোথাও কোথাও সোজা কথায় বলেছি,—"আমার নাম যুবক ভারত।" তারপর বৎসর দেড়ত্তই জাপানের পল্লীতে পল্লীতে, চীনের পল্লীতে পল্লীতে, কোরিয়ার পল্লীতে পল্লীতে, মাঞ্চুরিয়ার পল্লীতে পল্লীতে চাষীর সঙ্গে, মজুরের সঙ্গে, মেথরের সঙ্গে, পণ্ডিতের সঙ্গে, মন্ত্রীর সঙ্গে, মান্দারিণের সঙ্গে, ব্যবসাদারের সঙ্গে, চিত্রশিল্পীর সঙ্গে মাখামাখি করে প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে আবার ফিরে এলাম। এবার ইয়াঙ্কিস্থানের লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করেছে, "কি নাম তোর ?" বলেছি "আমার নাম যুবক এশিয়া।"

তারপর ফরাসী, জার্ম্মাণ, অষ্ট্রিয়ান, সুইস বা ইতালিয়ান চাষী, মজুর, পণ্ডিত, ব্যবসাদার, চিত্র-শিল্পী, কবি, বিজ্ঞানবীর ইত্যাদি লোক যখন জিজ্ঞাসা করেছে, "কি নাম তোর ?" বলেছি "আমার নাম যুবক এশিয়া।"

সেই ১৯০৫ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত চলেছি যুবক বাংলার সেবক হিসাবে। সব চাকর সমান নয়; কর্ম্মদক্ষতা, গুণপনা সব চাকরের সমান হতে পারে না। আমার কোন গুণপনা আছে কিনা, কর্ম্মদক্ষতা আছে কিনা সে সব জরীপ করবার অবসর আমার কখনও জুটে নি আর জুটবেও না। কেননা আমার মন্ত্র মাত্র এক—

"যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল তোমারি কার্য্য সাধিবে।" তাই আমার আর-কিছু জানবার দরকার হয় না। এমন কি, আমি কি পারি, কি না পারি তা পর্য্যন্ত বুঝে দেখবার অবসর পাই না।

১৯০৫ সনের বাণী

বিদেশীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে,—"কিহে বাপু, মতলব কি ?" "আমি কি জন্য এসেছি ?" বলেছি, "আমি এসেছি লড়াই করতে, শক্তি

পরখ কর্‌তে, শক্তিমানদের দৌড় দেখ্‌তে। 'হাত-পার জোরে মাথার জোরে শক্তিমানেরা পূজা পায়' এই হচ্ছে আমার আর এক মন্তর। আমি রয়েছি যুবক বাংলার এক অতি সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, এস হাতাহাতি করি, পাঞ্জা কশাকশি করি।" ইংরেজ-ফরাসী-জাপানী-জার্ম্মাণ সকলে বলেছে "তাইত এ লোকটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গই বটে। ১৯০৫ সন ছাড়া আর কিছু বলে না।"

১৯০৫ সনটা কি? সেটা এই। উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, কর্ম্মদক্ষতা, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন—সকল বিষয়ে দুনিয়া চলেছিল একমুখো হয়ে। তা হচ্ছে এশিয়ার নির্য্যাতন আর দুনিয়ায় ইয়োরামেরিকার একাধিপত্য-বিস্তার। তার বিরুদ্ধে যখন একটা নবশক্তি জেগে উঠ্‌ল—মাঞ্চুরিয়ার পোর্ট আর্থার যার এক খুঁটা, —বাঙ্গালীর জীবন-সংগ্রামেও তার একটা কণা ছিট্‌কে এসে পড়েছিল। সেই জীবন-কণার সোআদ বিতরণ করাই আমার মতলব। রকম সকম দেখে মার্কিণদের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, গোটা দুয়েক ফরাসী আকাদেমী, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি নানা লোকে ডেকে এসে বল্লে,—"আয়, দিচ্ছি আসন পেতে। বকে' যা যুবক এশিয়ার বাণী।" তা ছাড়া জগতের কতকগুলা নং ১ শ্রেণীর মাসিক, ত্রৈমাসিক বা পরিষৎ-পত্রিকা আমাকে আমার বক্তব্য আওড়ে যাবার অধিকার দিয়েছে। সর্ব্বত্রই চালিয়েছি হাতাহাতি আর মারামারি।

আপনারা জানেন আমার বিদ্যাবুদ্ধি বেশী কিছু নাই। রেল গাড়ীতে, ষ্টিমারে, গাধার পিঠে, রাস্তায় রাস্তায় টহল মেরে, লোকজনের সঙ্গে গা ঘেঁশাঘেঁশি করে দুচারটা কথা শিখেছি মাত্র। তা সত্ত্বেও বিদেশের গলিঘোঁচে,—বাঙ্গালী জাতির যে যেখানে যা কিছু কর্‌ছে—নামজাদা

হউক বা অতি নগণ্য হউক (বড় লোক সবাই নয়),—সকলকেই হিড় হিড় করে টেনে উঠাতে চেষ্টা করেছি। আমি 'বন্দেমাতরম্"এর তিলক কেটে গোটা ভারতকে ঘাড়ে করে নিয়ে ফিরেছি। দুনিয়ার সকলকে শুনিয়েছি,—আমাদের ছোকরারা এই কাজ কর্‌ছে, পণ্ডিতেরা এই কাজ কর্‌ছে, অমুক পরিষদ্ এই কাজ করেছে। যুবক বাঙ্‌লার আর যুবক ভারতের বিজ্ঞান-সভা, সাহিত্য-সভা, শিল্প-আন্দোলন, স্বরাজ-আন্দোলন, মজুর-আন্দোলন ইত্যাদি কিছুই আমার বিদেশী বোলচালে, বক্তৃতায় বা প্রবন্ধরচনায় বাদ পড়েনি। এই ভাবে দুনিয়ার সর্ব্বত্র লেখাপড়া চালিয়েছি। আমার বিশ্বাস,—আমি কোথাও আমার জাতির আমার স্বদেশের ইজ্জত মারিনি। এমন কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়াইনি যেখানে আমাকে ঘাড় হেঁট করে চল্‌তে হয়।

বিদেশীর সামনে ঘাড় সোজা রাখা

আমি বুঝিয়েছি বাংলা দেশের ঘাড়ে, ভারতবর্ষের মাথার উপর বিরাজ করে হিমালয় পাহাড় আর তার ঘাড় কখনো নুইয়ে পড়ে না। আমার চলাফেরায় আর কথাবার্ত্তায় লোকজন বুঝেছে যে, ১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী যুবক বাঙ্‌লায় এমন লোক আছে যারা বিদেশীদের সঙ্গে ঘাড় সোজা রেখে বোলচাল চালাতে অভ্যস্ত। তারা বুঝতে পেরেছে যে, দুনিয়ার যে-কোনো লোকের সঙ্গে যখন তখন যুক্তিশাস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর নব্য ন্যায়ের আখড়ায় পাঞ্জা কষবার জন্য যুবক বাংলায় মানুষ পায়দা হয়েছে। পণ্ডিতের বৈঠকে, বিজ্ঞান-পরিষদের পত্রিকায়, অন্যান্য মহলে এই টুকু বুঝান আমার কাজ।

আমি বলেছি এই যে, আমাদের এই জঙ্গলী বাংলা দেশ আজ রোদে-পোড়া আধপেটা-খাওয়া বাঙ্গালী জাতের বাসস্থান। কিন্তু এমন

কি দেড়শ দুশ বৎসর আগেকার বাঙালীরাও যে সকল মন্দির-দেউল-ইমারত খাড়া করে গেছে, সে সব এখন পর্য্যন্ত আজও পরাক্রমের প্রতিমূর্ত্তিরূপেই দাঁড়িয়ে আছে। সে সব যারা দেখ্‌বে তারা কখনো ভাব্‌তে পার্‌বে না যে, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী বাস্তুশিল্পীরা যে সকল সৌধ কায়েম করে গেছে, সেকালের জার্ম্মাণরা তার চেয়ে বেশী কিছু করেছিল। সেকালের ভারতসন্তান, সেকালের হিন্দুজাতি সমসাময়িক দুনিয়ায় অন্য কোনো জাতের চেয়ে শক্তিযোগে, সাংসারিক জ্ঞানে, বৈষয়িক সাধনায় কম ওস্তাদ এরূপ বুঝে রাখা বিজ্ঞান-রাজ্যের একটা চরম অসত্য। ভারতবাসী যে অলস জাতি, নাদোশনোদোশ, গোলগাল অথবা পৃথিবীর মত গোলাকার আর অন্যান্য জাতি যে আমাদের চেয়ে কর্ম্মঠ ইত্যাদি ধারণা মিথ্যা, কুসংস্কার মাত্র।

গোটা বাঙ্গালীজাতির বিশ্বপর্য্যটন

বিদেশে আমি যা করেছি তা বোধ হয় কোনো বাঙ্গালীকে না বলে না জানিয়ে করিনি। আমি এক সঙ্গে ৩।৪।৫।৭ হাজার বাঙ্গালীকে আমার সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে গিয়েছি। লেখালেখির মারফৎ গোটা বাঙ্গালী জাতিটাকে, চেষ্টা করেছি দুনিয়া টহল করাতে। সকলেই জানেন,—ঠিক যেন সিনেমার সাহায্যে দেখিয়েছি "ওরে এই দ্যাখ্‌ এখানে খৃষ্টিয়ানদের মা-মেরীর মন্দির। ভবিষ্যতের চিন্তায়, পরলোকের চিন্তায় লাখ লাখ ইয়োরামেরিকান্‌ নরনারী মস্‌গুল। ওদিকে লোক পড়ে রয়েছে মেরীর কাছে ধর্‌ণা দিয়ে, হাঁটু গেড়ে রয়েছে, কোথাও বা ভিখারীরা ধর্ম্মের আওতায় দু পয়সা এক পয়সা কর্‌ছে। এই দ্যাখ্‌ মন্দিরের এখানে ওখানে হাজার হাজার ভক্তিমান নরনারীর নিদর্শন থাকে থাকে সাজানো রয়েছে। অমুক্‌ লোক মানত করেছিল যে,

দুঃখ কষ্ট কেটে গেলে সে রোজ মন্দির পরিষ্কার করবে। তাই সে করছে স্বাথ্। আর একজন ছেলে হারিয়েছিল, মানত করে ছেলে পেয়েছে। পরে এসে মানতের নিদর্শন রেখে গেছে। এই স্বাথ্ মা মেরীর কাছে দাঁড়িয়ে লোকের পাল। সকলেই "বৈষয়িক", "গো-খাদক" যদিও তবুও, রীতিমত প্রণাম করছে। এই স্বাথ্ কোনো কোনো ভক্তিমান খৃষ্টিয়ানের চোখ দিয়ে জল পর্য্যন্ত পড়ছে।"

এই ধরণের ছবির পর ছবি তিন চার পাঁচ দশ হাজার বাঙালীকে ফি হপ্তায়, ফি মাসে, ফি বৎসরে দেখিয়েছি। গোটা দুনিয়াকে বাঙলায় এনে হাজির করেছি।

বাঙালীরা আমার সিনেমা-চিত্রে কখনো দেখেছে,

"পাইন-ঢাকা পাহাড়ের পায়ে দেউল ভাসছে সাগরে যেথায়,

এসেছি নিপ্পন-শিকক্ষের মাঝে দেউল-দ্বীপ সেই মিয়াজিমায়।"

এশিয়ার ভিতরকার "সেকেলে" "বৃহত্তর ভারত" আবিষ্কার করা আমার একটা বড় কাজ ছিল। কাজেই জাপানে "বৃহত্তর ভারতে"র খুঁটাগুলাও ঢুঁড়ে বের করতে কসুর করিনি। বাঙালীকে নারা-হোরিয়ুজির সেই সব দৃশ্যও দেখিয়েছি,—

"হরিণ সেথা মানব-সখা লাক্ষা-মোড়া তোরী-তলে,

ধানের ক্ষেতে সবুজ সেদেশ গম্ভীর ধ্বান সাগর-জলে।"

বাঙালীদেরকে দেখিয়েছি দুনিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ্ আর ধনৈশ্বর্য্য। কোথাও বা কালিফর্ণিয়ায় কমলা লেবুর ক্ষেত, কখনও দক্ষিণ ফ্রান্সের আর উত্তর ইতালির আঙুর-গৌরব। উত্তর চীনের বিরাট্ প্রাচীর আর ঈজিপ্টের পিরামিড এসব টপকানোও বাঙালীর অভিজ্ঞতায় এসেছে। ইংরেজ-ফরাসী-জার্ম্মাণ-মার্কিণ সকল জাতের ডিরেক্টর-এঞ্জিনিয়র-পণ্ডিত-রাসায়নিক-ডাক্তার আমাকে অনেক ঘণ্টা খরচ করে

তাদের কর্ম্মশালা দেখিয়েছে, ল্যাবরেটরি দেখিয়েছে, সংগ্রহালয় দেখিয়েছে, হাসপাতাল দেখিয়েছে, লাইব্রেরী দেখিয়েছে, মিউজিয়াম দেখিয়েছে। তারা জানে যে, এই সব দেখে শুনে যা পারি আমি ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে নবীন বাংলায় ফেল্‌বই ফেল্‌ব। এই বুঝে ৬৫।৭০।৭৫ বছরের বুড়োরাও—নামজাদা পণ্ডিত অবশ্য সবাই,—তবে এখানে আর তাদের নাম প্রচার করে দরকার নাই—আমাকে ডেকে খাইয়েছে, তাদের পরিবারে পরিচয় করিয়েছে, ভাব করিয়েছে। সকলেই ভাইয়ের মত, আপনার এক জনের মত ব্যবহার করেছে। চীনা, জাপানী, ফরাসী, ইংরেজ, জার্ম্মাণ, মার্কিণ, সকল মুল্লুকেই ভাই পেয়েছি। মিশর-চীনের মুসলমান নরনারী এই বাঙ্গালী ইন্দো-বাচ্চাকে আপনার জনই ভেবেছে। দুনিয়ার কোথাও বিদেশী ভাবে জীবন কাটাতে হয় নি। এই সকল অভিজ্ঞতায় বাঙ্‌লার নরনারীকে আমারই সঙ্গে একত্রে ধনী করে তুলবার চেষ্টা সর্ব্বদাই করেছি। অভিজ্ঞতাগুলা বাসি করে ফেলে রাখিনি। সবই বাঙ্গালীর পাতে পাতে টাট্‌কা পরিবেষণ করেছি।

নিজে গিয়ে বিদেশ দেখে একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতা বা বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতের চাকর আমি। আমার পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব। এক সঙ্গে পাঁচ সাত হাজার বাঙ্গালীকে গোটা দুনিয়া দেখিয়ে এনেছি। বাঙ্গালী জাত এক সঙ্গে বর্ত্তমান জগৎ দেখেছে।

সভ্যতায় পূবও নাই পশ্চিমও নাই

আপনারা জানেন,—পণ্ডিতেরা তর্ক করছে কোন্‌টা পূব কোন্‌টা পশ্চিম! সভ্যতা-শাস্ত্রে, সমাজ-বিজ্ঞানে, ইতিহাস-বিদ্যায় এ এক তুমুল লড়াই। আমি দেখ্‌ছি পূবও নাই পশ্চিমও নাই। পশ্চিমও পশ্চিম

নয় আর পূবও পূব নয়। ধরুন প্রশান্ত মহাসাগরের এক পারে জাপান আর এক পারে আমেরিকা। এদের পূবই বা কে আর পশ্চিমই বা কে? মামুলি ভূগোল অনুসারে আমেরিকা জাপানের পক্ষে নিশ্চয়ই পূর্ব্বদেশ। কিন্তু "সভ্যতা"র হিসাবে আমেরিকাকে পশ্চিম বলা আজকালকার পণ্ডিতমহলে দস্তুর! জাপান নিশ্চয়ই ভৌগোলিক হিসাবে আমেরিকার পশ্চিম অথচ দুনিয়া তাকে বলছে পূব!!

এইখানে তর্কশাস্ত্রের একটা জবর গলদ চলেছে। বিদ্যার রাজ্যে আমি হচ্ছি এই গলদের যম। দুনিয়ার লোককে,—কেষ্টবিষ্টু, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম সবাইকেই আমি বলেছি সোজা কথা। তার সারমর্ম্ম এই—"ভারতবর্ষের লোক, এশিয়ার লোক এবাং রক্তমাংসের মানুষ। তার মানে কি? তথাকথিত পশ্চিমারা, তোরা, যেমন রক্ত-মাংসের মানুষ, আমরাও, তথাকথিত পূরবীরাও, সেইরূপ। ক্ষিধে পেলে তোরা খাস, ঘুম পেলে ঘুমোস। আমরাও ক্ষিধে পেলে খাই আর ঘুম পেলে ঘুমাই। অথচ তোদের হেগেল, ম্যাক্সমুলার, তোদের বাক্‌ল, কুজাঁ, গবিন্যো, আর একালের তোদের হান্টিংটন—একশ বৎসর ধরে' দুনিয়াকে শেখাচ্ছে, 'এশিয়ার লোক কোনো দিন সাংসারিক কাজে পটুতা দেখাতে পারে নি। এশিয়ার লোক একমাত্র পরলোকের চিন্তা করেছে। ইয়োরোপের ধাত অন্য রকমের!'' এই 'ধাত'টা বিশ্লেষণ করা, এই তথাকথিত 'জাতীয় আদর্শ' গুলা জরীপ করা, নানান্ জাতের মাথার ঘীটা ওজন করে' বেড়ানো আমার বিদ্যা-সেবার অন্তর্গত।

হিন্দু জাতির শক্তিযোগ

সোজা কথায় সকলকে মল্লযুদ্ধে ডেকেছি আর ডাকছি। আর বল্‌ছি,—রক্তমাংসের স্বধর্ম্মটা ইতিহাসের ইট-কাঠ-কামড়াকামড়ির ভিতরই পাকড়াও করতে হবে। একটা মন-গড়া অলীক দর্শন কায়েম করে'

তথাকথিত জাতি-ভেদ, জাতীয় বিশেষত্ব জাহির করা চলে না। বস্তু-নিষ্ঠ ইতিহাস বল্‌ছে,—কি ভারতে কি ভারতের বাহিরে,—রক্তমাংসের বাণী নিম্নরূপ :—

জন্মেছি এই ধরায় আমি রক্তমাংসের শরীর পেয়ে,
শ্রেষ্ঠধর্ম্ম জানিনা আর দুনিয়াটা ভোগ করার চেয়ে;
চায় দুনিয়া আমায় শুধু, চাই আমিও কেবল তারে,
আমায় ছেড়ে অন্ধ সমান ঘুর্‌বে যে সে অন্ধকারে!
ত্যাগ-সংযম-ব্রহ্মচয্য শক্তিলাভের যন্ত্র এ সব,
ভোগ করি এই শক্তি-বলে বীরের মত ধরার বিভব!
রূপের ধরিত্রী, রসের সাগর, শব্দের আকাশ, গন্ধের বায়,
আর স্পর্শের তড়িৎ এরা সবাই মিলিয়া চাঙ্গা করে' মোর
প্রাণ বাড়ায়।
যতক্ষণ প্রাণ চাঙ্গা আমার ততক্ষণই যে অমর আমি
হরদম্‌ আসুক নয়া নয়া উত্তেজনা আর পাগলামি।
তপ্ত তাজা রক্তে আমার উঠুক সারা অঙ্গ ভরে'
জীবনটা চাই হাতপা এবং চোখ নাকে যে রাখতে ধরে'।
ভরা প্রাণের অশেষ খেয়ালে গড়্‌ব লাখ্‌ লাখ্‌ ধর্ম্মনীতি
দুনিয়া-সুন্দরী বর্‌বে আমায় ভগবান্‌ আর প্রাণের পতি।

এই শক্তিযোগ আমাদের ভারতের অন্যতম স্বধর্ম্ম। আপনারা সকলেই জানেন, কালিদাস লোকটা যখন কবিতা লিখ্‌তে বস্‌ল তার মেজাজে যে সব কথা বেরুল তার ভিতর দিগ্‌বিজয় হচ্ছে খুব মোটা। "আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্‌" লোকজনের তারিফ হচ্ছে তার মহাকাব্য। সমুদ্র গুপ্তের কবি হরিষেণ বোধ হয় রক্তমাংসের স্বধর্ম্মপ্রচার হিসাবে কালিদাসকেও নকড়া ছকড়া করে' ছেড়েছে, তার মেজাজে রক্ত-

পিপাসা আর হিংসা-ধর্ম্ম এতই বেশী। আমাদের দিগ্‌বিজয়ী রাজরাজড়া আর দিগ্‌বিজয়ের কবিদের কাছে ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই দাঁড়াতে পারে কি না সন্দেহ। হর্ষবর্দ্ধনও বল্লে "পা ঢর সুর করুছে রে! বড় বেশী! দেখ্‌ছি— বেরুতে হবে দিগ্‌বিজয়ে।" চল্ল সকলে তার সঙ্গে সঙ্গে। এরা দেখিয়েছে শরীরের পরাক্রম। এরা বুঝিয়েছে, "হাত-পার জোরে মাথার জোরে শক্তিমানেরা পূজা পায়।" সেই চাণক্য-চন্দ্রগুপ্ত থেকে আরম্ভ করে' ধর্ম্মপাল-রাজেন্দ্রচোল পর্য্যন্ত লোকগুলা সবাই শক্তিধর সবাই সংসারনিষ্ঠ, কর্ম্মবীর। তারা এই ভারতেই জন্মেছে। কিন্তু ইয়োরামেরিকার "দার্শনিকেরা" বল্‌ছে,—"হিন্দুজাত সাংসারিক লোক ছিল না।" আর বলেছে "কলকব্জায় এদের মাথা খেলবে না, স্বরাজ-স্বাধীনতা এদের কাছে বাতুলতা মাত্র!" আর আমাদের স্বদেশী "দার্শনিকেরা"ও,— আমাদের একেলে মহাত্মারাও,—পশ্চিমাদের এই কুসংস্কারগুলা আওড়িয়ে বল্‌ছে—"ঠিক ত, হিন্দুজাত, ভারত সন্তান আধ্যাত্মিক। ছিঃ! বৈষয়িক, সাংসারিক, রাষ্ট্রীয় জীবন ত অপদার্থ। ও পথ মাড়িও না, যুবক ভারত!"

দুনিয়ায় কি দেখে এলাম

এ সব মহাত্মাদের দর্শনের ভিতর প্রবেশ করা সম্প্রতি আমার মতলব নয়। আমি আমার কথা বলছি। দুনিয়ায় কি দেখে এলাম? আমরা যেমন দেবতাও নই জানোয়ারও নই, ঠিক মানুষ, তারাও তেমনি দেবতাও নয় জানোয়ারও নয় মানুষ। আমরা মনে করি ইংরেজেরা জানোয়ার বটে; চীনারা মনে করে ইংরেজ, ফরাসী ইত্যাদি সব পশ্চিমা লোকই জানোয়ার। যার সঙ্গে বনিবনাও নাই অথবা বনিবনাও কম তাকে জানোয়ার বিবেচনা করা সকল দেশেই একপ্রকার স্বাভাবিক। আমি বল্‌ছি ইংরেজ মানুষ বটে। ইংরেজ দেবতাও নয় জানোয়ারও নয়।

তেমনি ফরাসীরা দেবতাও নয় জানোয়ারও নয়, মানুষই বটে। আমাদের দেশে কতকগুলি দোষ আছে অস্বীকার করি না। কিন্তু এই সব দোষ, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি কি তাদের দেশে ছিল না? না আজও নাই?

আমি ফরাসী মুচী-মজুরদের ঘরের কথা জানি। ইতালীর আর জার্ম্মাণীর পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে,—একদিন দুদিন নয়, অনেক দিন,—যারা ভাই বলে ডেকেছে তাদের ঘরে খেয়েছি, রয়েছি, আত্মীয়তা করেছি। মধ্যবিত্ত, উচ্চশ্রেণী, কেরাণী, ব্যাঙ্কার, মাষ্টার ইত্যাদি সকলের সঙ্গেই ভাব হয়েছে। ফরাসী মেয়ে, মার্কিণ মেয়ে, এমন কি ইংরেজের মেয়ে পর্য্যন্ত, যারা মফঃস্বলের ছোটখাট শহরে বাস কর্‌ছে—তারা কি ধরণের জীব? একটি করে খোঁচা মেরে একটুখানি রক্ত বের কর্‌লে দেখা যায় যে, সেই মধ্যযুগের মানব আজও ইয়োরামেরিকায় প্রচুর পরিমাণে বিরাজ কর্‌ছে। অর্থাৎ সাধারণতঃ তারা নামজাদা লোক দেখ্‌লে টুপী নামিয়ে সেলাম করে। মেয়ে জাত পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনভাবে টক্কর দিতে সুরু করেছে মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর হ'ল। এই জিনিষটাকে মেয়েদের রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশাতে এখনো কত বৎসর লাগ্‌বে কে জানে? ফ্রান্স-জার্ম্মাণী-আমেরিকা-ইংলণ্ডের পল্লীর সাবডিভিশানের মেয়ে আর আমাদের পল্লীর যারা অশিক্ষিত মেয়ে, তাদের মা-বাপ পর্য্যন্ত, স্বামী-ভাই পর্য্যন্ত সবাই প্রায় একই রীতিতে চলে' আস্‌ছে। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতায় এ সব দেশ যতই উন্নত হউক না কেন, এখন পর্য্যন্ত সেই মধ্যযুগের ধারা এই সকল উন্নত দেশে চলে আস্‌ছে, যে ধারাকে আমরা তথাকথিত হিন্দুত্ব নামে পুষ্‌তে অভ্যস্ত।

আমাদের যে মন্দির তার ভিতর যে ভক্তিভাব, ভগবৎ আরাধনা আর আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি দেখ্‌তে পাই, সেই সব জিনিষ ইয়োরোপের পল্লীতে তার চেয়ে কম দেখ্‌তে পাই না। তাদের সাধু-ফকিরদের ভিতর এমন

অনেক শ্রেণী দেখতে পেয়েছি যারা টাকা ছোঁয় না নোট অস্পৃশ্য বিবেচনা করে, জামা পরে না, যদি বা পরে এমন কাঁটাওয়ালা চট যা গায়ে ঘসে' ঘসে' পালিশ করতে হয়। অর্থাৎ কষ্ট স্বীকার, কৃচ্ছ্র সাধনা বল্লে যা বুঝায় তা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের একচেটিয়া জিনিষ নয়। দুনিয়া সম্বন্ধে এই সব তত্ত্ব ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্রই প্রচার করে' আসছি।

দুনিয়াকে ঘাড়ে করে' ভারতে হাজির

ছেলে বেলায় গল্প শুনতাম, হনুমান যখন লঙ্কায় গেল আম খেয়ে আঁটিগুলি ছুঁড়ে দিয়েছিল মালদহের দিকে, সেই জন্যই মালদহের আম নাকি বিখ্যাত মুখশাল। বিদ্যাবুদ্ধি কিছু থাকুক না থাকুক, ভারতবর্ষকে ঘাড়ে করে' ইয়োরামেরিকা-মিশর-জাপান-চীনে ঘুরেছি। এখন দুনিয়াকে ঘাড়ে করে' হয়েছি ভারতে হাজির। ইতিমধ্যে বিদেশে থাকতে থাকতেই ফ্রান্সের এক টুকরা, জাপানের এক টুকরা, জার্ম্মাণির এক টুকরা ভারতের এখানে ওখানে ছড়িয়ে দিয়েছি। পড়েছে গিয়ে কোনোটা মাদ্রাজে, কোনোটা হরিদ্বারে, কোনোটা পুণাতে, কোনোটা বা কলিকাতায়। এই ভাবে নানা জায়গায় নানা জিনিষ ছিটকে পড়ছে। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় যাকে বলে "আথালি পাথালি"—একদম বিশৃঙ্খল ভাবে দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে দুনিয়ার রকমারি আমের আঁটি ভারতে ছুঁড়ে ফেলেছি। অনেকে বলেন এতে ফল হয় না, হবে না। কিন্তু কোনো ফল ফলেছে কিনা তা বলতে পারে বোধ হয় আজকালকার যুবক ভারতের কর্ম্মবীরেরা আর চিন্তাবীরেরা। এরা যদি কখনো আত্মজীবন-চরিত লিখে' নিজ নিজ ব্যক্তিত্বগঠনের মশলাগুলা বিনা গোঁজামিলে বিবৃত করতে চেষ্টা করে, তা'হলে হয়ত এই বাঙালী হনুমানের আথালি-পাথালি আঁটি-ছোঁড়ার ফলাফল কিছু কিছু জানা যেতে পারে। থাক্ সে কথা। অবশ্য

আহাম্মুক ভাবে ছুঁড়েছি হনুমান যেমন করেছিল। কিন্তু তবুও একটা ফলের কথা উল্লেখ করতে চাই।

আপনারা জানেন পঁচিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা মূলধনে প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম হয়েছে পুনাতে। নাম "মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়।" তার প্রতিষ্ঠাতা মারাঠা পণ্ডিত অধ্যাপক কার্ব্বে। প্রায় দশ-এগার বৎসর পূর্ব্বে এই বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি তখন বিদেশে। কার্ব্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বার্ষিক বিবরণী প্রদান করেছেন, তাতে এই প্রতিষ্ঠানের জন্মকথা সম্বন্ধে সকল কথা আন্তরিকভাবে খুলে বলেছেন। তিনি লিখেছেন - "আমি হিন্দু বিধবাদের জন্য একটা আশ্রয় মাত্র খাড়া করেছিলাম। কোন্ দিকে ইস্কুলটা চালাব কিছু ঠিক করতে পারছিলাম না। এমন সময় দেখি ডাকঘরের মারফৎ একটা প্যাকেট এসে হাজির হল। কোন্ দেশ থেকে এল, কে পাঠাল কিছু জানি না। প্যাকেটের লেপাফাটা ফেলে দিয়েছিলাম। পড়তে আরম্ভ করলাম. পড়তে পড়তে দেখি— এটা জাপানের মেয়ে-বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট যত পড়তে লাগলাম ততই কৌতূহল বাড়তে লাগল। দেখলাম পঁচিশ বৎসর ধরে' জাপানের একজন কর্ম্মী এদিকে চেষ্টা করেছেন। আমি আজ পনর বৎসর ধরে' ভারতবর্ষে তাই করছি। কোন্ পথে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা চালান উচিত এখন পর্য্যন্ত ঠাওরাতে পাচ্ছি না। দেখলাম জাপানী প্রণালী ভারতেরও বেশ কাজে লাগবে। তারপর ১।২।৩।৪ করে' আসল কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য হুবহু সেই রিপোর্টের নকল করলাম। তারপর অমুক অমুক পয়সাওয়ালা লোকের কাছে গেলাম, তাদেরকে পুছলাম,—তোমরা এতে রাজী আছ কিনা। স্যার বিঠলদাস ঠাকুর্সে রাজী হল। ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠানটা দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল প্রতিষ্ঠাতা কে? আমি কার্ব্বে নই, স্যার বিঠলদাসও নন। প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে সেই লোকটা যে

আমাকে জাপানী প্রতিষ্ঠানের বৃত্তান্তটা পাঠিয়েছে।” আমরা ভারতবাসী অতিমাত্রায় বিনয়ী। মারাঠা পণ্ডিত কার্ব্বেও অতিমাত্রায় বিনয়ের নিদর্শন দিয়েছেন এই রিপোর্টে।

তার দশ বৎসর পর কার্ব্বের একখানি চিঠি আসে আমার কাছে। আমি তখন ইতালীতে। তখনও ভারতবর্ষে ফির্‌ব কিনা, অথবা কবে ফির্‌ব—কিছু ঠিক ছিল না। তিনি লিখেছিলেন, “সম্প্রতি আমাদের এখানে তোমার বন্ধু, কাশীর শিবপ্রসাদ গুপ্ত এসেছিল। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়্‌ল,—জাপানী মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তান্তটা এসেছিল আমার কাছে সেই বৎসর, যে বৎসর তোমরা দুজনে এক সঙ্গে জাপানে মোসাফিরি কর্‌ছিলে। এতদিনে জান্‌তে পারা গেল যে, তোমরা যে সব ভারতবাসীর কাছে রিপোর্টটা পাঠিয়েছিলে তাদের ভিতর আমিও একজন।”

দেখা যাচ্ছে যে, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে বিদেশী আমের আঁটিগুলা “আথালি-পাথালি” দেশের নানা ঘাঁটিতে পাঠাতে থাক্‌লে অনেক সময়ে বড় বড় কাজের গোড়াপত্তনে অথবা বিকাশ-সাধনেও অনেক-কিছু সাহায্য করা সম্ভব। আনাড়ি হনুমান অথবা নেহাৎ চীনের বলদও এই উপায়ে দেশের কাজ কিছু কিছু করিতে পারে। এই ধরণের বিদেশী আঁটির অন্যান্য ফল—যুবক ভারতের কত জায়গায় কত কি করেছে তার হিসাব অবশ্য আমার জানা নাই। মারাঠা মুল্লুকের কাহিনীটা দৈবক্রমে মাত্র কাণে এসেছে।

বর্ত্তমান যুগের “বৃহত্তর ভারত” প্রতিষ্ঠা

আপনারা বল্‌ছেন, আজ আমি ফিরে এসেছি; আমি জানি যে, “ফিরে” এসেছি কথাটা ঠিক নয়। এই পৌনে বার বৎসরের একটা দিনও আমি বাংলা দেশের বাইরে ছিলাম না। এই যুগটার প্রতিদিন

রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত কাজ করেছি। দেশে থাকবার সময় যতটুকু বা যা-কিছু করেছি বিদেশেও নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি বিলকুল ছিল তাই। ভোর ৫টার সময় উঠেছি। সকাল ৬টা থেকে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সব কয়টা ঘণ্টাই কাজে ভরা। মিউজিয়াম-ল্যাবরেটরি-লাইব্রেরি-ব্যাঙ্ক-কারখানায় ঘুরাফিরাই হউক, কি বই মুখস্তই হউক, কি কলম পেষাই হউক, কি লিখিয়ে-পড়িয়ে মণ্ডলীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাই হউক, কি জননায়ক-স্থানীয় নরনারীর সঙ্গে দহরম-মহরমই হউক, কি আর কোনো কাজ-কর্ম্মই হউক, প্রতি মুহূর্ত্ত আমি মনে রেখেছি যে যুবক বাংলার সামান্য অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ আমি। প্রতি মুহূর্ত্ত আমাকে সর্ব্বত্র যুবক বাংলার আর যুবক ভারতের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে ঢুঁড়ে বের কর্ত্তে হয়েছে। জগতের ডিহিতে ডিহিতে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী একটা "বৃহত্তর ভারত" গড়ে' তোলা রয়েছিল আমার এক বিপুল ধান্ধা।

১৯৩০-৩৫ সনের সেবাধর্ম্ম

আমার কাজ ছিল ভারতের ১৯০৫।০৬ সনকে ১৯১৫।১৬ সনের উপযুক্ত করে' দেওয়া। তারপর ১৯১৫।১৬ সনকে ১৯২৫।২৬ সনের উপযুক্ত করে' তোলা ছিল আর এক কাজ। আজ আমার কাজ হচ্ছে ১৯২৫।২৬ সনের যুবক ভারতকে ১৯৩০।৩৫ সনের উপযুক্ত করে' দেওয়া। চাকর ভাবে গিয়েছি, চাকর ভাবে ফিরে এসেছি। চিরকালই, সর্ব্বত্রই আমি বাংলার সেবক।

আজকাল আপনারা কেহ কেহ সন্দেহ কর্‌ছেন যে, আমি আহাম্মুকের মত কথা বলে' থাকি। "পাশ্চাত্য" "পাশ্চাত্য" করে' আবল তাবল বক্‌ছি। আমি বল্‌তে চাই,—জন্ম অবধি আমি পাশ্চাত্যের অনুরাগী। সে কথা অজানা নয় আপনাদের। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ অনেক দিন আগে আমার একখানা বই ছেপেছেন। সেটা আপনাদের ৩৫ নম্বর

কি ৩৬ নম্বর বই। আর মজার কথা,—সেটা আমার একপ্রকার প্রথম বই। নাম "প্রাচীন-গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা"। এতেই বুঝিতে পারছেন পশ্চিমমুখো আমি কখন থেকে। তখন আমার বয়স চব্বিশ পার হয় নি। আমার ব্যবসা হচ্ছে,—দেশের দুঃখ-দারিদ্র-দৈন্য কোথায় তা খুঁজে বের করা। সেটা যদি দেশকে নিন্দা করা বলেন আপত্তি নেই। দেশের দাওয়াই যদি পশ্চিম থেকে আমদানি করাটা পাপ হয়, সেই পাপ আমার চরিত্রে আজ নতুন-কিছু নয়। আমি দেশের চাকর,—চাকরের ব্যবসা মনিবের অভাব পূরণ করা।

কলিকাতায় ফিরে আসবার পর আজ বছর খানেক যাচ্ছে। এই বৎসরের ভিতর সুযোগ পেয়েছি কিছু কিছু. নানা রকম লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। যারা বল্‌ছে "ঘান কর্‌তে চাই ত্যান কর্‌তে চাই" তাদের সকলকে বলেছি "কর্‌. করে' যা, যে যা পারিস্‌।" গত তিন চার দিনের ভিতর হাওড়া জেলার মাজুতে আর শান্তিপুরে নানা রকম প্রস্তাব ঝেড়েছি। এই সব প্রস্তাবের ভিতর সেই ১৯ ৫।১০ ইত্যাদি যুগের দেশ-ধর্ম্মই একমাত্র কথা।

য়ুয়ান-চুয়াঙের বস্তা

আমাদের দেশে য়ুয়ান-চুয়াঙ্‌ নামে চীনের একজন পণ্ডিত এসেছিল। সে হচ্ছে চীনেদের সমাজে প্রায় ভারতীয় শঙ্করাচার্য্যের মত নামজাদা। আবার য়ুয়ান-চুয়াঙ কর্ম্মবীর, ধুরন্ধর লোকও বটে। পনর-ষোল বৎসর ভারতে বসবাস করে' সে বস্তা বস্তা মাল গাধার পিঠে, উটের পিঠে চাপিয়ে ভারতবর্ষ লুটে নিয়ে গিয়েছিল। চীনে গিয়ে দেখে—তার মনিব তাঙ্‌ তাইচুঙ্‌ মারা গেছে। তখনকার সম্রাট যিনি তিনি বল্লেন—"আমি অবশ্য তোকে চিনি না। কিন্তু তোকে সাহায্য করতে চেষ্টা কর্‌ব। লেগে যা। দেখি কদ্দূর করতে পারিস।" এই যে য়ুয়ান-চুয়াঙ বস্তা

বস্তা মাল নিয়ে গিয়েছিল তাই দিয়ে ভারতবর্ষকে সে প্রচার করতে চেয়েছিল চীনে। কি করা হল ? বাদশাহী বন্দোবস্তে কতকগুলি লোককে খরচ-পত্র দিয়ে পড়ানো হল। তারা ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, উপনিষদ্, তন্ত্র, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন—যত রকম যা কিছু থাক্তে পারে—সবগুলিকে চীনা তর্জ্জমার সাহায্যে চীনা করে' ছাড়লে। ভারতবর্ষ থেকে যে জিনিস চীনে গিয়েছে সব জিনিষকে তারা "বৌদ্ধ" সমঝে' নিয়েছে। চীনে ভারতবর্ষের লজিক, থিয়েটার মায় ডাণ্ডাগুলি সবই "বৌদ্ধ"! চীন-জাপানের ভাষায় ভারতবর্ষের অর্থ স্বর্গভূমি (তিয়েনচু বা তেন-জি-কু)। কেন না বুদ্ধদেব এখানে জন্মেছেন অতএব বুদ্ধদেবের দেশ থেকে যা কিছু এসেছে সবই বৌদ্ধ। তারপর চীনে পাঁচ সাত শত বৎসরের যে যুগ তাকে প্রকাণ্ড ভারতীয় যুগ বলা যায়। সুঙ আমল আর বাংলার সেন রাজাদের যুগ সমসাময়িক। এই দুই আমল এশিয়ার অন্যতম চরম গৌরবের যুগ। যে সময়ে চীনা বাদশারা ভারতীয় জিনিষগুলাকে চীনের পল্লীতে পল্লীতে প্রচার করেছেন, তখন বাংলা দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ অবস্থা। সেই যুগটা চীনে সত্যসত্যই বৃহত্তর ভারতের যুগ। যুয়ান-চুয়াঙের ভারতীয় বস্তাগুলা চীনে "বৃহত্তর ভারত" প্রতিষ্ঠার কাজে খুব বড় সাহায্য করেছে সন্দেহ নাই।

চাই ভারতে আটলাণ্টিকের স্রোত

যুয়ান-চুয়াঙের বস্তা ছিল। আমার তাঁবে বস্তা নাই। পোঁটরি বোঁচকা পর্য্যন্ত নাই। দুনিয়ার সম্পদ লুটে আন্‌বার মতন ঝুলিও একটা আমার ছিল না। তবে যুয়ান-চুয়াঙের সাধনা আমার আছে। ভারত-সেবক আর বাংলার চাকর হিসাবে আমি দুনিয়াকে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই। বিশ্বশক্তির স্রোত যাতে গঙ্গা-গোদাবরীতে বয়ে যেতে পারে তার চেষ্টা করাই আমার লক্ষ্য।

আট্‌লান্টিককে তাই বলে এসেছি,—

"হুড় মুড়িয়ে আট্‌লান্টিক, তুই ছুটে' যাস্ কোথায় ?
আয় তোরে বাঁধব নিয়ে এশিয়ার পায়।
ভারত সাগর বুড়িয়ে গেছে,
জলে নাই তার নূন
নূণ না পেয়ে পার্শী-হিন্দু-চীনার হাড়ে ঘুন।
ভারত সাগর ছেঁচে কর্‌ব আটলান্টিকের খাল,
আর সবার আগে চাঙ্গা হয়ে উঠবে দেশ বাঙ্গাল।"

ইয়োরামেরিকাকে উপ্‌ড়িয়ে যদি ভারতে আন্‌তে পার্‌তাম, তাহলে বুঝ্‌তাম কাজের মতন একটা কাজ করেছি বটে, যেমন করেছিল চীনের স্বদেশ-সেবক কর্ম্মবীর য়ুয়ান-চুয়াঙ্ চীনে ভারতবর্ষকে প্রচার করে'। সে সুযোগ আর সে আবহাওয়া আমার নাই। তাই আমি রামাশ্যামাকে, রাস্তার লোককে ডেকে বল্‌ছি, "ভাই এই কর্, ঐ কর্। আমি যদি পারি তা হলে এই করব, এই কর্‌ব" ইত্যাদি।

সাহিত্য-পরিষদের এই মজ্‌লিশে সম্প্রতি একটা কথা মাত্র বল্‌তে চাই। আমাদের দেশে অর্থশাস্ত্র বা ধন-বিজ্ঞান বিদ্যাটার চর্চ্চা অতিশয় কম চল্‌ছে। দেশে পণ্ডিত-মাষ্টার-রীসার্চ্চওয়ালা রয়েছে বটে। তবুও, ১৯২৭ সনের দুনিয়ায় যে মাপ সে হিসাবে আমাদের বিদ্যা নেহাৎ নগণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম শ্রেণীতে পড়া সাঙ্গ করে' তারপর বৎসর পাঁচেক স্কুলে যদি রীতিমত ক্লাস করে' পড়া যায়, তবু আমরা উপযুক্ত হতে পারি কিনা সন্দেহ "ইয়োরামেরিকা অথবা জাপান এই করছে, এই করছে, এত বড়, এত উঁচু" ইত্যাদি মত আমি ঝাড়্‌ছি। য়ুয়ান-চুয়াঙ্ স্বদেশে ফিরে ভারত সম্বন্ধে এইরূপ লম্বা-চৌড়া বোলই ঝেড়েছিল। য়ুয়ান-চুয়াঙ্‌কে বিশ্বাস কর্‌বার লোক ছিল। আমি বল্‌ছি না যে,

আপনারা আমাকে সেইরূপ বিশ্বাস করুন। কিন্তু স্বচক্ষে দুনিয়াখানাকে দেখ্‌বার আর বুঝ্‌বার ফিকির বাৎলিয়ে দেওয়াই সম্প্রতি আমার লক্ষ্য।

বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের মোসাবিদা

আমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চাকর। কিন্তু সাহিত্যপরিষদ্‌কে ভেঙ্গে নতুন চার পাঁচটি পরিষদ্ গড়ে' তোলা দরকার। কথাটা হেঁয়ালীর মত বোধ হচ্ছে। ফরাসীদের ১৫০ বৎসরের পুরাণো যে আকাদেমী ছিল সেটা ভেঙ্গে পাঁচসাতটা আকাদেমী গড়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া আরও গণ্ডা গণ্ডা সমিতি, পরিষৎ বা সভার সাহায্যে জ্ঞানবিজ্ঞান-শিল্পকৃষির চর্চ্চা চলেছে। বাংলাদেশে সাহিত্য-পরিষদ্ খুব বড় প্রতিষ্ঠান। পরিষদের কর্ম্মের ফলে বাংলাদেশে অনেক নতুন নতুন কর্ম্মবীর ও পণ্ডিত দাঁড়িয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু তাদের জন্য আজ নতুন নতুন কর্ম্ম-কেন্দ্র চাই।

আজ একটা মাত্র কর্ম্মকেন্দ্রের মোসাবিদা দিয়ে যাচ্ছি। এজন্য ৫।৭।১০ জন লোককে খোরপোষ দিয়ে রাখা দরকার। এরা কোথাও চাক্‌রী টাক্‌রী কর্‌বে না। এরা কর্‌বে লেখা পড়া, বই মুখস্থ আর বই লেখা। তারা মাথা খেলাবে,—কেহ এঞ্জিনে, কেহ জাহাজে, কেহ কৃষিতে, কেহ পাটে, কেহ স্বাস্থ্য-সমস্যায়। ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, ইতালীতে আজ কি কি আর্থিক আইন-কানুন দাঁড়াল, সে সব হজম করে' তারা বাংলা ভাষায় বই লিখ্‌বে। কাউকে আমার কথা' আমার মত মেনে নিতে বল্‌ছি না। এ জন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে,—তাদেরকে বৎসর পাঁচেকের জন্য বাহাল করুন। পাঁচ বৎসর পরীক্ষা করে' দেখুন। পাঁচ বৎসরের কাজ হবে ২৫ খানি উচ্চ অঙ্গের বই—এম এ, বি এর পাঠ্য—ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বই তৈয়ার করা। উপযুক্ত লোক বেছে ২৮।৩০।৩২ বৎসর বয়সের যে সব ছোকরা কাজ-কর্ম্মে আর লেখা-পড়ার সোয়াদ পেয়েছে তাদেরকে

বৃত্তি দিয়ে যদি পাঁচ বৎসরের জন্য রাখ্‌তে পারেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যে ধনবিজ্ঞানটা দাঁড়িয়ে যাবে।

বাংলা দেশের মফঃস্বলে তিনচারশ লোন অফিস রয়েছে। তা ছাড়া দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত কর্‌বার নানা রকম চেষ্টা চল্‌ছে। সে সম্বন্ধে চিন্তা কর্‌বার জন্য খোরপোষ দিয়ে পণ্ডিতদের লোক কায়েম করুন। "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ" নামে একটা নতুন পরিষৎ গড়ে' তুলুন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টারের যে বেতন তাদের তার চেয়ে কম বেতন হওয়া উচিত নয়। পাঁচ বৎসর কাজ করতে হলে লাখ দুই টাকা লাগ্‌বে। এ টাকা বাংলাদেশ থেকে তুলুন। তার জন্য আন্দোলন রুজু করুন। আমাকে যদি সেবক ভাবে বাহাল করতে চান তাহলে আমি কাজে লেগে যেতে রাজি আছি। যদি এই ধরণের কাজ করতে পারেন তাহলে আর্থিক সাহিত্য সম্বন্ধে বাংলাদেশে উঁচু ধরণের একটা কিছু হতে পারবে।

এই ধরণের আরও অন্যান্য দিকে উঁচু মাপকাঠি লাগিয়ে কাজ সুরু কর্‌বার দিন এসেছে। বাঙালী শক্তিযোগের নানা প্রতিষ্ঠান ও নানা আন্দোলন আজ কায়েম করা চাই। বাংলার চাকর হিসাবে আপনাদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, আজ ১৯২৭ সনের কোঠে দাঁড়িয়ে আগামী ভবিষ্যতের জন্য একটা উল্লেখযোগ্য কিছু খাড়া কর্‌বার সুযোগ আপনারা সৃষ্টি করুন। তাহলে চীনে য়ুয়ান-চুয়াঙ্‌-প্রবর্ত্তিত ভারত-প্লাবনের সমান না হ'ক,—বাঙ্‌লা দেশে বিশ্বশক্তির বন্যাটাকে জগদ্‌-বাসীরা একটা দর্শনযোগ্য বস্তুরূপে সম্মান করতে শিখ্‌বে। আর বিশ্ব-শক্তির ভরা জোয়ারে নিয়মিতরূপে সাঁতার কাটবার সুযোগ পেলেই যুবক বাঙ্‌লার হাত-পা'র জোর আর মাথার জোরও সহজেই দুনিয়ার মালুম হতে থাক্‌বে।

পরিশিষ্ট ১

বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে সম্বর্দ্ধনা

বন্দেমাতরম্

পূজনীয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার

মহোদয় শ্রীচরণ কমলেষু

হে আচার্য্য,

সুদীর্ঘ কাল দেশ দেশান্তরে থাকিয়া আপনি পুনরায় আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুর্লভ সৌভাগ্যকে সসম্ভ্রমে বরণ করিবার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বিদ্যার্থিগণ আমরা শ্রদ্ধামুগ্ধ হৃদয়ে সমবেত হইয়া আপনার চরণে প্রণতি নিবেদন করিতেছি। আপনার পুণ্য দর্শন ও স্নেহপূত আশীর্ব্বাদে আমরা আজ ধন্য হইব।

আপনার এই উপস্থিতি অতীতের কত কথাই না স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সেই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে যখন নব ভাবের বন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল সে দিন আপনি সমস্ত কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া জাতীয় বিদ্যায়তন গড়িবার মহামৌন তপস্যার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। শুভ সংকল্পে জাগ্রত, হে কর্ম্মকঠোর তপস্বি! আপনার এই সাধনার সিদ্ধি আজ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

হে দুঃখব্রতী সাধক, সেদিন আপনি রুদ্রের দক্ষিণ মুখের উপর প্রশান্ত নির্ভর দৃষ্টি রাখিয়া নিরহঙ্কৃত কর্ত্তব্যের সাধনায় আপনার বুদ্ধিকে, জ্ঞানকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সেই মহান আদর্শ আজিও জাতীয় শিক্ষা পরিষদে প্রাণ স্বরূপ হইয়া আছে। তরুণ জীবনের বুদ্ধি, মন ও চরিত্র লইয়া আপনি যে নবযুগের নূতন মানুষ গড়িতে চাহিয়াছিলেন, তাহাকে

যে সাধনার দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্থায়ী সম্পদরূপে অব্যাহত থাকিয়া আজিও আমাদের জীবনের উচ্চতর প্রেরণা, দুস্পূরণীয় দুরাকাঙ্খা, জাগ্রত জীবনের আনন্দ প্রদান করিতেছে। স্বদেশীর প্রথম প্রভাতে যাঁহারা জাতীয় শিক্ষা দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাদের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক্ বলিয়া আমরা আপনাকে আজ প্রাণের অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি।

নব্যভারতের প্রাচীন একনিষ্ঠ সেবকগণের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে অতীত যুগ শান্ত সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে আপনার দেশবাসী আপনার নিকট অনেক কিছুই আশা করিতেছে।

হে জ্ঞানের গুরু, জ্ঞানার্জ্জনের মহতী দুরাশায় আপনি সমুদ্র-মেখলা ধরিত্রী পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বিশ্বের বিপুল স্রোতে অনির্দ্দেশ যাত্রায় আপনি একদিন তরী ভাসাইয়া ছিলেন, আজ সেই তরী নানা বিচিত্র জ্ঞানের পণ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া দেশের ঘাটে ভিড়িয়াছে। জাতির জন্য আহারিত এই জ্ঞান-সম্পদ আপনি দুহাতে বিতরণ করিবেন, আমরা সে প্রসাদকণা হইতে বঞ্চিত হইব না। আপনার সেই মহৎ দান কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ করিবার জন্য আজ আমরা নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়াছি। হে আচার্য্যশ্রেষ্ঠ, পরা ও অপরা এই উভয় বিদ্যা আপনি আমাদের প্রদান করুন, "শিষ্যস্তেঽহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"। ইতি।

যাদবপুর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৫	}	বিনয়াবনত বেঙ্গল টেক্নিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ।

পরিশিষ্ট ২

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সম্বর্দ্ধনা

পরম কল্যাণবর

অধ্যাপক শ্রীমান্ বিনয় কুমার সরকার এম্. এ.

কল্যাণবরেষু

কল্যাণীয় বিনয়কুমার,

তুমি ত দিগ্বিজয় করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে। তুমি যখন যাও, আমরা সকলে কতই আশা করিয়াছিলাম, কতই ভরসা করিয়াছিলাম, তুমি নানা দেশে গিয়া অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়া দেশে ফিরিবে। আমাদের সে আশা সে ভরসা পুরা দস্তুর সফল হইয়াছে। তুমি যাহা আনিয়াছ, তাহার পার নাই। এখন তুমি সেই অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার দুই হাতে আপনার দেশীয় লোকদিগকে বিতরণ কর।

তুমি যখন যাও, তখন দেশের বড় বড় লোক, বড় বড় পণ্ডিত তোমার পাণ্ডিত্যে তোমার স্বভাবের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিতেন, তুমি একজন বিশ্বপ্রেমিক। স্বর্গীয় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিতেন, দেশীয় লোকের শিক্ষার জন্য তুমি যেরূপ প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছ, সেরূপ আর দেখা যায় না। নানা অবস্থায় পড়িয়া, নানারূপ কষ্ট পাইয়া তোমার স্বভাব আরও মধুর হইয়াছে আরও কোমল হইয়াছে, তাহাতে আমরা, যাহারা আজও বাঁচিয়া আছি, আরও মুগ্ধ হইয়াছি। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও ও দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।

তুমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু। যে দেশেই যখন গিয়াছ, সাহিত্য পরিষদের মঙ্গল কামনা করিয়াছ। তোমারই কল্যাণে সাহিত্য পরিষদের নাম নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রায় সকল দেশ হইতেই তাহার নানারূপ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। তুমি যখন এদেশে ছিলে, তখন স্বতঃ পরতঃ পরমেশ্বরতঃ অনবরত, সাহিত্য পরিষদের মঙ্গল করিয়াছ। এখন অনেক বড় হইয়া আবার স্বদেশে ফিরিয়াছ। সাহিত্য-পরিষদের অনেক মঙ্গল তোমার নিকট আকাঙ্ক্ষা করি। পরিষৎ আমার মুখ দিয়া তোমায় অন্তঃকরণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তুমি চির-জীবী হও ও পরিষদের মুখ উজ্জ্বল কর।

শুদ্ধ পরিষৎ নহে, সমস্ত বাঙ্গালী, এমন কি সমস্ত ভারতবাসী তোমার নিকট অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা করে। তুমি সকল রকমে বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীর উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিতেছ। তাহারা সকলে একবাক্যে তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছে, তুমি চিরজীবী হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির,
কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ৫ই বৈশাখ।

শুভার্থী
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ

বর্ণানুক্রমিক সূচী

পৃষ্ঠা